মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীরা

সম্পাদনা : হায়দার আকবর খান রনো

তরফদার প্রকাশনী

মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীরা

প্রকাশক : মাহবুব আলম, তরফদার প্রকাশনী
২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭১৫-৪৫৬৩২৮, ০১৬৭৩-৫৮৫৪৯২
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৮
প্রচ্ছদ : সৈয়দ লৎফুল হক
বর্ণবিন্যাস : মো. বেলাল হোসেন খাঁন
মুদ্রণ : ইউ এন প্রেস
৪/১ ওয়াল্টার রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
অন-লাইন পরিবেশক : rokomari.com/tarafdar
ফোন : ০১৫১৯-৫২১৯৭১, হট লাইন ৭৬২৯৭
ভারতে পরিবেশক : একুশ শতক
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ ৮০০.০০

Muktijudhe Bampontira
Edited by Haidar Akbar Khan Rano
Pbulished by Tarafdar Prokashoni
2/3 Paridash Road, Dhaka-1100
Bangladesh, Phone : 01715-456328

Price : Taka-800

ISBN 978-984-93324-3-5

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা ৭

মুক্তিযুদ্ধ ও কমিউনিস্ট পার্টি ১৫
মণি সিংহ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা ৩১
রাশেদ খান মেনন

মুক্তিযুদ্ধ চলছে ৪২
মনজুরুল আহসান খান

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল 'জনযুদ্ধ' ৫৭
খালেকুজ্জামান

মুক্তিযুদ্ধ ও চট্টগ্রামের বামপন্থীরা ৬৭
মো. শাহ আলম

কাজী জাফর আহমদ'এর সাক্ষাৎকার ৭১

মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীরা ৮১
হায়দার আকবর খান রনো

মুক্তিযুদ্ধে শিবপুর ১২০
হায়দার আনোয়ার খান জুনো

'৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বামপন্থীদের ভূমিকা ১৬১
অধ্যাপক আবদুস সাত্তার

চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুরে মুক্তিযুদ্ধ ১৭৫
আসাদুজ্জামান

পেয়ারা বাগান ১৮৭
মনির মুরশেদ

আত্রাইয়ের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৮
ওহিদুর রহমান

একাত্তরের যুদ্ধে যশোর জেলা ইপিসিপি (এম-এল)-এর বীরত্বপূর্ণ লড়াই ও জীবনদান ২৪০
নূর মোহাম্মদ

'Bangladesh Wins Freedom' ৩০৬
Farooque Chowdhury

কয়েকটি রাজনৈতিক দলিল

স্বাধীন পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে (১৯৬৮) বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ৩১৬

পূর্ব বাংলার জনতার নিকট কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচি পেশ ৩২১

২২ ফেব্রুয়ারি'র (১৯৭০) ঐতিহাসিক ঘোষণা ৩৪৪

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির ডাক ৩৫০

বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণা ৩৫২

বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ১৬ ডিসেম্বরের (১৯৭১) বিবৃতি ৩৬২

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ও বামপন্থীদের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ৩৬৮
মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

মুক্তিযুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ভূমিকা : আত্মস্মৃতি ৩৯৮
ডা. সারওয়ার আলী

বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধে সিপিআই (এম)-র ভূমিকা ৪০৯
গৌতম দাশ

মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে আসার কয়েকটি ঘটনা

গোলাপের কথা ৪৪৪
হায়দার আনোয়ার খান জুনো

২৫ মার্চ, জগন্নাথ হলের হত্যাকাণ্ড ৪৫৫
আবুল ফজল

মিরেশ্বরাইয়ের বধ্যভূমি থেকে উঠে আসা অবধ্য প্রাণ ৪৬৩
মৃদুল গুহ

লেখক পরিচিতি ৪৭৪

মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীরা

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবজ্জ্বল অধ্যায় হল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। এইদেশের জনগণ সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেছিল। সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছিল ছোট বড় সশস্ত্র বাহিনী। তার মধ্যে জাতীয়তাবাদীরাও ছিলেন, কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরাও ছিলেন। বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল মহান, যারা দেশের ভিতরে থেকে অসম সাহসী যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

একমাত্র মস্কোপন্থী বলে পরিচিত কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপ ভারত সরকারের সাহায্য তো পায়নি, এমনকি ভারতে তাদের অনেকের জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত ছিল। *[এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত আমার একটি লেখায় একটি উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ আছে। কুমিল্লা জেলার কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধা নাজাতকে (সদ্যপ্রয়াত) ভারতের বিএসএফ বিনা কারণে শুধুমাত্র সন্দেহবসে উরুতে বেয়োনেট চার্জ করেছিল। সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফের তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপের ফলে তার জীবন রক্ষা পায়। সুস্থ হয়ে তিনি আবার যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন।]* তবে দলমত নির্বিশেষে ভারতের জনগণের সাহায্য ও সহানুভূতি ছিল অপরিসীম।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এই যুদ্ধে ভারতের পক্ষে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। এই পক্ষে থাকাটা ছিল অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভারত সরকার বাধ্য হয়েছিল সিপিবি-ন্যাপ (মোজাফফর)-ছাত্র ইউনিয়নের তরুণ-যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে। সিপিবি'র এই বাহিনী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। তারা সরাসরি ভারতের সেনাবাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হত।

কোলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের অধীনস্থ মুক্তিফৌজের *(যার*

সর্বাধিনায়ক ছিলেন জেনারেল ওসমানী) কাঠামো তৈরী হয়েছিল পাকিস্তানী সেনাবাহিনী থেকে দলত্যাগী বাঙ্গালী সেনা অফিসার ও সৈনিক, বাঙ্গালী পুলিশ ও ই পি আর সদস্য দ্বারা। এ ছাড়াও ছিল স্বল্পকালীন ট্রেনিং প্রাপ্ত তরুণ যুবকরা যাদের বলা হত FF অর্থাৎ Freedom Fighter.

প্রবাসী সরকারের এই বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে আরও ছিল কাদেরিয়া বাহিনী এবং BLF (Bangladesh Liberation Force) যাকে সাধারণভাবে বলা হয় মুজিব বাহিনী। কাদেরিয়া বাহিনী ও BLF এর উপর বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তারা সরাসরি ভারতের সেনাবাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতো। বলা বাহুল্য, অস্ত্রও দিতো ভারতের সেনাবাহিনী। ছাত্রলীগের থেকে বিশেষভাবে বাছাইকৃতদের দ্বারা এই BLF *(মুজিব বাহিনী)* গঠিত হয়েছিল। তারা বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সুবিধাপ্রাপ্ত ছিলেন। নয় মাসের যুদ্ধের প্রায় শেষের দিকে মুজিব বাহিনীকে দেশের ভিতরে পাঠানো হয়েছিল। তাদের টার্গেট ছিল দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা বাম ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করা। এ ছাড়াও ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের দিকে *(এমনকি ১৬ ডিসেম্বরের পরও)* বিভিন্ন জায়গায় FF এর সঙ্গে মুজিব বাহিনীর প্রায়ই ছোটখাট সংঘর্ষ হয়েছিল।

"কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি" এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টি, গ্রুপ ও ভাসানী ন্যাপ মিলিতভাবে গঠন করেছিল "বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি" *(যদিও মওলানা ভাসানী নিজে অনুপস্থিত ছিলেন)*, যারা দেশের মধ্যে থেকেই পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এর মধ্যে এককভাবে 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'রই ছিল তিরিশ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা। যারা দেশের মধ্যে থেকে যুদ্ধ করেছেন এবং ভারত তাদের কোন অস্ত্র দেয়নি। বরং ভারত সরকার তাদের সন্দেহের চোখে দেখতো। ভারত সরকার ও আওয়ামী লীগের বিশেষ নজর ছিল, যাতে মুক্তিফৌজের মধ্যে বামপন্থীরা প্রবেশ না করতে পারে। তবু ভারত সরকারের সাহায্য ছাড়াই এই বামপন্থীরা যে দেশের অভ্যন্তরে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করেছেন, কোথাও কোথাও মুক্তাঞ্চল গঠন করেছেন, শতাধিক শহীদ হয়েছেন– এইসব খবর বুর্জোয়া প্রচার মিডিয়া একেবারেই উল্লেখ করে না।

এই সংকলনে কয়েকজন বাম ও কমিউনিস্ট নেতা এবং কমিউনিস্ট মুক্তিযোদ্ধার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ লেখা সংকলিত হয়েছে। তার থেকে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের বিশাল ও মহান ভূমিকার পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে। এই সংকলনে কয়েকটি রাজনৈতিক দলিলও স্থান পেয়েছে।

এই সকল লেখা ও দলিল পাঠ করলে এটা বোঝা যাবে যে, সেই সময় বহুধাবিভক্ত কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের মধ্যে কেবল সমন্বয়ের অভাব ছিল তাই-ই নয়, যুদ্ধ প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যও ছিল যথেষ্ট। অবশ্য এই সংকলনে কোন বিতর্কের অবতারণা করা হয়নি। বিভিন্ন প্রবন্ধের লেখকদের দ্বারা পরিবেশিত তথ্য এবং তাদের মন্তব্য একান্তভাবেই সেই সকল লেখকের নিজস্ব।

এই যুদ্ধে চীন পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল। একদা চীনপন্থী বলে পরিচিত কয়েকটি পার্টি *(যেমন "কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি", দেবেন শিকদার- আবুল বাশারের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি)* প্রকাশ্যেই চীনের সমালোচনা করেছিল এবং পাক বাহনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিল।

কিন্তু কোনো কোনো চীনপন্থী ও নকশালপন্থীরা এই যুদ্ধকে "দুই কুকুরের কামড়াকামড়ি" বলে তত্ত্বায়ন করেছিল। এটা যে ছিল জনগণের মহান জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম ছিল তা তারা বুঝতেই পারেননি। তবে বাস্তবতা এমনই ছিল যে ঐ সকল দলের অন্তর্ভূক্ত কোনো কোনো অংশ দলীয় হাই কমান্ডকে অস্বীকার করে পাকিস্তান বিরোধী যুদ্ধে নামতে বাধ্য হন। আত্রাই অঞ্চলের নেতা ওহিদুর রহমান অথবা যশোরের EPCP-ML নেতা নূর মহম্মদের লেখা থেকে তা জানা যায়। এমনকি আমি নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে মার্চ এপ্রিল মাসে কমরেড আব্দুল মতিনের দলের টিপু বিশ্বাস পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহসী যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তারা চীনের ভূমিকার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে লাইন পরিবর্তন করেন।

এমনকি EPCP-ML এর শীর্ষ স্থানীয় নেতা মহম্মদ তোয়াহাও স্বীয় পার্টি লাইনের বিরুদ্ধে গিয়ে নোয়াখালি অঞ্চলে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তিনি স্থানীয়ভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গেও সাময়িক সমঝোতা করেছিলেন বলে জানা যায়। কারণ সেটাই ছিল বাস্তবতা। চর জঙ্গলিয়ায় মহম্মদ তোয়াহা কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন করেছিলেন এবং পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

তোয়াহার মৃত্যুর অনেক পরে তাঁর যে "স্মৃতিকথা" ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল বদরুদ্দিন উমর কর্তৃক সম্পাদিত 'সংস্কৃতি' পত্রিকায় (ডিসেম্বর ২০০২ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০০৩) সেখানে আশ্চর্যজনকভাবে ১৯৭১ সাল সম্পর্কে কিছুই লেখা নেই। স্মৃতিকথায় ৭১ সাল প্রসঙ্গে কিছুই থাকবে না, তা কি করে হয়? হয়তো হতে পারে "স্মৃতিকথার" ঐ পাতাগুলি হারিয়ে গেছে (কারণ লেখাটি পাওয়া গেছে আকস্মিকভাবেই এবং মুহম্মদ তোয়াহার মৃত্যুর অনেক পরে)। কিন্তু বদরুদ্দিন উমর অন্য ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন "..... তৎকালীন পরিস্থিতিতে সে কাজ সঠিক হলেও সেটা ছিল তাদের পার্টির লাইনের বিরোধী। কাজেই এ নিয়ে তোয়াহার পক্ষে কিছু লেখা সম্ভব ছিল না"। *[সেই 'সঠিক কাজ' বলতে বদরুদ্দিন উমর পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকেই বুঝিয়েছেন, যদিও তাঁর নিজের (অর্থাৎ বদরুদ্দিন উমরের) যুদ্ধের ব্যাপারে কোন ভূমিকাই ছিল না।]*

বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের একটি ক্ষুদ্র অংশ বিভ্রান্ত হলেও মুক্তিযুদ্ধে বাম ও কমিউনিস্টদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অস্বীকার করা বা এড়িয়ে যাওয়া হবে ইতিহাসকে অস্বীকার করা।

তবে সামগ্রিকভাবে যুদ্ধে যে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল সেটাকে অস্বীকার করাও হবে ইতিহাসকে অস্বীকার করা। কিন্তু যুদ্ধ পরিচালনায় আওয়ামী লীগের যে বিরাট দুর্বলতা ছিল সেটাকেও বুঝতে হবে। প্রথমত এই দল কোন বিপ্লবী দল ছিল না। যুদ্ধ সম্পর্কে প্রস্তুতি ও কাণ্ডজ্ঞান কিছুই ছিল না। আর ছিল ভারতের উপর পরিপূর্ণরূপে নির্ভরশীলতা। তবে ষাটের দশকে আওয়ামী লীগের একটি ছোট তরুণ অংশের মধ্যে স্বাধীনতা ও সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা দানা বাধতে থাকে। ঘটনাক্রমে এদেরই বড় অংশ নিয়ে মুজিব বাহিনী গঠিত হয়েছিল। *(যাদের অনেকের কমিউনিস্ট ও বাম বিরোধী ভূমিকার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।)*

অন্যদিকে বামপন্থীরা দেশের মধ্যে থাকলেও, সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে অকাতরে জীবন দান করলেও অঞ্চলবিশেষ বাদে সামগ্রিক দেশে তাদের হাতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্পিরিট যেন গোটা জনগণকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেরণা যুগিয়ে চলেছিল।

যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে কি হত তা কেবল অনুমান সাপেক্ষ বিষয়। এইভাবে অবশ্য ইতিহাস বিচার করা যায় না।

এই যুদ্ধ সম্পর্কে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট উল্লেখ করা দরকার।

প্রথমত যুদ্ধটা ছিল পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে। সরাসরি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উপাদান ছিল না *(তাই বলে এই যুদ্ধটি জাতীয় যুদ্ধ ছিল না বা ন্যায় যুদ্ধ ছিল না, এমন সিদ্ধান্তে আসা হবে প্রতিক্রিয়াশীলতা)*। তাই আওয়ামী লীগের পক্ষে রাজনৈতিক নেতৃত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। স্মরণ করা যেতে পারে যে, মাত্র দেড় দশক আগে এই আওয়ামী নেতৃত্ব বিশেষত হোসেন শহীদ সহরোওয়ার্দী সিয়াটো-সেন্টো ও পাক মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিলের দাবি এবং এমনকি পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে অস্বীকার করেছিলেন। যা নিয়ে ভাসানী সোহরাওয়ার্দীর বিরোধ তৈরী হয় এবং ন্যাপ গঠিত হয়। আওয়ামী লীগ চরম দক্ষিণপন্থী পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর অবর্তমানে সেই দলকে কিছুটা নতুনভাবে সংগঠিত করেন এবং বাঙ্গালী

জাতীয়তাবাদে জাগিয়ে তোলেন সমগ্র জনগণকে। কিন্তু তাই বলে রাতারাতি দলটি বিপ্লবী দলে পরিণত হয়নি। এই স্ববিরোধীতা ছিল একটি বাস্তব সত্য। একদিকে ঐতিহাসিক চরিত্র বঙ্গবন্ধুর জনগণের উপর অসামান্য ঐতিহাসিক প্রভাব *(যা ইতিহাসের এক বিরল ঘটনা)* এবং গোটা দেশে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যেমন হবে ভুল, তেমনি ভুল হবে বহু দুর্বলতা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের মহান আত্মত্যাগ ও বিপ্লবী ভূমিকাকে অস্বীকার করা বা খাটো করে দেখা।

দ্বিতীয় যে পয়েন্টটি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল: এই যুদ্ধকে আমরা 'স্বাধীনতার যুদ্ধ' বা 'বিচ্ছিন্নতা'র *(ইংরেজীতে যাকে বলে secession)* জন্য যুদ্ধ তো বলিই না, বরং বলি মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা একটি পতাকা নয় *(সেটাও অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ)*, মুক্তিযুদ্ধ মানে সামগ্রিক মুক্তির জন্য যুদ্ধ যা কেবল সমাজতন্ত্রেই সম্ভব।

বঙ্গবন্ধু যখন বলেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' তখন তিনি মুক্তি ও স্বাধীনতা দুইটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন দুইটি স্বতন্ত্র বিষয়কে বোঝানোর জন্য। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় তিনি তা ব্যাখ্যা করেননি। তবে তখনকার পরিস্থিতিতে তা ছিল খুবই বুদ্ধিদীপ্ত, কৌশলী এবং একই সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ শব্দচয়ন।

গোড়া প্রতিক্রিয়াশীলরা যারা পাকিস্তান সৃষ্টিকেও সমর্থন করেন, আবার ১৯৭১এর যুদ্ধকেও যথার্থ মনে করেন, তাদের মতে এই যুদ্ধ ছিল লাহোর প্রস্তাবের 'প্রকৃত' বাস্তবায়ন। কারণ তাদের মতে, লাহোর প্রস্তাবে একটি নয়, দুইটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রস্তাবনা করা হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে তারা বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা- তারা সকলেই তো পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা ও কর্মী ছিলেন। মাত্র এক প্রজন্মের মধ্যেই এই যে উত্তরণ, পাকিস্তানের জন্য লড়াই করা থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ- এই যে ঐতিহাসিক ঘটনাস্রোত তা বিস্ময়কর হলেও সত্য। একাত্তরের যুদ্ধ দুই মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে শরিকি যুদ্ধ ছিল না কোনভাবেই। বরং লাহোর প্রস্তাবের ও পাকিস্তান আন্দোলনের অবৈজ্ঞানিক ও প্রতিক্রিয়াশীল দ্বিজাতি তত্ত্বকে খণ্ডন করা সম্ভব হয়েছিল বলেই একাত্তরের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

২৪ বছরে জাতির এই যে উত্তরণ- প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক অবস্থান থেকে জাতীয় বিপ্লবের অবস্থানে উত্তরণ, তা সম্ভব হয়েছিল বাম ও কমিউনিস্টদের নিরলস সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে। চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও তারা যে নির্যাতন সহ্য করেছেন সেটা খুবই কম আলোচিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার

পরপরই স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রথম তোলেন মওলানা ভাসানী। পূর্ব পাকিস্তানের আইনসভায় তিনি এই দাবি জোরালো আকারে উত্থাপন করেছিলেন। চরম সাম্প্রদায়িক পরিবেশের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবর্তন করেন ভাসানী ও কমিউনিস্টরা। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনীতি তো তারাই করেছেন। ১৯৫৬ সালে বিখ্যাত কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী একদিকে দৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বক্তব্য তুলে ধরেন অপরদিকে একই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি বিখ্যাত 'আসসালামু আলাইকুম' উচ্চারণ করে বিচ্ছিন্নতার অর্থাৎ স্বাধীনতার হুমকি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁর সেই উচ্চারণ তখন তখনই বাস্তবে রূপ নেয়নি। নিয়েছিল এক দশকেরও পরে। এর কারন দুইটি। প্রথমত দেশ তখনও স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়নি *(বিশেষ করে সোহরোওয়ার্দীর মত নেতার ঘোর বিরোধীতার কারণে যিনি স্বায়ত্তশাসনের পর্যন্ত বিরোধীতা করেছিলেন)*। দ্বিতীয়ত স্বাধীনতার দাবি যখন ভাসানী বা কমিউনিস্টরা তোলেন তখন উঠতি বাঙ্গালী বুর্জোয়াও ভীত হয়ে ওঠে এবং বিরুদ্ধে চলে যায়। তখন শ্রেণী স্বার্থই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু দশ বছর পরে যখন মধ্যমপন্থী জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান *(যার আবার ছিল অসাধারণ ক্যারিজমাটিক ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্বের যোগ্যতা)* এই ধরণের স্লোগান তোলেন *(ছয় দফা)*, তখন এই প্রশ্নে সকল শ্রেণীর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ হয়েছিল।

প্রথম ভাষাভিত্তিক জাতীয় চেতনা তৈরীর ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা ছিল। সেখানেও দেখা যায় কমিউনিস্টদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও মণি সিংহের নেতৃত্বে হাজং বিদ্রোহ, সিলেটের নানকার বিদ্রোহ, ইলা মিত্রের নেতৃত্বে নাচোলের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ভাসানীর ফুলছড়ি কৃষক সম্মেলন ও পরবর্তীতে লালটুপি আন্দোলন, ষাটের দশক জুড়ে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে নতুন ধরণের জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন- এই সকল আন্দোলনকে কেবল শ্রেণী আন্দোলনরূপে আলাদা করে দেখলেই চলবে না। এই সকল আন্দোলনও ভবিষ্যতের বৃহত্তর সশস্ত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরী করেছিল। তাই একই কারণে মুক্তিযুদ্ধের সময়, তার কিছু আগে ও পরে সমাজতন্ত্রের দাবিটিও সামনে এসেছিল। তবে আবারও বলছি, স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব বামপন্থীদের হাতে ছিল না। তার কারণ দুইটি। এক. বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ জনপ্রিয়তা, সাংগঠনিক যোগ্যতা ও অত্যন্ত যোগ্যতা সম্পন্ন নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা। দুই. বামপন্থীদের বেশ কিছু বড় রকমের ত্রুটি, বিভক্তি ও দুর্বলতা।

আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধ বলি, তখন লাহোর প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বকে অস্বীকার করি। আমরা একাত্তর সালে এবং তার বেশ কয়েক বছর আগে

থেকেই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে নতুন করে এবং সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করি, যার মূল ভিত্তি হল ভাষা। বলা যেতে পারে ভাষা আন্দোলন থেকেই এই নতুন চেতনার সূত্রপাত ঘটেছিল। সেইজন্য ১৯৭১এর যুদ্ধের উত্তাপ থাকতে থাকতেই '৭২ সালে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল তাতে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটা স্থান পেয়েছিল।

মুক্তির সংগ্রাম বা মুক্তিযুদ্ধ বললে সহজেই চলে আসবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা এবং সমাজতন্ত্রের প্রসঙ্গটি। পাকিস্তান আমলের চব্বিশ বছরে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা (এবং মওলানা ভাসানী) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা ও সমাজতন্ত্রকে জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষ রাজনীতির মঞ্চে সদর্পে পদক্ষেপ রাখতে পেরেছিল। এই সবই মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরী করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থীদের যে প্রভাব ছিল তাকে অস্বীকার বা খাটো করা হবে ইতিহাসকে অস্বীকার করা। বামপন্থীদের শক্তিশালী প্রভাবের কারণেই সমাজতন্ত্র কথাটি সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে খুব সহজেই স্থান লাভ করেছিল। যদিও সংবিধানের প্রণেতারা (সামান্য দুই একজন নেতা বাদে) সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন বলে মনে করার কোন কারণ নেই। মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে এই সকল প্রশ্ন সামনে চলে আসবে।

তবুও যেহেতু যুদ্ধের সামগ্রিক নেতৃত্ব বামপন্থীদের হাতে ছিল না, ছিল উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে, তাই সমাজতন্ত্র এমনকি ধর্ম নিরপেক্ষতা কেবল কথার কথা হিসেবেই ছিল, বাস্তবায়িত হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ঘটনাবলী ক্রমাগত দক্ষিণদিকে মোড় নিয়েছিল। তাই মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা থেকে আমরা ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছি। এর জন্য বর্তমানের বামপন্থীদের দুর্বলতাও কম দায়ী নয়। এটি অবশ্য একটি স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় যা এই গ্রন্থের অলোচ্য বিষয় নয়।

এই সংকলনে আমরা কোন বিতর্কে যাইনি। প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতা ও কমিউনিস্ট মুক্তিযোদ্ধার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছি। অভিজ্ঞতাগুলি একান্তভাবেই লেখকের নিজস্ব এবং যে মতামত তারা ব্যক্ত করেছেন সেটাও তাদেরই নিজস্ব। এই সংকলনে ব্যতিক্রম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ফারুক চৌধুরীর (Farooque Chowdhury) লেখা একটি ইংরেজী নিবন্ধ 'Bangladesh Wins Freedom'. তাঁর এই লেখাটি কোলকাতা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত মার্কসবাদী কবি সমর সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী ইংরেজী সাপ্তাহিক Frontier এ (Vol. 48, No 27, Jan 10, 2016) ছাপা হয়েছিল। এই নিবন্ধে লেখক পাকিস্তানের মত নয়া উপনিবেশিক রাষ্ট্রে সংকট এবং তার থেকে উদ্ভুত সেই

পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন যা মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরী করেছিল। তিনি দেখাচ্ছেন এই যুদ্ধে জনগণই ছিল আসল বীর।

ভারত ও অন্যান্য দেশের সমাজতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক মানুষের সমর্থন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সহযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তিনটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে কমরেড গৌতম দাশ ভারতীয় নাগরিক, বাস করেন আগরতলায়। তিনি এখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন তরুণ। তবু বাংলাদেশের বাম মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল অনেক বেশী।

"মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা" কয়েকটি অভিজ্ঞতাও এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। সেগুলি পাঠ করলে আজকের প্রজন্ম জানতে পারবে কী বর্বর ছিল পাক হানাদার বাহিনী।

এই সংকলন কোন ইতিহাস গ্রন্থ নয়। তবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার জন্য বেশ কিছু উপাদান রয়েছে এই সংকলনে।

হায়দার আকবর খান রনো
ঢাকা: আগস্ট ২০১৮

মুক্তিযুদ্ধ ও কমিউনিস্ট পার্টি

মণি সিংহ

১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত আমি কারাগারে বন্দী ছিলাম। দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থেকে কাজ করার পর ১৯৬৭ সালে আমি গ্রেপ্তার হই এবং ১৯৬৯ সালের মহান গণ-অভ্যুত্থানের সময় জনগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমার এবং অন্যান্য রাজবন্দীর মুক্তির দাবি দেশের আনাচে-কানাচে ধ্বনিত করে তোলে, সেই পটভূমিতে ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা মুক্তি পাই। কিন্তু সামরিক শাসন জারি ও ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসার পর ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে আমাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর বন্দীরা রাজশাহী জেল ভেঙে আমাকে বের করে নেয়ার আগে পর্যন্ত আমি আটক ছিলাম। কাজেই উল্লেখিত সময়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে পার্টি ও জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামে সরাসরি যোগ দিতে পারিনি। তবে আমাদের পার্টির তখনকার ভূমিকা আমার জানা আছে, সেটা সংক্ষেপে বলছি।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে করা হয়। আমরা নির্বাচনের ফলাফলকে পূর্ব বাংলার জনগণের ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থান এবং একটি আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ রূপে দেখি। আমাদের বিশ্লেষণে বলা হয়েছিল যে-নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ৬-দফার পক্ষে রায়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা আরও বিকাশ লাভ করেছে এবং বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের পার্টি নীতিগতভাবেই

সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠাকে ন্যায্য মনে করে এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের পার্টিই প্রথম বাংলাদেশের জনগণের পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি ধ্বনিত করে।

নির্বাচনের ফলাফল মূল্যায়ন করে আমরা আরও দেখেছিলাম যে-আওয়ামী লীগ কেবল 'পূর্ব পাকিস্তানে'র জনগণেরই সর্বাত্মক সমর্থন পায়নি, তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে গোটা পাকিস্তানের সরকার গঠনের অধিকারও লাভ করেছে। কিন্তু আমরা মূল্যায়নে বলেছিলাম যে-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো এবং এই শাসকদের মদতকারী সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই নির্বাচনের এই ফলাফল মেনে নেবে না, তা বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র করবে। বিশেষত ৬-দফার সঙ্গে ছাত্রসমাজের ১১-দফাও তখন জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল এবং বিজয়ী দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১১-দফাকে সমর্থন দিয়েছিলেন। ১১-দফায় সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়েছে, ফলে তারা ওই নির্বাচনের দাবি কিছুতেই মানতে পারে না। এ কারণে পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সরকার গঠন ছিল অনিশ্চিত এবং এমতাবস্থায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকেই অগ্রসর হবে এবং সে সংগ্রামের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার।

১৯৭০ সালের নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের পার্টির এই বিশ্লেষণ পরবর্তী ঘটনাবলিতে সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ নির্বাচনের ফলাফল বানচালের জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং ভুট্টো প্রমুখের ষড়যন্ত্র পরিষ্কার হয়ে ওঠে এবং জাতীয় সংসদের যে অধিবেশন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী ৩ মার্চ হওয়ার কথা ছিল, তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ওই সময় ২৫ ফেব্রুয়ারি আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক প্রস্তাবে রাজনৈতিক দাবি হিসেবে ঘোষণা মোতাবেক জাতীয় সংসদের অধিবেশন, সেখানে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি সংবলিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ওই শাসনতন্ত্র অনুমোদন ও ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি উত্থাপন করে। সেইসঙ্গে ওই প্রস্তাবে বলা হয় যে, নির্বাচনের রায়কে কার্যকরী করতে দেয়া না হলে বাংলাদেশের জনগণের আন্দোলন একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দিকে যেতে পারে। এ পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য হবে বাঙালির জাতীয়

আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসারে ওই সংগ্রামে শরিক থাকা এবং ওই নীতি অনুসারে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সংগ্রামকে সঠিক পথে চালিত করতে চেষ্টা করা।

১ মার্চ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশন হবে না-এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে আমরা শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র কার্যকর হতে দেখলাম। ওই দিন জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে স্বাধীনতার আওয়াজ তুলল। পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন ছিল যে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতির এই অভ্যুত্থান দমন করার জন্য সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করবে এবং স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হবে। সে জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার।

এ ছিল পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। কিন্তু এটা করেই আমরা বসে থাকিনি। আমাদের পার্টি বেআইনি এবং আত্মগোপনে ছিল। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি গণসংগঠনের মাধ্যমে এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে আমাদের যতটুকু যোগাযোগ এবং সম্পর্ক ছিল তা কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রচারকার্য চালিয়েছি। পার্টির নাম উল্লেখ না করে আমরা 'একতা' নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করেছিলাম, তার মাধ্যমেও আমরা দেশপ্রেমিক শক্তি ও জনগণকে প্রস্তুত করার জন্য প্রচার চালিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে আমরা সম্ভাব্য স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাধ্যমতো আমাদের পার্টি ও জনগণকে প্রস্তুত করে তুলেছিলাম।

১ মার্চের পর ৭ মার্চ রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর জনসমাবেশ থেকে 'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম' বলে ঘোষণা দিয়ে যে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন, আমরা তার পুরোপুরি সমর্থক ছিলাম। ইয়াহিয়া খান যখন ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় বসেন, তখন আলোচনার বিরোধিতা করাকে আমরা যুক্তিসংগত মনে করিনি। কিন্তু আমাদের পার্টির মূল্যায়ন ছিল যে-ওই আলোচনায় কোনো আপসরফা হবে না, কেননা জনগণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী, সাম্রাজ্যবাদীরা এটা মেনে নিতে পারে না। আমাদের পার্টি তখন জনগণের সচেতনতা জাগরুক রাখার জন্য এবং আসন্ন যেকোনো ধরনের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে ঢাকাসহ

সম্ভবমতো দেশের সব জায়গায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, তাদের কুচকাওয়াজ ও ট্রেনিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করি। তখন ছাত্রসমাজের শক্তিশালী প্রগতিশীল সংগঠন 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে' আমাদের পার্টির প্রভাব থাকায় তাদের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউওটিসি'র সহায়তায় তরুণ-তরুণীদের রাইফেল ট্রেনিং ও কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়েছিল। ডেমরা এলাকার কিছু সংখ্যক শ্রমিককেও আমরা স্বেচ্ছাসেবক করে এ ধরনের ট্রেনিংয়ে যুক্ত করেছিলাম। এসব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে দেখিয়ে উদ্বুদ্ধ ও তাদের মনোবল বৃদ্ধি করা এবং সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে মানসিকভাবে সচেতন ও প্রস্তুত করে তোলা।

এক কথায় ওই সময়টাতে আমাদের পার্টির ভূমিকা ছিল অবশ্যম্ভাবী স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাধ্যমতো সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ, জনগণকে সচেতন ও প্রস্তুত করে তোলা। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ২৫ মার্চের আগেই বুঝতে পেরেছিল যে, অবস্থা ক্রমেই সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ করা যায় যে, ৯ মার্চ ঢাকায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের এক বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের যথাসম্ভব প্রস্তুতির জন্য একটি সার্কুলার প্রচার করা হয়েছিল। তবে তখনকার পরিস্থিতিতে কোনো কোনো জেলায় সার্কুলারটি বিলম্বে পৌঁছে এবং পার্টির তখনকার শক্তিসামর্থ্য সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যাপকতর প্রস্তুতির উপযুক্তও ছিল না। সেই পরিস্থিতিতে ২৫ মার্চ জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হয়।

সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ছিল এই যে-জনগণ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে এবং বিশেষত সমগ্র পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং বাঙালির জাতীয় অধিকারের দাবির সঙ্গে ১১-দফায় সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হওয়ায় পাকিস্তানে একটা সরকার গঠন এবং বাঙালির দ্বারা শাসিত হওয়ার অবস্থা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই মেনে নেবে না। কাজেই বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য এবং তা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যাবে। সে জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও প্রস্তুত করাই মুখ্য কাজ এবং তা খুব দ্রুত করতে হবে।

সামগ্রিক অবস্থা মূল্যায়নের আরও একটি দিক আমাদের পার্টির ছিল। তা হচ্ছে, আমরা সচেতন ছিলাম যে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কতক দুর্বলতা থাকবে। মধ্যস্তরের জনগণের যে দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ওই স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল, তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও তার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চেতনার ঘাটতি ছিল এবং শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের সংগঠন-শক্তি ছিল দুর্বল। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আওয়ামী লীগের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আমরা অনিবার্য ঘটনা-ধারায় পিছনে পড়ে না থেকে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংগ্রামের গতিধারায় অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তি ও জনগণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের সচেতন হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় ওই দুর্বলতাগুলো কাটানো প্রয়োজন বলেই তখন সিদ্ধান্ত করেছিলাম। তাছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভের জন্য জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় মুক্তির সমর্থক আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের সমর্থন সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তাও আমরা উপলব্ধি করেছিলাম। উল্লেখ্য যে, ২৫ মার্চের আগেই ঢাকায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভিন্ন দেশে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে পত্র পাঠায়।

স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করা এবং প্রচার চালানোর মাধ্যমে প্রতিরোধের শক্তিগুলোকে প্রস্তুত করার চেষ্টার কথা আগেই বলা হয়েছে। ২৫ মার্চ পাকবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হলে আমাদের পার্টির ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-স্বেচ্ছাসেবকরা যেখানে যতটুকু সম্ভব হয়েছে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ প্রভৃতি দেশপ্রেমিক শক্তির সঙ্গে মিলিতভাবে প্রতিরোধরত বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর বাহিনীর সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ এই প্রাথমিক প্রতিরোধ ভেঙে পড়লে প্রথমে শহর থেকে গ্রামে এবং পরে বাধ্য হয়ে আমাদের কর্মীরা ভারতে চলে যায়। তারা আমাদের পার্টি, গণসংগঠনের সমর্থক ও ইচ্ছুক তরুণদেরও সংগঠিত করে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিংয়ের জন্য ভারতে নিয়ে যেতে থাকেন। অনেক বিপন্ন পরিবারও ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

সীমান্ত অতিক্রম করার প্রাক্কালে আমি রাজশাহী জেলে বন্দী ছিলাম। বাইরে সমগ্র জাতি যে মুক্তির জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে, তা বুঝতে পারতাম। বুঝতে পারতাম সামনে অপেক্ষা করছে এক নিদারুণ রক্তাক্ত সংগ্রাম। রাজশাহী

শহরে ইপিআর-এর ক্যাম্প ছিল। পাকবাহিনীর ক্যাম্পও ছিল। ২৫ মার্চ পাকবাহিনী ইপিআর ক্যাম্প আক্রমণ করে। ইপিআর প্রতিরোধ করে। আমি গোলাগুলির আওয়াজ শুনি এবং কিছু কিছু গোলাগুলি জেলখানার কাছে এসে পড়তে থাকে। ফলে বন্দীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। গোলাগুলির মধ্যে পড়ে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু ঘটতে পারে। অন্য সকলে আমাকে এসে বলে যে আপনি ডিআইজিকে বলুন জেলের গেট খুলে সকলকে মুক্ত করে দিতে। আমি ডিআইজিকে বললাম, কিন্তু তিনি রাজি হন না। তখন বন্দীরা সিদ্ধান্ত নেয়, জেল ভেঙে বের হবে। বাইরে জনতাও জেল ভাঙা সমর্থন করে। বন্দী ও জনতা মিলে জেলের ময়লা ফেলার দরজা ভেঙে ফেলে। আমরা বের হয়ে আসি। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন। জনতাই আমাদের পদ্মা নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে নৌকায় উঠিয়ে দেয় এবং বলে যে, শহরে থাকা আপনাদের জন্য নিরাপদ নয়, আপনারা নদীর ও-পারে চলে যান। নৌকাযোগে নদী পার হয়ে বুঝতে পারি যে, আমরা ভারতের মাটিতে পা দিয়েছি। কারণ পদ্মার ওপারেই ভারত।

এই সময়ে জেলের ভেতরের বিচিত্র কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু মার্চ মাসের একটি অসাধারণ ঘটনা ছিল। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে ডাক দেয়ার পর ওই ভাষণ এবং ঘোষণার জন্য আমি বন্ধবন্ধুকে অভিনন্দন ও সমর্থন জানিয়ে রাজশাহী জেল থেকে একটি টেলিগ্রাম করতে চাই। জেল কর্তৃপক্ষ বলেন যে, 'আপনি তো টেলিগ্রাম করতে পারবেন না, কারণ আপনি ডেটিনিউ। আপনার টেলিগ্রাম পাঠাতে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অনুমোদন লাগবে।' আমি বললাম, 'তবে অনুমোদন নিয়ে আসুন।' তারা বললেন যে, 'এখন অনুমোদন আনা যাবে না, কারণ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে কেউ কাজ করছে না, তারা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে।' পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগও অসহযোগ আন্দোলনে শরিক হয়েছে এমন অভিজ্ঞতা আমার রাজনৈতিক জীবনে ইতিপূর্বে আর ছিল না। তখন জেলের ভেতর থেকে আমি বুঝতে পারি যে, সমগ্র জাতি স্বাধীনতার জন্য কতখানি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

প্রতিরোধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে আমাদের আত্মগোপনরত পার্টির সম্পর্ক ছিল। বিশেষত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)-এর সঙ্গে আমাদের পার্টির ঐতিহ্যগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

ছিল। ন্যাপের অসাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সমাজতন্ত্রের সমর্থক ভূমিকার জন্য আমাদের পার্টির সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক ও নীতিগত মিল ছিল বেশি। অসহযোগ আন্দোলন, প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে ন্যাপের (এবং ছাত্র ইউনিয়নের) সঙ্গে মিলিতভাবে আমাদের পার্টি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে। অনেক স্থানে একত্রে ক্যাম্প করা হয়।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে ১৯৬০-৬১ সাল অর্থাৎ আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সূচনা থেকেই আমাদের পার্টির সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ছিল। আমাদের পার্টি আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব সময়টাতে আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়ে আমাদের মতবিনিময় ও পরামর্শ হয়েছে। ১৯৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানি শাসকরা যে মেনে নেবে না এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য এবং তা সশস্ত্র সংগ্রাম হতে পারে-এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের পার্টি ঐকমত্যে পৌঁছেছিল। বঙ্গবন্ধু আমাদের বলেছিলেন যে, সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থনের জন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতা তাঁর জন্য মূল্যবান হবে, কেননা আওয়ামী লীগের এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগের অভাব রয়েছে। বঙ্গবন্ধু আজ বেঁচে নেই। তিনি ঘাতকের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁর স্মৃতিকে স্মরণ করে আমি বলতে চাই যে, কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তিনি যে মূল্যায়ন ও প্রত্যাশা করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে আমরা তা পূরণ করতে পেরেছি। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে আওয়ামী লীগ প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঘোষণা করার পর পরই দেশের ভেতরে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সম্পাদকমণ্ডলীর উপস্থিত সদস্যরা এক বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বাগত জানায় এবং প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার কথা ঘোষণা করে। আমাদের পার্টির ওই প্রথম প্রকাশ্য বিবৃতি বিদেশে সংবাদপত্র ও বেতারে প্রচারিত হয়েছিল। এর ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্টির ভূমিকা দেশে-বিদেশে জনগণ জানতে পারে। আমাদের পার্টির বহু সদস্য-সমর্থক বাংলাদেশ সরকারের অধীনে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং গ্রহণ করে। তবে এক্ষেত্রে সরকার ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে পার্টির কিছু কিছু দ্বিমত ও সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল।

অন্যান্য দলের মধ্যে কাজী জাফর আহমেদ ও রাশেদ খান মেননদের দলের

সঙ্গেও আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়। এরা মাওবাদী নীতি অনুসরণ করলেও ২৫ মার্চের পর সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যায়। এরা স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন দিলেও আওয়ামী লীগের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাধীনতার শক্তিগুলোর ঐক্য এবং স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক শত্রু-মিত্র সম্পর্কে এদের নীতির সঙ্গে আমাদের প্রভূত পার্থক্য ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে এঁরাসহ কিছু মাওবাদী শক্তি আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে একটি 'বামপন্থী ফ্রন্ট' গঠনের যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তাকে আমরা বিভেদাত্মক ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল করার প্রয়াসী বলে ভ্রান্ত মনে করে প্রত্যাখ্যান করি এবং আওয়ামী লীগসহ জাতীয় ঐক্য গঠনের নীতি অনুসরণ করি। স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী দলগুলোকে আমরা শত্রু বলে মনে করি।

২৫ মার্চের পরে জেল ভেঙে মুক্ত হওয়ার পর কয়েকজন সহকর্মীসহ আমার নিরাপত্তা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন উপলব্ধি করে জনতাই আমাদের ঠেলে নিয়ে পদ্মা পার করিয়ে দেয়-এ কথা আগেই বলেছি। কাজেই দেশের ভেতরে আমাদের পার্টির সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকতে পারিনি।

আমাদের পার্টির অন্য নেতারা ২৫ মার্চের পর, সঙ্গে সঙ্গেই দেশত্যাগ করেননি। তাঁরা পরিস্থিতি অনুযায়ী ভেতরে থেকে প্রতিরোধ সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। অচিরেই ঢাকায় থাকা অসম্ভব এবং সকলের থাকা অপ্রয়োজনীয় মনে হলে আমাদের পার্টির নেতৃবৃন্দ তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম, খোকা রায়, মোহাম্মদ ফরহাদ, জ্ঞান চক্রবর্তী, সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক, মনজুরুল আহসান খান প্রমুখ ঢাকা জেলার বেলাবো থানার রায়পুরায় ঘাঁটি করে অবস্থান করেন। কিছু কমরেডকে অধিকৃত রাজধানীতে রেখে যাওয়া হয়। রায়পুরা এলাকা পাকবাহিনীর পদানত হলে আমাদের নেতৃবৃন্দ ভৈরবের দিকে আশুগঞ্জে সরে গিয়ে অবস্থান নেন। নেতৃবৃন্দ দেশে থেকে পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ে সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং পুনর্গঠিত হয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ ভূমিকা পালনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। আশুগঞ্জে বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিরোধ ভেঙে পড়লে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে নেতৃবৃন্দের থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং প্রকৃতপক্ষে এলাকার জনগণ তাঁদেরকে ক্রমে সীমান্তের দিকে নিয়ে যায়। সীমান্ত অতিক্রম করার আগেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিভিন্ন জেলা সংগঠনের জন্য

নির্দেশ দিয়ে ক্যাডার পাঠাতে সক্ষম হন।

পাকবাহিনীর আক্রমণ, নির্বিচার গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ প্রভৃতির মুখে সীমান্ত এলাকার জেলাগুলো থেকে হাজার হাজার মানুষ ভারতে চলে যায়। আমাদের পার্টির বহু কর্মী-সমর্থক সপরিবারে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়। অন্যান্য দলের রাজনৈতিক কর্মীরাও চলে যায়। আমাদের হিসাবে আমাদের পার্টির নেতা, সমর্থক ও কর্মীগণ এবং তাদের পরিবারবর্গ মিলিয়ে প্রায় ৬ হাজার নর-নারী পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও মেঘালয় এই তিনটি ভারতীয় রাজ্যে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় গোটা পার্টির সংগঠন সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন জেলায় দেশের মধ্যেও আমাদের কিছু কমরেড থেকে গিয়েছিলেন। প্রবাসে সকলের জন্য আশ্রয়, খাদ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, ভেতরে-বাইরে সকল পর্যায়ে পার্টির সংগঠনের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করা, সংগঠন গুছিয়ে নেয়া এবং সর্বোপরি কালবিলম্ব না করে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা প্রভৃতি অত্যন্ত দুরূহ কাজ তখন পার্টির সামনে ছিল। আমাদের নেতা-কর্মীদের সবকিছু দৃঢ়তার সঙ্গে হাসিমুখে সহ্য করা, অসম সাহসিক প্রয়াস এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তির সাহায্যের ফলে অতি অল্প সময়ে আমরা কাজগুলো গুছিয়ে তুলি।

এ পর্যায়ে আমাদের সংগঠিত হওয়ার কাজের ধারাগুলো ছিল সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(ক) কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ ক্যাম্প স্থাপন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের সহায়তায় সীমান্তবর্তী ভারতের তিনটি রাজ্যে তাদের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা।

(খ) দু ধরনের ক্যাম্প ছিল-পার্টির বয়স্ক সদস্যদের পরিবারবর্গসহ আশ্রয়ের জন্য এবং তরুণদের জন্য যাদেরকে লড়াইয়ের উপযুক্ত মনে করা হবে ও ট্রেনিং দিয়ে পাঠানো হবে।

(গ) ক্রমশ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সহায়তা গ্রহণ এবং আমাদের ক্যাম্পে সংগঠিত তরুণদের সরকারের মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিংয়ে প্রেরণ।

(ঘ) আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের মিলিত একটি নিজস্ব গেরিলা বাহিনী গঠন। এতে প্রথমে ট্রেনিংদানে প্রভূত 'টেকনিক্যাল' অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। কিন্তু পরে ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে তা গঠন করা সম্ভব হয়।

(ঙ) আগরতলায় এবং মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে কলকাতায়ও কেন্দ্রীয় কমিটির

কার্যালয় গঠন করে কাজ করা।

(চ) আমাদের নিজস্ব গেরিলা বাহিনীকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই দেশের ভেতরে যুদ্ধ করতে পাঠানো।

(ছ) দেশের ভেতরের কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অনুপ্রবিষ্ট গেরিলাদের সহায়তা প্রদান।

(জ) আমাদের ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা তরুণদের রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা।

(ঝ) কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করে তা সকল ক্যাম্পে, শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এবং দেশের ভেতরেও প্রচারের ব্যবস্থা করা।

আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়ন গেরিলা বাহিনীতে ৫ হাজার তরুণকে ট্রেনিং দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে পাঠানো হয়। এ ছাড়া আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা ১২ হাজার তরুণ সংগ্রহ ও সমাবেশ করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিবাহিনীতে পাঠাই। অর্থাৎ আমরা মোট ১৭ হাজার তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং ও যুদ্ধের জন্য সংগঠিত করি। তবে যুদ্ধের পরে এই তরুণরা অনেকে লেখাপড়া, অনেকে চাকরি, কৃষিকাজ ও ব্যবসা প্রভৃতি নিজ নিজ পেশায় ফিরে যায় এবং রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ছিল না।

ভারতে যাওয়ার পরই ১৯৭১ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি মিলিত হয়ে প্রথমে স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌলিক চরিত্র, সংগ্রামের শক্তি ও শত্রু-মিত্র সম্পর্কে একটি দলিল গ্রহণ করেছিল। ওই দলিলে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের স্বরূপ নির্দেশ করে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামকে জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম বলে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে স্বাধীনতার জন্যে জনগণের দৃঢ় একতা এবং মুক্তিবাহিনীর বীরত্ব ও ত্যাগ আমাদের প্রধান শক্তি। প্রতিবেশী ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক শিবির, বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলন ও স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও প্রগতিকামী শক্তি আমাদের বন্ধু ও অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, মাওবাদী চীন ও দুনিয়ার অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলেরা পাকিস্তানের সমর্থক ও আমাদের স্বাধীনতার শত্রু বলে মূল্যায়ন করেছিল। এই মূল্যায়ন সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

মে মাসের পরেও মাঝেমধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা করা সম্ভব হয়েছে। যদিও আমাদের কমরেডরা ভারতের তিনটি রাজ্যে ও দেশের মধ্যে ছড়িয়ে থাকায় তা কষ্টসাধ্য ছিল। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয় তিনটি রাজ্যেই সীমান্তবর্তী শহরে আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ ক্যাম্প

ছিল। দু ধরনের ক্যাম্প ছিল। পার্টির বয়স্ক সদস্যদের পরিবারবর্গসহ এবং যুদ্ধে পাঠানোর জন্যে তরুণদের 'ইয়ুথ ক্লাব'।

দেশ থেকে যাওয়ার সময়ে আমাদের কমরেডদের সঙ্গে যে সামান্য অর্থসম্পদ ছিল, তাই ছিল আমাদের প্রাথমিক সহায়। পরে ভারতীয় নাগরিকদের দ্বারা গঠিত সহায়ক কমিটি থেকে আমরা অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য পেয়েছিলাম। আমাদের প্রতিষ্ঠিত কিছু ক্যাম্প আমরা বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মিলিয়ে দিয়েছিলাম। পরে অল্প সংখ্যক ক্যাম্পই আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

এছাড়া ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় প্রবাসী আমাদের পার্টির সমর্থকেরা অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করে পাঠাতেন। বাংলাদেশে পাকবাহিনীর নৃশংসতা ও বাঙালিদের সাহসিক যুদ্ধের খবর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে ছাপা হওয়ার পর সারা দুনিয়াময় আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। এ পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধের শেষের মাসগুলোতে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য সংগ্রহের কাজটা আমাদের কমরেডরা সমন্বিত করে পাঠাতেন।

আমাদের ক্যাম্পে সংগঠিত তরুণদের অধিকাংশকেই যেহেতু মুক্তিবাহিনীতে পাঠিয়ে দেয়া হতো, তাই খরচের বোঝা আমাদের বহন করতে হয়নি। আর আমাদের নিজস্ব গেরিলা বাহিনীর ছেলেরা দেশের ভেতরে এসে জনগণের সহায়তায় আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা করত।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের কিছু সম্পর্কের কথা আগেই বলেছি। সবচেয়ে বড় ঐকমত্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে তা অর্জনের প্রশ্নে আমরা একমত ছিলাম।

আমরা আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তির বৃহত্তম ঐক্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলাম। এই প্রচেষ্টা তেমন সফল হয়নি। শেষের দিকে বাংলাদেশ সরকারের 'পরামর্শদাতা কমিটি' গঠিত হয় এবং তাতে আমাদের পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে আমি ছিলাম। সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্রগতির পর্যায়ে আমাদের উভয় দলের দৃষ্টিভঙ্গিগত কিছু পার্থক্য ছিল। আমরা মুক্ত এলাকা গড়ে তুলে সেখানে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতি গ্রহণ ও কার্যকরের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের মডেল জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতাম এবং ওই রকম রণকৌশলের কথা বলতাম। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেবল সাধারণ জাতীয়তাবাদী

দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতাম না। মেহনতি মানুষ শোষণ ও নির্যাতনমুক্ত সুখী জীবন গড়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে স্বাধীনতা চাইত। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের দৃঢ় ও শক্তিশালী রূপে সংগঠিত হওয়ার লক্ষ্য সামনে রেখেছিলাম। মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে পারলে সারা দেশের মেহনতি মানুষ আরও উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে আসত। আমরা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজস্ব শক্তির ওপর নির্ভর করার ওপর জোর দিতাম। এই সকল বিষয়ে আওয়ামী লীগের স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

আওয়ামী লীগের একাংশের তরুণদের দ্বারা 'মুজিব বাহিনী' নামে পৃথক একটি বাহিনী হবার পর তাদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে আমাদের সমর্থক গেরিলাদের দেশের ভেতরে প্রেরণের প্রশ্নে সরকারের সঙ্গে আমাদের কিছু অসুবিধা দেখা দিত। এসব সমস্যা সমাধানের জন্যে পরে একটি কোওর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়েছিল।

তবে সার্বিকভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। কমিউনিস্টরা সবসময় তাদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য হিসেবেই যেকোনো জাতির ন্যায্য সংগ্রাম-জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন করে। এই নীতি থেকে বস্তুত আমাদের প্রচেষ্টা ছাড়াই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং বাংলাদেশের পক্ষে ভারতে জনমত গঠনে প্রভূত সহায়তা করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিশেষত পাকবাহিনীর নিষ্ঠুর নির্যাতন ও গণহত্যা এবং প্রায় এক কোটি ছিন্নমূল নারী ও শিশুর ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি ভারতের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে গভীর আবেগ সৃষ্টি করেছিল। তারা, বিশেষত সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে বাংলাদেশের শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই জনমতকে আরও বিস্তৃত ও সংহত করার জন্যে অবদান রেখেছে। ভারতের বিরোধী দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কিছু কিছু বিভ্রান্তি ও বিরুদ্ধ মত ছিল। কোনো কোনো প্রশ্নে কংগ্রেসেরও দোদুল্যমানতা ছিল। এক্ষেত্রে ভারতের অভ্যন্তরে একটি রাজনৈতিক লড়াই ছিল। এই লড়াইয়ে বাংলাদেশের পক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)-এর ভূমিকা দ্বারা

আমাদের সংগ্রাম লাভবান হয়েছে।

আগেই বলেছি, ২৫ মার্চের আগেই আমরা ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর কাছে আমাদের সম্ভাব্য স্বাধীনতা সংগ্রামের সহায়তায় জন্যে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে চিঠি পাঠাই। এরপর ভারতে যাবার পর মে মাসে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্য সিপিআইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের কোচিনে অনুষ্ঠিত সিপিআইয়ের কংগ্রেসে আমাদের পার্টির একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়েছিল এবং সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত জানানোর সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আগে থেকেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছিল।

সকলেই জানেন যে রণক্ষেত্র থেকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের টেবিল পর্যন্ত সর্বত্র প্রতিবেশী ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং আন্তর্জাতিক প্রগতি ও শান্তির শক্তিসমূহের সক্রিয় সমর্থন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। আমাদের পার্টিই এপ্রিল মাসে উদ্যোগী হয়ে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রমেশ চন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সহায়তায় তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বিদেশ পাঠায়। এই দলের সদস্য ছিলেন আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ, ন্যাপের দেওয়ান মাহবুব আলী (ফেরার পথে দিল্লিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন) এবং কমিউনিস্ট পার্টির ডা. সারোয়ার আলী। এই শান্তি প্রতিনিধিদল ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানী সফর করে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের কাছে ইয়াহিয়া বাহিনীর ভয়াবহ গণহত্যা এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় তুলে ধরেন। তখন পর্যন্ত কলকাতা ছাড়া বিদেশের কোথাও বাংলাদেশ সরকারের মিশন গঠিত হয়নি।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতে বিদেশে এমনকি প্রগতিশীল মহলেও নানারকম প্রশ্ন বিদ্যমান ছিল। বিদেশে পাকিস্তানিদের মিথ্যা প্রচার খণ্ডন করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণের রায়ের প্রকৃত তাৎপর্য এবং আমাদের সংগ্রাম যে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা' নয় ও জনগণের ব্যাপক সমর্থনপুষ্ট

ন্যায্য সংগ্রাম-এই কথাও বিদেশে প্রচারের প্রয়োজন ছিল। অন্য দেশের মুসলমানদের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে 'মুসলিম দেশ পাকিস্তান ভাঙার জন্যে অন্য দেশের ষড়যন্ত্র' বলেও বিভ্রান্তি ছিল। আমরা চিঠিপত্র ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে এইসব ভ্রান্তি মোচনের চেষ্টা করেছি। সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হবার কিছুকাল আগে থেকেই আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে- আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল শক্তিসমূহ, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সমর্থন ও সাহায্য ব্যতীত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের মাওবাদী নেতৃত্বের সমর্থনপুষ্ট বর্বর ইয়াহিয়া চক্রকে পরাভূত করা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করা সম্ভব হবে না। তাই আমাদের পার্টি স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন ও সাহায্যের আবেদন জানিয়ে দুনিয়ার ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কাছে বিশদ চিঠি পাঠানোর এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে দুনিয়ার সকল প্রগতিশীল জনমত সমবেত করার জন্যে ও অন্য সকল সম্ভাব্য পন্থার জন্যে চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত মতে প্রথমে পাকবাহিনীর গণহত্যা শুরু হবার আগে ১৪ মার্চ এবং সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হবার পরে মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিসহ দুনিয়ার প্রায় সকল কমিউনিস্ট পার্টির নিকট চিঠি পাঠানো হয়েছিল। আমাদের পার্টির সে চিঠি হতেই বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলন ও দুনিয়ার বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের মাধ্যমে জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও মুক্তি সমর্থনকারী শান্তি ও প্রগতির শক্তিসমূহ এবং গণতান্ত্রিক জনগণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেয়েছিল। এটি বিশ্ব-জনমত গড়ে ওঠার এবং আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বের গণমাধ্যমে প্রচারে সহায়ক হয়েছিল।

কোচিনে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যে কংগ্রেসের কথা আগে বলেছি, সেখানে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল ২২টি ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তাছাড়া শান্তি আন্দোলন ও অন্যান্য প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সমর্থন পাবার চেষ্টা আমাদের পার্টি করেছে। আমরা বলতে পারি যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে সমবেত করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি যথোচিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে যথাসাধ্য

অবদান রেখেছে। বিশ্ব-জনমত গঠনের ক্ষেত্রে এবং তার কার্যকর ভূমিকা সুসংহত করতে আমাদের পার্টির অবদানই সবচেয়ে বেশি।

স্বাধীনতা যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্যে একটি অপরিহার্য শর্ত ছিল সমগ্র জাতির একতা এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে স্বাধীনতার সকল শক্তি বিশেষত আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতার প্রয়োজন ছিল। আমাদের পার্টি স্পষ্টভাবে এইসব রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আওয়াজ তুলেছিল এবং সে ফ্রন্ট গঠনে অবিরাম প্রচেষ্টা নিয়েছিল। বিশ্ব-জনমত ও ভারতের জনমতও বাংলাদেশের নিকট এরূপ জাতীয় ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চাচ্ছিল। আওয়ামী লীগ এ ধরনের জাতীয় ঐক্য গঠনের গুরুত্ব বিলম্বে উপলব্ধি করে। পাশাপাশি কয়েকটি মাওবাদী উপদল আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে তথাকথিত 'বামপন্থী ফ্রন্ট' এর নামে বিভেদাত্মক আওয়াজ তুলেছিল। এই দুই মনোভাবের বিরুদ্ধেই আমাদের পার্টির ঐক্যের নীতি তথা জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের নীতি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথমদিকে কার্যকর হয়নি। যুদ্ধ শুরু হবার কিছুকাল পরে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেসের প্রতিনিধি ও ব্যক্তিগতভাবে মওলানা ভাসানীকে নিয়ে তদানীন্তন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের একটি 'পরামর্শদাতা' কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটিতে আমাদের পার্টির প্রতিনিধি ছিলাম আমি।

এই পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের গুরুত্ব ছিল এই যে-স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টিসহ দেশপ্রেমিক শক্তি যে একতাবদ্ধ সেটা প্রত্যক্ষভাবে দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করা গিয়েছিল। বিভিন্ন দলের সমন্বয় নিয়ে ওই কমিটি দেশের ভেতরে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মনে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। আমাদের পার্টি 'পরামর্শদাতা কমিটি' গঠনকে স্বাগত জানিয়েছিল। তবে ওই কমিটি তেমন কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি এবং ওই ঐক্যের উচ্চতর কোনো বিকাশও ঘটেনি। এ বিষয়ে প্রধানত গুরুত্ব উপলব্ধিতে আওয়ামী লীগের দুর্বলতা ও অনুৎসাহ ছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের সম্মিলিত একটি পৃথক গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই বাহিনী গঠন, ব্যবস্থাপনা, ভারত সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ প্রভৃতির সামগ্রিক দায়িত্ব ছিল আমাদের পার্টির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদের ওপর। আমাদের গেরিলা

টিম সকল জেলায় পাঠানো হয়েছিল। খোদ ঢাকা, রায়পুরা, কুমিল্লা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, রংপুরসহ উত্তরবঙ্গের কয়েক স্থানে আমাদের গেরিলা টিম অ্যাকশন করেছে এবং রণক্ষেত্রে আমাদের কমরেডরা প্রাণ দিয়েছেন। যাঁরা ভারতে যাননি, সেই কমরেডরা দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধের সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন এবং এঁরাই ভারত থেকে আগত গেরিলাদের অ্যাকশনে সাহায্য করেছিলেন। এখন বয়সের কারণে কোন সময়ে কোথায় কোথায় আমাদের টিম কীরূপ অ্যাকশন বা লড়াই করেছিল, তা স্মৃতি থেকে আমার পক্ষে বিশদ বলা সম্ভব নয়। আমরা নিজেরা এবং বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় সাধ্যমতো সারাদেশে যুদ্ধরত ছিলাম। যুদ্ধ ছাড়া সংবাদ বহন, রেকি করা প্রভৃতি যুদ্ধের সহায়ক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ আমাদের কমরেডরা করেছেন। কেবল নিচু পর্যায়ে নয়, উঁচু পর্যায়েও যুদ্ধের সংগঠনে আমাদের ভূমিকা ছিল। ছোটখাটো গেরিলা অ্যাকশন ছাড়া আমাদের গেরিলারা চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানি জাহাজ ডুবিয়েছিল। কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে বেতিয়ারা নামক স্থানে আমাদের কমরেড আজাদ, মুনির প্রমুখ আমাদের গেরিলা বাহিনীর ৯ জন সদস্য পাকবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে নভেম্বর মাসের ১১ তারিখে নিহত হন।

মুক্তিযুদ্ধকালে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শহীদুল্লা কায়সার ঢাকায় আলবদর বাহিনীর হাতে নিহত হন।

মার্চ ১৯৮৪

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা

রাশেদ খান মেনন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা নিয়ে বিশেষ কিছু লেখা হয়নি। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনায়ও সে সম্পর্কে কমই উল্লেখ হয়। বরং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাম কমিউনিস্টদের একাংশের ভ্রান্ত অবস্থানের কারণে তাকে উল্লেখ করেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের ভূমিকা পুরোপুরি অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়। অথচ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নয় মাসে সংঘটিত হয়েছে কেবল নয়, '৪৮ থেকে বস্তুত: পাকিস্তানে চলে আসা পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত রূপ ছিল সেটি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই এই লড়াই শুরু হয়। যাত্রা শুরু থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁক মোড়ে বামপন্থীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। একেবারে যাত্রা শুরুর কথা যদি বলতে হয় তা'হলে মওলানা ভাসানীর কথা বলতে হয়। তিনি ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন। তখনও তিনি মুসলিম লীগে। আসাম থেকে পূর্ব বাংলায় এসে তিনি রাজনীতি শুরু করেছেন। ১৯৪৯ সালে মুসলিম লীগ ছেড়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। এদেশের বামপন্থীদের, যার মাঝে কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল প্রধান, তখন চরম দুর্দিন। ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই তৎকালীন সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি- যাতে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন- 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়, লাখো ইনসান ভুখা হায়, সাচ্চা আজাদী ছিনকে লও' বলে বিপ্লবের যে রণকৌশল নিয়েছিলেন জনগণের কাছ থেকে কোন সাড়া না পাওয়ার কারণে

একদিকে যেমন তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তারা তেমনি সম্মুখীন হয়েছিলেন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর চরম নিপীড়নের। এই অবস্থায় এদেশের কমিউনিস্টরা মওলানা ভাসানী ও তার প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্য থেকে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। অন্যদিকে যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করে ছাত্র-তরুণদের সংগঠিত করতে শুরু করেন। ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাতে এই যুবলীগেরই ছিল অগ্রণী ভূমিকা। ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্ব লক্ষ্য করলে নব উত্থিত বামপন্থী তরুণদের এই ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত ভাষা আন্দোলন, বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলীতে এদের ভূমিকা প্রাধান্যে ছিল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা প্রণয়নে, চুয়ান্ন'র নির্বাচনের কর্মী শিবিরসমূহে, পঞ্চাশের প্রথমার্ধব্যাপী স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে, কাগমারী সম্মেলনে, যেখানে মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানকে তার ঐতিহাসিক 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়েছিলেন, বামপন্থীরা ছিল প্রধান ভূমিকায়। কলকাতা পার্টি কংগ্রেসে ১৯৪৮ সালে ভারত ও পাকিস্তানে দুটি আলাদা পার্টি করার সিদ্ধান্ত হয় এবং সারা পাকিস্তানভিত্তিক কেন্দ্রীয় কমিটিও গঠন করা হয়। কিন্তু সারা পাকিস্তানভিত্তিক পার্টির ঐ কেন্দ্রীয় কমিটি কখনও বসতে পারেনি। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি এই উপলব্ধিতে উপনীত হয় যে পাকিস্তানের দুই অংশের একই সাথে বিপ্লব হবে না। কার্যত: ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ভাগ হয়ে পাকিস্তান পার্টির পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটি প্রথম থেকে একেবারে আলাদাভাবেই তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছিল। ইতোমধ্যে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি সাধারণ দাবিতে পরিণত হয়েছিল। কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি বেলুচিস্তান, সিন্ধু প্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতেও সোচ্চার ছিল।

এখানে ইতিহাসের একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা'হল ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গ্রহণ করা হয়। ঐ সংবিধানে পূর্ব বাংলার সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি বিসর্জন দিয়ে সংখ্যা সাম্যনীতি গ্রহণ করা হয় এবং পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে দুই ইউনিট হিসাবে গণ্য করা হয়। এই সাথে পূর্ব বাংলার নামটিও পাল্টিয়ে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়। মওলানা

ভাসানী ও বামপন্থীরা এই সংখ্যাসাম্য নীতির ঘোর বিরোধিতা করেন। অপরদিকে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই সংখ্যাসাম্যনীতির প্রবক্তাই ছিলেন না কেবল, তারপক্ষে ওকালতিও করেন। এর বিরোধীতাকারীদের কমিউনিস্ট বলে আখ্যায়িত করেন। পরবর্তীতে কয়েকমাসের জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে সোহরাওয়ার্দী ঢাকা এসে বক্তৃতা করে বলেন পূর্ব পাকিস্তানের ইতোমধ্যে আটানব্বই ভাগ স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই সংখ্যাসাম্যনীতি গ্রহণ না করলেও সোহরাওয়ার্দীর প্রতি তার আনুগত্যের কারণে তার পক্ষেই অবস্থান নেন। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তফ্রন্টের পক্ষে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ *(এক্ষেত্রেও সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ব্যাখ্যা ছিল- 'জিরো প্লাস জিরো ইকুয়ালটু জিরো')*। এ দুই বিষয় বিশেষভাবে আওয়ামী লীগে বিভক্তি ডেকে নিয়ে আসে। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বামপন্থীরা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে (ন্যাপ) সংগঠিত হন ও পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে অটল থাকেন। এসময় তাদেরকে ভারতের দালাল, যুক্তবাংলার সমর্থক বলে আওয়ামী লীগ অভিযুক্ত করত।

এ পর্যায়ে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারীর মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী তাদের ক্ষমতাকে আরো কেন্দ্রীভূত করে এবং পূর্ব বাংলার উপর জাতিগত নিপীড়ন তীব্র থেকে তীব্রতর করতে থাকে। সামরিক শাসক আয়ুব খানের দশ বছরের শাসনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দৃশ্যমানভাবে এমন বেড়ে যায় যে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ক্রমাগত প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। ষাটের দশকের যাত্রা শুরুতেই এই অঞ্চলের ছাত্র, সংস্কৃতিককর্মী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরা পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য, বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও সর্বোপরি গণতন্ত্রের দাবিকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে নিতে থাকে। বস্তুত; এই ষাটের দশকের শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের স্বাধিকারের দাবি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করতে শুরু করে। এবং একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই যে এই দাবির পিছনে বামপন্থী ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

এর কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যায়। '৬২-র সামরিক শাসনবিরোধী ছাত্র

আন্দোলন ও শিক্ষা আন্দোলনের অন্যান্য দাবির মধ্যে মুখ্য ছিল পাকিস্তানের উভয় অংশের বৈষম্য। ইতোমধ্যে অধ্যাপক রেহমান সোবহান তার ঐতিহাসিক 'দুই অর্থনীতি'র তত্ত্ব হাজির করেছেন। বস্তুত; '৬২-র সামরিক শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিতে আসা পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদেরকে ঐ অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে সূচিত ঘটনা প্রবাহে। এই ধারাবাহিকতায় '৬২-র একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারকে সাজানো হয়েছিল ঐ অর্থনৈতিক বৈষম্যকে চিত্রিত করে বিভিন্ন প্লাকার্ড ও পোস্টার দিয়ে। এর মূল কাজটাই করেছিল সে সময়কার বামপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা। এর কিছুদিন বাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগ আয়োজিত প্রদর্শনী, যার মূল আয়োজক ছিল এই বামপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী সমর্থকরা, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে বিপুল বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেছিল। পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিও তারা প্রকাশ্যেই তুলে ধরতে থাকে। সম্প্রতি সময়ে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের অনুঘটক হিসাবে যে 'নিউক্লিয়াসে'র কথা সোচ্চারে প্রচার করা হয় এসব আন্দোলনে তাদের ভূমিকা বরং বিপরীতই ছিল। এ প্রসঙ্গে আজকের বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' এই কথাগুলি দিয়ে পোস্টার করায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনে ছাত্র লীগের ছেলেরা বোমা-পটকা নিয়ে আক্রমণ করেছিল। কেবল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নয়, সারা দেশেই পূর্ব বাংলার স্বপক্ষে এসব কথা বলাতে এনএসএফ, ছাত্র শক্তি তো বটেই, ছাত্র লীগও ছাত্র ইউনিয়নকে যুক্ত বাংলার সমর্থক বলে অভিযুক্ত করত।

এই ছাত্র ইউনিয়ন পরিচালিত হত মূলত পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা। আগেই বলা হয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি এই উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলো যে পার্টির দুই অংশে একসঙ্গে বিপ্লব করা যাবে না। তবে তারা স্বাধীনতার প্রশ্ন তখনও বিবেচনায় নেয়নি। পরবর্তীতে ১৯৬৭ তে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি মতাদর্শগত প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল) হিসাবে নতুন করে সংগঠিত হলে তার প্রথম কংগ্রেসে রণনীতিগত দলিলে 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা'

প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরা হয়। এটা ছিল স্বাধীনতার প্রশ্নে প্রথম কোন রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত। অবশ্য ইতোমধ্যে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দীর নীতি পরিহার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ছয়দফা দাবি তুলে ধরেছেন এবং তার ভিত্তিতে আন্দোলন ক্রমাগত জনসমর্থন লাভ করছে। পাশাপাশি পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার ও স্বাধীনতার দাবিতে বামপন্থী ধারাও নিজেদের সংগঠিত করতে থাকে। যদিও এই সময় পশ্চিম বাংলার নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রভাবে বাম কমিউনিস্টদের মধ্যে বাংলাদেশের বিপ্লবের রূপ কি হবে এ নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক শুরু হয় এবং বাম কমিউনিস্টদের সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) এর মধ্যে বিভিন্ন ধারা উপধারার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ সকল ধারা উপধারার মধ্যে সাধারণভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আদায়ের প্রশ্নে এক ধরনের ঐক্যমত ছিল। ১৯৬৮ সালের সামরিক আইনের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে মওলানা ভাসানী আহুত পাবনার শাহপুরের কৃষক সম্মেলনে লালটুপি পরিহিত কৃষকের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আসা মিছিলে এবং সম্মেলন স্থলে মূল যে শ্লোগান উচ্চারিত হয় তা'ছিল 'শ্রমিক-কৃষক অস্ত্র ধর' পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর'। '৬৮-এর ডিসেম্বরে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গভর্ণর হাউস ঘেরাও, ২৯ ডিসেম্বর দেশব্যাপী গ্রামাঞ্চলে হাট হরতাল এসবই '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল। এর প্রতিটি ক্ষেত্রে বামপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। শ্রমিক অঞ্চলেও টঙ্গী, চট্টগ্রামে এই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে ছাত্রদের ১১ দফা ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন নেতা শহীদ আসাদের জীবনদানের মধ্য দিয়ে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিকাঞ্চলে ঘেরাও আন্দোলন ও গ্রামাঞ্চলে তহশিল অফিস-জোতদার, মহাজন ও বদ মাতব্বরদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই গণঅভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিতে আগরতলা মামলায় সেনানিবাসে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি লাভ করেন এবং বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বিপুলভাবে বেগবান হয়।

কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) থেকে বেরিয়ে আসা 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি' স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচী

প্রকাশ্যে ছাত্র-শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭০ এর ২২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ও পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে পল্টনের জনসভায় প্রকাশ্যেই 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' প্রতিষ্ঠার আহ্বান ও তার ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

এই জনসভার প্রতিক্রিয়া ছিল বিভিন্নমুখী। একদিকে ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন এই শ্লোগান ও কর্মসূচীর জন্য ঐ সভার সভাপতি ও বক্তাদের বিরুদ্ধে সামরিক আইনে মামলা দায়ের করে। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখপত্র 'ইত্তেফাক'-এর রাজনৈতিক মঞ্চে একে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'দের কর্মকাণ্ড বলে সামরিক আইনে সভার উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইংরেজি সাপ্তাহিক 'মস্কো টাইমস'-এর ৪৫ অথবা ৪৬ সংখ্যায় 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা' প্রতিষ্ঠার আহ্বান ও তার কর্মসূচীকে পিকিংপন্থী কতিপয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উস্কানীমূলক কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ ঐ জনসভার বক্তাদের বিরুদ্ধে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে হুলিয়া জারী করে এবং তার কিছুদিনের মাঝে সামরিক আদালত ঐ সভার বক্তা কাজী জাফর ও রাশেদ খান মেননকে সাত বছর ও তাদের সম্পত্তির ষাটভাগ বাজেয়াপ্ত করার ও মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহবুব উল্লাকে এক বছরের সশ্রম কারাভোগের দণ্ডাদেশ প্রদান করে। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' কর্মসূচী ঘোষণার ধারাবাহিকতায় আত্মগোপনে অস্ত্র সংগ্রহ, গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি অঞ্চল তৈরী করার কাজ শুরু করে। এদিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এর নাম পরিবর্তন করে পূর্ববাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের নাম পূর্ববাংলা শ্রমিক ফেডারেশন রাখা হয়। পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি অবশ্য স্বনামেই থাকে। ইতোমধ্যে পশ্চিম বাংলার নকশালবাড়ী আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদারের তত্ত্ব অনুসরণ করে 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি' বাদে বাম কমিউনিস্ট অন্যান্য গ্রুপ গণসংগঠন, গণআন্দোলন বর্জন ও শ্রেণী শত্রু খতমের রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঐ মুক্তিযুদ্ধকে 'দুই কুকুরের কামড়া-কামড়ি'

বলে নিজেদের তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে এসে এদের কোন কোন অংশ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর পক্ষালম্বনও করে। বাম কমিউনিস্টদের এই বিভিন্ন গ্রুপ উপগ্রুপের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী এ ধরনের ভ্রান্ত অবস্থান *(যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহসী যুদ্ধ করেছেন ও জীবনদান করেছেন)* মুক্তিযুদ্ধে বাম-কমিউনিস্টদের ভূমিকাকে চরমভাবে কলঙ্কিত করেছে এবং এর দায় সকল বামপন্থীদের নিতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আগেই বলা হয়ে বাম-কমিউনিস্টদের এ সকল অংশের ঐ ভ্রান্ত অবস্থানের বিপরীতে 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি' তার 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' কর্মসূচী বাস্তবায়নে গেরিলা গ্রুপ গঠন, ঘাঁটি অঞ্চল গঠন ও অস্ত্র সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করে। এই ধারাবাহিকতায় '৭১-এর ২৫ মার্চের কালরাত্রির গণহত্যার পরপরই ঐ সমন্বয় কমিটির মূল নেতৃত্ব তৎকালীন ঢাকা জেলার নরসিংদীর শিবপুর থানা (বর্তমানে উপজেলা)কে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার কাজ শুরু করে। সমন্বয় কমিটির নেতৃত্ব এপ্রিল-মে মাসে সারাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে অস্ত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে আমার শ্যালক গোলাম মোস্তফা হিল্লোল শহীদ হন। সে ছিল আমাদের প্রথম শহীদ। এ সময় বাগেরহাটের সমন্বয় কমিটির রফিক বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতির কর্মীদের সংগঠিত করে গোটাপাড়াকে কেন্দ্র করে বাগেরহাটে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করে। এই বাগেরহাটে সমস্ত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় রফিকের নেতৃত্বে পাক-বাহিনী ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে আমাদের যোদ্ধারা অসম সাহসী যুদ্ধ করে। রফিকের নেতৃত্বাধীন এই বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা নোমা কুখ্যাত রাজাকার নেতা রজব আলীকে হত্যা করে। এই ঘটনা বাগেরহাট অঞ্চলের রাজাকারদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে এবং তাদের অনেকেই পক্ষ ত্যাগ করে রফিকের নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে যোগ দেয়। অন্যদিকে পিরোজপুরে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ফজলুর নেতৃত্বে প্রতিরোধ যুদ্ধের শুরুতেই পিরোজপুরের থানার অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র দখল করে নেয়। অবশ্য পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতি আক্রমণ শুরু হলে ফজলু ধরা পড়ে এবং তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পিরোজপুরে এই যোদ্ধারাই সমগ্র মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় ঐ অঞ্চলে পাক-

বাহিনীকে ব্যস্ত রাখে। রফিকের নেতৃত্বাধীন এই বাম মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক অস্ত্র সংগ্রহ করে যা বাংলাদেশ স্বাধীন হলে কর্নেল মঞ্জুরের কাছে সমর্পণ করা হয়। এই সময়ে বরিশালে সৈয়দ নজরুল ও শাহ আলম ছাত্র-কৃষকদের সংগঠিত করে ঐ অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু করে। পরে সৈয়দ নজরুল পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়লে নির্মমভাবে নিহত হয়। এরা কেউই ভারতে যায়নি। দেশের অভ্যন্তরে থেকে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেছেন। অন্যদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 'মার্কসবাদী'র সাথে সংযোগ স্থাপন করে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে ও সিপিআই (এম)-এর সহযোগিতায় জুন মাসে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বামপন্থী বিভিন্ন দল গ্রুপকে একত্রিত করে 'জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয়। জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ সমন্বয় কমিটি তার ঘোষণায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থনদান ও তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার কথা ঘোষণা করে *(এব্যাপারে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বাঙলা ও বাঙালির ইতিহাস খণ্ডে হায়দার আকবর খান রনোর লেখায় আরও অন্য অঞ্চলের বামদের দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যাবে)*। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডারদের অধীন পরিচালিত যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করে আমাদের ছেলেরা। কিন্তু এ কাজটা করা খুব সহজ ছিল না। এ ব্যাপারে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বিশাল বাধার সম্মুখীন হতে হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বও একই আচরণ করে বিভিন্ন যুব ক্যাম্প ও সেক্টর থেকে বামপন্থী এসব কর্মীদের প্রায়ই বের করে দিয়েছে। কাউকে কাউকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে, কেউ কেউ ভারতের জেলেও গেছেন। মূলত; নকশাল ভীতি ও মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের একছত্র নেতৃত্ব যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সে কারণে মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস ও বাংলাদেশ পরবর্তীকালে বাম-কমিউনিস্টদের এই বিরূপ আচরণের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে বিভিন্ন সেক্টরে ও দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় এই বাম কমিউনিস্টরা অসম সহসী ভূমিকা পালন করে। আগরতলার মেলাঘরে যেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হত তার মূল ভূমিকায় ছিল আমার ছোট ভাই শহীদুল্লাহ খান বাদল। আর ২নং সেক্টরের কর্নেল হায়দারের স্টাফ অফিসার ছিল আমার আরেক ছোট ভাই সুলতান মাহমুদ খান মনন। বস্তুত

ক্যাপ্টেন *(পরবর্তীতে কর্নেল)* হায়দারের অধীনে ঢাকা ক্রাক প্লাটুনের অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা ছিল বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী ও সমর্থক। অন্যান্য সেক্টরেও তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালীন নয়মাসে সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে আমার দায়িত্ব ছিল দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে মুক্তিযুদ্ধ সমন্বয় করা। সে অনুযায়ী আমি সেক্টর কমান্ডার বাশার, সেক্টর কমান্ডার কর্নেল কাজী নুরুজ্জামান বীর উত্তম, ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ, এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দীনের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহীর আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ পরিচালনায় সহায়তা করি। এ সময় দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ফ্রন্টাল যুদ্ধ দেখার ও তাদের সহায়তা করার সৌভাগ্য হয়। *(এ সকল যুদ্ধের বিবরণ জানতে হলে পড়ুন- হায়দার আনোয়ার খান জুনোর শিবপুরের মুক্তিযুদ্ধ, হাবিবুল আলম বীর প্রতিকের ব্রেভ অফ হার্ট)*।

ডান কমিউনিস্টরা অবশ্য সেদিক দিয়ে সুবিধায় ছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) কংগ্রেসের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় তারা ভারতে বিশেষ সুবিধা লাভ করে। তারা মূলতঃ সিপিআইয়ের সাথে মিলে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা করে বেড়াত। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সহায়তায় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে তারা অংশ নেয়। কিন্তু অক্টোবর পর্যন্ত তারা আলাদাভাবে সংগঠিত হতে পারেনি। অক্টোবরে ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের আলাদা গেরিলা গ্রুপ গঠিত হয়। তারা ভারতের বিভিন্ন সামরিক ছাউনীতে প্রশিক্ষণ নেয়। কিন্তু সেই প্রশিক্ষণ শেষ হতে না হতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারত-পাকিস্তান পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে রূপ নেয়। *(এদের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ সম্পর্কে এই সংকলনে অন্যান্যদের লেখা দেখা যেতে পারে)*।

বাম কমিউনিস্টদের মধ্যে যারা 'দুই কুকুরে কামড়া কামড়ি'র সর্বনাশা তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন তাদের এক বড় অংশ খুলনা-যশোর অঞ্চলে পাকিস্তানী বাহিনী ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে অসম সাহসী লড়াই করেন। *(তাদের এ সকল যুদ্ধ সম্পর্কে এই সংকলনে লেখা পাওয়া যাবে)*। কমরেড মোহম্মদ তোয়াহা পার্টির মূল নেতৃত্বে থাকার পরও তার বাস্তববুদ্ধিতে নোয়াখালী চর অঞ্চলে মুক্ত অঞ্চল গঠন করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণ করলেও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কোন সংঘাতে আসেননি। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার তার সাথে যোগাযোগও স্থাপন করেছিল বলে

জানা যায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের অংশগ্রহণে ভারত সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও ঐ মুক্তিযুদ্ধের শেষভাগে এসে মওলানা ভাসানীকে প্রধান ও অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহম্মদ, মণি সিংহ, মনোরঞ্জন ধর প্রমুখদের অন্তর্ভুক্ত করে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। অবশ্য ঐ উপদেষ্টা পরিষদের একটি মাত্র সভা হয়েছিল। ঐ সভার ছবি তুলে ভারত সরকার ব্যাপক প্রচার করে যাতে বিশ্বের অন্যান্য শক্তি মনে করে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে দলমত নির্বিশেষ সবাই ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু কোন ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করে মুক্তিযুদ্ধে সকল দলমতের অংশগ্রহণের সুযোগ দানে তারা রাজী ছিল না। একারণে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ সমন্বয় কমিটি কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করার অথবা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার বা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কোন ধরনের ইতিবাচক সাড়া পায়নি। মুক্তিযুদ্ধে দেশের সকল স্তরের মানুষের খুব অল্প সংখ্যক দল ও গোষ্ঠী বাদে, অংশগ্রহণ করলেও মুক্তিযুদ্ধকে আওয়ামী লীগের একক লড়াই বলে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা ছিল সেই মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে, যা এখন পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

একথা বলা অনস্বীকার্য যে সত্তরের নির্বাচন ও একাত্তরের মার্চ পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলন আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতা আন্দোলনের একক নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করেছিল। একাত্তরের সাতই মার্চের পর তারই নির্দেশে দেশ পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু '৪৮ থেকে শুরু করে ৫২'র ভাষা আন্দোলন, '৫৪ এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের বিজয়, ষাটের দশকের শুরুতে ছাত্রদের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-র ৬ দফা আন্দোলন, ছাত্রদের ১১ দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সর্বোপরি সত্তরের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার আন্দোলন ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে। এই প্রতিটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। '৭০-র নির্বাচন ও ৭১-র মার্চের ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন তাকে দেশের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করেছিল। '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ তার নামেই পরিচালিত হয়েছিল।

একই সঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য যে বামপন্থীরা এদেশের মানুষের মনে

স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিল। ঐ সকল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভক্তি ডান ও বাম বিচ্যুতি ও সর্বশেষে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঐ বাম কমিউনিস্টদের একাংশের সর্বনাশা বিভ্রান্তি স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বামপন্থী ধারাকে হীনবল কেবল নয়, বিশাল প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল। কিন্তু ইতিহাসের একটি বা দুটি ঘটনা ইতিহাসের সব সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করেনা। সেক্ষেত্রে মধ্য পঞ্চাশে সংখ্যাসাম্যনীতি মেনে নেয়া, পূর্ব পাকিস্তানের আটানব্বই ভাগ স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হয়েছে বলে দাবি করা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা বলে উল্লেখ করা যায়। কিন্তু সেটিও ইতিহাসের সব কথা বা শেষ কথা ছিল না। বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাসের উঠতি পড়তির মধ্য দিয়ে পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়েছে। সেক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থার ধারা সমানতালেই অগ্রসর হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা এই সমগ্র ইতিহাসের আলোকেই বিচার করতে হবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় যাদের স্বপ্ন, যাদের প্রচেষ্টা, ত্যাগ, জীবনদান একে সম্ভব করেছে তাদের সবাইকেই স্বীকার করতে হবে। বামপন্থীরা এক্ষেত্রে অবশ্যই এগিয়ে ছিল। তাদের আদর্শনিষ্ঠ সংগ্রাম, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে সংগঠিত করা স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করেছিল, যার উপরে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধ চলছে

মনজুরুল আহসান খান

সুদীর্ঘ সংগ্রাম, অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি এবং বাংলাদেশের সকল মানুষের জন্য একটি বিজয়ের দিন। গৌরব ও অহংকারের দিন। এই দিন আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে দখলদার বাহিনী থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত করেছিলাম। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত, পাকিস্তানের আধুনিক ও শক্তিশালী বলে খ্যাত সেনাবাহিনী সেদিন বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

বাংলাদেশের সংগ্রামকে আমরা শুধু স্বাধীনতা সংগ্রাম বলি না, মুক্তিযুদ্ধও বলি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও '৭১-এর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন-'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

স্বাধীন বাংলাদেশ, স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান নয়। শুধুমাত্র একটি পতাকা বা নিজস্ব জাতীয় সংগীতের জন্য আমরা দেশ স্বাধীন করিনি। পাকিস্তান যে মতাদর্শ নিয়ে সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ এবং সামরিক স্বৈরশাসনের ধারায় চলেছিল। তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। শত বছরের ধারাবাহিকতায় ও বহু গণসংগ্রামে অসংখ্য মানুষের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্ন, আদর্শ ও লক্ষ্যগুলো ধীরে ধীরে দানা বেঁধে ওঠে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু এই

শক্তির অনেকের মধ্যেই লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

পেটি-বুর্জোয়া মধ্যস্তরের শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতা ও দোদুল্যমানতা এর পেছনে কাজ করেছে। আওয়ামী লীগের যে সব নেতা মুক্তিযুদ্ধের পুরোভাগে ছিলেন, তাদের অনেকেই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। যুক্ত বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্তের উত্থান হিন্দু মধ্যবিত্তের বিকাশের বেশ পরে। চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শিক্ষা-দীক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্ত প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্তের প্রতিযোগী হয়ে উঠেছিল। এই ভাবে একটা স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ক্রমে এই দ্বন্দ্ব-বিরোধ বাংলায় মুসলমান অথবা হিন্দু এই আত্মপরিচয়ই প্রধান করে তোলে। সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সমগ্র ভারতব্যাপী মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত যুক্ত হয়ে যায়। কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে আপসকামিতা, দোদুল্যমানতা ও সাম্প্রদায়িকতা এবং 'বিভক্ত করো এবং শাসন করো' নীতির ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বিভেদকে উসকানি প্রদান, দ্বিজাতিতত্ত্বকে আরও জোরদার করে তোলে। ১৯৪৭-এর আগে এবং বেশ কিছু পরেও সেই সময়কার রাজনৈতিক নেতা যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সামনের কাতারে ছিলেন তাদের অনেকের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাব বেশ ভালোভাবেই ছিল।

বাংলাদেশের আদর্শ ও লক্ষ্যসমূহের একনিষ্ঠ ধারক ছিল কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল বামপন্থীরা। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট চিন্তা-চেতনা নিয়ে দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছে। ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল কমিউনিস্টরাই। শুধু তাই নয় কমিউনিস্টরাই এসব আন্দোলন তিল তিল করে গড়ে তুলেছে এবং অন্যদেরকে সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে, সেই সঙ্গে কৃষক, শ্রমিক, নারী, ছাত্র, পেশাজীবী আপামর জনতার লড়াই-সংগ্রামে টেনে এনেছে এবং তাদের সংগঠন গড়ে তুলেছে। বামপন্থীদের উদ্যোগে এই সব সংগ্রামের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে আওয়ামী মুসলিম লীগ, পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি ও গোটা সমাজের ওপর। কমিউনিস্টরা চরম দমন-পীড়ন ও নির্যাতনের শিকার

হয়েছে। পাকিস্তানের শুরুতেই কমিউনিস্টরাই হয়ে উঠেছিল সাহসী প্রতিবাদ, আন্দোলন-সংগ্রাম ও বিপুল আত্মত্যাগের প্রতীক। বিকাশমান রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক শক্তির সামনে তারা সাহস ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। '৭৫-এর জেল হত্যার বহু আগেই ১৯৫০ সালে রাজশাহীর খাপড়া ওয়ার্ডে গুলি করে ৭ জন কমিউনিস্টকে হত্যা করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট, ন্যাপ প্রভৃতি বাম-প্রগতিশীল শক্তির বিশাল গণসংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হওয়ার পটভূমি সৃষ্টি করেছে। গোটা আন্দোলনে শুধু স্বাধীনতা নয়, আমাদের আর্থ-সামাজিক মুক্তি এবং একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এবং কর্মসূচি সম্পৃক্ত হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে ক্রমেই বাংলাদেশের স্বাধিকারের দাবিটি সামনে চলে আসে। ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। স্বায়ত্তশাসনের দাবিটিও জোরদার হয়ে ওঠে। মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরে। পার্টি নিষিদ্ধ থাকার কারণে এ সময় অনেক কমিউনিস্টই আওয়ামী লীগে কাজ করত। আওয়ামী লীগ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সোচ্চার হওয়ার পেছনে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু ১৯৫৭ সালে ক্ষমতার রাজনীতির কূটচালের সঙ্গে আওয়ামী লীগ জড়িত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে নানা প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রে সরকারে রদবদল ঘটতে থাকে। সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। বিনিময়ে তাঁকে বাংলাদেশসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবি পরিত্যাগ করতে হয়। পাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে ভেঙে দিয়ে এক ইউনিট মেনে নিতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানের মোট ভোট পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে বেশি হওয়া সত্ত্বেও দুই অংশের ভোটের ক্ষেত্রে সংখ্যা-সাম্য বা প্যারিটি মেনে নেয় আওয়ামী লীগ। সোহরাওয়ার্দী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সিয়াটে সেন্টো প্রভৃতি পাক-মার্কিন চুক্তির পক্ষে এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থান গ্রহণ করেন। সে সময় পল্টনের একটি জনসভায় সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন, স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে অনর্থক চেঁচামেচি করা হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানকে ৯৮% স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়ে গেছে। আর বাকি আছে ২%। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে ১% সংযোগ পিআইএ অর্থাৎ

পাকিস্তানের বিমান পরিবহন এবং আর ১% সোহরাওয়ার্দী নিজে। ওই জনসমাবেশে সোহরাওয়ার্দী তার শূন্য যোগ শূন্য সমান শূন্য তত্ত্ব দেন। অর্থাৎ পাকিস্তান একটি শূন্য এর সঙ্গে অন্য ছোট বা সদ্য স্বাধীন দেশ ঐক্যবদ্ধ হলেও ফল হবে শূন্য। শূন্যের বাম পাশে এক বসালে অর্থাৎ একটি বৃহৎ শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বসালে অমনি শূন্যের মান অনেক বেশি বেড়ে যায়।

এমতাবস্থায় মওলানা ভাসানী, মোজাফফর আহমদ প্রমুখের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ভেঙে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হয়। বলাবাহুল্য স্বায়ত্তশাসনের স্বপক্ষে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং তার ভেতরে-বাইরে কমিউনিস্টরা শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, সমগ্র পাকিস্তানে আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। ন্যায্য দাবিতে নীতিনিষ্ঠ অবস্থানের জন্য এবং সাহসের সঙ্গে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনার জন্য সমাজ ও রাজনীতিতে ন্যাপ ও কমিউনিস্টদের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে থাকে। জাতীয় নির্বাচন বাতিল করে ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পেছনে প্রগতিশীল ও বামপন্থী শক্তির শক্তি বৃদ্ধি জনিত আতঙ্কও শাসকশ্রেণির মধ্যে কাজ করেছিল। সামরিক শাসনে শত শত কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের ওপর তীব্র দমন নীতি, গ্রেপ্তার, বেত্রাঘাত, হুলিয়া নেমে আসে। শাসকশ্রেণির সঙ্গে দহরম মহরম, আপস এবং ক্ষমতায় ভাগ বসানো সত্ত্বেও দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি গ্রেপ্তার ও দমন-পীড়ন থেকে রেহাই পায়নি।

বস্তুত ১৯৫৭ সন থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত প্রগতিশীল বামপন্থী শক্তিকেই এককভাবে স্বাধিকারের দাবিতে তৎপরতা চালাতে হয়।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে ৬-দফা দাবি তুলে ধরেন। ৬-দফার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন গড়ে তোলায় ব্রতী হয়ে ওঠে। শেখ মুজিবসহ অনেকেই আন্দোলন গড়ে তোলার এক পর্যায়ে কারারুদ্ধ হন। শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে এবং প্রাক্তন সামরিক বেসামরিক বাঙালি কিছু আমলার বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা দায়ের করা হয়। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রাম, বন্দী-মুক্তির সংগ্রাম ক্রমেই জোরদার ও ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। শ্রমিক, পেশাজীবী, কৃষক, মেহনতিদের

সংগ্রামও অগ্রসর হতে থাকে। পিকিংপন্থী বলে পরিচিত কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের একাংশ '৬-দফা সিআইএ প্রণীত দাবি'-এ অভিযোগ তুলে সরাসরি তার বিরোধিতা করে। এদের কোনো কোনো অংশ সে সময় পিং পং কূটনীতি বলে খ্যাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনে আইয়ুব খানের দূতিয়ালীর কারণে 'ডোন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব' লাইন নিয়ে চলতে থাকে। অবশ্য চীনপন্থী অনেকেই আইয়ুববিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। মস্কোপন্থী বলে পরিচিত কমরেড মণি সিংহ, কমরেড আব্দুস সালাম ওরফে বারীণ দত্ত, কমরেড খোকা রায়, কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ প্রমুখের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্ডারগ্রাউন্ড কমিউনিস্ট পার্টি এবং ন্যাপ (মোজাফফর) ৬-দফা দাবির প্রতি সমর্থন জানায়। একইসঙ্গে তাঁরা বলে যে বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে ৬-দফা সম্পূর্ণ নয়। এর সঙ্গে আর্থ-সামাজিক দাবি, শ্রমিক-কৃষক, মধ্যবিত্ত, সাধারণ মানুষের দাবি এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দাবি যুক্ত না করলে বাঙালির মুক্তি আসবে না। অবাঙালি, আদমজি, বাওয়ানি, ইস্পাহানির পরিবর্তে বাঙালি ধনিক কর্তৃক শোষিত হবে বাংলার জনগণ।

পরবর্তীকালে আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষক, সাধারণ মানুষকে টেনে আনার জন্য আওয়ামী লীগ জনগণের বিভিন্ন দাবি সামনে তুলে ধরতে থাকে। ১৯৬৬ সালের ৭ জুনের হরতাল শুধু ৬-দফা নয়, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে পালিত হয়। আরও কয়েকজনের সঙ্গে তেজগাঁর শ্রমিক মনু মিয়ার আত্মদান ও শ্রমিকশ্রেণির দৃপ্ত অংশগ্রহণ আন্দোলনে এক নতুন মেজাজ ও মাত্রা যুক্ত করে। আওয়ামী লীগ ও গণতান্ত্রিক শক্তির ওপর নেমে আসে প্রচণ্ড নির্যাতন। শেখ মুজিব ও অন্য নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার ও ব্যাপক নির্যাতনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করে আন্দোলনকে সাহসের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নেয়ার মতো যথেষ্ট উপযুক্ত সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগ গড়ে উঠতে পারে নাই। দলের পুরাতন রক্ষণশীল নেতাদের বাদ দিয়ে শেখ মুজিবের একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও দলের অনেক নেতাই ছিলেন দুর্বল-চিত্ত ও দোদুল্যমান। আন্দোলনে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষ এবং প্রগতিশীল শক্তির অংশগ্রহণের অভিঘাত যেমন আওয়ামী লীগকে র‍্যাডিক্যাল অবস্থানের দিকে ঠেলে দেয়, তেমনি তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণির সীমাবদ্ধতার প্রকাশ পায় নানা দোদুল্যমানতায়। এক পর্যায়ে ৬-দফা আন্দোলনে কিছুটা ভাটা পড়ে। কিন্তু আগরতলা মামলার বিচার কার্যক্রম,

কীভাবে স্বাধীনতার প্রস্তুতি হয়েছিল, কী ছিল নেতাদের স্বপ্ন, কোনটি হবে জাতীয় সংগীত ইত্যাদি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়াতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক চেতনা ও আবেগ তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। শেখ মুজিব পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর প্রধান টার্গেট হওয়াতে বাংলাদেশের মানুষের সহানুভূতি ও সমর্থন তাঁর পক্ষে যায়।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে গণ-আন্দোলনকে আগ্রসর করে নেয়ার জন্য আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ (ভাসানী) ও কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন (মস্কোপন্থী), ছাত্র ইউনিয়ন (পিকিংপন্থী), ছাত্র লীগ ইত্যাদি ১১-দফার ভিত্তিতে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গড়ে তোলে। ১১-দফার মধ্যে ৬-দফা, শ্রমিক-কৃষক, ছাত্রসমাজের দাবি, আর্থ-সামাজিক দাবি এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দাবিসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণের বিভিন্ন স্তর ও অংশ এই আন্দোলনে সামিল হয়। এই ঐক্য গড়ে তোলা এবং ১১-দফা প্রণয়নের ব্যাপারে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি ও ব্যাপক জনগণকে শামিল করার ব্যাপারেও বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে অবশেষে ২৪ মার্চ ১৯৬৯ সালে আইয়ুব শাহির পতন ঘটে। বস্তুত আওয়ামী লীগ আন্দোলনকে শেষ পর্যন্ত এককভাবে অগ্রসর করে নিতে পারেনি।

কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় এবং সামগ্রিক দাবি নিয়ে গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠায় একটি সফল গণ-অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল। গণ-অভ্যুত্থানের ফলে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দী কারাগার থেকে মুক্তি পান। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক সে সময়ে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সকল রাজবন্দীর সংবর্ধনা দেয়ার কথা থাকলেও, সেখানে শুধুমাত্র শেখ সাহেবের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাঁকে বঙ্গবন্ধু খেতাব দেয়া হয়। মণি সিংহ, অমল সেন, মণিকৃষ্ণ সেন, সন্তোষ ব্যানার্জী, আশু ভরদ্বাজ, মতিয়া চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন প্রমুখ অসংখ্য বামপন্থী নেতাকে পরবর্তীতে পল্টনে সংবর্ধনা দেয়া হয়। একনায়ক আইয়ুব খানের কারাগারে বেশির ভাগই ছিলেন কমিউনিস্ট ও বামপন্থী। এভাবে আন্দোলনে সঠিক সময়ে সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং

এইসঙ্গে বিভিন্ন সময় নানা ছলে-বলে-কৌশলে আওয়ামী লীগ গণ-আন্দোলনে তার একক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নিশ্চিত করে। সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আন্দোলন, রাজনীতিতে প্রধান দ্বন্দ্ব ও ইস্যু, স্বাধিকার প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে আসা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয়তাবাদী আবেগকে ধারণ করা এবং তার সত্যিকার চ্যাম্পিয়ন হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ বিকাশমান আন্দোলনে ও জনমনে একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে নির্বাচন ও অসহযোগ আন্দোলনেও শেখ মুজিব একক কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ ছিল জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগের প্রতিধ্বনি। তখনও পাকিস্তানের অধীনে বাংলাদেশের মাটিতে সেনা দখলদারিত্বের মধ্যে প্রকাশ্য জনসভায় এক ঐতিহাসিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভাষণে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক-নির্দেশনা দেন-'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা একই ধারায় আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় থাকলেও শেখ মুজিব তাঁদের সঙ্গে একজোট হওয়া বা কোনো ধরনের সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজন বোধ করেননি। বামপন্থী নেতৃবৃন্দ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শেখ সাহেবের কাছে আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি বিষয়ে আলোচনা করতে গেলেও তাঁর কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি। তিনি বরং বলেছেন, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে ।

মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার সময় পাকবাহিনীর ভয়ংকর আক্রমণ-প্রস্তুতি সম্পর্কে শেখ সাহেবকে বিস্তারিত খবরাখবর পৌঁছে দেয়া সত্ত্বেও তিনি সুনির্দিষ্ট কোনো পদেক্ষেপ গ্রহণ করেননি। সামরিক বাহিনীতে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তারা কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখলেও, তা উপেক্ষা করা হয়। অনেক বাঙালি সেনা নানাভাবে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ করলেও, তাদেরকে সুনির্দিষ্ট কোনো পরামর্শ দেয়া হয়নি। অপরদিকে সবকিছু মিলে নানাভাবে এই ধারণারই সৃষ্টি হয় যে মুজিব-ইয়াহিয়ার আলোচনা একটা মীমাংসার পথে যাচ্ছে। সামরিক বাহিনীর সিনিয়র বাঙালি কর্মকর্তারাও যখন পাকবাহিনীর মরণ-আঘাত আসন্ন বিবেচনায় আত্মরক্ষার্থে অ্যাকশনে যাওয়ার কথা বলছেন তখনও শেখ সাহেবের ঘনিষ্ঠ অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র প্রভাবশালী অফিসার কোনো রকম 'হঠকারিতা'র সঙ্গে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। ২৫ মার্চের কালোরাত্রিতে পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস

হামলা শুরু হলে, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে জনগণকে বিশেষ করে বাঙালি ও অন্যান্য বাহিনীকে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এতদসত্ত্বেও বাঙালি সেনা-সদস্যরা নিজেরাই দ্রুত সংহত হয়ে প্রথম থেকেই সাহসী প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু যেন থমকে গেলেন। মধ্য রাতে অথবা ২৬ মার্চ তিনি পাকিস্তানিদের হাতে ধরা দিলেন, গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু তাঁরই নেতৃত্বে জনগণের স্বাধিকার সংগ্রামে যে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল, সেটাই জনতার সংগ্রামকে তার যৌক্তিক পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। আওয়ামী লীগের যথাযথ প্রস্তুতি ও একটি সশস্ত্র ও সুকঠিন স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিকল্পনার অভাব এবং শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের শূন্যতা ও অন্যান্য ঘাটতি থাকা স্বত্ত্বেও মুক্তির সংগ্রাম তার অর্ন্তনিহিত শক্তি নিয়ে এগিয়ে যায়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে আওয়ামী লীগ জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে অগ্রসর করার জন্য কোনো ঐক্যজোট গঠন করার প্রয়োজন মনে করে নাই। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সময় ন্যাপ, সিপিবিসহ অন্যদের প্রস্তাব সত্ত্বেও ভিয়েতনাম বা অন্যান্য দেশের মতো মুক্তিফ্রন্ট গঠন করতেও আওয়ামী লীগ রাজি হয় নাই।

অপরদিকে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসই তীব্র অন্তর্কলহ ও সংঘাতে লিপ্ত ছিল। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখের বলিষ্ঠ ও ধৈর্যশীল নেতৃত্বের কারণে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের, বিশ্বের এবং বাংলাদেশের অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তির ভূমিকার ফলে আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত উতরে গেছে। আওয়ামী লীগের দলবাজি, ক্যাম্পে দুর্নীতি, রিক্রুটমেন্টে বামপন্থীদের বিরোধিতা ইত্যাদি নানা কারণে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে নিজস্ব সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে এবং সমস্ত যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। অন্য কয়েকটি বামপন্থী গ্রুপও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ধারায় লড়াই-সংগ্রাম চালায়।

শেষের দিকে জাতীয় আন্তর্জাতিক নানা কারণে সিপিবি সভাপতি কমরেড মণি সিংহ, ন্যাপ সভাপতি মওলানা ভাসানী এবং ন্যাপের অপর অংশের সভাপতি মোজাফফর আহমেদ, কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধরসহ কয়েকটি দলের প্রতিনিধি নিয়ে প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলী গঠিত হয়। বাস্তবে আওয়ামী লীগ কোনো ঐক্যেই আসে নাই। প্রবাসী সরকারের মন্ত্রী খন্দকার

মোশতাক এবং আওয়ামী লীগের আরও কিছু নেতা মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি রাজনৈতিক মীমাংসার উদ্যোগ নেয়। ন্যাপ, সিপিবি মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার লক্ষ্যের পক্ষে ছিল দৃঢ়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো আমাদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো, ভারত ও বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তি আমাদের সমর্থক ছিল। এসব বিষয়ে যুদ্ধরত বামপন্থীদের কোনো দ্বিধা বা সংশয় ছিল না।

স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে-পরে শত্রু-মিত্র সম্পর্কে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে ধারণা যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল না। অনেকের মধ্যে স্বাধীনতা সম্পর্কেই দ্বিধা ছিল। জনগণের ভোটে নির্বাচিত দলকে সরকার গঠন করতে দেয়া হচ্ছে না এই কারণে 'গণতন্ত্রের সূতিকাগার' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শক্তির স্বপক্ষে থাকবে বলে অনেকেই আশা করেছিলেন। ২৫ মার্চের আগে আগে মার্কিন দূত জোসেফ ফারল্যান্ডের সঙ্গে শেখ সাহেবের একান্ত সাক্ষাৎকারে কী কথা হয়েছিল তা এখনও নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরুর পর পরই অবশ্য একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে দৃঢ় ও সক্রিয় অবস্থান নিয়েছে। বাংলাদেশের নেতৃত্বের মধ্যে মার্কিন প্রীতি ও মোহ প্রগতিশীল বিশ্বকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয়ভাবে টেনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর), সিপিআই, বিশ্ব শান্তি পরিষদ, বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন প্রভৃতি প্রগতিশীল সংগঠন, সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল বিশ্ব, ভারত সরকারসহ অন্যদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় ও দৃঢ় অবস্থানে টেনে আনতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

অনেকের কাছেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মানবতা, শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্রবিরোধী মৌলিক চরিত্রের কারণে নয় বরং পাকিস্তানের মিত্র সেই কারণেই বাংলাদেশের স্বাভাবিক শত্রু হিসেবে পরিগণিত হয়। মার্কিন সরকার বাংলাদেশের 'গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য সংগ্রামের পাশে দাঁড়ায়নি' বলে আওয়ামী নেতৃত্বের কেউ কেউ আশাহত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের আগামী দিনের বুর্জোয়া চেতনার ধারক অনেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মার্কিনবিরোধী মেরুকরণ এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের প্রকাশ্য সমর্থনের

কারণে বাংলাদেশের বুর্জোয়া নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বিগ্ন ছিলেন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে বামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধি এবং বুর্জোয়া নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে বলে শঙ্কিত ছিল বাংলাদেশের উঠতি বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া নেতৃত্ব।

এই প্রেক্ষাপটে দীর্ঘ ও কঠিন যুদ্ধের বাস্তবতার মুখোমুখি অনেককে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে এই মর্মে প্রকাশ্যে অভিযোগ করতে শোনা যায় যে, ভারত রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য এবং শরণার্থীদের নামে বিদেশ থেকে অর্থ ও সাহায্য আনার জন্য সরাসরি যুদ্ধে নেমে বাংলাদেশকে দ্রুত জয়যুক্ত না করে, অনর্থক বিলম্ব করছে। অবশ্য ভারতের ধনিক শ্রেণি ও মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি সশস্ত্র সংগ্রামে পেটি-বুর্জোয়া নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা এবং কমিউনিস্ট ও র‍্যাডিক্যাল শক্তির প্রভাব বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে কম উদ্বিগ্ন ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগের মধ্যে দলাদলি, বিভিন্ন বাহিনীর ওপর নানা বিদেশি গোয়েন্দা নিয়ন্ত্রণ এবং বামপন্থীদের সম্ভাব্য উত্থানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের জন্য বিশেষ বাহিনী গঠনসহ নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভারতের বুর্জোয়া সরকার। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল দক্ষিণ এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী রণনীতির পরাজয় স্বরূপ এবং শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শক্তির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বিজয়।

মুক্তিযুদ্ধ এদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের গণ-সংগ্রামের পরিণতি। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ফকির ও সন্ন্যাস বিদ্রোহ, কৃষক ও আদিবাসী বিদ্রোহ, সেনা বিদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদী বা অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণি ও মেহনতি মানুষের সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এগিয়ে গেছে। তেভাগা আন্দোলন, টংক, নানকার প্রভৃতি প্রথার বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ, নাচোলসহ অন্যান্য স্থানে আদিবাসী বিদ্রোহ, '৪৮-এর ভাষা সংগ্রাম ও মুক্তবুদ্ধির সংগ্রাম, '৫২-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, '৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১-দফাভিত্তিক নির্বাচনী সংগ্রাম, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬ সালের ৬-দফা সংগ্রাম ও ১১-দফার ভিত্তিতে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী-নারী-ছাত্র-জনতার বিভিন্ন গণসংগ্রাম, '৭০ ও '৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন, বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সুরক্ষার সংগ্রাম, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন, গণতন্ত্র, স্বাধিকার ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে আর্থ-

সামাজিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল বিকাশের দাবিতে আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রায় পঁচিশ বছর ধরে পাকিস্তানের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। আসলে এইসব অসংখ্য গণসংগ্রামের নদ-নদী ও স্রোতধারাগুলি মুক্তিযুদ্ধের মহাসমুদ্রে মিলিত হয়ে এক মহাপ্লাবন সৃষ্টি করে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

বাংলাদেশ শুধুমাত্র একটি পৃথক এবং স্বাধীন দেশ, একটি জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের জন্য জন্ম নেয়নি। পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে একটি 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' সৃষ্টি করার জন্যও বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে জীবন দেয়নি। পাকিস্তান ছিল সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন শ্রেণি ছিল বড় পুঁজিপতি এবং বৃহৎ ভূস্বামী। পুঁজিবাদী ধারায় দেশ পরিচালিত হতো। তারা দেশের শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষের ওপর শোষণ চালাত। তারা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বাঙালি, পাঠান, বেলুচ, সিন্ধি প্রভৃতি জাতির ওপরও জাতিগত শোষণ চালিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তান জোটবদ্ধ ছিল। সিয়াটো, সেন্টো প্রভৃতি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির সঙ্গে পাকিস্তান আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল।

তার বিপরীতে বাংলাদেশের ধারা এবং চেতনা ও রূপকল্প ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘকাল ধরে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তাঁরা অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়-যেখানে মুক্তচিন্তা, ধর্ম ও বিবেকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, কিন্তু ধর্মীয় বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার কোনো সুযোগ থাকবে না, যেখানে ধর্ম, জাতি, গোত্রের কারণে কারও প্রতি কোনো বৈষম্য অবিচার থাকবে না। পাকিস্তানের ২৪ বছর পুঁজিবাদী পথে চলায়, দেশের অর্থনীতি সংকটগ্রস্ত হয়েছে, ধন-বৈষম্য, জাতিগত বৈষম্য ও জনজীবনের সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই বাংলাদেশ সেই পুঁজিবাদের পথে হাঁটবে না, সমাজতন্ত্রমুখী হবে।

পাকিস্তান আমলে শ্রমিকদের শোষণ করা হয়েছে, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে, কৃষক ফসলের ন্যায্য মূল্য পায়নি, গ্রামাঞ্চল ছিল বঞ্চিত-অবহেলিত, বড় ভূস্বামীদের স্বার্থে ভূমি-সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়নি, ছাত্রসমাজ শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এইসব শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেশের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতির ওপর জাতিগত শোষণ চালিয়েছে। তাঁদেরকে অধিকার বঞ্চিত করেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে যাতে বাংলাদেশের ওপর আমেরিকা বা অন্য কোনো দেশ শোষণ-আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। যাতে বাংলাদেশের ভেতরেও যে সমস্ত জাতিগত সংখ্যালঘু আছে তারাও শোষণ-বঞ্চনার শিকার না হয়। তাঁদের সাংবিধানিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষার অধিকার যাতে স্বীকৃত হয়।

আমেরিকা আগা-গোড়া শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবতার সবচেয়ে বড় দুশমন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আমেরিকা পাকিস্তানকে সেদিন সবরকম সমর্থন দিয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামও ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকে দমন করার জন্য শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্র-সজ্জিত সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল। বাংলাদেশ এই হুমকি মোকাবিলা করেছে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বন্ধু দেশগুলোর সহায়তায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন অবস্থান নিয়ে মাথা উঁচু করে থাকার জন্য, সাম্রাজ্যবাদের কথা মতো চলার জন্য নয়।

পাকিস্তানে কোনোদিন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়া হয়নি। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। তারা নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন চালিয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও শাসন-ব্যবস্থা বিকশিত হতে পারেনি। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে, বারবার সামরিক স্বৈরাচার ক্ষমতা দখল করবে না-এটাই ছিল দেশবাসীর আশা।

যে স্বপ্ন যে আদর্শ-লক্ষ্য নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম সে সবের অনেকটাই আমাদের '৭২-এর সংবিধানে বিধৃত। বিধৃত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির মধ্যে-গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র।

কিন্তু আমরা স্বাধীনতার পর উপরোক্ত লক্ষ্যে না এগিয়ে পাকিস্তানি ধারার দিকেই পিছিয়ে গেছি। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানি প্রবণতাগুলোই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং '৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর সেই ধারা আরও শক্তিশালী হয়েছে। এ অবস্থার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও দেশি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ষড়যন্ত্র

যেমন দায়ী, তেমনি এই দেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের শক্তি বলে যারা নিজেদের মনে করেন তাদের এবং বিশেষত আওয়ামী লীগের ব্যর্থতাও বহুলাংশে দায়ী।

মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে এবং লুটপাট, দুর্নীতি, পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ধারা অনুসরণ করার কারণে ধনিকশ্রেণির দলগুলি, সঠিকভাবে বললে লুটেরা ধনিকশ্রেণি ব্যর্থ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদী শক্তির ষড়যন্ত্র তো আছেই। অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অর্থাৎ গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের ধারাকে যে সব শক্তি দৃঢ় ও নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে নিতে পারে সেই কমিউনিস্ট বাম প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তি জনগণের আস্থাভাজন কোনো বিকল্প শক্তি গড়ে তুলতে পারেনি। বামপন্থীদের একটি ধারা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) স্বাধীনতা সংগ্রামে সুস্পষ্ট ও দৃঢ় ভূমিকা নিয়েছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর অনেক ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে হলেও যে সব প্রগতিশীল নীতি ঘোষিত হয়েছিল, সে লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল-সেগুলো সঠিকভাবেই সিপিবি, ন্যাপ সমর্থন করেছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও সরকার ঘোষিত নীতির বিপরীতমুখী কাজ-দুর্নীতি, সন্ত্রাস, দলীয়করণের বিরুদ্ধে সিপিবি, ন্যাপ সংগ্রাম করলেও, তা যথেষ্ঠ ছিল না। স্বাধীনতাবিরোধী দেশি-বিদেশি তৎপতার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকা, ঐক্যের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে সঠিক পথে নিয়ে আসা, তার ভুলভ্রান্তিগুলোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করা, নিজেদের ইতিবাচক কাজ দিয়ে দেশপ্রেম ও দেশ গড়ার কাজে অন্যদের অনুপ্রাণিত করার ওপরই সিপিবি জোর দিয়েছিল। আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের বিপরীতে একটি শক্তিশালী বিরোধী আন্দোলন ও জোট গড়ে তোলার দিকে যেতে সিপিবি, ন্যাপ ব্যর্থ হয়। বামপন্থীদের আরেকটি ধারা 'দুই কুকুরের লড়াই' অথবা বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত বিধায় মুক্তিযুদ্ধ থেকে নিজেদের দূরে রাখে এবং বস্তুত অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার শত্রু শিবিরের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তোলে। স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ ভারতের অঙ্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছে, স্বাধীনতা অর্জিত হয় নাই, বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী শোষণ-লুটপাট চালাচ্ছে-এই অভিযোগ তুলে সশস্ত্র সংগ্রাম, শ্রেণি-শত্রু

খতম করো, খুন, হত্যা, গুম, অন্তর্ঘাত এবং 'শান্তিপূর্ণ' আন্দোলনের অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীনতাবিরোধী দেশি-বিদেশি শক্তির সঙ্গে মিলে-মিশে যায় অথবা মাঠ পর্যায়ে ঐক্য গড়ে ওঠে।

স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি সুপরিকল্পিতভাবে নানা পন্থায় এই সব 'বাম'দের আন্দোলনের সঙ্গে থেকে নিজেদের সংগঠিত ও রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করেছে। চরম বাম একজোট হয়েছে চরম ডানপন্থীদের সঙ্গে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪৬ বছর কেটে গেল। যে আদর্শ ও স্বপ্ন নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম তা আজও বাস্তবায়িত হয় নাই। বরং মুক্তিযুদ্ধের বিপরীত ধারায় বা পাকিস্তানি ধারায় দেশ ফিরে যাচ্ছে। আজ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী শক্তির হাতে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন। আমাদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামরিক সার্বভৌমত্ব আজ বিপর্যস্ত। নানা গোপন ও প্রকাশ্য চুক্তিতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাংলাদেশকে বেঁধে ফেলা হয়েছে। আমাদের তেল-গ্যাস-কয়লা, পানি ও সমুদ্রে বিদেশি নিয়ন্ত্রণ ও দখলদারিত্ব। সারা বিশ্বেই আজ সাম্রাজ্যবাদী হামলা, যুদ্ধ, আগ্রাসন চলছে। আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ আগ্রাসন নয় দেশের বুর্জোয়া দলগুলোর আমন্ত্রণেই একে একে সবকিছুর দখল নিচ্ছে তারা।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শগুলোর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছিল '৭২-এর সংবিধানে। বাকশাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে সেই সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন করা হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক ৫ম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করায় '৭২-এর সংবিধানের মূল ভিত্তিতে ফিরে যাওয়ার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল আওয়ামী-মহাজোট সরকার কৌশলে তা বানচাল করে দিয়েছে। সামরিক শাসক জিয়া ও এরশাদের সংশোধনীগুলো ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে হাসিনা সরকার। শেখ হাসিনা বলেছেন, 'বুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। যে অবস্থায় '৭২-এর সংবিধান রচিত হয়েছিল সেই অবস্থা আজ আর নেই'। শেখ হাসিনা কি এ-ও বলবেন, যে পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নগুলি রচিত হয়েছিল, তা-ও আজ নেই! সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা, জাতীয়তাবাদ আজ পরিত্যক্ত।

মুক্তিযুদ্ধ ছিল পুঁজিবাদী শোষণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণার প্রকাশ। আজ সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশ ও প্রেসক্রিপশনে পুঁজিবাদী শোষণ-বৈষম্যের ফলে জনজীবনে গভীর সংকট। মুক্তিযুদ্ধের সময় শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার

স্বপ্ন আজ ধুলায় লুণ্ঠিত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জাতিগত শোষণের বিরুদ্ধে। আজ স্বাধীন বাংলাদেশেই জনজাতি, আদিবাসীদের ওপর চলছে জাতিগত শোষণ ও নিপীড়ন। সেখানে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিদেশি শক্তির ভূ-রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হাসিলের জন্য কাজে লাগাবার চেষ্টা হচ্ছে। পাকিস্তানি সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গড়ে উঠেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই বাংলাদেশেই গত ৪৬ বছরে অধিকাংশ সময় সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসন বহাল দিল। পাকিস্তানের সামরিক প্রতিষ্ঠান আজ সে দেশে নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশটি আজ এক ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হতে চলেছে। পাকিস্তানের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের সামরিক প্রতিষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধের ধারায় নয়, বরং পাকিস্তানের মার্শাল ল সংস্কৃতিরই বাহক হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু করে ২০০৭ সালের ১/১১ ঘটনাবলি থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা বুঝতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বর্তমানে আবারও রাজনৈতিক ব্যর্থতা, সংকট ও সংঘাতের মুখে ১/১১-এর পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক সামরিক শাসন অবৈধ ঘোষণা সত্ত্বেও এবং দুই বুর্জোয়া দলের শীর্ষ নেতাদের ১/১১-এর শক্তি দ্বারা নিগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও সরকার অবৈধ সামরিক শাসনের কুশীলবদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সাহস পায় নাই। গণতন্ত্র যা-ও আছে তা নিয়ত বেয়োনেটের হুমকির মুখে।

মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য, আদর্শ ও চেতনার সঙ্গে ধনিকশ্রেণি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দেশ ধনিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী দ্বি-দলীয় মেরুকরণ বা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সামরিক শাসনের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে হলে দেশের কমিউনিস্ট, বাম-গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক মানুষকে এক সর্ববৃহৎ বিকল্প গণসংগ্রাম ও বিকল্প শক্তি গড়ে তুলতে হবে। জনগণের আস্থাভাজন বাম-প্রগতিশীল শক্তির উত্থানই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয় নাই- মুক্তিযুদ্ধ এখনও চলছে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল 'জনযুদ্ধ'

খালেকুজ্জামান

১৯৪৭ সালে বৃটিশ উপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্তস্রোতে হিন্দু ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদ আর তার প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার মাঝে ভারতীয় জাতি ও পাকিস্তানী জাতি রাষ্ট্রের দুটি ভিন্ন মানচিত্র আঁকা হলেও আমরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানীরা জাতিহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হলাম। শুধু তাই নয়, বৃটিশ উপনিবেশিক খাঁচা থেকে বেরিয়ে নতুন করে পাকিস্তানী উপনিবেশিক শিকলে বাঁধা পড়লাম। পশ্চিম পাকিস্তানীরা (আজকের পাকিস্তান) বহু ধরনের অসঙ্গতি-অসম্পূর্ণতা নিয়েও এক জাতের পাকিস্তানী জাতিবোধের অন্তর্গত থাকলো। কিন্তু মাঝখানে ভারতকে রেখে হাজার মাইলের দূরত্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ (আজকের বাংলাদেশ) তাদের ভাষা, কৃষ্টি, ঐতিহ্যগত পার্থক্য ও পাকিস্তান ভিত্তিক কেন্দ্রীভূত জাতীয় অর্থনীতির একই আবর্তে প্রবাহিত হতে না পারার কারণে শুধু ধর্মের কৃত্রিম বাতাবরণে এক পাকিস্তানী জাতি হয়ে উঠতে পারেনি। আবার বাংলাভাষী পশ্চিমবঙ্গীয়দের মতো ভারতীয় জাতির অন্তর্গতও হইনি। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সাল থেকেই ভাষাকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনের ভিতর থেকেই ভারতীয় ও পাকিস্তানী জাতিবোধের বাইরে এক নতুন জাতিচেতনা জন্মলাভ করতে থাকে যা পরিণতি পায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতিচেতনার উন্মেষ উপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ক্রমাগত গণসংগ্রামের উথাল পাথাল

ঢেউ এর পর ঢেউ তুলে এগুতে থাকে। ১৯০৬ এ জন্ম নেয়া মুসলিম লীগ এর সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ধারা ও ১৯৪১ সালে গঠিত জামায়াতে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ধারার সমান্তরালভাবে পরাজয় ঘটে ভাষা আন্দোলনের বিজয়ের মধ্য দিয়ে। বাংগালী জাতিস্বার্থের প্রতীকী ব্যক্তিত্ব শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি হয়, যা ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টীয় নির্বাচনের বিজয় নিরঙ্কুশ করে। যদিও ক্ষমতাকেন্দ্রিক আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও পাকিস্তানী শাসকচক্রের চক্রান্তে স্বল্পকালেই শাসন ক্ষমতা বাঙ্গালীর হাতছাড়া হয়ে যায়। পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় শাসক চক্র ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক শাসন চাপিয়ে দেয়। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতন হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান তার স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯৪৯ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের মাধ্যমে যে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ধারা জন্ম নেয় তা চলতে চলতে ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে সেক্যুলার অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৫৭ সালে এসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক আদর্শিক মত-পথ, নীতি-কৌশল প্রশ্নে পরস্পর বিরোধী অবস্থান তৈরি হয়। পাকিস্তানী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অখণ্ডতা ভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন লাভ ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার নেতৃত্বকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি মনোভাবের প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দী ছিলেন আপোষকামী অন্যদিকে ভাসানী ছিলেন আপোষহীন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে সোহরাওয়ার্দী যখন পূর্ব পাকিস্তান ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন পেয়েছে দাবি করছেন, তখন একই দলের সভাপতি ভাসানী তা নাকচ করে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের উপর চরম শোষণ-বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেন। স্বায়ত্তশাসন না পেলে স্বাধীনতার হুমকিও আকারে-ইঙ্গিতে দিতে থাকেন। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ছেড়ে মওলানা ভাসানী গঠন করলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)।

১৯২০-২৫ সালে বৃটিশ ভারতে যে কমিউনিস্ট বাম রাজনৈতিক ধারা জন্ম লাভ করেছিল তা ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে নতুনভাবে ভিত্তি লাভ করে ক্রিয়াশীল হতে না হতেই পাকিস্তানী শাসকশ্রেণির চরম রোষানলে পতিত হয়। নবগঠিত ন্যাপ তখন বামপন্থী প্রগতিশীল শক্তির

আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে আর মওলানা ভাসানীও বামপন্থী শক্তি নির্ভর তাঁর রাজনৈতিক ভরকেন্দ্র গড়ে তোলেন। কমরেড মণি সিং, খোকা রায়, সুখেন্দু দস্তিদার, মো. তোয়াহাদের নেতৃত্বে পার্টি গোপনে কার্যক্রম চালাতে থাকে আর ভাসানী তার বিশাল ব্যক্তিত্বের ছায়াতলে বামপন্থার পক্ষে তার মতো করে আদর্শিক বীজও ছড়াতে থাকেন। শ্লোগান তোলেন, 'কেউ খাবে তো কেউ খাবেনা-তা হবেনা, তা হবেনা'। মওলানা হয়েও ভাসানী সমাজ মানসে বামপন্থী আদর্শিক রাজনৈতিক প্রভাব কতটুকু ফেলতে পেরেছিলেন তা বুঝা যাবে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন জামায়াতে ইসলামী নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের ১৯৬৯ সালের বক্তব্য থেকে। তিনি পাকিস্তানের আদর্শের লড়াই বইতে 'সমাজতন্ত্রী নেতা ভাসানী' শিরোনামে লিখেছেন, "আপনি কি মুসলমান? যদি মুসলমান হন তাহলে 'আমি ইসলাম বিরোধী নই' বললেই চলবে কেন? ... কোন কাফের একথা বলতে পারে যে 'আমি যদিও মুসলমান নই, তবু আমি ইসলামের বিরোধী নই।' কিন্তু আপনার মুখে এ ধরনের কথা শুনে মুসলমানরা কি মনে করেন? আপনার তো বলা উচিত যে, আমি কোরআন ও হাদীসের আইন জারি করতে চাই এবং পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে চাই। যদি আপনি মুসলমান হন তাহলে ইসলাম কায়েমের জন্য কাজ করেন না কেন? ... আপনি নাস্তিক ও ধর্ম দুশমন মাও-সে-তুং এর শাগরিদ হলেন কেন? হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষায় আপনার বিশ্বাস নেই কেন? আপনি কি কোরআন ও হাদীসের উপর এলেম হাসিল করার চেষ্টা করেছেন? যদি করে থাকেন তাহলে সমাজতন্ত্রের উপর ঈমান আনলেন কেন? আর যদি আপনি আলেম না হয়ে থাকেন তাহলে মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেবার জন্যই কি মওলানা সেজেছেন? ... আপনার দলের নেতা ও কর্মীদের মন, মগজ ও চরিত্রে মুসলমানের কোন পরিচয় নেই কেন? আপনার সভায় কোরআন তেলাওয়াত হয়না কেন? আপনার দল এত শ্লোগান দেয়, কিন্তু 'আল্লাহু আকবার' শ্লোগান কেন দেয় না? এরা নামাজ রোজার ধার ধারেনা কেন? পাকিস্তান বিরোধী পুরোনো হিন্দু নামধারী কমিউনিস্টরা আপনার দলে কেন? আপনি টুপী, দাড়ি ও মওলানা উপাধি নিয়ে মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করলেও আপনার দল যে টুপী, দাড়ি ও আলেমের ঘোরতর দুশমন সে কথা কি গোপন আছে।" *(পৃ: ঊনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ)*

মওলানা ভাসানীর আদর্শিক সংগ্রামের প্রভাব কতটুকু জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগ সংগঠনের মাঝেও পড়েছিল তা বুঝা যায় গোলাম আযম এর আরেকটি বক্তব্য থেকে। তিনি লিখেছেন, "এ-সব কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীরা যে ইসলামের বিরোধী এ-কথা সবাই জানে। কিন্তু কিছুদিন থেকে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগও সমাজতন্ত্রের প্রতি ঈমান এনেছেন দেখে দুঃখিত হলেও আশ্চর্য হইনি। ... আওয়ামী লীগের সাথে ন্যাপের বিরোধ থাকলেও তারা পুঁজিবাদী হিসাবে পরিচিত হতে চাননা বলেই সমাজতন্ত্রের সমর্থক সেজেছেন। শুধু তাই নয় ইসলামী আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মোকাবিলায় আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ সব সময়ই এক জোট হয়ে বিরোধীতা করে থাকে।" *(পৃ: সাতচল্লিশ)*

ভাসানী সমান্তবাদী-পুঁজিবাদী শোষণের বিরোধীতার পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণচেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। পাক-মার্কিন সামরিক জোটের বিরোধীতায় তিনি বলেন, 'ওরা আমাদের ছেলেদের বোমার আঘাতে গুঁড়িয়ে দেবে। তা আমি হতে দেবনা। আমি জান দিয়ে যুদ্ধজোটের বিরোধীতা করবো। কেউ যদি আমাকে দিয়ে জোর করে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি মানিয়ে নিতে চান, তাহলে আমি কবরে এক পা দিয়ে চিৎকার করে বলবো - না, না, না - আমি সর্বনাশা যুদ্ধজোট সমর্থন করিনা।' সোহরাওয়ার্দী সামরিক জোট-এর পক্ষে ছিলেন।

তাছাড়াও ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান জাতীয়তাবাদ-এর বিপরীতে ভাষা ভিত্তিক যে জাতি চেতনা গড়ে উঠেছিল তার বিকাশের পরিপূরক সাংস্কৃতিক জমিন ও আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারেও ভাসানী সচেতন ছিলেন। পূর্ববঙ্গীয় জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতিকে বিলোপ করে কথিত পাকিস্তান জাতীয়তাবাদী রজ্জুতে ৫৬ ভাগ বাংলাভাষীকে বাঁধতে রাষ্ট্রভাষা উর্দ্দু চাপিয়ে দেয়ার চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ার পর পাক-ভারত যুদ্ধকে হিন্দু রাষ্ট্র ও মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধ-যুদ্ধোন্মোদনা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শত্রু সম্পত্তি আইনের মতো নানা সাম্প্রদায়িক আইনের খড়গ ইত্যাদির পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক হাতিয়ারে সংস্কৃতির উপর আঘাত হানার অংশ হিসাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত-এর উপর যখন নিষেধাজ্ঞা জারি হলো তখন ১৯৬৭ সালের ২৭ জুন ভাসানী বিবৃতিতে বলেছিলেন, 'তথ্যমন্ত্রী জনাব সাহাবুদ্দিন ঘোষণা করেছেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীত ইসলাম ও পাকিস্তানের ঐতিহ্য পরিপন্থি বিধায় আর বেতার ও টেলিভিশন

মারফৎ পরিবেশিত হইবেনা। কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব সবুর খাঁনও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছিলেন। তাঁহাদের এই বক্তব্য পাকিস্তান সরকারের মনোভাবেরই প্রকাশ কিনা - ইহাই সরকারের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য। ... রবীন্দ্রনাথ তাহার কাব্য সাহিত্য, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস ও সঙ্গীতের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে নতুন গৌরবে অভিষিক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অবদান সার্বজনীন। ইসলাম সত্য ও সুন্দরের জন্ম ঘোষণা করেছে। এই সত্য ও সুন্দরের পতাকাকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই যারা ইসলামের নামে রবীন্দ্রনাথের উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন, তারা আসলে ইসলামের সত্য ও সুন্দরের নীতিতে বিশ্বাসী নন। তাই আমি দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি সরকারের এই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। *(২৮ জুন দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত)* এর আগে ১৯৫৭ সালের কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে দেশবাসীর জানা আছে। তখনই ভাসানী পাকিস্তানকে 'আসসালা মুআলাইকুম' বলে প্রতীকী অর্থে বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়ে স্বাধীনতার সুপ্ত আকাঙ্খাকে ইঙ্গিতবহ ধ্বনিতে পরিণত করেন। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ সংগঠন ত্যাগ করে ন্যাপ গঠনের পর একদিকে আপোষহীন সংগ্রামী ধারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে অন্যদিকে বাংগালীর স্বার্থ পূরণে আপোষকামী ধারার কার্যকারিতা সম্পর্কে মানুষ সন্দিহান হয়ে উঠতে থাকে। এই সময়কাল জুড়ে ধাপে ধাপে গোটা সমাজ মননে একটা বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটতে থাকে। নারায়ে তকবীর - আল্লাহু আকবর এর স্থলে জয় বাংলা, তোমার আমার ঠিকানা- মক্কা আর মদিনা'র স্থলে তোমার আমার ঠিকানা - পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, পিন্ডি না ঢাকা - ঢাকা-ঢাকা, ২২ পরিবার খতম কর - সমাজতন্ত্র কায়েম কর, স্বৈরতন্ত্র খতম কর - গণতন্ত্র চালু কর ইত্যাদি শ্লোগানে সাম্য চেতনা, গণতান্ত্রিক ভাবনা, ধর্ম নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ফুটে উঠে। সোহরাওয়ার্দী'র মৃত্যুর পর জাতীয়তাবাদী ধারার আওয়ামী লীগ আপোষ সর্বস্বতা ছেড়ে আপোষমুখী বিরুদ্ধবাদী ধারায় অগ্রসর হয়। পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের মাঝে তারা তাদের ক্ষমতা লাভ অনিশ্চিত দেখতে পায়। তাই তারা বাঙ্গালীর স্বায়ত্তশাসন-স্বাধীকার দাবিকে মূর্ত করে ৬ দফা ও পরে ১১ দফা সংযুক্ত করে ক্ষমতার গদী লাভের জন্য অগ্রসর হয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরুর আগ পর্যন্ত একদিকে আপোষের প্রস্তাবনা অন্যদিকে বিদ্রোহের হুঙ্কার দিয়ে চলে। জাতীয়তাবাদী

দলের ভিতরেও আপোষপন্থা দুর্বল হতে থাকে এবং বিরুদ্ধবাদীতা শক্তিশালী হয়ে উঠে। একপক্ষ বলে বাঁশের লাঠি তৈরি কর- প্রতি বিপ্লবী খতম কর, অন্যপক্ষ শ্লোগান তোলে বীর বাঙালি অস্ত্র ধর - বাংলাদেশ স্বাধীন কর। দিনে দিনে জনগণের প্রত্যাশা এমন স্তরে উঠতে থাকে যা পূরণ পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় আর ১৯৭০ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পরও ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতির কারণেই আপোষ রফার পথ প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে যায়। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের দিকে জাতি ধাবিত হয়। সকল আপোষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯৪৯ সাল থেকেই বাম কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে হাজং বিদ্রোহ, নমঃশুদ্র ও দাস সম্প্রদায়ের আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহসহ দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে সশস্ত্র প্রতিরোধের রূপ ধারণ করে। আর আন্দোলনকারী ও অসংখ্য বাম নেতা-কর্মী চরম নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার হন, কারাবন্দী হন ও মৃত্যুবরণ করেন। এ আন্দোলনের ঢেউ কারাগারে এসে ধাক্কা দেয়। বন্দীদের নানা দাবিতে অনশন কর্মসূচি দফায় দফায় চলতে থাকে। এক পর্যায়ে ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহী কারাগারের খাপড়া ওয়ার্ডে গুলি বর্ষণে প্রথম কারাগারে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়। ৭ জন বিপ্লবী শহীদী মৃত্যুবরণ করেন। ৩৩ জনের মতো আহত হন। এরপর ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৫৮ সালে আরোপিত জে. আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, মৌলিক গণতন্ত্রের নামে সামরিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত ভোটতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সেক্যুলার, অসাম্প্রদায়িক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আন্দোলন, ১৯৬৯ এ গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই বামপন্থীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ভাষা আন্দোলনে বামপন্থী ছাত্রনেতা আব্দুল মতিন-এর নাম ভাষা মতিন হয়ে গিয়েছিল। ঊনসত্তরের শহীদ বামপন্থী ছাত্রনেতা আসাদের উদ্দেশ্যে খ্যাতিমান কবি শামসুর রাহমান 'আসাদের শার্ট' কবিতা রচনা করেছিলেন।

১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটা জনযুদ্ধ। স্বাধীনতা ও মুক্তির চেতনায় উদ্ভাসিত বাংলাদেশের জনগণের সশস্ত্র জনযুদ্ধ। পরাক্রমশালী উপনিবেশিক সশস্ত্র শক্তিকে নিরস্ত্র জনগণের মোকাবেলা করার এবং বিজয়ী হওয়ার এ এক বিরল ঐতিহাসিক ঘটনা। তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি,

উপনিবেশিক রাষ্ট্র শক্তি পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির স্বরূপ ও তাদের রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, বাংলাদেশের নিকট প্রতিবেশী ও পাকিস্তানের চির বৈরী ভারত রাষ্ট্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সহযোগিতা, নানামুখী আন্তর্জাতিক বৈরী শক্তিসমূহের নানা হিসাব নিকাষ সহ ছোট বড় সকল উপাদান ছাপিয়ে বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামী ঐক্য ও শক্তিই ছিল মুখ্য ও প্রধান নিয়ামক। তিন দিক পরিবেষ্টিত ভারতের শাসকশ্রেণির চেয়েও ভারতের জনগণ বিশেষ করে বাংলাভাষী ভারতীয় জনগণের আবেগ ঘনিষ্ঠতা ছিল ভিন্ন মাত্রিক। যে কারণে ভারতে প্রায় কোটি মানুষের শরনার্থী হওয়া নির্বিঘ্ন হয়েছিল। বাঙ্গালী আদিবাসী মিলে সাড়ে সাত কোটি মানুষের অখণ্ড ঐক্যের বাইরে স্বাধীনতা বিরোধী ও উপনিবেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ দালালদের সংখ্যা এত নগণ্য ছিল যে তা বিবেচনাযোগ্য হিসাবের মধ্যে আসেনা। অনেকে যুদ্ধপূর্ব ভোটের সংখ্যা দিয়ে এই সংখ্যা নিরূপনের চেষ্টা করেন যা সংখ্যাতাত্তিক বিভ্রান্তি মাত্র। তবে এটা পরিতাপের বিষয় যে স্বাধীনতার ৪৮ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার কালেও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হয়নি। ইতিহাস রচনার বহু উপাদান খণ্ডিতভাবে নানা স্থানে নানাভাবে জড়ো হয়েছে সত্য কিন্তু নানা বিভ্রান্তির জটাজালে, শাসকশ্রেণি কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের গৌরব আবেগ চেতনাকে পুঁজি করার প্রবণতা, অবহেলা, ঔদাসিন্য, ইতিহাস চেতনার অভাব ইত্যাদি কারণে সঠিক ইতিহাস তো দূরের কথা বহু বিকৃতির কালিমা মুক্তি সংগ্রামের গায়ে লেপন করা হয়েছে এবং তা চলছে।

বর্তমান সময়ে তো বটেই বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়েও শ্রেণি বিভক্ত ছিল। একদিকে স্বাধীনতা ও সার্বিক মুক্তিকামী জনতা অন্যদিকে স্বাধীন ভূখণ্ডের মালিকানা প্রত্যাশী উঠতি বাঙ্গালী ধনিক শ্রেণি। দুই শ্রেণিরই মিলন ঘটেছিল এক বিন্দুতে স্বাধীনতা চাই। মুক্তি চাই। একপক্ষের ছিল সকল প্রকার শোষণ শাসন থেকে মুক্তি, অন্যপক্ষের ছিল ২২ পরিবারের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি। নেতৃত্ব শোষিত শ্রেণির পক্ষের রাজনৈতিক শক্তির হাতে ছিলনা। চলে গিয়েছিল উঠতি ধনিক বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের হাতে। এখান থেকেই স্বাধীনতাত্তোরকালের পরিণতি ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। যা আমরা দিনে দিনে পরিচ্ছন্ন রূপে দেখতে পাচ্ছি।

৭১ এর সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ বুর্জোয়া শ্রেণির দলের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় তার অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক বহুমুখী দুর্বলতা ও জনআকাঙ্খা পরিপন্থি আকার

প্রকার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ রূপে প্রতিফলিত ছিল। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা, প্রতিশ্রুতি, গণআকাঙ্খা ও চেতনা, সাংবিধানিক অঙ্গীকার সবই ধূসর হতে হতে মুছে যেতে চলেছে। যদিও মুক্তিযুদ্ধের আবেগ, চেতনা, মর্যাদা ইত্যাদিকে পণ্য বানিয়ে তার বাজার সম্প্রসারণ দিনে দিনে বাড়ছে। গত ৪৮ বছরেও একটা সঠিক মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীদের অনেকের শাস্তি হলেও যে ধর্মান্ধতা-সাম্প্রদায়িকতা ও ভাবাদর্শকে হাতিয়ার করে তারা স্বাধীনতাবিরোধী অবস্থানে দাঁড়িয়েছিল, তার বিপরীতে বিজ্ঞান মনস্ক, সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক, প্রগতিবাদী আদর্শিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, সামাজিক আন্দোলন তো দূরের কথা বরং সেই প্রত্যাখ্যাত চিন্তা ও শক্তির সাথে আপোষের মাত্রা বাড়ছে একদিকে, অন্যদিকে শোষণ বৈষম্যের নীতির সাথে পাল্লা দিয়ে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ সত্য বেরিয়ে আসবে যে মুক্তিযুদ্ধ পরিণত রূপ পাওয়ার ক্ষেত্রে বামপন্থী বিপ্লবী দল ও শক্তিসমূহের ভূমিকা বহুকাল ছিল অগ্রগণ্য। যদিও শেষ পর্যন্ত জাতীয় ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান থেকে স্বাধীনতার দিক নির্দেশনা সুস্পষ্ট রূপে হাজির করতে না পারার ব্যর্থতা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে চীন-সোভিয়েতকে ঘিরে যে মতাদর্শিক সংগ্রাম চলছিল সঠিক বিচার বিশ্লেষণে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের বদলে পক্ষে-বিপক্ষে বিভক্তি ও নানা বিভ্রান্তির আবর্তনে বিবর্তনে আটকা পড়ে নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতার জায়গায় বাম বিপ্লবীরা চীন-ভিয়েতনামের মতো সামনে আসতে পারেনি। বুর্জোয়া দল আওয়ামী লীগ-এর নেতৃত্বেই মূলতঃ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে শত প্রতিকূলতার মুখেও একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের কথা বাদ দিলে বামপন্থী শক্তিসমূহের অংশগ্রহণ, আত্মবলিদান ও সাহসী লড়াইকে অস্বীকার করা যাবেনা। যে অংশের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে তাদেরকেও স্বাধীনতাবিরোধীদের কাতারে ফেলা যাবেনা। তাদের সংগ্রামকেও খাটো করে দেখা যাবেনা। যদিও তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ভ্রান্তি তাদের সংগ্রামী ভূমিকাকে অনেক ক্ষেত্রে ম্লান করে দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে দলীয় নেতৃত্ব থাকা মানে এটা দলীয় যুদ্ধ ছিলনা। ছিল জনযুদ্ধ এ বিষয়ের সঠিক উপলব্ধি ও প্রকৃত ইতিহাস রচিত হলে বামপন্থী শক্তির ভূমিকা অনেক উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠবে

নিঃসন্দেহে। তাছাড়া আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকাল অন্ততপক্ষে আড়াইশত বছরের ঐতিহাসিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবেনা। অথচ আমাদেরকে নয় মাসের অহেতুক বিতর্কের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে।

বামপন্থী দল, শক্তি ও ব্যক্তিসমূহের ভূমিকা কিংবা অবদান যে মুক্তিযুদ্ধে ছিল তাকে এমনভাবে জাতীয় ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে রাখা হয়েছে যে নব প্রজন্মের পক্ষে তার হদিস পাওয়া খুবই কঠিন। সেই কারণেই হয়তো মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের অবস্থান জানাতে এই প্রকাশনার উদ্যোগ। এটা অভিনন্দনযোগ্য। তবে এক্ষেত্রেও এই পরিসরে যে পূর্ণচিত্র পরিস্ফুট করা যাবে তা বলা মুস্কিল। তবে এটা একটা সূচনা এবং ভবিষ্যতে ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এখানে সঞ্চিত থাকবে আশা করা যায়।

আমি বামপন্থার সাথে যুক্ত ছিলাম। যুদ্ধপূর্বকালীন চট্টগ্রামে একটি কারখানার একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন-এর নির্বাচিত সভাপতি হিসাবে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম। ১৯৬৮-৬৯ সাল থেকে বামপন্থী দলের সাথে আমার সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিলনা। ৩১ মার্চ কিংবা ১ এপ্রিল আমি আগরতলায় এক সাথীকে নিয়ে পৌঁছে যাই। মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের অংশগ্রহণ প্রতিবন্ধকতা মাথায় রেখেই ছাত্র পরিচয়ে ট্রেনিং এ যুক্ত হই। আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগ এর নেতা কর্মীদের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা ছিল ভিন্ন। তারা বিএলএফ *(বেঙ্গল লিবারেশন ফোর্স)* নামে পরিচিত ছিল। সাধারণ যোদ্ধারা এফএফ *(ফ্রিডম ফাইটার)* নামে চিহ্নিত ছিল। পুলিশ, ইপিয়ার ইত্যাদি মিলে মুক্তিফৌজ নাম ব্যবহার করেছে অনেক ক্ষেত্রে। ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি নেতা-কর্মীদের জন্য ভারতে বিশেষ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা হয়েছিল। শুরুতে নারী কর্মীদের জন্য বিশেষ ট্রেনিং চালু হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যায়। ট্রেনিং ইচ্ছুক বহু নারী ফিরে গিয়ে শরণার্থী ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবক হাসপাতালে সেবিকা, দাপ্তরিক কাজ কিংবা সংস্কৃতি কর্মী দলে যুক্ত হন। দেশের অভ্যন্তরে থেকে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে বামপন্থীদের একটা বড় অংশ বরিশাল, নোয়াখালী, নরসিংদী, রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁদপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় গেরিলা প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়েছিল, অনেক কর্মী শহীদী মৃত্যুবরণ করেছেন। আদিবাসী জনগোষ্ঠী চাকমা, সাঁওতালদের প্রতিরোধ যুদ্ধের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে চাকমা, মারমা, সাঁওতালরা যেমন ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা তেমনি

বাঙ্গালীও ছিল একটা জাতিসত্ত্বা। সরকারি হিসাবে বাঙ্গালী ও পাহাড় সমতলের আদিবাসী ২৯/৩০ জাতিসত্ত্বা মিলে স্বাধীনতা যুদ্ধ করলেও ৯৯ ভাগেরও বেশি বাঙ্গালী জাতিসত্ত্বার নামেই বাঙ্গালী জাতি গঠিত হয়েছে। সকল জাতিসত্ত্বা এর অন্তর্গত। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙ্গালী ছাড়া অন্য সকল জনগোষ্ঠীর মাঝে এই জাতিবোধ গ্রথিত না করে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। আজও তার কোন সাংবিধানিক স্বীকৃতি মেলেনি। বরং একদিকে উগ্র জাতীয়তা অন্যদিকে জাতি বিচ্ছিন্নতার যে বীজ বপণ করা হয়েছিল তা আজও বড় বিষবৃক্ষ রূপে দাঁড়িয়ে আছে। সমৃদ্ধ জাতি চেতনার জন্য এর অবসান দরকার।

আমি কাঠালিয়া, মতিনগর, অম্পিনগর, মেলাঘর হয়ে ২নং সেক্টরের অধীন নির্ভরপুর সাব সেক্টরে স্থিত হই। ট্রেনিং চলাকালে কোম্পানী কমান্ডার এবং পরে আমাকে এফএফ বাহিনীর তৎকালীন বৃহত্তর কুমিল্লা *(বর্তমান কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর)* জেলার দায়িত্ব দেয়া হয়। আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করার বা কোন কিছু লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করিনি। কারণ সেটা হয়তো অন্ধের হাতি দেখার মতো হয়ে যেতে পারতো। অনেকে লিখেছেন এবং এখনও লিখছেন। ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে; তবে ব্যক্তিকে বড় করতে গিয়ে, বীরত্বের কাহিনী প্রদর্শন করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই বস্তুনিষ্ঠতা উপেক্ষিত হয়েছে বা আড়ালে পড়ে গেছে। কমরেড হায়দার আকবর খান রনো বার বার তাগাদা দেওয়ায় আমি শুধু জানান দিতে চেয়েছি যে আমি মুক্তিযুদ্ধে ছিলাম, বড় সংগ্রামের মহৎ অর্জনগুলো হারিয়ে যাওয়ার বেদনা ও অতৃপ্ত মন নিয়ে এখনও আছি। সীমিত সাধ্যে মুক্তিযুদ্ধের কাঙ্খিত শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাসদ সংগঠন এর সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় ও বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ মিলিত সংগ্রামের মাঝে রয়েছি। বামপন্থীদের অতীত ব্যর্থতা ও গ্লানি মুছে ফেলে নব প্রজন্ম আগামী দিনের কর্তব্য পালনে সন্মুখ সমরে অগ্রভাগে থাকার ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে চলতে চলতে প্রকৃত ইতিহাসের আলো ফুটবে এবং ভবিষ্যতের পথও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই স্বল্প পরিসরে আমি জানা অজানা বহু ঘটনার সাক্ষী থেকেও লেখা থেকে বিরত থাকলাম। প্রকৃত ইতিহাস পূর্ণতায় হাজির হওয়ার দিনে এটা কোন ঘাটতি তৈরি করবেনা এই বিশ্বাসে।

মুক্তিযুদ্ধ ও চট্টগ্রামের বামপন্থীরা

মো. শাহ আলম

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। ১ মার্চ রেডিও-টেলিভিশনে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আহূত ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন। দেশের মানুষ যে যেখানে, যে অবস্থায় ছিল রাস্তায় নেমে এলো। মানুষের মুখে স্লোগান ছিল-'সব কথার শেষ কথা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা'; 'ভুট্টোর মুখে জুতা মারো-ইয়াহিয়ার মুখে জুতা মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'।

আমরা চট্টগ্রামে ছাত্র ইউনিয়নের বিরাট মিছিল নিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। সারা দেশে জনতার প্রতিরোধ। আমরা চট্টগ্রামে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই চট্টগ্রাম জামে মসজিদের পেছনে ডামি রাইফেল দিয়ে সামরিক কসরত শুরু করি। শত শত তরুণ-তরুণী এতে অংশ নেয়। ২২ মার্চ পাকিস্তানি জাহাজ সোয়াত থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র নামাতে গেলে বন্দর শ্রমিকরা বাধা দেয়। ওই সময় বন্দর শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আহসান উল্লাহ চৌধুরী, আবুল কালাম, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। এই প্রতিরোধে আমরা ছাত্র-জনতা যোগ দিই। ২৩ মার্চ চৌধুরী হারুনের নির্দেশে আবু তাহের মাসুদের নেতৃত্বে আমরা চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিংয়ের মালখানা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করি। পরের দিন ২৪ মার্চ ফরেস্ট হিলের অফিস ও আইস ফ্যাক্টরি রোডের নেভাল গোডাউন থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করি। এর মধ্যে বাঙালি ইপিআর সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়। ইপিআর কমান্ডার মেজর রফিক বিদ্রোহ করে সিআরবি রেলওয়ের পাহাড়ে অবস্থান নেয়। ২৬ মার্চ রেডিও-চট্টগ্রাম

আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, বেলাল মোহাম্মদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। আবুল কাশেম সন্দ্বীপ ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক নেতা।

ষোলশহরে অবস্থানরত মেজর জিয়াও বিদ্রোহ করেন। ২৬ মার্চ আওয়ামী লীগের তৎকালীন জেলা সাধারণ সম্পাদক হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে চট্টগ্রাম রেডিও থেকে ঘোষণা পাঠ করেন, মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন ২৭ মার্চ। শুরু হয়ে যায় সশস্ত্র প্রতিরোধ-যুদ্ধ। ৩০ মার্চ পর্যন্ত আমরা ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা অস্ত্র নিয়ে চট্টগ্রামে প্রতিরোধ-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। বিকেলে চট্টগ্রাম শহর ত্যাগ করে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে বিভিন্ন থানায় ছড়িয়ে পড়ি। পটিয়া, বোয়ালখালী, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, ফটিকছড়ি, মীরসরাই থানায় ১৪ এপ্রিল ১৯৭১ পর্যন্ত অসংখ্য গ্রুপে ছাত্র-তরুণদের সামরিক কসরতের মহড়া প্রদান করি। আবদুস সাত্তার, চৌধুরী হারুন, পূর্ণেন্দু কানুনগো, মওলানা আজমী, আহসান উল্লাহ চৌধুরী-এঁরা এ কাজ সংগঠিত করেন। বখতেয়ার নূর সিদ্দিকী, আবু তাহের মাসুদ, তপন দত্ত, খোরশেদুল ইসলাম, মোহাম্মদ মুছা, মাহবুবুল হক, গিয়াস উদ্দিন, শাহ আলম, বালাগাত উল্লাহ, শামছুজ্জামান হীরা, আব্দুল আওয়াল, অমল নাথ, বখতেয়ার নোমানী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

১৪ এপ্রিল কালুরঘাট যুদ্ধের প্রতিরোধ ভেঙে গেলে গ্রামগুলোও শত্রু কবলিত হয়ে পড়ে। হারুন ভাই, সাত্তার ভাইয়ের নেতৃত্বে এপ্রিলে আমাদের কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী সীমান্ত অতিক্রম করে। আমরা দেশের অভ্যন্তরে নেটওয়ার্ক করে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান করি। '৭১-এর জুন মাসের প্রথম থেকে আগরতলায় আমরা সমবেত হতে থাকি।

আসামের তেজপুর থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে অক্টোবর '৭১-এ আমরা চট্টগ্রামের দক্ষিণে প্রবেশ করি। উত্তরে মীরসরাইতে আমার গ্রুপের আগে প্রবেশ করে আলাউদ্দিনরা *(বর্তমানে বন্দর শ্রমিক নেতা)*। মুক্তিযোদ্ধাদের আনা-নেয়ার ব্যাপারে বীরত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন ন্যাপ নেতা মোমিন ভুঁইয়া, ব্যাংক নেতা মওলা, তৎকালীন ছাত্রনেতা গিয়াস উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, বালাগাত উল্লাহ, বখতেয়ার নোমানী প্রমুখ।

চট্টগ্রামে ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়ন গেরিলা বাহিনীর গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে যাঁরা প্রবেশ করেছিলেন : আলাউদ্দিন-মীরসরাই, মো. শাহ আলম-চট্টগ্রাম দক্ষিণ, খোরশেদুল ইসলাম-সীতাকুণ্ড, তপন দত্ত-ফটিকছড়ি,

ফনি ভূষণ দাশ প্রমুখ। শত্রু-কবলিত এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্কের ভূমিকা পালন করেন অ্যাডভোকেট নুরুন্নবী, সাইফুদ্দিন খান, অ্যাডভোকেট শফি (বেবি), হান্নানা বেগমসহ আরও অনেকে।

চট্টগ্রামে ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়ন গেরিলা বাহিনীর ভূমিকা লেখা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে কোনোভাবে সম্ভব নয়। আমরা স্থানীয়ভাবে আগামীতে তার ইতিহাস রচনা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি।

চট্টগ্রাম দক্ষিণে মুক্তিযুদ্ধে আমরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পেরেছি। আমরা আমাদের বেইস ক্যাম্প করেছিলাম পাহাড়ের পাদদেশে করলডেঙ্গা, কেলিশহর এলাকায়। *(বোয়ালখালী, পটিয়া থানা)* আমরা দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পনা করে এগিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ হয় ২৫ অক্টোবর সকাল ৭টায় কেলিশহরে গোয়ালপাড়ার রাজাকারদের সঙ্গে ভোর সাতটায়। রাজাকাররা ছিল সামনে, পাঞ্জাবিরা অবস্থান নিয়ে ছিল এক কিলোমিটার দূরে দারোগা হাটে। যুদ্ধে দুইজন রাজাকার মারা যায়। আমরা পাহাড়ে ঢুকে পড়ি। ১৯ নভেম্বর রাত তিনটায় আমরা পটিয়ার ইন্দ্রপোল ডেমুলিশ করি। ২২ নভেম্বর ধলঘাট রেললাইন উপড়ে ফেলি। আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় শত শত মানুষ। ৯ ডিসেম্বর দুপুরে পটিয়ার গৈড়লার টেকে যুদ্ধ হয় হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের সঙ্গে। এই যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর ১৪ জন সদস্য নিহত হয় এবং প্রচুর গোলাবারুদ আমাদের হস্তগত হয়। ১১ ডিসেম্বর আমরা জোহরের নামাযের পর পটিয়া থানায় স্বাধীনতার রক্তপতাকা উত্তোলন করি। বিজয়ের গর্বে আমাদের বুক ভরে ওঠে। আমাদের ওই সাফল্য জনগণকে করেছে উৎসাহিত। দলীয় সংকীর্ণ লোকদের করেছে শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। ওটা কনভেনশনাল যুদ্ধ ছিল না। আমাদের যুদ্ধ ঢাকা-পিন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। একদিকে ছিল ঢাকা-দিল্লি-মস্কো, আর অন্যদিকে ছিল পিন্ডি-পিকিং-ওয়াশিংটন। একদিকে বিশ্বের শান্তি-স্বাধীনতা-প্রগতির শক্তি ছিল আমাদের পক্ষে আর অন্যদিকে প্রতিক্রিয়ার শক্তি পাকিস্তানের পক্ষে। পরবর্তীতে আমাদের সমাজ ও রাজনীতিতে গণতন্ত্র ও প্রগতির ধারা শক্তিশালী হয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের জায়গায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ স্বৈরতন্ত্রের জায়গায় গণতন্ত্র-সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের নীতি নিয়ে '৭২

এর সংবিধান রচিত হয়।

যুদ্ধ মানে জীবন দেয়া আর নেয়া। কিন্তু যে জীবন দিতে আমরা সেদিন যুদ্ধে গিয়েছিলাম সে জীবন নিয়ে পরবর্তী সময়ে বড়ই কাতর হয়ে পড়লাম। দেশ গড়ার পরিবর্তে আখের গোছানো ও লুটপাটের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লেন শাসকদলের অধিকাংশ। বঙ্গবন্ধু বললেন-'আমি ভিক্ষা করে সাহায্য-সহযোগিতা আনি আর চাটার দল সব চেটে খেয়ে ফেলে।' সৃষ্টি হলো বিচ্ছিন্নতা, শুরু হলো ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত। ঘটল '৭৫-এর নির্মম হত্যাকাণ্ড। ফিরে এলো পাকিস্তানি রাজনীতি-অর্থনীতি-পররাষ্ট্রনীতির ধারা। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি লুট করে লুটেরা শাসকশ্রেণি আজকে সমাজ ও রাষ্ট্রের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এরা বড় বড় দলে বিভক্ত হয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের হর্তা-কর্তা বনে যায়। দেশ স্বাধীন, কিন্তু মানুষের সামাজিক মুক্তি আসেনি। তবে নানারূপে এই মুক্তি সংগ্রাম অব্যাহত আছে। মানুষের সামাজিক মুক্তির লড়াই হবে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ।

কাজী জাফর আহমদ'এর সাক্ষাৎকার

[১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে (বাংলা ১৩৯২ সালের অগ্রাহায়ণ মাসে) "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের" "তথ্য মন্ত্রণালয় ১৬ খণ্ডে বিভিন্ন দলিলপত্র প্রকাশ করেছিল। এটা করা হয়েছিল তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে "বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পে (প্রথম পর্যায়)'এর তত্ত্বাবধানে। ইতিহাস গ্রন্থ রচনা বা বিভিন্ন দলিলপত্র সংকলনের সম্পাদক ছিলেন কবি হাসান হাফিজুর রহমান। সেই ইতিহাস গ্রন্থের ১৫তম খণ্ডে (শিরোনাম দলিলপত্র) কাজী জাফর আহমদের একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল। সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়েছিল ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে। নিচে পুরো সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হল।]

১৯৭১ সালে প্রকাশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ও কৃষক সমিতি এবং আমাদের সরাসরি নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সাথে জড়িত ছিলাম। আমি ছিলাম বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি। আমাদের মূল সংগঠন ছিল 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৬৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী আমরা এই গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করি। সে বৎসরেরই এপ্রিলে আমরা স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচী পেশ করি। এতে পরিকল্পিত রাষ্ট্রকে 'পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' আখ্যা দেয়া হয়। ১৯৭০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) আয়োজিত এক সভায় অতিথি বক্তা হিসেবে আমরা এই কর্মসূচীর ভিত্তিতে রচিত ১১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করি। এই অভিযোগে পাকিস্তানের সামরিক আইনের অধীনে আমাকে এবং রাশেদ খান মেননকে সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের আদেশ দেয়া হয়, মোস্তফা জামাল হায়দার ও

মাহবুব উল্লাহকে দেয়া হয় এক বৎসরের কারাদণ্ডাদেশ। আমরা আত্মগোপনে চলে যাই, অবশ্য মাহবুব উল্লাহ পরবর্তীকালে গ্রেফতার হন।

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের আমরা বিরোধিতা করি। এর কারণ আমরা তখন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানে আর বিশ্বাস করতাম না, তদুপরি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবননাশী নভেম্বরের জলোচ্ছ্বাস এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের ক্ষমার অযোগ্য উপেক্ষায় আমরা ছিলাম বিক্ষুব্ধ। অন্য দিকে ইয়াহিয়া ঘোষিত 'লীগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারে'র অধীনে নির্বাচন এবং এতে বিজয় পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করতাম না। তাই আমরা নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানাই এবং পাশাপাশি শ্লোগান তুলে ধরি : 'শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতা অস্ত্র ধরো, পূর্ব বাংলা স্বাধীন করো'। মওলানা ভাসানীও নির্বাচন বর্জন করেন এবং ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানের জনসভায় স্বাধীনতার আহ্বান জানান। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয়ে অনেকে আশাবাদী হলেও আমরা বলেছিলাম পাকিস্তানী বিজাতীয় শাসক গোষ্ঠি যে কোন অজুহাতে পূর্ব বাংলার জনগণকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে দেবে না। এ জন্যই আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার আহ্বান জানাতে থাকি।

'৭১-এর মার্চে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে আমাদের তৎপরতা বেড়ে যায়। ৭ই মার্চ প্রচারিত এক প্রচারপত্রে আমাদের আহ্বান ছিল, 'আঘাত হানো, সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করো, জনতার স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েম করো'। মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণ আমাদের খুব আশান্বিত করতে পারেনি– সেদিনই তিনি সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে এত বিপুল রক্তক্ষয়কে এড়ানো যেতো। কয়েকজন সহকর্মী সহ আমি তাঁর সাথে দেখা করে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা এবং সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নে কথা বলি। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক আমাদের খারাপ ছিল না। তিনি বলেন, 'তোমাদের গেরিলা যুদ্ধের দরকার নেই, আমি সব ঠিক করে দেবো। ওখানে আমি এখানে তাজউদ্দিন, তারপর দেখবে কি হয়'। এই কথায় স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁকে খুব সিরিয়াস মনে হয়নি– আদৌ তিনি স্বাধীনতার কথা, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনার কথা চিন্তা করেছিলেন কিনা সে ব্যাপারে আমাদের সংশয় ছিল। অথবা এমন হতে

পারে যে তিনি তখন ভাবছিলেন বিচ্ছিন্নতার কথা– ক্ষমতায় যাবার পর দাবী আদায় করতে না পারলে তিনি হয়তো পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। ইয়াহিয়া ভুট্টোর সাথে মুজিবের আলোচনার আমরা বিরোধিতা করেছিলাম, কারণ সারা পূর্ব বাংলা তখন জ্বলছে একটি মাত্র দাবীতে : স্বাধীনতা। এই পরিস্থিতিতে আমাদের (বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন) উদ্যোগে ২৫ মার্চ বিকেলে পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় সভাপতির ভাষণে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামের ১৩ দফা কর্মসূচী তুলে ধরি। এই সভায় আমরা বলেছিলাম, আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য, আর তাই সারা দেশে অবিলম্বে গেরিলা বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে হবে। এটাই ছিল তৎকালীন 'পূর্ব পাকিস্তানের' পল্টন ময়দানের শেষ জনসভা। সভাশেষে এক প্রকাণ্ড মিছিল যোগে আমরা শহীদ মিনারে যাই এবং সেখানে শপথ গ্রহণ করি। কর্মীদের পাঠিয়ে দেই তাদের নিজ নিজ এলাকায়।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তাদের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড শুরু করলে আমি আশ্রয় নেই এদেশের প্রগতিশীল সিনেমা আন্দোলনের পথিকৃত শহীদ জহির রায়হানের বাসায়। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে তিনদিন আশ্রয় দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, জহির রায়হানের গাড়িটিও আমাদের দিয়েছিলেন ঢাকার বাইরে যাওয়ার জন্য। এই গাড়ি নিয়েই আমরা ঢাকা জেলার শিবপুর চলে যাই। সেখানে আমাদের সংগঠনের নেতা আবদুল মান্নান ভুঁইয়া গড়ে তুলেছিলেন এক বিরাট গেরিলা বাহিনী। উল্লেখ করা দরকার যে জহির রায়হানের গাড়িটি যুদ্ধের গোটা সময়টাতেই শিবপুরে ছিলো এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এটাকে বিভিন্ন কাজে লাগিয়েছিলেন।

শিবপুরে আমরা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে নেই। হায়দার আকবর খান রনো এবং রাশেদ খান মেননকে মওলানা ভাসানীর সাথে যোগাযোগের জন্য টাংগাইল পাঠানো হয়। তাঁরা দেখা করতে পারলেও বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পাননি, কেননা ৩ থেকে ৫ এপ্রিলের মধ্যে পাক বাহিনী মওলানা ভাসানীর সন্তোষ এবং বিন্নাফৈরের দুটি বাড়ীই জ্বালিয়ে দেয়। মওলানা ভাসানী আত্মগোপনে চলে যান।

এদিকে আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছিল নিজ এলাকা কুমিল্লার চিয়রায় গিয়ে বাম এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করার জন্য। চিয়রা

ভারত সীমান্তের কাছাকাছি ছিলো। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারি যে, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই সীমান্ত অতিক্রম করে গেছেন।

২৫ বা ২৬ এপ্রিল আমি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা দেবেন সিকদারের আগরতলা থেকে লেখা একটি চিঠি পাই। ওতে জানানো হয়েছিলো যে ৩০ এপ্রিল ভারতের জলপাইগুড়িতে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে বামপন্থীদের এক নীতি নির্ধারণী সভা হবে, আমি যেন অন্য সকলকে জানিয়ে নিজেও চলে আসি। সভা নির্দিষ্ট ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হলেও সেখানে আমাদের আকাংখিত নেতা মওলানা ভাসানী উপস্থিত ছিলেন না। জানানো হয় যে, মওলানা ভাসানীকে ভারত সরকার সীমান্ত এলাকা থেকে নিয়ে গেছেন। গ্রেফতার কিনা জানা যায়নি। ফলে সভায় উৎসাহ সঞ্চারিত হতে পারেনি। একটি মাত্র সিদ্ধান্ত সেখানে গৃহীত হয় যে, আমরা বামপন্থীরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করবো। পরবর্তী সভার তারিখ নির্ধারিত হয় ২৯ ও ৩০ মে এবং এর স্থান নির্বাচন ও আয়োজনের দায়িত্ব অর্পিত হয় দেবেন সিকদার ও ন্যাপ সম্পাদক মশিউর রহমানের ওপর। এই সভায় আমি ছাড়া উপস্থিত অন্যরা ছিলেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ, অমল সেন, মশিউর রহমান, দেবেন সিকদার, আবুল বাশার, ডাঃ মারুফ হোসেন, ডাঃ সাঈফ-উদ-দাহার এবং নজরুল ইসলাম। আমরা ফিরে আসি দেশের অভ্যন্তরে।

পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়, কিন্তু এতেও মওলানা ভাসানী উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর লেখা একটি চিঠি পড়ে শোনানো হয় যাতে তিনি লিখেছিলেন মওলানা ভাসানী আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে বলেছিলেন, তাঁর নির্দেশ ছিল আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য। চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে গণচীনসহ কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রধানদের নিকট তিনি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন সমর্থন চেয়ে। মওলানা ভাসানীর এই চিঠিটি এসেছিল ভারতের একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে কাগজে কলমে না হলেও পরোক্ষাভাবে সুকৌশলে মওলানা ভাসানীকে বন্দী দশায় রাখা হয়েছিল।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন দিনাজপুরের কৃষক নেতা শ্রীবরোদা ভূষণ চক্রবর্তী। বিস্তারিত আলোচনা শেষে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয়। কমিটিতে সদস্য

হিসেবে নির্বাচিত হন দেবেন সিকদার (পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি), নাসিম আলী (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-হাতিয়ার), অমল সেন (কমিউনিস্ট সংহতি কেন্দ্র), ডাঃ সাইফ-উদ-দাহার (কমিউনিস্ট কর্মী সংঘ) এবং আমি (কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি)। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগের প্রতি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানানো হয় এবং এ ব্যাপারে যোগাযোগের দায়িত্বলাভ করি আমরা। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণাটি ভারতসহ বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যথেষ্ট প্রচারলাভ করেছিলো। এতে বিভেদের নীতি পরিহার করে সকল বামপন্থী ও দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহকে আওয়ামী লীগের সাথে একযোগে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই-এ অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছিলো। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুন জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণার কপিসহ আমি, রাশেদ খান মেনন এবং হায়দার আকবর খান রনো কলকাতায় অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করে স্বাধীনতাযুদ্ধে বামপন্থীদের অংশগ্রহণের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করি। ধৈর্য্য ও সহানুভূতির সাথে বক্তব্য শুনলেও তিনি আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে অস্বীকৃতি জানান এবং সরকারের মুক্তিবাহিনীতে আমাদের কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। কারণ হিসেবে তিনি হক-তোয়াহার নেতৃত্বাধীনে কমিউনিস্টদের শ্রেণী সংগ্রামের এবং স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতার উল্লেখ করেন, তাদের প্রচারপত্রের প্রসঙ্গও টেনে আনেন। আমরা বলি যে হক-তোয়াহারা যা করছেন তা নিজেদের দায়িত্বেই করছেন, এর সাথে বামপন্থীদের বিরাট অংশটি আদৌ জড়িত নয়। আপনি কেবল আওয়ামী লীগের সম্পাদকই নন, দেশেরও প্রধানমন্ত্রী এবং এজন্যেই জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে যে কাউকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া আপনার কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে জনাব তাজউদ্দিন জানান যে তাঁকে সিদ্ধান্তের আগে গোয়েন্দা রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে এবং আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার অনুপস্থিতিতে নির্ভর করতে হবে ভারত সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টের ওপর। এই পর্যায়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়, এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সামাদ আজাদের উপস্থিতি সে অপ্রিয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আমরা মর্মাহত হয়ে ফিরে আসি।

দেশে ফেরার পথে জুনের মাঝামাঝি আগরতলায় আমাকে ভারতের কেন্দ্রীয়

গোয়েন্দা সংস্থা 'র' আটক করে নিয়ে যায় শিলং-এর একটি ডাক বাংলোয়। সেখানে আমাকে সাত দিন রাখা হয়। ঘটনাটিকে আমি গ্রেফতার বলবো না, কেননা, কোন খারাপ আচরণ আমার সাথে করা হয়নি। কিন্তু সাত দিন ব্যাপী অবিরাম প্রশ্নের মাধ্যমে আমাকে ব্যতিব্যস্ত রাখা হয়। আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান মিঃ সুব্রামনিয়াম। তিনি অবশ্য সমগ্র ব্যাপারটিকে 'নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা' হিসাবে বোঝাতে চেয়েছিলেন। এই আলোচনায় দেশের অতীত ও বর্তমান রাজনীতিতে বামপন্থীদের ভূমিকাসহ বিভিন্ন প্রসঙ্গ এসেছিলো। তিনি বারবার আওয়ামী লীগ এবং ভারতের প্রতি বামপন্থীদের মনোভাব সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন। আমি বলেছিলাম : এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান সমস্যা পাকিস্তানের সেনাবাহিনী; এর বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে চাই, আওয়ামী লীগের সাথে মতপার্থক্যসমূহ এখন আমরা তুলে ধরবো না– তাদের সাথে আমাদের সমস্যাসমূহের মীমাংসা আমরা স্বাধীন দেশের মাটিতে করবো, যুদ্ধের মধ্যে বা ভারতের অভ্যন্তরে নয়। ভারতের সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বা সম্ভাবনার প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম : ভারতের পক্ষে সেটা উচিত হবে না, আমরা বাংলার মাটিতেই শত্রুদের খতম করবো। স্বাধীনতাকে আমরা ছিনিয়ে আনতে চাই, কারো অনুগ্রহে পেতে চাই না।

অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সাথে ব্যর্থ আলোচনার পর আমরা নিজেদের উদ্যোগে যেখানে যতটুকু শক্তি নিয়ে যেভাবে সম্ভব স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখি। মুজিব নগর সরকারকে আমরা অস্বীকার করিনি, কিন্তু তাই বলে প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগও রাখিনি, সহযোগিতাও পাইনি। সরকার সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন ছিল, সমালোচনা ছিল, কেননা তারা আওয়ামী লীগের বাইরে বিশেষ করে বামপন্থীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ প্রশ্নে অযৌক্তিক সংকীর্ণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই নীতি আমাদের হতাশ করেছিল। এজন্যেই আমরা নিজেদের উদ্যোগে লড়াই চালিয়েছিলাম।

স্বাধীনতাযুদ্ধকালে আমাদের সংগঠনের নীতি ছিল দুটি :

১. যেখানে সম্ভব বেংগল রেজিমেন্ট, ইপিআর এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত সরকারী মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে তাদের নির্দেশ মান্য করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা এবং (২) কোথাও তেমন বাহিনী না থাকলেও, কিংবা দলীয় সংকীর্ণতার কারণে যোগদান সম্ভব না হলে আলাদাভাবে 'গেরিলা ফৌজ' গঠন করে যুদ্ধ পরিচালনা করা। উল্লেখ্য যে, আমাদের সংগঠনের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর নাম ছিলো 'গেরিলা ফৌজ'। এর গঠন প্রণালী ছিল– পাঁচ থেকে সাত জন নিয়ে একটি গ্রুপ, কয়েকটি গ্রুপ নিয়ে একটি স্কোয়াড এবং কয়েকটি স্কোয়াড নিয়ে গঠিত হতো এক একটি আঞ্চলিক ইউনিট। আমাদের এ নির্দেশ ২৫ মার্চের জনসভাতেই ঘোষণা করা হয়েছিল।

দেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই আমাদের কর্মীরা মুক্তিবাহিনীর সাথে একযোগে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সেটা সম্ভব না হওয়ায় বিশেষ কয়েকটি এলাকায় গেরিলা ফৌজ গঠন করতে হয়। এই এলাকাগুলি ছিল নিম্নরূপ :

১. ঢাকা জেলার শিবপুর, মনোহরদী, রায়পুর ও কালিগঞ্জ নিয়ে গঠিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে গেরিলা ফৌজের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। এই এলাকায় যুদ্ধকালে অন্য কোন বাহিনী গঠিত হয়নি, এমনকি রাজাকার বা বদর বাহিনীও গঠিত হতে পারেনি। প্রসঙ্গত, একটি দুঃখজনক ঘটনা ছিল : মাঝে মাঝে মিথ্যে রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে এখানে মুক্তি বা মুজিব বাহিনীকে পাঠানো হতো আমাদের যোদ্ধাদের নিরাশ করার জন্য। প্রায় ক্ষেত্রেই উল্টোটি ঘটতো, কিংবা গেরিলা ফৌজের তৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে আগত যোদ্ধারাও দলভুক্ত হয়ে যেতেন। এই এলাকায় আমাদের বিখ্যাত কমান্ডার ছিলেন পাকিস্তানের নৌবাহিনীর সাবেক সদস্য নেভাল সিরাজ। উল্লেখ্য যে যুদ্ধকালে এই এলাকাটি আমাদের সংগঠনের হেড কোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

২. কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ অঞ্চল। এখানে গেরিলা ফৌজের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার।

৩. টাংগাইলে প্রথম দিকে গেরিলা নেতা কাদের সিদ্দিকীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি হলেও পরে মতৈক্যের ভিত্তিতে আমাদের প্রায় পাঁচ হাজার যোদ্ধা অংশ নেন। কাদের সিদ্দিকী দলীয় সংকীর্ণতায় ঊর্ধ্বে থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কর্মীরা তাঁর নেতৃত্বে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন।

৪. খুলনা জেলার সাতক্ষিরায় সৈয়দ কামেল বখতের নেতৃত্বে প্রায় ২ হাজার

সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে ওঠে। এখানে যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুজিব বাহিনী বলে কথিত একদল লোকের হাতে বীর যোদ্ধা কামেল মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া বাগেরহাট সদর, বিষ্ণুপুর, রঘুনাথপুর প্রভৃতি এলাকায় গেরিলা ফৌজের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ হাজার। এই এলাকায় মুক্তি বাহিনীর সংখ্যা খুব কম ছিল।

৫. রাজশাহী জেলার আত্রাই অঞ্চলে আফতাব মোল্লার নেতৃত্বে প্রায় দু'হাজার সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে ওঠে। সেখানে আমাদের গেরিলারা স্থানীয় মুক্তি বাহিনীর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অন্য এক বামপন্থী নেতা অহিদুর রহমানের সাথে তাদের সংঘাত হয়।

৬. ফরিদপুরের বোয়ালমারী এবং মাদারীপুরের একটি অঞ্চলে মিয়া সাদেকুর রহমানের নেতৃত্বে কয়েকশত সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে উঠেছিলো।

৭. চট্টগ্রাম শহর ও রাউজান এলাকায় শামসুল আলমের নেতৃত্বে কয়েকশত সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে ওঠে। এখানে মুক্তি বাহিনী বা নিয়মিত সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়নি। এখানে আমাদের যোদ্ধারা প্রধানতঃ চট্টগ্রাম শহর এলাকায় গেরিলা তৎপরতা পরিচালনা করেছিলেন।

৮. নোয়াখালীর ফেনী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল কয়েকশত সদস্যের এক গেরিলা ফৌজ।

আগেই বলেছি : কেবল সেই সব অঞ্চলেই গেরিলা ফৌজ গঠিত হয়েছিল যেখানে সরকারী মুক্তিবাহিনী (বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআরসহ) ছিল না কিংবা থাকলেও সংকীর্ণতার কারণে আমাদের কর্মীরা ওতে যোগ দিতে পারেনি। দেশের অন্য সকল এলাকায় কর্মীরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে অধিনায়কের নির্দেশে যুদ্ধ করেছেন– কোনো প্রকার দলীয় বিভেদাত্মক কার্যকলাপ তারা চালাননি। সেই প্রেক্ষিতে যুদ্ধ শেষে হিসেব অনুযায়ী সারা দেশে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আমাদের সংগঠনের কর্মীদের সংখ্যা সব মিলিয়ে ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার। দেশের অভ্যন্তরে একমাত্র শিবপুর এলাকায় আমাদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ শিবির ছিল। প্রশিক্ষণের ব্যাপারে যুদ্ধকালে যে ক'জন সামরিক অফিসার আমাদের সহযোগিতা করেছিলেন তাঁরা হলেন : মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর আবুল মঞ্জুর, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর এম এ জলিল। এঁরা ছাড়াও মেজর হায়দার, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন এনাম,

ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের কর্মীদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কঠিন হয়ে পড়তো। প্রশিক্ষণের সাথে সাথে তাঁরা অস্ত্রের ব্যবস্থাও করতেন। মেজর জিয়ার জেড ফোর্সে আগস্টের দিক থেকে আমাদের প্রায় এক হাজার যোদ্ধা অংশ নিয়েছিলেন। এ ছাড়া যুদ্ধের শেষ দিকে আমরা দুটি প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলেছিলাম : একটি কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম সংলগ্ন সীমান্তের ওপারে এবং অন্যটি কিশোরগঞ্জ সংলগ্ন সীমান্তবর্তী এলাকায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যুদ্ধকালে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির পক্ষে সরাসরি নেতৃত্ব বা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না, ফলে যেখানে কমিটির যে সংগঠন বেশী শক্তিশালী ছিল সেখানে অন্য সংগঠনের সদস্যরা তার অধীনে মিলিতভাবে যুদ্ধ করতো। সংগঠন হিসেবে আমাদের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি নিজেদের মধ্যে মোটামোটি নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে পারতো। যেখানে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি সেখানে পূর্বঘোষিত নির্দেশানুযায়ী কর্মীরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

স্রোতধারার সাথে আমরা মিশে গিয়েছিলাম। মাও সে তুঙের চিন্তাধারা আমাদের প্রেরণার অন্যতম উৎস হলেও যুদ্ধকালে গণচীনের ভূমিকার আমরা তীব্র সমালোচনা করেছিলাম। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ছিল আমাদের ঘোষিত শত্রু। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশেষ করে ভারতের সাহায্যকে আমরা স্বাগত জানালেও সে প্রশ্নে আমাদের সন্দেহ ছিল, সংশয় ছিল। আমরা কোনো পর্যায়েই চাইনি যে ভারতের সেনাবাহিনী আমাদের যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিক। ভারতের বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন–বিশেষ করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতা আমাদের অনেক উপকারে এসেছে। এই সাহায্য ছিল প্রধানতঃ নৈতিক। অনেক সময় তাঁরা আমাদের আশ্রয় এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁদের সাহায্যের ফলে শত্রুর হামলার কবল থেকে আমাদের জীবনও বেঁচে গেছে।

যুদ্ধ চলাকালে বেশ কয়েকবার আমার সাথে বাঙালি সামরিক অফিসারদের বিশেষ করে মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ এবং মেজর আবুল মঞ্জুরের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। আলোচনাকালে আমি তাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের একাংশের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিক্ষোভ লক্ষ্য করেছি। মুজিব বাহিনী সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ভারতের

সেনাবাহিনীর অযাচিত হস্তক্ষেপও তাদের ক্ষুব্ধ এবং নিরুৎসাহিত করতো বলে মনে হয়েছে। জুনের শেষে বা জুলাই এর প্রথমদিকে একদিন মেজর জিয়া আমাকে সাথে নিয়ে জীপ চালিয়ে ধর্মনগর থেকে করিমগঞ্জ গিয়ে ফিরেছিলেন। চার শ কিলোমিটার পথে প্রায় সাড়ে সাতঘণ্টা ব্যাপী আলোচনাকালে তিনি বলেছিলেন : ভারত চায়না যে বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধ প্রলম্বিত হোক এবং এজন্যই আমার মনে হয় ভারতের সেনা বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে। কারণ ভারত একটি ব্যাপারে ভীত–গেরিলাযুদ্ধ প্রলম্বিত হলে তার নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাতে থাকবে না।

মেজর জিয়ার এই আশংকার সত্যতা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হই আগস্ট মাসে। এই সময় কলকাতার একটি হোটেলে আমার সাথে আলোচনা হয় মুজিব বাহিনীর দুই নেতা এবং আমার এককালীন বন্ধু ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ শেখ ফজলুল হক মনি ও সিরাজুল আলম খানের। মুজিব বাহিনী গঠনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেছিলেন : আমরা নিশ্চিত নই যে মুজিব বেঁচে আছেন কিনা, কিংবা তিনি জীবিত অবস্থায় ফিরে আসবেন কিনা। যদি না আসেন তাহলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে তার জন্যেই মুজিব বাহিনী– যাতে (পরিহাসচ্ছলে) তোমরা কিংবা সামরিক বাহিনীর কোনো বাঙালি অফিসার সে শূন্যতার সুযোগ নিতে না পারে। তাঁদের বক্তব্যে বোঝা গিয়েছিলো যে তাঁরা বেংগল রেজিমেন্টের কোনো কোনো কমান্ডার সম্পর্কে যথেষ্ঠ সংশয় এবং আশংকায় আছেন।

ভারতসহ বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি প্রগতিশীলরাও আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। বিশেষ করে বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালিরা এব্যাপারে ছিলেন বিশিষ্ট ভূমিকায়।

কাজী জাফর আহমদ
মার্চ, ১৯৮৪

মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীরা

হায়দার আকবর খান রনো

[এই নিবন্ধটি ভিন্ন শিরোনামে (বামপন্থী সংগঠিত গেরিলা বাহিনী গঠন ও তাদের কর্মতৎপরতা) বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস' এর চতুর্থখণ্ডের দ্বিতীয় পর্বে অন্তর্ভূক্ত আছে। পুনর্মুদ্রণের সময় ঈষৎ পরিবর্তন করা হয়েছে।]

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতির জীবনে সবচেয়ে বড়ো ঘটনা। নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয় এই কারণে যে এত বড়ো ঐতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আরো সৌভাগ্যবান মনে হয় এই কারণে যে, এই সময় আমার বয়স ছিল পূর্ণ যৌবনে, যুদ্ধে যাবার শ্রেষ্ঠ বয়স।

১৯৭১ সালে নয় মাস ধরে চলা এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল গোটা দেশ জুড়ে এবং যুদ্ধের ছিল বহুমাত্রিক রূপ। কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে সেই যুদ্ধের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা অর্জন করাও সম্ভব নয়। ভারতে অবস্থিত মুক্তিফৌজের সীমান্তের ওপার থেকে বিভিন্ন ধরনের সশস্ত্র আক্রমণ, শেষের দিকে বড়ো রকমের সামরিক অ্যাকশন ইত্যাদি ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে ছোটো-বড়ো গেরিলা দল ও মুক্ত এলাকা গড়ে উঠেছিল, যারা পাকিস্তানের হানাদারবাহিনীকে গেরিলা অ্যাকশনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ও ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল। দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা তৎপরতাসমূহ পরিচালিত হয়েছিল প্রধানত কমিউনিস্ট তথা বাম সংগঠনসমূহের দ্বারা। আমি নিজেও তেমনি একটি কমিউনিস্ট সংগঠনের 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'- এর নেতৃত্বের পদে ছিলাম। এই প্রবন্ধে সেই সংগঠনের (কারণ সে সম্পর্কে জানি বেশি) এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টি ও সংগঠনের সশস্ত্র তৎপরতার কিছু বিবরণ দেবার চেষ্টা করবো। সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গও

আসবে।

তার আগে দেখা যাক, ১৯৭১ সালের দিকে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের রাজনৈতিক অবস্থান ও ভূমিকা কী রকম ছিল।

একটু পেছন থেকে শুরু করা যাক। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামেও কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল যা প্রায়শ আলোচনায় উপেক্ষিত হয়। আমরা এখানে অতো পেছনে ফিরে যাচ্ছি না। পাকিস্তান আমল থেকেই শুরু করা যাক। ১৯৭১ সালে হঠাৎ করেই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় নি। পাকিস্তান আমলের ২৪ বৎসরে ক্রমান্বয়ে এই মহান যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল। একথা ভাবতে অবাক লাগে যে, ১৯৪৭ সালে যারা একদিন পাকিস্তানের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন, ২৪ বৎসর পর তাদেরই সন্তানরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। জিন্নাহ'র দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলনের মতো প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক স্রোতে ভেসে গিয়েছিল এই দেশের মানুষ। সেই জায়গা থেকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও বাঙালি জাতীয়তাবোধের জায়গায় নিয়ে আসতে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। বামপন্থী বলতে আমরা এখানে কমিউনিস্ট ছাড়াও ন্যাপ ও মওলানা ভাসানী ও তাঁর অনুসারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করছি। মওলানা ভাসানীই প্রথম স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপস্থাপন করেছিলেন ১৯৪৮ সালে। ১৯৫৬ সালে কাগমারী সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি বিখ্যাত 'আসসালামু আলাইকুম' উক্তি ছিল বিচ্ছিন্ন হবার হুমকি। সেই সময় আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে দুইটি প্রশ্নে মতবিরোধ তৈরী হয়েছিল। (১) স্বায়ত্তশাসন (২) পররাষ্ট্র নীতি। মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা হোসেন শহীদ সোহরোওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে অস্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন, ১৯৫৬-এর সংবিধান অনুযায়ী ইতোমধ্যেই ৯৮ শতাংশ স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিতর্কের বিষয়টি ছিল পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে। পাকিস্তান তখন মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট সিয়াটো, বাগদাদ প্যাক্ট (পরবর্তীতে সেন্টো)'র সদস্য ছিল। আরও ছিল পাক-মার্কিন সামরিক জোট। মওলানা ভাসানী তিনটি সামরিক জোট থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষে ছিলেন। ভাসানী সবসময়ই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলেন। কিন্তু সোহরোওয়ার্দী সরাসরি সামরিক জোটের

পক্ষে; মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অবস্থান নেন। এই বিতর্কে সেদিন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান সোহরোওয়ার্দীর পক্ষে ছিলেন। মওলানা ভাসানী নিজের হাতে গড়া আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন এবং গঠন করেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। এটাই ছিল পাকিস্তান আমলের সবচেয়ে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল। কমিউনিস্ট পার্টি গোপনে ছিল, কারণ তা প্রথম থেকেই চরম নির্যাতনের শিকার ও প্রায় নিষিদ্ধ ছিল এবং ১৯৫৮ সাল থেকে বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল। ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৪-এর নির্বাচন ও ২১ দফা, সামরিক শাসনবিরোধী ছাত্র আন্দোলন (১৯৬২), বিভিন্ন সময়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও ১৯৬৮-৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে এবং ১১ দফা প্রণয়নে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের যে বিশাল ভূমিকা ছিল তা অনস্বীকার্য। এছাড়াও পাকিস্তান আমলের প্রথম জামানায় কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন হাজং বিদ্রোহ, কমরেড অজয় ভট্টাচার্য ও অন্যান্য কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সিলেটের নানকার বিদ্রোহ, ১৯৫০ সালে নাচোলে ইলা মিত্রের নেতৃত্বে সাঁওতাল ও কৃষক বিদ্রোহ এবং ষাটের দশকে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গ্রাম বাংলা কাঁপানো লাল টুপি আন্দোলন ও কৃষক অভ্যুত্থান এবং ষাটের দশকে নতুন ধারার জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন পাকিস্তান আমলের ইতিহাসে কয়েকটি উজ্জ্বল অধ্যায়। এই সবই ছিল কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের নেতৃত্বে পরিচালিত। ১৯৬৮ সালে ৬ই ডিসেম্বর ভাসানীর লাটভবন ঘেরাও, ৭ ও ৮ তারিখে ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল, ২৯শে ডিসেম্বর হাট হরতাল, ঘেরাও আন্দোলন এই সবই ছিল ভাসানীর বিশাল সংগ্রামের কয়েকটি দিক যা গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি তৈরী করেছিল এবং অভ্যুত্থানকে চূড়ান্ত অভিমুখে নিয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন সভায় তিনি শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করে বাস্তিলের দুর্গের মত পাক ক্যান্টনমেন্ট ভেঙ্গে ফেলার এবং মুজিবকে মুক্ত করে ছিনিয়ে আনার হুমকি দিয়েছিলেন। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বামপন্থীদের ভূমিকা আলোচনা করতে গেলে এইসকল ঘটনাকে যথাযথ ঐতিহাসিক মূল্য দিয়েই দেখতে হবে। তবে এ কথা সত্য যে শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব বামপন্থীদের হাতে ছিল না।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি পেশ করলে বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উচ্চতর ও সামগ্রিক রূপ লাভ করেছিল এবং বঙ্গবন্ধু

হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি জাতির অবিসম্বাদিত নেতা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক। তবে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন ও আওয়ামী লীগ পন্থী ছাত্র সংগঠন মিলিতভাবে যখন এগারো দফা দাবি পেশ করে যার মধ্যে ছয় দফাও ছিল, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উপাদানও ছিল, শ্রমিক কৃষকের আশু দাবিসমূহও অন্তর্ভূক্ত ছিল, তখন গণআন্দোলন এক সামগ্রিক রূপ লাভ করেছিল।

ষাটের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকলেও আত্মগোপন অবস্থাতেও কমিউনিস্ট আন্দোলন ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তবে এ সময়ে আবার আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাবে এখানকার কমিউনিস্ট পার্টিও দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি সরাসরি পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার রণনীতি গ্রহণ না করলেও তাঁরা বলতেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে একই ভাবে একই সাথে বিপ্লব হবে না। এর মানে দাঁড়ায় যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। তথাকথিত চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি- পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী), (নেতৃত্বে ছিলেন সুখেন্দু দস্তিদার, তোয়াহা, আবদুল হক) ১৯৬৭ সালের কংগ্রেসে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার রণনীতি গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে এই পার্টি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। নিচে তার বিবরণ তুলে ধরা হচ্ছে:

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (সুখেন্দু দস্তিদার-তোয়াহা-হক)

১৯৭১ সালে এই পার্টিও দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল।

(ক) সুখেন্দু দস্তিদার ও তোয়াহার নেতৃত্বে

(খ) আবদুল হকের নেতৃত্বে

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পর্টি

১৯৭১ সালে এই পার্টিও দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল

(ক) দেবেন শিকদার ও আবুল বশারের নেতৃত্বে

(খ) আবদুল মতিন ও আলাউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি

(নেতৃত্বে কাজী জাফর, মেনন, রনো, মান্নান ভূঁইয়া)

সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন, পরবর্তীতে

নামকরণ করা হয় **সর্বহারা পার্টি**।

এই নিবন্ধে কমিউনিস্টদের বিভিন্ন অংশের যুদ্ধকালীন ভূমিকা সংক্ষেপে *(যদিও তা পরিপূর্ণ নয়)* তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। আমি নিজে সংশ্লিষ্ট ছিলাম 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীর পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি' এর সঙ্গে। অতএব এই সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে জানিও বেশি। অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

১৯৬৯ সালেই কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার রণনীতি গ্রহণ করেছিল এবং গ্রামাঞ্চলে পরিচালিত গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার প্রস্তুতি নিয়েছিল। ১৯৭০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র উদ্যোগে কিন্তু প্রকাশ্যে 'বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন' ও ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ)-এর ডাকে ঢাকার পল্টন ময়দানে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখান থেকে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছিল। সেজন্য সামরিক আদালত সভার বক্তাদের- কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেননকে তাদের অনুপস্থিতিতেই সাত বছর কারাদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের দণ্ডাদেশ প্রদান করেছিল। একই অপরাধে সভার অপর দুই বক্তা মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহবুব উল্লাহকে তাদের অনুপস্থিতিতেই এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছিল। কাজী জাফর আহমেদ, রাশেদ খান মেনন ও মোস্তফা জামাল হায়দার আত্মগোপনে গিয়েছিলেন। মাহবুব উল্লাহ পরে গ্রেফতার হন।

একই বছর পহেলা মে 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি' কর্তৃক সমর্থিত বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইকবাল হলের *(বর্তমানে সার্জেন্ট জহরুল হক হল)* মাঠে। সেই সম্মেলনের রাজনৈতিক প্রস্তাবে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁটি গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। সেই সম্মেলনে ছাত্র ইউনিয়নের মূল স্লোগান 'ঐক্য শিক্ষা শান্তি প্রগতি' এর পরিবর্তে নতুন স্লোগান নির্ধারিত হয় 'মেহনতি জনতার সাথে একাত্ম হও'। ১৯৭০- এর নির্বাচনের পর ১৯৭১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পাকিস্তানি শাসকদের দ্বন্দ্ব মীমাংসাহীন জায়গায় চলে যাচ্ছে এবং জনগণ

মানসিকভাবে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের প্রভাবাধীন গ্রাম এলাকায় গেরিলা স্কোয়াড তৈরির কাজ দ্রুততর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অস্ত্র সংগ্রহের ও বোমা বানানোর উদ্যোগ নিয়েছিলাম। বিভিন্ন জেলা থেকে ক্যাডারদের ঢাকায় এনে বোমা বানানো শেখানো হয়েছিল।

বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হায়দার আনোয়ার খান জুনো প্রশিক্ষণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। বন্দুকের দোকান লুট করে কিছু সংখ্যক বন্দুক সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই কাজে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকাস্থ আরামবাগের কর্মী বাহিনী। ১৯৭১-এ মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু অসহযোগের ডাক দিলে সারা দেশ বিদ্রোহে ফেটে পড়েছিল। মার্চ মাসে টঙ্গীর কারখানার মধ্যেই ব্যাপকভাবে বোমা বানানোর কাজ শুরু হয়েছিল। তারা প্রধানত লেদ মেশিনে বোমার খোল তৈরী করতেন। রোকেয়া হলের বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের মেয়েরা বোমের জন্য রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত করত। তৎকালীন বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন নেতা সাদেক হোসেন খোকার নেতৃত্বে গোপীবাগের কর্মীরা হাটখোলার রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহকারী কয়েকটা দোকান থেকে কিছু প্রয়োজনীয় এসিড সংগ্রহ করেন। ঢাকায় মিলিটারির গাড়ির উপরও বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাতে বিকট শব্দ হতো, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হলে আমরা বুঝতে পারলাম, আমাদের বানানো বোমা ও গুটিকতক বন্দুক এবং সামরিক প্রস্তুতি কত অপ্রতুল ছিল। কিন্তু পার্টি ক্যাডারদেরকে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছিলাম। সেটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ফলে দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১৪টির মতো জায়গায় ছোটো বড় *(তার মধ্যে কয়েকটি স্বল্পস্থায়ী)* গেরিলা ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। এই সকল ঘাঁটি অঞ্চল থেকে ৩০ শহস্রাধিক সশস্ত্র যোদ্ধা বিভিন্ন গেরিলা এ্যাকশনে অংশগ্রহণ করেন। এবং অস্ত্র হাতে না নিলেও যুদ্ধে সরাসরি সহযোগী ভূমিকা পালন করেছিলেন যারা তাদের সংখ্যা যোগ করলে তা এক লক্ষ অতিক্রম করে যাবে। এই সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত শহীদের সংখ্যা শতাধিক হবে।

১৯৭১ এর মার্চ মাসে আমরা লাল হরফে ছাপা তিনটি লিফলেট বিতরণ করি যেখানে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তান আমলে পল্টন ময়দানে শেষ জনসভাটি আমরা করেছিলাম ২৫ মার্চ বিকেলবেলায়।

প্রায় দুই লক্ষ মানুষের জমায়েত হয়েছিল। আমাদের নিজস্ব সাংগঠনিক শক্তিতে এত বড়ো জনসভা অনুষ্ঠান করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে আমাদের ডাকে এত বড়ো সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির নামে প্রথম প্রকাশ্য জনসভা। সভায় কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আনোয়ার খান জুনো, আতিকুর রহমান সালু ও আমি বক্তৃতা করেছিলাম। আমরা ঘোষণা করেছিলাম যে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক যা চলছে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য আর এ জন্যে জনগণকে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির আহ্বান রাখি। তবে আমরা জানতাম না যে সেই রাত্রেই পাকবাহিনীর এমন নৃশংস আক্রমণ আসবে।

২৭ মার্চ কারফিউ উঠে গেলে কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আনোয়ার খান জুনো, আতিকুর রহমান সালু ও আমি শিবপুর *(বর্তমানে নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত উপজেলা)* চলে যাই। সেদিন সকালে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হান (তখন তিনি কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন) আমাদেরকে তাঁর গাড়িটি দিয়েছিলেন, যাতে যুদ্ধের কোনো কাজে লাগে। এই গাড়ি করেই আমরা শিবপুর গিয়েছিলাম। যুদ্ধের নয় মাস গাড়িটি শিবপুরেই ছিল এবং যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল।

শিবপুরে এসে দেখি আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতির কর্মীদের সামরিক ট্রেনিং চলছে। থানার সব কয়টি রাইফেল নিয়ে নেওয়া হয়েছে। এটাই ছিল শিবপুর ঘাঁটি এলাকার সর্ব প্রথম অস্ত্রভাণ্ডার। পরবর্তীতে কীভাবে আরো অস্ত্র সংগৃহীত হয়েছিল এবং কীভাবে বিশাল গেরিলা অঞ্চল গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে একটু পরে কিছুটা বর্ণনা দেয়া হবে।

২৭ মার্চ রাত্রেই শিবপুরে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসলো। ঠিক হলো এখন থেকে শিবপুর হবে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালনার প্রধান ঘাঁটি। আমাদের প্রভাবাধীন বিভিন্ন জেলায় কিছু নির্দেশাবলি দিয়ে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছিল। বস্তুত আগের থেকে কিছুটা মানসিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছিল বলে কয়েকটি অঞ্চলে দ্রুত গেরিলা বাহিনী গঠন করা এবং যুদ্ধে নেমে পড়া সম্ভব হয়েছিল।

মেনন এবং আমি মওলানা ভাসানীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য কিশোরগঞ্জ,

ময়মনসিংহ হয়ে টাঙ্গাইলে পৌঁছলাম ৩ এপ্রিল। টাঙ্গাইলে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা ইতিমধ্যেই পুলিশ, ইপিআর-এর কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে সশস্ত্র হয়েছে।

৩ এপ্রিল বিন্নাফুর গ্রামে মওলানা ভাসানী এক সমর্থকের বাড়িতে ছিলেন। আমরা সেখানেই উঠেছিলাম। সেদিন বিকেলের দিকে পাকবাহিনী টাঙ্গাইলে প্রবেশ করে এবং ভাসানীর সন্তোষের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। পরদিন খবর পাওয়া গেল পাক মিলিটারি বিন্নাফুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মওলানা ভাসানী একাকী বাড়ি ছেড়ে চলে যান, কাউকে সঙ্গে নিতে রাজি হন নি। মেনন শিবপুর ফিরে যায়। বুলবুল খান মাহবুব ও আতিকুর রহমান সালুসহ আমি কয়েকদিন যমুনা নদীতে নৌকা করে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম মওলানা ভাসানীর খোঁজে। একদিন ভারতের আকাশবাণীর খবরে জানলাম যে তিনি ভারতে চলে গেছেন। এর পর আমি ও সালু নানা পথ ঘুরে শিবপুরে ফিরে আসি। ইতিমধ্যে শিবপুরের চেহারা পালটে গেছে। বেশ বড়ো ধরনের গেরিলা সংগঠন গড়ে উঠেছে। কিন্তু তখনো যুদ্ধ শুরু হয় নি।

এদিকে কাজী জাফর আহমদ এবং রাশেদ খান মেনন ভারতে চলে গেছেন। তাদের কাছ থেকে চিঠি এলো, আমারও ভারতে যাবার জন্য ডাক এসেছে। আমিও অনেক পথ ঘুরে একদিন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে পৌঁছলাম। ১ ও ২ জুলাই কলকাতার বেলেঘাটায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কমিউনিস্ট ও বাম রাজনৈতিক দল (ন্যাপ-ভাসানী) ও গণ সংগঠনসমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এই সম্মেলনের সকল আয়োজন ও ব্যবস্থাদি করে দিয়েছিল। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন ন্যাপ নেতা বরদা চক্রবর্তী। এই সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে চেয়ারম্যান করে গঠন করা হয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি। সম্মেলনে একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। ঘোষণাপত্রটির খসড়া রচনা ও সম্মেলনে পেশ করার দায়িত্ব পড়েছিল আমার উপর। ঘোষণাপত্রটি ছাপানোর ও প্রচারের কাজটি করেছিল ভারতের সিপিআই (এম)। তখন এটি আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল। ঘোষণাপত্রে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে মেনেই স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। একই সঙ্গে সরকারি মুক্তিফৌজের সঙ্গে সহযোগিতারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই ঘোষণাপত্রের কপি সঙ্গে নিয়ে কাজী জাফর, মেনন ও আমি প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করি এবং তাকে আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করি।

বস্তুত আমরা দুইভাবে যুদ্ধ করেছিলাম।

(এক) বাংলাদেশের সরকারি মুক্তিফৌজের অভ্যন্তরে আমাদের তরুণ কর্মীদের পাঠিয়ে দিয়ে এবং (দুই) দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা বাহিনী ও গেরিলা ঘাঁটি অঞ্চল গঠন করে। আমরা ভারত সরকারের কোনো সহযোগিতা পাই নি। সম্ভবত বাম রাজনীতির ধারক বলে ভারত সরকার আমাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে নি। এমনকি মুক্তিফৌজেও বামপন্থী ছাত্র-যুবকদের নেয়া হতো না, পরিচয় জানতে পারলে। অবশ্য এক্ষেত্রে আমরা বেশ কয়েক জন সেক্টর কমান্ডারের সহযোগিতা পেয়েছিলাম। যেমন মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, কর্নেল নুরুজ্জামান, মেজর জলিল, মেজর মনজুর আহমদ প্রমুখ। তাদের কেউ কেউ আমাদের ঘাঁটি এলাকায় গোপনে অস্ত্র সরবরাহ পর্যন্ত করেছিলেন। মেজর মনজুরের বড়ো ভাই ব্যারিস্টার মনসুর আহমেদ আমাদের পক্ষ হয়ে সেক্টর কমান্ডারদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

আমরা তিনটি জায়গা থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। প্রধান ঘাঁটি বা সদর দপ্তর ছিল শিবপুরে। সেখানে দায়িত্বে ছিলেন আবদুল মান্নান ভূঁইয়া। এ ছাড়া কলকাতা ও আগরতলা থেকেও আমরা যোগাযোগ রক্ষা করতাম। কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন ও আমি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াত করতাম এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগযোগ রক্ষা করতাম এবং রাজনৈতিক নির্দেশনা ইত্যাদি পৌঁছে দিতাম। আমাদের তিনজনের মধ্যে অঞ্চল ভাগ করা ছিল। তখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তাই বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ভারতের মাটি ব্যবহার একান্তভাবেই প্রয়োজনীয় ছিল। ভারতে আমাদের সবরকম সহযোগিতা দিয়েছিল সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি- সিপিআই (এম)। এছাড়াও ভারতের জনগণের যে আন্তরিক সাহায্য ও সহমর্মিতা সব সময় পেয়েছিলাম তা তুলনাহীন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমি যে সংগঠনের (কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি) সঙ্গে জড়িত ছিলাম সেই সংগঠনেরও যুদ্ধকালীন

তৎপরতা পরিপূর্ণরূপে দেওয়া সম্ভব হবে না। কারণ যে সকল এলাকায় আমাদের গেরিলা ঘাঁটি ছিল তার সবকয়টি যুদ্ধের নির্দিষ্ট তারিখ ও ঘটনা আমার মনে নেই। এত বছর পর তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেও পরিপূর্ণরূপে সংগ্রহ করা যায়নি। বড় দেরি হয়ে গেছে। নিজেকে তাই অপরাধী মনে হচ্ছে। উপরন্তু দেশের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের নেতৃত্বে যে অসম সাহসী গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল তার ইতিহাস রচনা কোন একক ব্যক্তির পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়।

শিবপুর : নরসিংদী জেলা

আমাদের সর্ববৃহৎ গেরিলা ঘাঁটি ছিল শিবপুর থানায়। থানা সদর বাদ দিয়ে পুরো থানার সমগ্র গ্রামাঞ্চল মোটামুটি মুক্ত ছিল এবং স্থানীয় গেরিলাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এমনকি শিবপুর থানার বাইরে মনোহরদি, রায়পুরা, পলাশ ও নরসিংদীতেও গেরিলা তৎপরতা ছিল। পার্টির প্রায় সকল তরুণ ও যুবক কর্মীকে এবং অনেক স্থানীয় ছাত্র ও কৃষকদেরকে সামরিক ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল। অসংখ্য ছোট বড় যুদ্ধ হয়েছে। এখানে কয়েকটি যুদ্ধের কিছুটা বর্ণনা দেয়া হবে।

প্রাথমিকভাবে অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল শিবপুর থানার পুলিশের রাইফেল এবং পশ্চাৎপসারণরত ইপিআর ও বাঙালি সেনাসদস্যদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র সংগ্রহ করে। এপ্রিল মাসের দুই তারিখে ডেমরা থেকে নরসিংদী যাওয়ার পথে পাঁচদোনায় ইপিআর আর বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের সঙ্গে পাকবাহিনীর যুদ্ধ হয়। অসংগঠিত বাঙালি সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হন। তারা নরসিংদী, রায়পুরা, নবীনগর হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে পৌঁছান। পথে তারা বিভিন্ন অস্ত্র ফেলে যান। অনেকেই সেই সকল অস্ত্র জোগাড় করেন। এদেরে মধ্যে কিছু চোর-ডাকাতও ছিল। মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে প্রথমে শুরু হয় অস্ত্র সংগ্রহ অভিযান। তিনি নির্দেশ দিলেন, ব্যক্তিগতভাবে কারোর কাছে অস্ত্র থাকবে না, অস্ত্র এক কমান্ডের অধীনে জমা হবে। আমাদের বাহিনীর প্রধান কমান্ডার মজনু মৃধা জনৈক ইপিআর হাবিলদারের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দুই ম্যাগাজিন ভর্তি গুলিসহ একটি হালকা মেশিনগানও কিনেছিলেন। এদিকে মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে শিবপুরে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতির খবর চারদিকে ছড়িয়ে

পড়লে আশেপাশের এলাকার অনেকে তাঁর সাথে যোগাযোগ করেন। তারে মধ্যে একজন ছিলেন পাকিস্তানি নৌবাহিনী সিরাজউদ্দিন আহমদ। তিনি নেভাল সিরাজ নামে পরিচিত। এপ্রিল মাসে পাঁচদোনায় যুদ্ধের সময় ফেলে যাওয়া প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি মান্নান ভূঁইয়ার কাছে সঙ্গে যোগাযোগ করে তার অস্ত্রসম্ভারের একটা অংশ শিবপুরে মান্নান ভূঁইয়ার কাছে প্রেরণ করেন। শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে ডাংগা নামক স্থানে অস্ত্রগুলি লুকানো ছিল। তা লঞ্চে করে হাতিরদিয়া বাজারে আনা হয়। নেভাল সিরাজ মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে সমন্বয় করে মুক্তিযুদ্ধ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি আমাদের রাজনৈতিক সংগঠনেও অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন। একটা সময় পর্যন্ত তিনি মনোহরদি থানার চালাকচরে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে তিনি নরসিংদীর আশেপাশের এলাকায় বেশ কিছু সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে যান।

শিবপুরের বাহিনীর প্রধান রাজনৈতিক নেতা ছিলেন মান্নান ভূঁইয়া আর প্রধান সামরিক কমান্ডার ছিলেন মজনু মৃধা। তিনি পাকিস্তান বাহিনীর কমান্ডো ছিলেন। মার্চ মাসে ছুটিতে শিবপুরের গ্রামের বাড়িতে আসেন এবং পরে সেখানেই থেকে যান। আমাদের ছেলেদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বও তিনি নিয়েছিলেন। পরে তিনি আমাদের দলের সদস্যপদও গ্রহণ করেছিলেন। মজনু মৃধার বীরত্ব, রণকৌশল ও সেনাপতিসুলভ দক্ষতা ঐ অঞ্চলে জনসাধারণের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি হয়ে উঠেছিলেন জীবন্ত কিংবদন্তি।

শিবপুরের গ্রামাঞ্চলে এক ধরনের গণশাসন তৈরি হয়েছিল। প্রথম দিকে কিছু ডাকাতি হলেও পরে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হেডকোয়ার্টার করা হয়েছিল বিলশরণ গ্রামের খালেকের ট্যাক নামক স্থানে। সেখানে থাকতেন মান্নান ভূঁইয়া। মাঝে মাঝে সাময়িকভাবে অন্যত্র হেডকোয়র্টার সরানো হতো। যুদ্ধের শেষ দিকে কামরাবোতে হেডকোয়ার্টার নিয়ে আসা হয়। শিবপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। জয়নগর, কামরাবো, কোদাল কাটা, ইটনা প্রভৃতি জায়গায় ক্যাম্প হয়েছিল। ক্যাম্প মানে মাটির ঘর। সেখানে খাবার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না। তবু পার্টির কড়া নির্দেশ ছিল যাতে কোনো ধরনের চাঁদা বা চাল ডাল ও অন্যান্য জিনিস ব্যক্তিগতভাবে আদায় করা না হয়। যেটুকু সংগ্রহ করা হতো তা

কেন্দ্রীয়ভাবেই হতো এবং জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে। দড়িপুরায় মহির ট্যাকে একটা ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে একটা মেডিক্যাল টিম গঠিত হয়েছিল। যার প্রধান ছিলেন রমিজ ডাক্তার। আহত যোদ্ধাদের এবং অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তার সেবার যেন কোনো বিরতি ছিল না। তিনি হাসিমুখে ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা করতেন। মে মাসের মাঝামাঝির দিকে শিবপুরে প্রথম আর্মি এসেছিল। তিনটা আর্মি গাড়ি। সেদিনই ঐ তিন গাড়ি নরসিংদীর দিকে ফিরে যাবার পথেই বান্ধাইদা ব্রিজের কাছে মজনু মৃধা এবং হারুন যৌথভাবে আক্রমণ চালিয়ে পাকসেনাদের গুরুতর আহত করেন। তবে আমরা সেবার কোনো অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারি নি। সেদিন পাকসেনারা সারারাত গোলাগুলি করেছিল।

শিবপুরে সামরিক কমান্ডে এবং পাকবাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মজনু মৃধা, হায়দার আনোয়র খান জুনো, মান্নান খান, আওলাদ হোসেন খান, তোফাজ্জেল হোসেন, ঝিনুক, কাঞ্চন, আবদুল আলী মৃধা, সাসমুজ্জোহা মিলন, সেন্টু, রশিদ মোল্লা, আমজাদ, রমিজউদ্দিন, হাবিব, মহাম্মদ হোসেন খান প্রমুখ। অন্যান্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন রব খান, বশিরউদ্দিন খান, তোফাজ্জেল হোসেন, তোফাজ্জল ভূঁইয়া, কালা মিয়া, শহীদুল ইসলাম, খালেক, নুরুল ইসলাম, বাতেন ফকির, রণজিৎ বাসু প্রমুখ।

শিবপুরে প্রথম বড়ো রকমের সামরিক অ্যাকশান হয় জুন মাসের দিকে। শিবপুর-নরসিংদী রাস্তার উপর অবস্থিত পুটিয়া বাজারের কাছের ব্রিজটি উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা নেয়া হয়। ভোরের দিকে অ্যান্টি ট্যাংক মাইনের সঙ্গে একটা ফিউজ জুড়ে দিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে মাইন ফাটানো হলো। তাতে বিকট আওয়াজে গ্রামবাসী জেগে উঠলেও ব্রিজের বেশি ক্ষতি হয়নি। এরপর এক অবাক করা কাণ্ড। গ্রামবাসী নিজেরাই ছুটে এল হাতুড়ি বল্লম নিয়ে। তারাই ব্রিজের মাঝের অংশটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। এরপর প্রতীক্ষার পালা। এ খবর নিশ্চয়ই পাকবাহিনীর কাছে পৌঁছাবে। তারা আসবে নিশ্চয়। তখনি ওদের উপর আক্রমণ চালাতে হবে। ঠিক তাই হয়েছিল। এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন মজনু মৃধা, হায়দার আনোয়ার খান জুনো, ঝিনুক, আমজাদ, ফজলু, বেণু, আফতাব, ইয়াসীন ও আরো কয়েক জন। অস্ত্র ছিল একটা এলএমজি (মজনু মৃধার হাতে), পনেরোটা থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও দুটো

স্টেনগান। পাকসেনারা গাড়ি থেকে নেমে ব্রিজের কাছে এস দাঁড়িয়েছে। সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে আমাদের গেরিলারা এক সময় আক্রমণ শুরু করলেন। ওরাও পাল্টা গুলি চালালো। ওদের অস্ত্র অনেক বেশি ছিল। এমনকি সৈন্যসংখ্যাও বেশি ছিল। তারপরও ত্রিশ জনের মতো পাকসৈন্য নিহত হয়েছিল। তার মধ্যে একজন ক্যাপ্টেনও ছিল। তার টুপি ও ব্যাজ পাওয়া গিয়েছিল। ক্যাপ্টেনের নাম সেলিম। যুদ্ধে ওরা পরাজিত। ওরা পালিয়ে গিয়েছিল। ফেলে গিয়েছিল দুটো চায়নিজ রাইফেল, একটা পিস্তল ও ছয় বাক্স গুলি। এই যুদ্ধে আমরা হারিয়েছিলাম পনেরো বছরের কিশোর যোদ্ধা ফজলুকে। শিবপুরের রণাঙ্গনের প্রথম শহীদ।

এর পরের আরেকটি অ্যাকশনের পরিকল্পনা ছিল এইরকম : শিবপুর লাখপুর আর চরসিন্দুর হাতিরদিয়া রাস্তার সংযোগস্থান দুলালপুরের কাছাকছি এক নির্দিষ্ট স্থানে মাইন পুঁতে রেখে পাক-হানাদারবাহিনীর কনভয়কে উড়িয়ে দেওয়া এবং তারপরে লুকানো অবস্থান থেকে তাদের উপর আক্রমণ চালানো। আগের থেকে মাইন পুঁতে রাখলে অসুবিধা হচ্ছে এই যে, যে কোনো সময় গরুর গাড়ি ওর উপর দিয়ে গেলে বিস্ফোরিত হবে। তাহলে গ্রামবাসীকে সতর্ক করে দেয়া দরকার, যাতে ঐ রাস্তায় কেউ না যায়। তাতে আবার জানাজানি হয়ে যাবে, খবরটা পাকশিবিরে পৌঁছাতে পারে। এইসব বিবেচনা থেকে ঠিক হলো নির্দিষ্ট সময়ে যখন পাকবাহিনীর গাড়ি ওর ওপর দিয়ে যাবে এবং কনভয়ের মাঝামাঝির দিকের গাড়িটি যখন নির্দিষ্ট জায়গা অতিক্রম করবে, তখনি দূর থেকে মাইন ফাটানো হবে। এ জন্য মাইনের মুখ খুলে কিছু পিকে বিস্ফোরক ঢুকিয়ে দেওয়া হলো।

শিবপুরের যোদ্ধারা নিজেরাই হাতে তৈরি করেছিলেন বৈদ্যুতিক ডিটোনিটর। প্রায় কুড়ি গজ মতো দীর্ঘ তার দিয়ে মাইনের সঙ্গে ডিটোনিটর যুক্ত করা হয়। কথা ছিল ডিটোনিটর হাতে নিয়ে হায়দায় আনোয়ার খান জুনো ও মজিবুর রহমান বিশ গজ দূরে ধানক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে থাকবেন। ওদের হাতে ছিল শুধু ভারতীয় এসএলআর। পাকবাহিনীর অবস্থান দেখে, অর্থাৎ যখন তাদের কনভয়ের তৃতীয় গাড়িটি মাইনের জায়গা অতিক্রম করবে তখনি মানিক গুলি করে সিগন্যাল দেবে। গুলির আওয়াজ শুনে হায়দার আনোয়ার খান জুনো তারের দুই প্রান্তের সঙ্গে ব্যাটারি সংযোগ করিয়ে মাইন বিস্ফোরণ ঘটাবে। তারপর কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে আক্রমণ চালাবেন অথবা জুনো-

মজিবুরকে কভার দিয়ে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসতে সাহায্য করবেন কয়েকজন যোদ্ধা। তারা হলেন ঝিনুক, মানিক, আবদুল আলী মৃধা, কফিলউদ্দিন, শাহজাহান, সাহাবুদ্দিন, মিন্টু সোলেমান, সিরাজসহ মোট বারো জন।

নির্দিষ্ট সময় শত্রুবাহিনীর গাড়ি এল। মানিক গুলির শব্দ করে সিগন্যাল দিলেন। জুনো ব্যাটারি সংযোগ করলেন। কিন্তু মাইন ফাটলো না। কারণ যোদ্ধারা যখন দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করছিলেন তখন কোনো এক সময় কোনো গরু বা ছাগল চলার পথে তারটি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, সেটা জুনোদের জানা ছিল না। কিন্তু গুলির শব্দে পাকসেনারা থমকে দাঁড়ালো। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে গুলি করতে লাগলো। জুনো-মজিবুর মাত্র বিশ গজের মধ্যে লুকানো ছিলেন। দেখতে পারলে তারা নিশ্চিত মারা যেতেন। খুব সাবধানে তারা দুজনে ক্রল করে (হামাগুড়ি দিয়ে) কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছিলেন। তাদের কভার দিয়েছিলেন নির্দিষ্ট কয়েক জন যোদ্ধা। এ দিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝিনুক কিছুটা দূরে বিস্ফোরকের সাহায্যে একটা কালভার্ট উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই দিনের যুদ্ধে পাকসেনাদের কয়েকজন নিহত হয়েছিল। আমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। ঝিনুক আফসোস করে বলেছিলেন এলএমজি সঙ্গে থাকলে ওদের সবকটাকে শেষ করে দেয়া যেতো।

শিবপুরে ছোটো-বড়ো সামরিক অ্যাকশন অনেক হয়েছে। পুরো তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। একদিন পেতনী বাজারে অবস্থিত পাক আর্মি ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়েছিলেন মজনু মৃধা, জুনো ও শেখ কাদের। উদ্দেশ্য ছিল ওদেরকে ব্যতিব্যস্ত রাখা।

আরেকদিন খাসিরদিয়া রাস্তায় মাইন বসিয়ে একটা আর্মি গাড়ি ও ড্রাইভারসহ আটজন সৈন্যকে নিহত করা হয়। এই অ্যাকশনে অংশ নিয়েছিলেন হাবিবুর রহমান, রমিজউদ্দিন আহমেদ ও নাজিমুদ্দিন। পরদিন পাক আর্মি পার্শ্ববর্তী গ্রামে আগুন লাগায় এবং সাত জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে।

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে একটা বড়ো ধরনের সামরিক অ্যাকশনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল পুটিয়া বাজারের এক মাইল উত্তরে শাসপুর চৌরাস্তায় মান্নান খানের নেতৃত্বে একদল যোদ্ধা অ্যামবুশ করতে থাকবেন। আর চন্দরদিয়ায় অবস্থান নেবেন মজনু মৃধার নেতৃত্বে আরেক দল। তাদের

দায়িত্ব ছিল মান্নান খানের দলকে প্রয়োজনে সাহায্য করা অথবা পলায়নরত পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালানো। দুইটি দলই অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু সেদিন পাকবাহিনী শাসপুরের রাস্তায় না এসে পেছন দিক দিয়ে এসে অতর্কিতে চন্দরনদিয়ার অবস্থানরত মজনু মৃধার দলের উপর আক্রমণ চালায়। অতর্কিত আক্রমণে হতচকিয়ে গেলেও মজনু মৃধা, আবদুল আলী মৃধা, আমজাদ, মানিক, ইদ্রিস, নজরুল অসম সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করেছিলেন। এই যুদ্ধটি ছিল খুবই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ। বিশেষ করে মজনু মৃধা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে পড়েও যে ধরনের সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন তা ছিল অসাধারণ। এই যুদ্ধে পাকবহিনীর সাতজন মারা গেলেও আমরা হারিয়েছিলাম দুইজন টগবগে কিশোর যোদ্ধাকে- মানিক ও ইদ্রিস। আমজাদের পায়ে গুলি লাগে। নজরুল অস্ত্রসহ পাকবাহিনীর হতে ধরা পড়েন।

পাক ক্যাম্পে নজরুলের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। তারপর এক ঈদের দিন (সম্ভবত ২১ অক্টোবর) পাকবাহিনীর যে ক্যাপ্টেন তার উপর প্রায় প্রতিদিন অকথ্য অত্যাচার করতো সেইই নজরুলকে ডেকে এনে মুক্তি দেয়। ক্যাপ্টেন বলে যে, তার মার কথা মনে হচ্ছে, মায়ের সঙ্গে আর কোনো দিন ঈদ করা হবে কিনা জানে না, তাই নজরুলকে নজরুলের মার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছেড়ে দিচ্ছে। এখন পাকবাহিনীর মনোবল একবারে ভেঙে পড়েছিল।

একেবারে শেষ দিকের ঘটনা। পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ভরতের কান্দি সেতু উড়িয়ে দিতে হবে। এই সেতুটি পাহারা দেয় পাকবাহিনী। সেতুর দুই পাশে পাকসেনাদের বাংকার।

ভোরবেলা দুইদিক থেকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধার দুই দল সেতুর দুই দিকে অবস্থান নেন। প্রতি দলে ছয় জন করে। পুরো অ্যাকশনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মজনু মৃধা। অস্ত্র বলতে ছিল দুটো এলএমজি, দুটো স্টেন, একটা এসএমজি ও বাদবাকি রাইফেল। আরো কিছু গ্রেনেড ও বিস্ফোরক। প্রথমে আমরাই বাংকারে আক্রমণ চালাই। শত্রুসেনারা বাংকার থেকেই প্রতিরোধ দেয়। কিন্তু এক পর্যায়ে ছয়টি মৃতদেহ রেখে পালিয়ে যায়। ফেলে রেখে যায় তিনটি চায়নিজ রাইফেল ও চার বাক্স গুলি। সেতুটি বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেয়া হয়।

সেতু থেকে চার-পাঁচশত গজ দূরে দেখা গেল গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে এক পাকসেনা। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তাকে বন্দি করে নিয়ে আসা হলো। মরার আগে সে একটা পোস্টকার্ড বের করে ওটা পোস্ট করার জন্য অনুরোধ করেছিল।

সদ্যবিবাহিত সৈন্যটি তার স্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছিল। বলাই বাহুল্য সেদিনের ঐ রকম পরিস্থিতিতে মৃত্যুপথযাত্রী শত্রুসেনার অমন অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

নভেম্বর মাসে কুমোড়দি এতিমখানায় অবস্থিত মিলিশিয়া ও রাজাকারদের একটি ক্যাম্প দখল করেন শিবপুরের মুক্তিযোদ্ধারা। নভেম্বর মাসে শিবপুরের মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর উপর বার বার আক্রমণ চালাতে থাকেন। আক্রমণগুলো ছিল স্বল্পস্থায়ী ও আচমকা।

আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এবার শিবপুরকে মুক্ত করতে হবে। পরপর তিন রাত খুব কাছ থেকে শিবপুরে অবস্থিত পাক-ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালানো হয়। এই আক্রমণে আমাদের কোনো ক্ষতি হয় নি। কিন্তু চারজন পাকসেনা নিহত হয়। এর দুদিন পর তারা নিরাপত্তার অভাব অনুভর করে শিবপুর ছেড়ে চলে যায় এবং নরসিংদী ক্যাম্পে গিয়ে আশ্রয় নেয়। নভেম্বর মাসেই শিবপুর মুক্ত হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ শিবপুর থানা হেডকোয়ার্টারে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে বিজয় মিছিল করেছিল।

এগারো ডিসেম্বর নরসিংদীর টি অ্যান্ড টি ক্যাম্পের (পাকসেনাদের ক্যাম্প) উপর আক্রমণ চালান শিবপুরের মুক্তিযোদ্ধার দল। মজনু মৃধা, মান্নান খান, ঝিনুক, সেন্টু, আবদুল আলী মৃধা, আওলাদ, সাউদ, হায়দার আনোয়ার খান জুনো, ইকবালসহ প্রায় তিরিশ জন অংশ নেন।

মুক্তিযোদ্ধারা গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছিলেন। পাকিস্তানিরা বাংকার থেকে ভারী মেশিনগান দিয়ে ক্রমাগত গুলিবর্ষণ করে। মুক্তিযোদ্ধার দল সেদিন ক্যাম্পের কাছে যেতে পারেন নি। তবে তাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। পরদিন আবারও তারা আক্রমণ চালান।

তেরো ডিসেম্বর খুব ভোরে পাকসেনারা ক্যাম্প ছেড়ে ঢাকা চলে যায়। আমাদের যোদ্ধারা নরসিংদীর পাকক্যাম্প দখল করলেন। তারা তো অবাক। থাকে থাকে সাজানো কত অস্ত্র। তারা ট্রাক ভাড়া করে শিবপুরে অস্ত্র নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ঠিক এমন সময় একটি ভারতীয় সেনা

হেলিকপ্টার অবতরণ করে। তখন ভারতের বাহিনী ভৈরব পর্যন্ত এস গেছে। হেলিকপ্টারে একজন ভারতীয় অফিসার ও অল্প কিছু সৈন্য ছিল। তারা আমাদের ছেলেদের ধন্যবাদ জানিয়ে ক্যাম্পের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। ভারতীয়সেনার কথা না শুনলে তারা তখন কিছুই করতে পারতেন না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিচক্ষণ মান্নান ভূঁইয়া নির্দেশ পাঠালেন, ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে বিরোধে না গিয়ে শিবপুরে ফিরে এসো।

সমগ্র এলাকার উপর মান্নান ভূঁইয়ার চমৎকার নিয়ন্ত্রণ ছিল। এক ধরনের গণপ্রশাসন গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধের মধ্যেও অবসর সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাজনৈতিক ক্লাসের ব্যবস্থা থকত। জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণাপত্র ও বিভিন্ন প্রচারপত্র বিলি করা হতো। শিবপুরে সত্যিই এক ব্যতিক্রমী গেরিলা এলাকা ও ব্যতিক্রমী যুদ্ধ হয়েছিল।

একেবারে শেষের দিকে বিএলএফ-এর একটি গ্রুপ এসেছিল শিবপুরে। তাদের অস্ত্রসম্ভার আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তাদের উপর নির্দেশ ছিল মান্নার ভূঁইয়াকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু তারা তা করেন নি। প্রথমত তারা হঠাৎ করে এসে যুদ্ধ পরিস্তিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত তারা আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে জনগণের কাছ থেকে জানতে পেরে নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন। দেশপ্রেমিক মান্নান ভূঁইয়াকে শুধু বামপন্থী বলে কেন হত্যা করতে হবে, তা তারা বুঝে উঠতে পারেননি।

এটাও অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য যে শিবপুরের গ্রমাঞ্চলে একজন রাজাকারও তৈরি হয় নি। সমগ্র মানুষকে উন্নততর চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল।

শিবপুর থেকে দুইবার ভারতে দুটি গ্রুপ পাঠানো হয়েছিল ট্রেনিং এবং অস্ত্রের জন্য। আরো উদ্দেশ্য ছিল যাতে শিবপুর সম্বন্ধে বিভ্রান্তি দূর হয়ে সরকারি মুক্তিফৌজ তাদেরকে স্বীকৃতি দেন। দুইবার সামান্য ট্রেনিং-এর পর তারা পেয়েছিলেন কিছু স্টেনগান ও প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক। সরকারি মুক্তিফৌজের পক্ষ থেকে, তিন নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর সফিউল্লাহ নেভাল সিরাজকে নরসিংদী, শিবপুর, রূপগঞ্জ, আড়াই হাজার এলাকার আঞ্চলিক কমান্ডার এবং মান্নান খানকে শিবপুর থানার কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় নি। আমাদের পার্টির পরিকল্পনা মাফিক কাজ চলেছিল, কারণ আঞ্চলিক কমান্ডার ও থানা কমান্ডার

আমাদেরই সংগঠনের লোক ছিলেন।

জুলাই মাসের শেষ দিকে কিছু জামাত নেতাসহ দালাল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কিছু ডাকাতের উপদ্রবও দেখা দিয়েছিল। তাদেরকে সশস্ত্রভাবেই দমন করা হয়। সাবেদ আলী, নিজামুদ্দিন, উসমান, কার্তিক ডাকাতকে ধরে এনে প্রকাশ্যে বিচার করে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। এরপর আর ডাকাত দেখা যায় নি। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে শিবপুর বামপন্থীদের ঘাঁটি, তারা আওয়ামী লীগ কর্মীদের হত্যা করছে, এমন মিথ্যা প্রচার চলতে থাকে সেক্টর কমান্ডারের হেডকোয়ার্টারে। কখনো কখনো তারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।

এইরকম এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে শিবপুরের গেরিলারা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। যুদ্ধের একবারে শেষ দিকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ফটিক মাস্টার ভারত থেকে ফিরে এসে যশোর বাজারে অবস্থান নেন। তিনি মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং তারপর থেকে দুজনের মধ্যে সদ্ভাব বজায় ছিল।

শিবপুরের রণাঙ্গনের ছবি অনেক ব্যাপক, অনেক বিস্তৃত। এখানে সংক্ষেপে কিছু খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হলো।

বিষ্ণুপুর : বাগেরহাট জেলা

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বে বাগেরহাট জেলায় বাগেরহাট সদর থানার ভৈরব-দড়াটানা নদীর উত্তর তীরে চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুরে একটি শক্তিশালী গেরিলা ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বে ছিলেন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির বাগেরহাটের নেতা রফিকুল ইসলাম খোকন। খালিশপুরে গ্রামেই ছিল সদর দপ্তর। তাছাড়া সন্তোষপুর ও চিতলমারী ইউনিয়নের সুড়িগাতী গ্রামেও বিপ্লবীদের আরো দুইটি কেন্দ্র ছিল। কমরেড রফিকের নেতৃত্বে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতির কর্মীদের দ্বারা প্রাথমিকভাবে গেরিলা ফৌজ তৈরি হয়েছিল। এই ফৌজের সঙ্গে নয় মাসে মুজিবনগর সরকারের কোনো ধরনের যোগাযোগ ছিল না। যুদ্ধ চলাকলীন প্রায় নয় মাসই তারা বিষ্ণুপুর এলাকার বিশাল ভূখণ্ড মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রধানত স্থানীয়ভাবে তারা অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন। তারা ছোটে-বড়ো অসংখ্য যুদ্ধ করেছিলেন এবং অনেক

বিপ্লবীকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল।

৬৯-৭১ সালের দিকে বাগেরহাটের রঘুনাথপুর-বিষ্ণুপুর ও বাহিরদিয়া, পিরোজপুরের মাটিভাঙ্গা চেচরিমাপুর অঞ্চলে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বে কৃষক সংগঠনের ভালো ঘাঁটি তৈরি ছিল। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পাকবাহিনীর বর্বর আক্রমণ শুরু হলে রফিকুল ইসলাম কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দ, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতির কর্মীদের নিয়ে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির রাজনৈতিক কর্মসূচি তাঁর জানা ছিল। ফলে এক ধরনের মানসিক প্রস্তুতি আগে থেকেই ছিল।

১৯ এপ্রিল রফিকুল ইসলাম খোকন, জুবায়ের নোমা, শংকর বিশ্বাস, খসরু, গোলাম মোস্তফা হিল্লোল, ইসমাইল হোসেন (মেজো), মান্নান চৌধুরী প্রমুখ বিষ্ণুপুর হাই স্কুলে জড়ো হয়ে সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী গঠনের কাজ শুরু করেন। এরপর তারা টহলদার পুলিশ ও আনসারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে প্রথমিক অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে পাকবহিনী ও রাজাকারদের কাছ থেকে যুদ্ধ করে অস্ত্রসম্ভার বাড়িয়েছিলেন। ইতিমধ্যে পিরোজপুরের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির নেতা ফজলুর নেতৃত্বে *(পরে তিনি শহিদ হয়েছিলেন)* ট্রেজারির যে অস্ত্রাগার লুট করা হয়েছিল সেখান থেকে ১৯টি থ্রি নট থ্রি রাইফেল বিষ্ণুপরে পাঠানো হয়েছিল।

প্রথম থেকেই এই গেরিলা বাহিনীকে পাকবাহিনী তো বটেই স্থানীয়ভাবে গজিয়ে ওঠা দুই একটি বাহিনীর সঙ্গেও মোকাবিলা করতে হয়েছিল। এই পর্যায়ে ২৭ এপ্রিল বাগেরহাটের বামপন্থী শিবিরের প্রথম শহিদ হলেন গোলাম মোস্তফা হিল্লোল। বিষ্ণুপুরের ঘাঁটিটি কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নেতৃত্বে গড়ে উঠলেও এখানে মুক্তিকামী অন্য অনেক মানুষ জমা হয়েছিলেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ইসমাইল হোসেন (মেজো) এই বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বিমানবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি তাজুল ইসলামও যোগ দিয়েছিলেন। পরে তিনি ভারত চলে যান। কমরেড রফিক মুক্তিকামী সকল ধরনের মানুষকে জড়ো করেন। মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ অজিয়র রহমানও বিষ্ণুপুরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে তিনি

বাগেরহাটে ফিরে গেলে গ্রেফতার হন। তাকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রফিক বাহিনী ও টুকু বাহিনী *(কামরুজ্জামান টুকু ছিলেন তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা)* যৌথভাবে বাগেরহাট থানা আক্রমণ করেন। এটাই ছিল বাগেরহাটের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম বড়ো রকমের সামরিক অ্যাকশন। রফিকের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর পক্ষে যারা এই আক্রমণে অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন রফিক, জুবায়ের নোমা, খসরু, আসাদ, আনিস, গোবিন্দ, মধু, নজরুলসহ বাইশ জন। এই অ্যাকশন সফল হয় নি। অজিয়র রহমানকে তারা মুক্ত করতে ব্যর্থ হন। পরে অজিয়র রহমানকে পাকবাহিনী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এই যুদ্ধে দুই জন পুলিশ নিহত হয়। টুকু বাহিনীর দুই জন শহীদ হন।

মে-জুন মাসে রফিকের নেতৃত্বাধীন বাহিনী প্রধানত দালাল নিধন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। ১৭ মে দেশীয় রাজাকারদের সঙ্গে নিয়ে হানাদার বাহিনী গোটাপাড়া ও বিষ্ণুপুর এলাকায় ব্যাপক অগ্নিসংযোগ, হত্যা-ধর্ষণ করে। বাগেরহাটে ফিরে যাবার পথে গেরিলারা রাজাকারদের উপর আক্রমণ চালান এবং মজিবর নামে এক রাজাকার নিহত হয়। এরপর পাকহানাদাররা গানবোটে করে বাবুরহাট বাজার থেকে দ্বিতীয় দফা আক্রমণ চালালে গেরিলারা সাময়িকভাবে পিছু হটে মঙ্গলবাড়ি রঘুনাথপুরে আশ্রয় নেন। ২২ মে গেরিলারা এলাকাকে শত্রুমুক্ত করার জন্য সাত্তার লস্কর নামে এক দালালকে হত্যা করেন। ৬ জুন এক সংঘর্ষে মজবুল শহীদ হন।

জুন মাসে মুক্তিযোদ্ধা গেরিলারা দালাল নিধনের জন্য সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করেছিলেন। নোমা ও কেষ্ট ঘোষ দুইজনের একটি স্কোয়াড একটি রিভলভার ও একটি স্টেনগান নিয়ে (মাত্র ১১টি গুলি ছিল)। কুখ্যাত দালাল রজব আলীকে বাগেরহাট শহরে গিয়ে নিহত করার জন্য আক্রমণ চালান। এতে রজব আলী গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতরভাবে আহত হলেও মারা যায় নি। একজন দেহরক্ষী নিহত হয়েছিল। যশোর ক্যান্টনমেন্টে সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা করে রজব আলী বেঁচে উঠেছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে রজব আলী আত্মহত্যা করেছিল।

২৪ জুলাই রাজাকারদের বহনকারী রূপসা-বাগেরহাটগামী একটি ট্রেনে আক্রমণ চালান যৌথভাবে রফিকের নেতৃত্বাধীন বাহিনী এবং বাহিরদিয়ার মানস ঘোষের *(মানস ঘোষও তখনো কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির সাংগঠনিক কাঠামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)* নেতৃত্বাধীন আরেকটি

গেরিলা দল। অনেক রাজাকার হতাহত হয়। এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। ইতিমধ্যে রফিকেরর বাহিনী কচুয়া থানায় আক্রমণ চালিয়ে ৮টি রাইফেল, ২টি স্টেনগান ও একটি রিভলবার সংগহ করেন। এই অ্যাকশনে অংশ নিয়েছিলেন তাজুল ইসলাম, জুবায়ের নোমা, কেষ্ট, কান্ত, আ. মনসুর, কুদ্দুস, হাবিব, নিরোদ, মুজিবুর, বাচ্চু, বাদল, নবীরুদ্দিন, শংকর, তৈয়ব খাঁ, মালেক ও খসরু।

৭ আগস্ট বিষ্ণুপুরের গেরিলারা মাধবকাঠি মাদ্রাসায় অবস্থানরত পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ চালান। মধ্যরাত থেকে পরদিন দুপুর দুটো পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। তিন জন পাকসেনাসহ ষোলো জন রাজাকার নিহত হয়। আগস্টের শেষ দিকে বিষ্ণুপুরের উপর পাকবাহিনীর আক্রমণ বাড়তে থাকে।

৯ সেপ্টেম্বর যাত্রাপুর ইউনিয়নের পানিঘাটে পাকবাহিনীর সঙ্গে আমাদের গেরিলাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হয়েছিল। পরবর্ততে এটা পানিঘাট যুদ্ধ নামে পরিচিত হয় এবং জনগণের মুখে মুখে ছিল। গেরিলারা ছোটো ছোটো গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পাকবহিনীর উপর আক্রমণ চালিছেলেন। পাকবহিনী নদীপথে ছিল। গেরিলাদের গুলিতে সারেং আহত হয় এবং লঞ্চ নদীপথে ঘুরতে থাকে। সড়কপথেও পাকবাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল। তারা গেরিলা আক্রমণের মুখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে ১৬ জন পাকসেনা ও অনেক রাজাকার নিহত হয়।

১৩ সেপ্টেম্বর দেপাড়া ব্রিজের কাছে আবার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিজয় পাল শহিদ হন। অন্যদিকে তিন জন পাকসেনা ও পাঁচ জন রাজাকার নিহত হয়। ১৫ অক্টোবর বাঁশতলা ব্রিজের কাছে পাকবাহিনীর সাথে রফিকের নেতৃত্বাধীন গেরিলাদের আরেক দফা যুদ্ধ। কোনো পক্ষেরই তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। ৩০ অক্টোবর গোটাপাড়া ইউনিয়নের বাবুরহাট বাজারে পাকবাহিনীর সঙ্গে আবারও যুদ্ধ হয়। সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে গেরিলারা আক্রমণ চালালে পাকবাহিনীর অগ্রবর্তী অংশ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। হানাদার বাহিনীর আরেকটি অংশ বাবুরহাট বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। জনৈক কিশোরের মাথায় গোলাবারুদের বাক্স দিয়ে পাকবাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল। ব্রিজের কাছে আসতেই কিশোরটি বাক্সসহ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়ে যায়। এইভাবে প্রতিপদে জনগণ হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তাই বিপুল অস্ত্রে সজ্জিত সুশিক্ষিত পাকবাহিনী জিততে পারে নি। এই যুদ্ধে একজন

ক্যাপ্টেনসহ চার হানাদারসেনা ও তিন রাজাকার নিহত হয়। পানিঘাট যুদ্ধে ও বাবুরহাট যুদ্ধে গল্পকার সুশান্ত মজুমদার অংশ নিয়েছিলেন।

৯ নভেম্বর বাবুরহাটে গেরিলাদের সঙ্গে পাকবাহিরীর আবারও যুদ্ধ হয়। দুই ঘণ্টা স্থায়ী এই যুদ্ধে পাঁচ পাকসেনা ও অনেক রাজাকার নিহত হয়। ইসমাইল হোসেন (মেজো) এক পাকসেনার কাছ থেকে হেভি মেশিনগান ছিনিয়ে নেন। আল শামস বাহিনীর একজনকে গেরিলারা জীবন্ত ধরে ফেলেন। পলায়নরত কয়েকজন পাকসৈন্য জনতার হাতে গণপিটুনিতে নিহত হয়।

বিষ্ণুপুর এলাকায় গেরিলা বাহিনী একদিকে যেমন অসংখ্য যুদ্ধ করেছেন, অপরদিকে তেমনই রাজনৈতিক প্রচারও করেছেন। তারা বলতেন, শুধু স্বাধীনতা নয়, আমরা প্রতিষ্ঠা করব শোষণমুক্ত সমাজ। বস্তুত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির রাজনৈতিক লাইন তারা অনুসরণ করেছিলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর কামরুজ্জামান টুকুর নেতৃত্বে মুজিব বাহিনী বাগেরহাটে অবস্থান নেয়। একই সাথে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আসেন কয়েক জন সামরিক অফিসার। একদিকে মুজিব বাহিনী সঙ্গে এফএফদের সংঘর্ষ তখন সারা দেশেও হয়েছিল। অপরদিকে মুজিব বাহিনীর সঙ্গে বিষ্ণুপুরের কমিউনিস্ট গেরিলাদেরও ছোটোখাটো সংঘর্ষ হয়েছিল। একে অন্যের সদস্যদের পাল্টাপাল্টি আটক করে রাখার ঘটনাও ঘটেছিল। তবে তা বেশিদূর অগ্রসর হয় নি।

৩১ জানুয়ারি কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির কেন্দ্রীয় নেতা রাশেদ খান মেনন সেক্টর কমান্ডার মেজর মনজুর আহমদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিষ্ণুপুরের গেরিলাদের অস্ত্র সমর্পণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

বরিশাল

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকেই বরিশালে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির কাজ শুরু হয় প্রকাশ্যেই, কারণ বরিশাল তখনো মুক্ত ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর এম. এ. জলিল তখন ছুটি কাটাতে বরিশালে অবস্থান করছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগ নেতাদের সহায়তায় বরিশালে সামরিক বাহিনীর ইপিআর, পুলিশ, আনসারদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করেন। ন্যাপ (মো.) কমিউনিস্ট

পার্টি (মণি সিংহ) তাকে সমর্থন দেন। অপরপক্ষে ভাসানী ন্যাপ, কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ও অন্যান্য বামপন্থীরা বরিশাল শহরে আইন মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আরেকটি পৃথক ঘাঁটি গড়ে তোলেন এবং সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। প্রায় শতাধিক শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, রাজনৈতিক কর্মী গেরিলাযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ভাসানী ন্যাপের বর্ষীয়ান নেতা নুরুল ইসলাম খান, জেলা সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সিদ্দিক হোসেন, জেলা কমিটির সদস্য ইকবাল হোসেন ফোরকান, কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির তিনজন সদস্য সৈয়দ নজরুল ইসলাম *(তিনি বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি)*, শাহ আলম *(তিনি বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের জেলা সভাপতি)* এবং মো. মহিউদ্দিন মধু *(তিনি কর্ণকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক)* এই প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন।

২৫ এপ্রিল পাক-হানাদারবাহিনী নৌপথে বরিশাল আসে। একই সঙ্গে বিমান থেকে ছত্রীসেনারাও এলাকায় নামে। তারা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে শতাধিক গ্রামবাসীকে হত্যা করে। তালতলী নদীর মুখে মেজর জলিলের বাহিনী তাদের প্রতিরোধের চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে এই মুক্তিবাহিনী পিছু হটে গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় নেন এবং পরে সুন্দরবন দিয়ে ভারতে চলে যান।

এদিকে বামদের দ্বারা গঠিত মূলত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বাধীন বাহিনী বাবুগঞ্জ ও বানারীপাড়ায় অবস্থান নেন। মে মাসের মাঝামাঝির দিকে সমন্বয় কমিটির স্থানীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শাহ আলম ও মহিউদ্দিন মধু কর্ণকাঠি গ্রামে অধ্যাপক সাত্তারের সাথে যোগযোগ করেন। অধ্যাপক সাত্তারের *(পরবর্তীতে ওয়ার্কাস পার্টির নেতা)* আহ্বানে বরিশাল সদর, বাকেরগঞ্জ ও নলছিটি থানার শতাধিক ইপিআর, পুলিশ ও আনসার সদস্য সাড়া নিয়ে নতুনভাবে একটি বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। অধ্যাপক আবদুস সাত্তারকে বাহিনীপ্রধান এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক দপদপিয়া গ্রামের আব্দুল মান্নান হাওলাদরকে ফিল্ড কমান্ডার নির্বাচিত করা হয়। মহিউদ্দিন মধু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও শাহ আলম বাহিনীর রাজনৈতিক প্রশিক্ষক নির্বাচিত হন। বাহিনীর সদস্যদের থাকা-খাওয়ার ভার নিয়েছিল কর্নকাঠি ও আশেপাশের গ্রামের কৃষক ও সাধারণ জনগণ। প্রথম কাজ ছিল অস্ত্র সংগ্রহ করা। সাব-সেক্টর কমান্ডার

ক্যাপ্টেন বেগের সহকর্মী পরিমল দাস প্রথমে মজুদ কিছু অস্ত্রের সন্ধান দেন। এইভাবে প্রথমে কিছু চায়নিজ রাইফেল ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় হয়েছিল। তাছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে কিছু দোনলা বন্দুক ও দেশি অস্ত্র সংগৃহীত হয়েছিল।

এদিকে মুসলিম লীগ, জামাত দিয়ে গঠিত শান্তি কমিটি এবং রাজাকার, আল বদর বাহিনীর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার ছিল সীমাহীন। এই পরিপ্রেক্ষিতে জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অধ্যাপক আবদুর সাত্তারের নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনী নলছিটি থানা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। তারা রাত ১টার দিকে নলছিটি থানা ঘেরাও করে আক্রমণ করলেন। রাত ৪টা পর্যন্ত দুই পক্ষে প্রচণ্ড গোলাগুলি চলে। এই যুদ্ধে সৈয়দ নজরুল খুবই সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক ও কর্ণকাঠি গ্রামের আবুয়াল হোসেন হাওলাদার এই যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরদিন সকালে শান্তি কমিটির হাতে ধরা পড়েন। পাকবাহিনী তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। এই যুদ্ধে নলছিটির চাটের এলাকার সেকান্দার আলী শহীদ হন। বরিশালে এটাই ছিল প্রথম অ্যাকশন। ফলে এর প্রভাব সমগ্র বরিশাল জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

নলছিটি থানা অপারেশনের কয়েক দিন পর সৈয়দ নজরুল ইসলাম যোগাযোগ ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য কর্ণকাঠি থেকে বাবুগঞ্জ যান। সেখানে তিনি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। তাকে যশোর আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে তার উপর নির্মম অত্যাচার করা হয়। অক্টোবর মাসে তাকে ছেড়ে দেয়া হলেও নভেম্বরে আল বদর বাহিনী আবার গ্রেফতার করে এবং বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে সারা দেহ রক্তাক্ত করে কীর্তনখোলা নদীতে ফেলে দেয়। পরের দিন নৌকার মাঝিরা তাকে উদ্ধার করলে তিনি কেবল তার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যায় নি।

বরিশাল অঞ্চলের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম. এ. জলিল। বরিশাল সাব-সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হয়েছিলেন ক্যাপ্টের শাহজাহান ওমর। প্রথম দিকে বামপন্থীদের গেরিলা বাহিনীকে তারা কিছুতেই স্বীকৃতি দিতে রাজি ছিলেন না। এক পর্যায়ে এই বাহিনীকে অঞ্চল ভিত্তিক যুদ্ধ পরিচালনা করার অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। অবশ্য বামপন্থীদের এই গেরিলা বাহিনী কারোর

অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করেই নিজস্ব তৎপরতা চালিয়েছিল এবং জনগণের বিপুল সমর্থন ও সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে এবং সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করে টিকে ছিল এবং বিকাশ লাভ করছিল। তবু সরকারি স্বীকৃতিটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অন্যথায় দেশের অন্যত্র যা হয়েছিল তা হলো বামপন্থী গেরিলা বাহিনীকে অতিরিক্ত সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়েছিল। এক পর্যায়ে অধ্যাপক আবদুস সাত্তারকে বেইজ কমান্ডার নিয়োগ দেয়া হয়। এই বাহিনী একদিকে বরিশালের সকল বামশক্তিকে সংগঠিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, অপরদিকে ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে বিভিন্ন অ্যাকশনে যেতে পেরেছিল। শাহজাহান ওমরের সঙ্গে তারা বাকেরগঞ্জ থানা, স্বরূপকাঠি, নলছিটির চাটের গ্রামে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

চাচৈরের যুদ্ধ কে. এম. মহিউদ্দিন মালিক বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। সেজন্য তাঁকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। এছাড়াও তারা বরিশাল শহরে গেরিলা কায়দায় একধিকবার গ্রেনেড হামলা চালিয়ে হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার, আল বদর, আল শামসদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলেন।

এদিকে বরিশালে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন শ্রমিক আন্দোলন *(পরে নাম হয় সর্বহারা পার্টি)* ৩০ এপ্রিল বরিশালের বানারীপাড়ায় অবস্থান নিয়ে জাতীয় মুক্তিবাহিনী গঠন করেছিলেন। তারা পেয়ারা বগানের খানিকটা মুক্ত করে শক্ত ঘাঁটি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পেয়ারা বাগানের যুদ্ধ নানাভাবে যথেষ্ট আলোচিত হয়েছে। এই মুক্তিবাহিনীর একটি সর্বোচ্চ পরিচালকমণ্ডলী ছিল এবং সিরাজ সিকদার ছিলেন তার প্রধান। আটঘর কুড়িয়ানা পেয়ারা বাগান সংলগ্ন এলাকা ছিল বরিশালের মধ্যে প্রথম মুক্তাঞ্চল।

পিরোজপুর

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় পাকবাহিনীর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের খবর পৌঁছানের সঙ্গে সঙ্গেই পিরোজপুরে 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি' এর সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন যে, এখনই গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলতে হবে এবং অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির পিরোজপুর শাখার সমন্বয়ক ফজলুল হক (ফজলু) এর

নেতৃত্বে ৩০/৩৫ জনের একটি বাহিনী পিরোজপুর ট্রেজারি থেকে অনেকগুলি রাইফেলসহ অস্ত্র লুট করে। *(ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, তার একটি অংশ বিষ্ণুপুরে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির ঘাঁটিতে পাঠানো হয়েছিল।)* এই অভিযানে একই পার্টির (সমন্বয় কমিটির) সদস্য ওবায়দুল কবির বাদল, নূরদিদা খালেদ রবি, ফজলুল হক সেন্টু, শহীদুল হক চান, সমীর কুমার বাচ্চু, মন্টু প্রমুখ অংশ নেন। পরবর্তীতে কলাখালি থেকে ফজলুল হক খোকন রাজাকার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন (৫ মে)। আরো গ্রেফতার হয়েছিলেন একই দলের (সমন্বয় কমিটি) পুর্ণেন্দু বাচ্চু, প্রবীর বাচ্চু, জাহাঙ্গির, দেবু ও কেষ্ট। পাকবাহিনীর ক্যাম্পে বর্বর অত্যাচার করে তাদের হত্যা করা হয়। ফজলুল হক খোকনকে পাকসেনারা নদীর তীরে গুলি করে হত্যা করে। পরবর্তীকালে পার্টির অন্যতম কর্মী বিধানচন্দ্র মন্টু শহিদ হয়েছিলেন।

যুদ্ধের শুরুতেই নেতৃত্বের বড়ো অংশকে এইভাবে হারাতে হয়েছিল। এরপর কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির পিরোজপুর শাখার অন্যান্যরা পুনরায় সংগঠিত হন। একই পার্টির নেতা ওবায়দুল কবির বাদলের নেতৃত্বে বাহিনীকেও পুনর্গঠিত করা হয় এবং তারা নাজিরপুরের মাটিভাঙ্গায় অবস্থান নিয়েছিলেন। মাটিভাঙ্গার কাজী মোসলেম উদ্দিন, আতিয়ার রসুল, ফরিদ খান, আইউব আলী, উকিল উদ্দির ফরাজী, ধলু মিয়া, এবিএম জাহাঙ্গির, আবদুল আওয়াল, আবুল হোসেন ফকির, আজাহার আলী ও মোশারেফ হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। এক পর্যায়ে পিরোজপুরের পার্টির (সমন্বয় কমিটির) নূরদিদা খালেব রবি, ওবায়দুল কবির বাদল, শহীদুল হক চান, সামসুদ্দোহা মিলন, শহীদুল হক মন্টু, সমীর কুমার বাচ্চু, তোফাজ্জেল হোসেন মঞ্জুসহ কয়েক জন বিষ্ণুপুরের ঘাঁটিতে অবস্থান নিয়েছিলেন।

তালা-সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার প্রায় পুরোটাই স্বাধীন রেখেছিলেন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির সাতক্ষীরা জেলা শাখার সমন্বয়ক ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের নেতা কামেল বখত। আঠারো বছরের টগবগে তরুণ। বয়স কম হলেও নেতৃত্বের যোগ্যতা ছিল অসামান্য। স্থানীয়ভাবে অস্ত্র

সংগ্রহ করে তিনি বিশাল গেরিলা বাহিনী তৈরি করছিলেন। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন পাকবাহিনী ও রাজাকারদের সঙ্গে। দালালদের হত্যা করে তিনি প্রকাশ্যে গাছে ঝুলিয়ে রাখতেন। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির নামে কিছু ঘোষণাও তিনি একই সঙ্গে টাঙ্গিয়ে রাখতেন। যুদ্ধের পাশাপাশি তিনি কৃষকদের স্বার্থে কিছু বন্ধকী জমি উদ্ধার করেছিলেন এবং খোদ কৃষকের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের পাশাপাশি কৃষকের স্বার্থ এক ধরনের গণপ্রশাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

নভেম্বর মাসের কোনো এক সময়ে তিনি কোলকাতায় এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে তালার পরিস্থিতির উপর রিপোর্ট করছিলেন। কথা হয়েছিল, আমি যাবো তালাতে। নির্দিষ্ট তারিখও ঠিক হয়েছিল। কোন পথ দিয়ে যাবো, কে নিয়ে যাবে তার বিস্তারিত বন্দোবস্ত হয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত তারিখের দুই একদিন আগে তালা থেকে পার্টির এক কমরেড এলেন কোলকাতায়, বললেন, কমরেড কামেল বখত শহীদ হয়েছেন। ঘুমন্ত অবস্থায় আততায়ীর গুলিতে তার জীবনাবসান ঘটেছিল। পাকবাহিনী বা রাজাকারদের কেউ নয়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেরই অন্য এক শক্তি রাজনৈতিক কারণে অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। অমন সম্ভাবনাময় তরতাজা তরুণের মৃত্যু সংবাদে বেদনা ধরে রাখা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়েছিল। সংবাদদাতাকে আমি বলেছিলাম, তবু আমি তালায় যাবো, পরিস্থিতি দেখার জন্য এবং অন্যান্য কমরেডদের মনোবল রক্ষার জন্য। সেবারও নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ভারতের দিক থেকে বর্ডার সিল করে দেয়া হয়েছিল। ফলে সীমান্ত অতিক্রম করে যাতায়াত আর করা যায় নি।

টাঙ্গাইল

এপ্রিল মাসের ৩ তারিখে রাশেদ খান মেনন এবং আমি যখন টাঙ্গাইল পৌঁছেছিলাম, তখনি দেখেছি ছাত্রলীগ ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা স্থানীয় পুলিশ-ট্রেজারির অস্ত্র ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। ২৫ মার্চের পর থেকে এপ্রিলের ৩ তারিখ পর্যন্ত টাঙ্গাইল মুক্ত ছিল। তখনই টাঙ্গাইলে আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ সর্বদলীয় হাই কমান্ড গঠিত হয়েছিল। পাশাপাশি কমিউনিস্ট

বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, কৃষক সমিতির সদস্যদের নিয়ে নিজস্ব হাই কমান্ড গঠিত হয়েছিল। এই হাই কমান্ডের প্রধান ছিলেন কবি বুলবুল খান মাহবুব, উপপ্রধান এস. এম. রেজা। পরে প্রপ্রিল মাসে এস. এম. রেজা ও তার ভাই আহমেদ রেজা পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। উপরোক্ত দুই কমান্ডের মধ্যে অবশ্য কোনো বিরোধ ছিল না।

মে মাসের দিকে বুলবুল খান মাহবুব, আবদুল হালিম ইকবাল (তিনি ছিলেন কমান্ডার) আশরাফ গিরানী, গোলাম সারওয়ার ছানা, হাজেরা সুলতানা, আতিকুর রহমান সালু প্রমুখের নেতৃত্বে টাঙ্গাইলের চর অঞ্চলে বিশাল সশস্ত্র বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এক পর্যায়ে ভারত থেকে অনেক বেশি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অধিকতর শক্তিশালী কাদের সিদ্দিকী তার বাহিনী নিয়ে টাঙ্গাইলে প্রবেশ করেন এবং উপরোক্ত বাহিনীকে পরাজিত করেন। এই বাহিনীর একাংশ কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগদান করেন। কাদের সিদ্দিকী নিজে আওয়ামী লীগ করলেও কমিউনিস্ট বা দেশপ্রেমিক বামপন্থীদের নিজের দলে অন্তর্ভুক্ত করতে কখনই আপত্তি করেন নি। কাদেরিয়া বাহিনী কর্তৃক নিরস্ত্র হবার পরও আবদুল হালিম ইকবালের নেতৃত্বে ঐ সশস্ত্র বাহিনী আবার পুনর্গঠিত হয়েছিল। আবদুল হালিম ইকবাল বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করেছিলেন এবং যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। হাজেরা সুলাতানা ছিলেন টাঙ্গাইল জেলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভানেত্রী। তিনি শিবপুরের হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং এই কাজটা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

চৌদ্দগ্রাম থানা-কুমিল্লা জেলা

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে ও নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠেছিল কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম উপজেলায়, (তখন বলা হতো থানা)। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের একেবারে গা ঘেঁষে এই উপজেলা। সীমান্তরেখার খুব কাছ দিয়ে গেছে ঢাকা-চিটাগাং সড়ক। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির কুমিল্লা জেলা ছিল পাঁচ জনকে নিয়ে- কাজী আফতাবুল ইসলাম গেদু মিয় (আহ্বায়ক), হাবিবুর রহমান (সুয়া গাজী), ইদ্রিস মাস্টার (বরুরা), ধীরেন্দ্র নাথ (বিজয়া) ও আনিসুর রহমান

নাজাত (চিয়রা)। চিয়রা গ্রাম ছিল পার্টির কুমিল্লা জেলার প্রধান কেন্দ্র। কাজী জাফর আহমদের গ্রামের বাড়িও এখানে।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে চিয়রা গ্রামে ঢাকা থেকে হাতবোমা বানানোর রসদ ইত্যাদি আগেই সরবরাহ করা হয়েছিল। চিয়রা গ্রামে পর্যায়ক্রমে সেরু মুনসী, আমীর হোসের মনু, আবদুল আজিজ আফিন্দি প্রমুখের বাড়িতে বোমা বানানো এবং তার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন আনিসুর রহমান নাজাত (ছাত্র), কাজী গোলাম মওলা (ছাত্র), সেরু মুনসী (বয়স্ক কৃষক) মহম্মদ ইসহাক মিয়া (কৃষক)। বোমা বানানোর সময় দুইবার দুর্ঘটনা ঘটেছিল, বিস্ফোরণ হয়েছিল। তবু বোমা বানানোর কাজ চলতেই থাকে। ধারণা করা হয়েছিল এই বোমা দিয়ে যুদ্ধ করা যাবে। এছাড়া চিয়রা ও আশেপাশের গ্রাম থেকে ৭/৮টা বন্দুকও জোগাড় করা হয়েছিল। হাতে বানানো কিছু বোমা ফেনী ও চিটাগাং- এ দলের সহকর্মীদের কাছে পাঠানোও হয়েছিল।

এপ্রিল মাসেই এক রাতে হাইওয়ে দিয়ে চলাচলকারী এক কনভয়ের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। বোমা ফাটে নি। বন্দুক দিয়ে গুলিও করা হয়েছিল। গুলির শব্দে কনভয় কিছুক্ষণের জন্য থেমে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন তারা কোনো ক্ষয়ক্ষতি করে নি। এই অ্যাকশনে অংশ নিয়েছিলেন ২৫/৩০ জন। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গেদু মিয়া ও নাজাত। দুঃসাহসী কাজ সন্দেহ নাই। তবে বোকার মতই কাজ করেছিলেন যুদ্ধ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তরুণরা। এই তরুণরা আশেপাশের কয়েক গ্রাম থেকে ছুটিতে আসা অথবা অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যকে (১০/১২ জন) জড়ো করেছিলেন। বলেছিলেন, আমাদের ট্রেনিং দাও, যুদ্ধে কমান্ডারের ভূমিকা পালন করুন। সেনাসদস্যরা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। কিন্তু ছেলেদের কাণ্ড দেখে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, এই রকম হাতে বানানো বোমা দিয়ে বা দুই একটা একনলা দুইনলা বন্দুক দিয়ে যুদ্ধ হয় না। তারা বললেন, আগে অস্ত্র জোগাড় করো। এরপর তরুণ বিপ্লবীরা অস্ত্র জোগাড়ের জন্য আরেক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। বড়ো রাস্তার পাশে পাকবাহিনীর বাংকার আছে। ওটা আক্রমণ করতে হবে। সেখান থেকে অস্ত্র পাওয়া যাবে। জনৈক সাবেক সেনাসদস্য আবারও হাসলেন, বললেন, এভাবে আনাড়ির মতো যুদ্ধ হয় না। তবু তরুণদের উপলব্ধির জন্য তিনি কয়েক জন তরুণকে সঙ্গে নিয়ে পেছন থেকে

কিছুটা দূর থেকে নিরাপদ অবস্থান থেকে কয়েকটা গুলি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাংকার থেকে শুরু হলো বৃষ্টির মতো গুলি।

না, এভাবে যুদ্ধ হয় না। যুদ্ধ ছেলেখেলা নয়। আরো অস্ত্র চাই, রাইফেল গোলাবারুদ ইত্যাদি। তখন জনৈক মুজাহিদ (আনসারদের মতো আধা সশস্ত্র বাহিনী) খবর দিলেন যে, চৌদ্দগ্রাম থানায় মুজাহিদদের জন্য রাখা আছে অনেক থ্রি নট থ্রি রাইফেল, গুলি ইত্যাদি। ভালো হয় যদি চৌদ্দগ্রাম থানা আক্রমণ করা যায়। সেই মোতাবেক কাজ হলো। ১২টি দেশি বন্দুক ও হাতে বানানো ১০০টি বোমা নিয়ে প্রায় শতাধিক মানুষ গভীর রাতে থানা আক্রমণ করেন। এতে নেতৃত্ব দেন আনিসুর রহমান নাজাত। শতাধিক আক্রমণকারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশ ছিলেন মুজাহিদ এবং বাকিরা সকলেই কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির সদস্য, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতির সভ্য। প্রথম দিকে থানা থেকেও পাল্টা গুলি ছোড়া হয়েছিল। এই আক্রমণে আমাদের কোনো ক্ষতি হয় নি। একজন অবাঙালি পুলিশ সদস্য নিহত হয়। বাকি পুলিশ সহজেই আত্মসমর্পণ করেন। এটা খুব সম্ভব যে, পুলিশের মধ্যে প্রতিরোধ করার কোনো ইচ্ছা ছিল না, বরং তারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

আক্রমণকারী গেরিলাদের কিছু পেছনে অপেক্ষা করছিলেন পার্টির নেতারা (প্রধান নেতা গেদু মিয়া)। তাদের সঙ্গে ছিলেন প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ জন। থানা দখল সম্পন্ন হলে প্রায় চারশত রাইফেল, অনেক গ্রেনেড ও অ্যান্টি ট্যাংক মাইন পাওয়া গেল। গভীর রাতেও শত শত মানুষ এগুলো বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন চিয়রার কেন্দ্রে।

এইবার যথেষ্ট অস্ত্র সংগৃহীত হলো। তারপর চিয়রা গ্রামে প্রকাশ্যেই শুরু হলে ট্রেনিং। মে মাসের দিকে আমি ভারতে যাবার পথে চিয়রা গ্রামে কয়েকদিন অবস্থান করছিলাম। সেখানে আমাদের সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের দেখেছি। বিপুল আত্মবিশ্বাসে ভরপুর টগবগে তরুণ। তারা পাকবহিনী সঙ্গে আরো যুদ্ধ করতে চান। কিন্তু গ্রামের মুরুব্বীরা বলেন, ধারে কাছে কোথাও যুদ্ধ করো না। দূরে কোথাও যাও। এখানে যুদ্ধ করলে ওরা আমাদের গ্রাম পুড়িয়ে দেবে। জনমতকে উপেক্ষা করে তরুণ যোদ্ধারা আর সশস্ত্র অপারেশন করেন নি। ইতিমধ্যে একদিন চিয়রা গ্রামে পাক-হানাদারবাহিনী এলো। আধা ঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট ছিল। যুবক পুরুষ এবং অধিকাংশ নারী অন্যত্র সরে গিয়েছিল।

আমিও সরে গিয়েছিলাম। যখন খবর এলা যে, পাকবাহিনী চলে গেছে, তখন গ্রামে ফিরে এসে ভায়ানক দুঃসংবাদটি জানতে পারলাম। ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই পাকহানাদার দস্যুরা বেশ কয়েকটি ধর্ষণ করেছে এবং লুট করেছে। এবার জনমত বদলে গেল। তারা বললো, এরপর হানাদার বাহিনী আসলে যেন আমাদের যোদ্ধারা অ্যামবুশ করা থেকে আক্রমণ করে। বস্তুত দেশের মধ্যে যেখানেই যত যুদ্ধ হয়েছে, সবই সম্ভব হয়েছে জনগণের বিপুল সমর্থন ও সহযোগিতার কারণে। এই যুদ্ধ ছিল আমাদের দিক থেকে পরিপূর্ণরূপে জনযুদ্ধ।

চৌদ্দগ্রাম থানা আক্রমণের পর যথেষ্ট সংখ্যক অস্ত্র হাতে এসছিল। ফলে ৩০০ থেকে ৪০০ তরুণকে ট্রেনিং দেয় সম্ভব। হলোও তাই। এত মুক্তিযোদ্ধার জন্য থাকার ব্যবস্থা ও খাবার জোগাড় করার দায়িত্ব নিল কৃষক সিমিতির। ইতিমধ্যে ছোটখাট কিছু সামরিক অ্যাকশন করা হয়েছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল হাসনাপুর রেল স্টেশনের কাছে পরিকোট ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া। এই যে জনযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল তার রাজনৈতিক নেতৃত্বে ছিলেন গেদু মিয়া ও হাবিবুর রহমান। সামরিক কমান্ডার ছিলেন আনিসুর রহমান নাজাত (চিয়রা), মফিজউদ্দিন (সাবেক মুজাহিদ কমান্ডার, বাতিসা), সামসুল আলম খোকন ও শেয়ার উল্লা (চিয়রা)। অর্থ সংগ্রহ, আশ্রয় ও খাদ্য ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন গেদু মিয়া, আবদুল আজিজ আফিন্দি প্রমুখ।

এরপর মে মাসের কোনো এক সময় মেজর খালেদ মোশাররফের পরিবার শিবপুর হয়ে চিয়রা আসেন। নাজাতের উপর দায়িত্ব পড়েছিল পরিবারকে সীমান্ত অতিক্রম করে মেজর খালেদ মোশাররফের কাছে পৌঁছে দেয়া। এর আগে নাজাত কখনো ভারতে যান নি। যাই হোক তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে খালেদ মোশররফের কাছে তার স্ত্রীসহ পরিবারের কয়েক জনকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। খালেদ মোশররফ তার কাছ থেকে চৌদ্দগ্রামের মুক্তিফৌজ গড়ে ওঠার বিবরণ গুনে গোটা বাহিনীকে ত্রিপুরার নির্ভয়পুর ক্যাম্পে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। প্রায় শ চারেক মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্রসহ ভারতে চলে আসেন। এই বাহিনী এখন মুজিবনগর সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হলো। নাজাত সরকারিভাবে কমান্ডার নিযুক্ত হলেন। গোটা বাহিনীর সদস্যরা মাসিক বেতনও পেতেন। বেতন থেকে তারা কিছু অংশ কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির আঞ্চলিক শাখা কমিটিকে নিয়মিত চাঁদা প্রদান করতেন। এই বাহিনী অবশ্য

দেশে ফিরে এসেছিল এবং অনেকগুলি যুদ্ধ করেছিল।

কমরেড ইসহাক, মাকসুদ ও কাসেম তিন সহোদর একসাথে শহীদ হয়েছিলেন।

জোরকানন সামরিক অপারেশনে পাকবাহিনীর চারজন মারা যায়। ছয় জন জীবিত অবস্থায় ধরা পড়ে। তার মধ্যে একজন পাকিস্তানি মেজরও ছিল। তাদেরকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সালদার যুদ্ধ। সালদা নদীর ধারে এক যুদ্ধে স্বয়ং খালেদ মোশাররফ আহত হয়েছিলেন। ঢাকার গোপীবাগের ছেলে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী জাকির শহীদ হয়েছিলেন। এদিকে ভারতে কথা উঠেছিল যে, খালেদ মোশাররফ বামপন্থীদের ক্যাম্পে আশ্রয় দিচ্ছেন। মুক্তিযোদ্ধা নাজাত ত্রিপুরা রাজ্যে এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে যাওয়ার পথে ভারতের সীমান্ত বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক গ্রেফতার হন। বিএসএফ তার উরুতে বেয়োনেট চার্জ করে গুরুতর ভাবে আহত করেছিল। অভিযোগ নাজাত নাকি নকশাল। কিন্তু দ্রুতই খালেদ মোশাররফের কাছে খবর পৌঁছে যায়। তিনি দ্রুত হস্তক্ষেপ করেন। স্বয়ং ক্যাপ্টেন মাহবুব এসে নাজাতকে উদ্ধার করেন এবং পরে ফিল্ড হাসপাতালে তার চিকিৎসা হয়েছিল। এদিকে পাকবাহিনী নাজাতের গ্রামের বাড়িতে আক্রমণ চালিয়ে তার চার চাচা ও এক ফুফাকে গুলি করে হত্যা করে। উভয়মুখী বিপদের মোকাবিলা করে এই মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতার লক্ষ্যে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। এদিকে চৌদ্দগ্রাম থানার বেতিয়ারায় যুদ্ধে মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টির আট জন যোদ্ধা শহীদ হয়েছিলেন।

বামপন্থীদের ভারত সরকার এবং বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখলেও এক পর্যায়ে ভারত-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মণি সিংহ-এর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টিকে কিছু সুযোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ন্যাপ (মো.) কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের তরুণ-যুবক কর্মীদের ভারতে সামরিক ট্রেনিং এবং অস্ত্র প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রশিক্ষণ শেষে তারা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে দেশে প্রবেশ করেন। সীমান্ত দিয়ে পার হয়ে চৌদ্দগ্রাম থানায় প্রবেশমুখে একটি গ্রুপ পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সেই যুদ্ধে আট জন শহীদ হয়েছিলেন। তারা হলেন: নিজামউদ্দিন আজাদ, সিরাজুল মনির, বশিরুল্লাহ,

দুদু মিয়া, শহীদুল্লাহ, আওলাদ হোসেন, আবদুল কাদের, আবদুল কাইয়ুম। এই সামরিক অ্যাকশনে কমান্ডার ছিলেন মনজুরুল আহসান খান *(তিনি সিপিবির সাবেক সভাপতি)*।

ফাজিলপুর উপজেলা-ফেনী জেলা

ফেনী জেলা, চট্টগ্রামের মীরসরাই, নোয়াখালির কোম্পানিগঞ্জ ও সেনবাগ এবং কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানা নিয়ে একটি একক রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছিল। ফেনীর বামপন্থী মুক্তিযোদ্ধারা মূলস্রোতের সঙ্গেই মিলেমিশে যুদ্ধ করেছিলেন। একটি অংশ চৌদ্দগ্রাম থানার চিয়রা বাতিসা ক্যাম্পের সাথে যুক্ত হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। অন্য একটি অংশ ফাজিলপুর থানায় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এই ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মওলানা সৈয়দ ওয়ায়েজউদ্দিন, গিয়াসউদ্দিন নান্নু, দিলীপ সুর, আবুল খায়ের, মেহরাজুল করিম মানিক প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন ভাসনী ন্যাপের আবদুল ওদুদ, কাজী মেজবাহ উদ্দীন প্রমুখ।

পাকিবাহিনী ফেনী দখলের পর পরই দাগনভূঞার মমারিজপুর গ্রামের ন্যাপ নেতা সিদ্দিক মেম্বার পাকবাহিনীর সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইয়ে জীবন বিসর্জন দেন। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির ফেনী শাখার নেতা, ফেনী কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক সহসভাপতি এবং ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) এর সাবেক নেতা মওলানা ওয়ায়েজউদ্দিন সাংগঠনিক কাজে চট্টগ্রাম গেলে জামায়েত নেতাদের হাতে ধরা পড়েন এবং পাকবাহিনী তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। ফলে একেবারে শুরুর দিকেই ফেনীর বামপন্থী যোদ্ধাদের বেশ ক্ষতি হয়েছিল।

চিয়রা থেকে সরবরাহকৃত হাতে বানানো বোমা দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ২০ এপ্রিল রাতে ছাগলনাইয়া হয়ে চট্টগ্রামগামী পাকবাহিনীর গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করে তারা প্রথম সামরিক অ্যাকশন করেছিলেন। তাতে সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন খুরশেদুজ্জামান শাহজাদা। এরপর ফেনীর বামপন্থী যোদ্ধারা আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতের শ্রীনগর ক্যাম্পে। একটি

ক্যাম্পটি পরিচালিত হয়েছিল মীরসরাইয়ের বাম কমিউনিস্ট নেতা ওবায়েদ বলীর *(পরবর্তীতে তিনি বিএনপির নেতা হয়েছিলেন)* নেতৃত্বে। ভারতে অবস্থান করলেও ক্যাম্পটি বামপন্থী ক্যাম্প বলে প্রচারিত হওয়ায় ভারত সরকার ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে সেপ্টেম্বরের দিকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। অবশ্য এর আগেই শ্রীনগর ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ফেনীতে ফিরে আসেন গিয়াসউদ্দিন নান্নু, মরতুজা ভুঞা, মোহাম্মদ তোয়াহা (ফাজিলপুরের), গোলাম সরওয়ার, মোস্তফা সরকার, হুমায়ুন, মিন্টু ইলিয়াস, সিদ্দিক, সৈয়দ রহমান ছুটু প্রমুখ। তারা ফাজিলপুরের শিবপুর, কহুমা, করৈয়া, দুর্গাপুর প্রভৃতি গ্রামে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গেরিলা অপারেশন করেন।

একটি উল্লেখযোগ্য অপারেশন হলো খালি হাতে রাজাকারদের আটটি রাইফের ছিনিয়ে নেয়া। ফাজিলপুর থানার মুন্সীর হাটের নিকটবর্তী মুহুরীগঞ্জ ব্রিজ ক্যাম্প থেকে আট জন রাজাকার বাজারে প্রবেশ করে। এই সময় ফাজিলপুর জিন্না স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক চট্টগ্রাম স্টিল মিলে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার আবদুল মান্নান এক চমৎকার সাহসী পরিকল্পনা করেন। তারই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজাকারারা যখন বাজারে কেনাকাটায় ব্যস্ত তখন প্রতি রাজাকারের পেছনে দুই জন মুক্তিযোদ্ধা দাঁড়িয়ে যান এবং তারা রাজাকারদের জাপটে ধরে রাইফেল ছিনিয়ে নেন। কমান্ডার ইঞ্জিনিয়ার মান্নান প্রথমে ছাতি দিয়ে এক রাজাকারকে আঘাত করেন। পরে শুরু হয় গণপিটুনি। মানুষ ছুরি, লাঠি, পাকা নারিকেল দিয়ে রাজাকারদের হত্যা করে। যুদ্ধের এক প্রায় অবিশ্বাস্য অভিনব দৃশ্য। পরদিন পাকবাহিনী গ্রামে এসে বীভৎস হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। ফাজিলপুরে অল্প অস্ত্র নিয়ে আরো বেশ কয়েকটি অপারেশন হয়েছিল। একবার শিমনগর গ্রামে টঙ্গীর শ্রমিক রফিকের নেতৃত্বে এক দল যোদ্ধা অপেক্ষা করছিলেন কখন পাকসেনারা আসবে। লুটতরাজ ও নারী ধর্ষণের উদ্দেশ্যে পাকসেনাদের একটা দল বীরবক্স হাজির বাড়িতে প্রবেশ করলে গেরিলারা আক্রমণ চালান এবং ঘটনাস্থলে একজন পাকসেনা নিহত হয়। এই অপারেশনে রফিকের হাতের তিনটি আঙ্গুল উড়ে যায় এবং আবু বকর সিদ্দিক হাঁটুতে গুলিবিদ্ধ হলে তিনি চিরতরে পঙ্গু হন। এরপর নিহত পাকসেনার লাশ নেবার জন্য আবার সাত জন পাকসৈন্য গ্রামে প্রবেশ করেছিল। লুকানো অবস্থানে থেকে মুক্তিযোদ্ধারা গ্রেনেড নিক্ষেপ ও এলএমজি দিয়ে গুলি বর্ষণ

করলে সাত জন পাকসেনাই নিহত হয়। অবশ্য একই সময় অন্য দিক দিয়ে আরো সাত জন পাকসেনা আসছিল। মুক্তিযোদ্ধারা সেটা টের পান নি। পাকসেনারা এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণ করলে মুক্তিসেনারা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে আসেন। পরদিন পাকসেনারা গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করেছিল।

একই রকম ছোটো-বড়ো নানা ধরনের সামরিক অ্যাকশনে গিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের এই গ্রুপটি। ইঞ্জিনিয়ার মান্নানের নেতৃত্বে এই গ্রুপটি বেঙ্গল রেজিমেন্টের নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে সীমান্তবর্তী দারোগাহাটে কনভেনশনাল যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিল।

চর জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নঃ নোয়াখালি

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) এর নেতা কমরেড তোয়াহার নেতৃত্বে নোয়াখালির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, বিশেষত চর জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে যে ঘাঁটি এলাকা গড়ে উঠেছিল তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। চীনপন্থী বলে পরিচিত এই পার্টি ৭১ সালে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল। একটি অংশ তথাকথিত 'দুই কুকুরের কামড়া কামড়ি'র অত্যন্ত ভুল ও প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব তুলে ধরেছিল। সুখেন্দু দস্তিদার ও তোয়াহার নেতৃত্বাধীন পার্টির এই অংশও খুব স্বচ্ছ লাইন তুলে ধরতে পারে নি। গোটা দেশ যখন জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে তখন তারা আভ্যন্তরীণ শেণিসংগ্রামকে প্রধান্য দিয়ে কৃষি বিপ্লবের রণনীতি নিয়েছিলেন।

তবে ভুল লাইন সত্ত্বেও তারা পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিশাল মুক্ত এলাকা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। পার্টি ও তার সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানপন্থী ব্যক্তিদের এবং খাস জমি কৃষকের মধ্যে বিতরণ করেন। বণ্টনকৃত জমির পরিমাণ হবে দুই হাজার একরের মতো। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত কৃষকরা এই জলি দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। চর জাঙ্গলিয়াকে ঘাঁটি করলেও এই সশস্ত্র বাহিনীর তৎপরতা লক্ষ্মীপুর, রামগতি ও সুধারাম থানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান রাজনৈতিক নেতৃত্বে ছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা। অন্যান্য যারা রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম নুরুল হাসান (রাজনৈতিক কমিশনার), নিজামউদ্দিন (সামরিক

কমিশনার), মেসবাহ উদ্দিন (জেলা পার্টির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক), ক্যাপ্টেন কামাল মাহমুদ *(পাকিস্তানের বিমানবাহিনী অফিসার, কিছুদিন তিনি ঐ অঞ্চলে বাহিনীর সামরিক প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন)*, মেসবাউর রহমান মেসো, বাচ্চু মিয়া, তৈয়ব চৌধুরী, ফয়েজ, বাহার প্রমুখ।

কমরেড মোহম্মদ তোয়াহা উক্ত এলাকায় এক ধরনের গণপ্রশাসন চালু করেছিলেন। শিবপুরের মতো এখানেও মুজিব বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল কমিউনিস্ট শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য। মোহম্মদ তোয়াহা কৌশলের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে গিয়েছিলেন। এবং এক পর্যয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন নুরুল হাসান ও নিজাম উদ্দিন। ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত উক্ত অঞ্চলে তোয়াহার নেতৃত্বাধীন ভিন্ন ধরনের গণপ্রশাসন বজায় ছিল।

মুন্সীগঞ্জ

আলী ইমামের নেতৃত্বে মুন্সীগঞ্জের বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের একটি গ্রুপ প্রথমে শিবপুরে মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে সশস্ত্র বাহিনী করার উদ্যোগ নেন। পরে তারা ত্রিপুরায় মেজর খালেদ মোশাররফের অধীনে নির্ভয়পুর ও মেলাঘর ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তারা সশস্ত্র অবস্থায় চালাফেরা করতেন এবং সুযোগ বুঝে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের উপর আক্রমণ চালাতেন।। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝির দিকে শ্রীনগরে গোয়ালিমন্ডার পশ্চিমে নদীর দুই পারে মুক্তিবাহিনী অবস্থান নিয়েছিলেন। দুপুরের দিকে পাক গানবোট আসলে দুই পার থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ফায়ার ওপেন করেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত গোলাগুলি চলে। শেষ পর্যন্ত গানবোট পিছু হটতে বাধ্য হয়। তিনজন পাকসৈন্য মারা যায়। নদীর পারে তাদের লাশ পাওয়া গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে ভারত থেকে আগত বিএলএফ অবস্থান নেয়। আলী ইমাম প্রমুখ কৌশলের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে যান। নভেম্বরের প্রথম দিকে ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী আগরতলা থেকে একটা সশস্ত্র দল নিয়ে মুন্সীগঞ্জের গ্রামে উপস্থিত হলে ইমাম তার দলসহ ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরীর সঙ্গে যোগ দেন এবং কিছুদিন মানিকগঞ্জের গ্রামে অবস্থান করেন। পরে তারা আবার ফিরে আসেন শ্রীনগরে। ১ ডিসেম্বর সিরাজদিখান থানা আক্রমণে তারা অংশ নেন।

জয়দেবপুর

১৯৭১ সালের ২৫/২৬ মার্চ থেকে প্রায় একই সঙ্গে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হলেও, জয়দেবপুরে কিন্তু শুরুটা হয়েছিল কিছু আগেই।

১৯ মার্চ জয়দেবপুরের ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি সৈনিকরা বিদ্রোহ করেছিলেন মেজর সফিউল্লাহর নেতৃত্বে। সেদিন বিদ্রোহী বাঙালি সৈনিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন জয়দেবপুরের হাজার হাজার মানুষ। জয়দেবপুরের চৌরাস্তা ও ভাওয়ালের রাজবাড়ির কাছে জমা হয়েছিল হাজার হাজার সংগ্রামী মানুষ। তাদের হাতে ছিল দেশি অস্ত্র- লাঠি, সড়কি, বল্লম। সেখান থেকেও গুলি ছোড়া হয়েছিল। কিন্তু পাকবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন রহমত ও মনু মিঞা। এক অর্থে বলা যেতে পারে তারাই হলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ।

মেজর সফিউল্লাহর নেতৃত্বে জয়দেবপুরে অবস্থানরত বাঙালি সৈনিকরা এক পর্যায়ে পিছু হটতে বাধ্য হন। ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে তারা পূব দিকে সরে যান। আমি তাদেরই একটি দলের দেখা পেয়েছিলাম কিশোরগঞ্জে খুব সম্ভবত ১ এপ্রিলে।

জয়দেবপুর থেকে পশ্চাৎপসরণরত বাঙালি সৈনিকরা পথে পথে কিছু অস্ত্র ফেলে যান অথবা লুকিয়ে রাখেন। জয়দেবপুরে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির কয়েক জন সদস্য, কৃষক সমিতি ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কয়েক জন প্রথম সারির কর্মী এই সকল অস্ত্র সংগ্রহ করে নিকটবর্তী এক জঙ্গলে লুকিয়ে রাখেন। রোকন, গোলাপ, ফজলু, আকবর, ইকবাল, পালুরামসহ কয়েক জন এই দায়িত্ব পালন করছিলেন। এরপর গাজীপুরের এক দুর্গম জঙ্গলে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসা দুইজন বাঙালি সৈনিক এই প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। গড়ে ওঠে একটি বাহিনী। তারা পাকবাহিনীর উপর ছোটোখাট আক্রমণও চালাতে থাকেন। এই সকল সশস্ত্র তৎপরতায় এলাকাবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিলেন। সশস্ত্র কার্যক্রমের পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রচারের কাজও চলতে থাকে। গাজীপুরের মির্জাপুর, রাজেনন্দ্রপুর, ইজ্জতপুর ও শ্রীপুরে কৃষক ও সাধরণ মানুষের

মাঝেও ব্যাপক উদ্দীপণা দেখা গিয়েছিল।

বামধারার সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠতে দেখে কিছু বাম ও কমিউনিস্ট বিরোধী স্থানীয় গ্রুপ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। ভালুকার হামিদ বাহিনী রোকন, গোলাপ ও অন্যান্যদের কর্যক্রম বন্ধ করার জন্য চাপ দেয় এবং অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া হবে বলে হুমকিও দিয়েছিল। একদিকে পাকবাহিনী ও তাদের দোসররা। অপরদিকে এই নতুন বিপদ। তখন তারা শিবপুরে ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ করে পরামর্শ ও সাহায্য চেয়েছিলেন। রোকন শিবপুরে গিয়ে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমনন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাদেরকে পরামর্শ দেয়া হয় জয়দেবপুরের যোদ্ধাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে ত্রিপুরায় ট্রেনিং-এর জন্য পাঠানো হোক এবং আপাতত গাজীপুরে যুদ্ধের কাজ বন্ধ থাকুক। ত্রিপুরার ট্রেনিং-এর সার্টিফিকেট থাকলে বাম বা কমিউনিস্ট বলে বিরোধিতা করা কারোর পক্ষে সহজ হবে না।

রোকনের নেতৃত্বে ১০০ জনের একটি গ্রুপ ত্রিপুরা গিয়েছিল। রোকন যদিও কমিউনিস্ট তবে তার বড়ো দুই ভাই ছিলেন ছাত্র লীগের নেতা এবং ত্রিপুরার দুটো ট্রেনিং ক্যাম্পের দায়িত্বে। এই সুবিধাটি নেয়া হয়েছিল। ত্রিপুরা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাহিনীর সদস্যরা গাজীপুরে ফিরে আসেন। এই সময় অস্ত্রসমূহ লুকানো ছিল। আগ্নেয়াস্ত্রে গ্রিজ লাগিয়ে পলিথিনে পুরে কিছু দিনের জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। স্বল্প প্রশিক্ষণের পর উপরোক্ত বাহিনী আবার জয়দেবপুরে ফিরে এসে তৎপরতা শুরু করেন। কিছু দিন পরপরই পাকবাহিনীর উপর অকস্মাৎ আক্রমণ করে সড়ে পড়া ছিল কৌশল। এখানে একদিনের ঘটনা উল্লেখ করবো।

১৩ অক্টোবর আহসানউল্লাহ গোলাপ ভবানীপুর গ্রামে বিড়ি শ্রমিক আওয়ালের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঐ দিন হঠাৎ করে পাকবাহিনী উক্ত এলাকায় চিরুনী (কমবিং) অপারেশন শুরু করেছিল। নিচে পাকহানাদাররা চিরুনী অভিযান চালাচ্ছে। উপরে সামরিক হেলিকপ্টার নজরদারি করছে। গোলাপসহ আরো অনেকে ধরা পড়েন।

পাক বন্দিশিবিরে চলে অকথ্য নির্যাতন। তারপর গোলাপসহ তিন জনকে রাস্তার ধারে খালের পারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়। কুদ্দুস, গোলাপ ও রশিদ। হাতগুলো শক্ত করে বাঁধা। ইতিমধ্যে রশিদ কায়দা করে তার হাতের বাঁধন খুলে ফেলেছেন। গোলাপও একটু চেষ্টা করে আলগা করে ফেলেন

বাঁধনটা। চারদিকে অন্ধকার। ভোররাত্র। এখন গুলি করে হত্যা করা হবে তিন জনকে। ওদের গুলি ছাড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে নিঃশব্দে রশিদ পানিতে গড়িয়ে পড়েছেন। ওরা গুলি করলো। কুদ্দুসের বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

গোলাপ মুহূর্তের জন্য একটু বেঁকে গিয়েছিলেন। গুলিটা তার বুকের মধ্যে এক পাশ দিয়ে গেলেও তিনি মরেন নি। বরং প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ আর অসহ্য যন্ত্রণা নিয়েও তিনি ঝাঁপ দিয়েছিলেন পানিতে। পাকিস্তানি জল্লাদরা দুজনকে আর খুঁজে পায় নি। যখন আবিষ্কার করলো যে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই জন নেই, তখন তারা চারিদিকে গোলাগুলি করেছিল। কিন্তু ধরতে পারে নি। গোলাপের বুকের মধ্যে চারটি বুলেট ঢুকেছিল। গ্রামবাসীদের সহায়তায় তিনি বেঁচে উঠেছিলেন। স্বাধীনতার পর তার বুক থেকে একটা বুলেট সরানো হয়েছিল। তারপর চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা আহসানউল্লাহ গোলাপ এখনও বুকের মধ্যে নিতটি বুলেট বহন করে চলেছেন। এই রকম কত গোলাপের কত বীরত্বপূর্ণ অথবা কত মর্মান্তিক কাহিনি আছে। আমরা তার কতটুকুটুই বা জানি।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যেসকল যুদ্ধ বা গেরিলা তৎপরতা পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল, বিশেষ করে বাম ধারার যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল দেশের অভ্যন্তরে তার কিছু খণ্ডচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে এই নিবন্ধে। বলাই বাহুল্য এটি কোনো পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। দেশের ভিতরে প্রধানত গ্রামাঞ্চলে এবং ঢাকাসহ শহরাঞ্চলেও যে ধরনের অসীম সাহসী গেরিলা তৎপরতা চলেছিল, তা পরিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু এ কাজ কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য অনেকে মিলে সংগঠিত উদ্যোগ নেয়া দরকার। এই কাজ অনেক আগেই করা উচিত ছিল। ইতিমধ্যে সশস্ত্র গেরিলাযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগহণকারী অথবা প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকেই হারিয়ে গেছেন, পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আরো দেরি হলে ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আরো কমে আসবে। তাই আর দেরি নয়। দেশের অভ্যন্তরে যে সকল অসংখ্য গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল তার ইতিহাস রচনার কাজটি এখনই শুরু হোক, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানুক। কী প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে এই দেশের তরুণরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে শিবপুর

হায়দার আনোয়ার খান জুনো

এক

রাজধানী ঢাকার অদূরে নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত শিবপুর উপজেলায় বামপন্থীদের নেতৃত্বে এক বিশাল মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল ১৯৭১ সালে। শিবপুর সদর বাদে গোটা উপজেলাকে মুক্ত/আধা-মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন প্রায় স্বাধীনতাযুদ্ধের নয় মাসই। নয় মাসে অসংখ্য যুদ্ধ হয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে। শিবপুরের এই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় খুব বেশি আলোচনা হয় না। অথচ যুদ্ধকালীন আধা-মুক্ত শিবপুর এলাকায় অনেকটা চীন-ভিয়েতনামের মুক্তাঞ্চলের ধাঁচের ব্যতিক্রমধর্মী গণপ্রশাসনও গড়ে উঠেছিল। সে সম্পর্কে আলোকপাত করাই এই রচনার মূল উদ্দেশ্য। কারণ তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

শিবপুরে সত্যিকার অর্থেই জনযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। পাকিস্তানের প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। শিবপুরের গ্রামাঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছিল জনগণের নিজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা। সেখানে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থ ও খাদ্য সংগ্রহ হতো জনগণের সম্মতির ভিত্তিতেই। বস্তুতই শিবপুরের মুক্তাঞ্চল ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। মুক্তিযোদ্ধারা কোথাও স্বতন্ত্রভাবে চাঁদা সংগ্রহ করেছেন অথবা জনগণের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন, এমন একটি ঘটনাও ছিল না। একথা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য যে, শিবপুরে কোনো রাজাকার তৈরি হয়নি। পাকিস্তানি বাহিনী এসেছিল অনেকবার শিবপুরের প্রধান নেতা মান্নান ভূঁইয়ার বাড়ি পুড়িয়ে দিতে। কিন্তু কেউ তার বাড়ি দেখিয়ে দেননি। প্রথমদিকে কয়েকজন ডাকাতকে গুলি করে মারার পর পরবর্তী সময়ে একজন ডাকাতও ছিল না। এই সবই ছিল শিবপুরের গণযুদ্ধের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। জনগণের মধ্যে এমন সম্প্রীতি ও

পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব স্বাভাবিক সময়ে দেখা যায় না।

শিবপুরের এই ব্যতিক্রমধর্মী যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটি'র নেতৃত্বে। এই কমিউনিস্ট সংগঠনটির নেতৃত্বে ছিলেন কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, মোস্তফা জামাল হায়দার। বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, শ্রমিক ফেডারেশন ছিল এই গোপন কমিউনিস্ট সংগঠনের প্রকাশ্য গণসংগঠন। তাছাড়া 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটি'র গ্রামাঞ্চলের কর্মীরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন কৃষক সমিতিতে কাজ করতেন। শিবপুরে কৃষক সমিতি ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের শক্ত ঘাঁটি ছিল। শিবপুরের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান রাজনৈতিক নেতা ছিলেন আবদুল মান্নান ভূঁইয়া। প্রধান সামরিক কমান্ডার ছিলেন মজনু মৃধা।

শিবপুরের এই মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব পড়েছিল এবং বিস্তৃতি ঘটেছিল নরসিংদী *(যার প্রধান সামরিক নেতা ছিলেন শহীদ নেভাল সিরাজ, যিনি আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার সহযোগী ছিলেন এবং একই রাজনৈতিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন)*, রায়পুরা, মনোহরদি ও পলাশ উপজেলায়। নরসিংদীতে অবস্থিত পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্পটি শিবপুরের গেরিলাবাহিনীই দখল করেছিল। শিবপুরের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সাহায্য আসেনি। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অস্ত্র *(প্রধানত পশ্চাদপসরণকারী সৈনিকদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র)* এবং পরে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া অস্ত্র দিয়ে অস্ত্রভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত আমি ছিলাম ঢাকায়। তখন আমি বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল শিবপুরের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার। আমি নিজেকে বিশেষভাবে সৌভাগ্যবান মনে করি এই কারণে যে, তখন আমি ছিলাম যুবক– যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময়। অনেক বছর হলো। স্মৃতিতে অনেক কিছুই ঝাপসা হয়ে এসেছে। কিন্তু কিছু স্মৃতি কিছুতেই মলিন হতে পারে না। শিবপুরের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান কমান্ডার মজনু মৃধা আজ আর নেই। কিন্তু কি করে ভুলব তার অসাধারণ বীরত্ব, রণকৌশল এবং অমন চমৎকার বন্ধুর মতো আচরণ। মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বের অসাধারণ গুণাবলি, সাংগঠনিক দক্ষতা, বিচক্ষণতা, দেশপ্রেম ও মানবিক গুণাবলি আমরা কোনোদিন ভুলতে পারব না। ভুলতে পারব না

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ফজলু, মানিক ও ইদ্রিসকে। তারা সকলেই ছিল কিশোর। ভোলা যায় না অসম সাহসী যোদ্ধা নেভাল সিরাজকে, যিনি স্বাধীনতার অল্প পরেই আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন।

বটেশ্বরের নুরুল ইসলাম চাচা, খালেকের ট্যাকের খালেক ভাই, বসিরুদ্দিন খান *(যার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদাররা এবং যার দুই ছেলেই, কনক ও ঝিনুক যুদ্ধ করেছিল)*, মান্নান খান, আব্দুল আলী মৃধা, আওলাদ হোসেন খান, তোফাজ্জল হোসেন, সেন্টু, শহীদ, মিলন, গফুর এবং কিশোর মহম্মদ হোসেন ও সালেক এইরকম অসংখ্য সহযোদ্ধার কথা কখনই ভোলা সম্ভব নয়। স্মৃতিতে চিরঅম্লান হয়ে থাকবেন সহযোদ্ধা নুরুল হক ও নুরুল ইসলামের মা হেনা বিবি, যিনি মায়ের স্নেহ যেমন দিয়েছেন তেমনি জুগিয়েছেন সাহস। শিবপুরের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমার জীবনের দুর্লভ সম্পদ।

দুই

শুরুটা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকেই করা যাক। ঐ দিন বিকেলবেলা ঢাকার পল্টন ময়দানে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে দুই লক্ষাধিক মানুষের বিশাল জনসভা হয়েছিল। কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, আতিকুর রহমান সালু ও আমি বক্তৃতা করেছিলাম। আমরা ঘোষণা করেছিলাম যে, মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা আহ্বান রেখেছিলাম। তবে আমরা তখনও জানতাম না যে, সেই রাত্রেই পাকিস্তানি দস্যু বাহিনী নিরস্ত্র জনগণের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেটাই ছিল বিভীষিকার কালো রাত। ২৭ তারিখ সকালে স্বল্প সময়ের জন্য কারফিউ উঠে গেলে কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, শেখ আবদুল কাদেরকে (বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী) নিয়ে শিবপুরের পথে রওয়ানা হই। প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক ও লেখক জহির রায়হানের গাড়িতে করে, আমি ড্রাইভ করছিলাম। জহির রায়হান কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটির সভ্য ছিলেন। তিনি তার গাড়িটি আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছিলেন। যুদ্ধের নয় মাস ঐ গাড়িটি শিবপুরে ছিল যুদ্ধের প্রয়োজনে।

আমাদের আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া ছিল যে, গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি করে গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। শিবপুর হবে প্রধান ঘাঁটি। তাই নেতৃবৃন্দ প্রথমেই শিবপুর চলে যান। পরদিন ২৮ মার্চ আমি ঢাকা ফিরে গিয়ে আমার সদ্যবিবাহিত স্ত্রী চপল, কাজী জাফর আহমদের স্ত্রী বুলু ভাবি ও তাদের দুই বছরের কন্যা জয়া এবং ছাত্রীনেত্রী শাহরিয়া আখতার বুলুকেও শিবপুর নিয়ে আসি। পরে আমার মা-বাবাও ঢাকার বাসা ছেড়ে শিবপুর আশ্রয় নিয়েছিলেন।

১ এপ্রিল রনো ও মেনন ভাই মওলানা ভাসানীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ হয়ে টাঙ্গাইলের বিন্নাপুরে গিয়েছিলেন। এপ্রিল মাসেই প্রথমে রাশেদ খান মেনন ও পরে রনো শিবপুর ফিরে আসেন। তারা অবশ্য থাকেননি। চলে গিয়েছিলেন অন্যত্র। কাজী জাফর আহমদও চলে গিয়েছিলেন কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানার চিয়রা গ্রামে। ১ জুন তারা তিনজন বামপন্থীদের সম্মেলনে যোগদান করার জন্য কলকাতা গিয়েছিলেন। সেই সম্মেলনেই গঠিত হয়েছিল "জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি"। আমিও কাদের পার্টির নির্দেশে সিলেটের মৌলভীবাজার অঞ্চলে গিয়েছিলাম। সেখানে গেরিলাবাহিনী গঠন ও গেরিলা তৎপরতা শুরু করানোর দায়িত্ব নিয়ে অনেক ঘোরাপথে গিয়েছিলাম। কিন্তু যে পথে গিয়েছিলাম সে পথে ফিরতে পারিনি। বাধ্য হয়েছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করতে। সেখানে ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী, তরুণ কমরেড গৌতম দাশ প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। ঘটনাচক্রে তখন আগরতলায় এসেছিলেন ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক কমরেড প্রমোদ দাসগুপ্ত। তার সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, "নিজেদের শক্তির ওপর ভিত্তি করে আপনাদের যুদ্ধ করতে হবে। অস্ত্র ছাড়া আর সবরকম সাহায্য-সহযোগিতা সিপিএম আপনাদের করবে।"

ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের শুভানুধ্যায়ী ব্যারিস্টার মনসুর আহমেদ ও তার ভাগ্নে ক্যাপ্টেন মাহবুবের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি নির্ভয়পুর ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বললেন, "শিবপুর থেকে পনেরো থেকে কুড়িজনের মতো একটা দল পাঠিয়ে দিন, আমি তাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করব।"

তিন

এপ্রিলের শেষ দিকে সম্ভবত তিরিশে এপ্রিল কাদের আর আমি আগরতলা থেকে শিবপুর ফিরে আসি। শিবপুরে তখন পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনীর আগমন ঘটেনি। তবে নরসিংদীতে তারা শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে বসেছে। আমরা প্রথমেই গেলাম মান্নান ভাইয়ের কাছে। তিনি জানালেন, শিবপুরে অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও বাহিনী গঠনের পাশাপাশি অস্ত্র সংগ্রহের অভিযান শুরু হয়েছে। এপ্রিলের এক-দুই তারিখে ডেমরা থেকে নরসিংদী যাওয়ার পথে পাঁচদোনায় ই.পি.আর. আর বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের সাথে পাকিস্তানি বাহিনীর যুদ্ধ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসংগঠিত বাঙালি যোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হন। এই সৈন্যরা নরসিংদী, রায়পুরা, নবীনগর হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলা পৌঁছান। পথে অনেক অস্ত্র তাঁরা ফেলে যান। এই সব অস্ত্র অনেকেই সংগ্রহ করে। এদের মধ্যে কিছু চোর-ডাকাতও ছিল। মান্নান ভাই জানালেন, এখন এই সব অস্ত্র সংগ্রহের অভিযান শুরু হয়েছে। সব অস্ত্র এক কমান্ডে আনতে হবে। একক কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো অস্ত্র রাখা যাবে না।

আমি মান্নান ভাইকে ব্যারিস্টার মনসুর ও ক্যাপ্টেন মাহবুবের সাথে আলোচনার কথা জানালাম। আরো বললাম, আমাদের উচিত এখনই একটা দল আগরতলায় পাঠানো। ট্রেনিংয়ের সাথে সাথে কিছু অস্ত্র পাওয়ারও সম্ভাবনা থাকবে। তার চেয়ে বড় কথা, আগরতলায় অবস্থিত বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হবে। কৌশলগত কারণে সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মান্নান ভাইয়ের সাথে আলাপ শেষ করে গেলাম সাখাওয়াৎ ভাইয়ের বাড়ি। ওখানে চপল আর বুলু আছে। ওদেরকে সেই রাতেই নিয়ে যেতে হবে রব খানের বাড়িতে। ওখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হবে।

বাড়িতে চাল-ডাল যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ক্ষেতে শাক-সব্জিরও অভাব নেই। বাড়ির পেছন দিয়ে একটা ছোটো নদী চলে গেছে। কাদের প্রায়ই জেলেদের কাছ থেকে সস্তায় মাছ কেনে। চপল আর বুলু রান্না করে। শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজের শিক্ষক আলতাফ প্রায় সারাদিন আমাদের সাথে থাকে। স্কুলশিক্ষক আওলাদ মাঝে মাঝে আসেন। রব খানের বাড়িতে বেশ একটা ভালো আস্তানা গড়ে উঠল। মান্নান ভাই সাংগঠনিক কাজে খুবই ব্যস্ত। তবুও

মাঝে মাঝে আমাদের আস্তানায় চলে আসতেন আলোচনা করার জন্য।

শিবপুরে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির পাশাপাশি গ্রামে গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলার প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। এলাকায় এলাকায় ছাত্র, কৃষক ও সাধারণ জনগণকে নিয়ে ছোটো ছোটো সভার আয়োজন করা হয়। যদিও আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতাই ইতিমধ্যে দেশ ত্যাগ করেছেন, তবু দুই-একজন যাকে পাওয়া যেত, তাদেরকে সভায় উপস্থিত থাকতে বলা হতো। মান্নান ভাই, তোফাজ্জল হোসেন, আওলাদ, আব্দুল আলী মৃধা, কালা মিয়াসহ আমরা কয়েকজন এই সব বৈঠকে আলোচনা করতাম। আমাদের বক্তব্যে আমরা বলতাম, পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। আমরা চাই সত্যিকার অর্থে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি। তাদের খাওয়া-পরার স্বাধীনতা। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা।

ইতিমধ্যে আমাদের প্রতিটি এলাকার সংগঠকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই এলাকায় কার কার কাছে অস্ত্র আছে, তার তালিকা তৈরি করার জন্য। সেই সব অস্ত্র আস্তে আস্তে সংগ্রহ করা শুরু হয়। অনেকেই স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়। আবার অনেকের কাছ থেকে জোর করেই অস্ত্রগুলো নিতে হয়েছে। মজনু মৃধা একদিন একটা সাব মেশিনগান নিয়ে হাজির। সাথে গুলিভর্তি দুটো ম্যাগাজিনও আছে। তিনি মাত্র পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ওটা ইপিআর-এর এক হাবিলদারের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। এভাবে আরো কিছু অস্ত্র সংগ্রহ হতে থাকে।

শিবপুরে মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি চলছে, এ খবর আশপাশের এলাকায় বেশ প্রচার হতে থাকে। মনোহরদি, রায়পুরা, কালীগঞ্জ, নরসিংদী– এসব এলাকা থেকে মুক্তিযুদ্ধে আগ্রহী লোকজন মান্নান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ শুরু করে। এদের মধ্যে একজন পাকিস্তানি নৌবাহিনীর সিরাজউদ্দিন আহমেদ। পরে তিনি নেভাল সিরাজ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। নেভাল সিরাজের সাথে প্রাথমিকভাবে আলোচনা হয় মজনু মৃধা, ঝিনুক ও মান্নান খানের। পরে মান্নান ভাই ও তোফাজ্জলের সাথে তাঁর দীর্ঘ আলাপ হয়। নেভাল সিরাজ জানান যে, ডেমরা ও পাঁচদোনার যুদ্ধের পর ঐ এলাকা থেকে বহু অস্ত্র ও গোলাবারুদ তিনি সংগ্রহ করেছেন। সে সব অস্ত্রের সঠিক ব্যবহার হোক এটাই তাঁর কাম্য। তিনি মান্নান ভাইয়ের সাথে

সমন্বয় সাধন করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাঁর সংগৃহীত অস্ত্রের একটা বড় অংশ শিবপুরে দিয়ে দিতে সম্মত হন।

নেভাল সিরাজের সংগৃহীত অস্ত্রসমূহ ডেমরার কাছে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে ডাংগা নামের এক জায়গায় লুকানো ছিল। সিদ্ধান্ত হয় যে, লঞ্চে করে ঐসব অস্ত্র কালীগঞ্জ থানার চরসিন্দুরে আনা হবে। সেখান থেকে সেই সব অস্ত্র শিবপুরে আনার জন্য মোটরসাইকেল করে মান্নান ভাই, আওলাদ হোসেন, ফজলু মেম্বার ও আতিকসহ ছয়জন চরসিন্দুর উপস্থিত হন। কিন্তু তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি থাকায় চরসিন্দুরে অস্ত্র না নামিয়ে ঐ অস্ত্র বোঝাই লঞ্চ হাতিরদিয়া নিয়ে আসা হয় এবং সব অস্ত্র হাতিরদিয়া স্কুলে তোলা হয়।

ডাংগা থেকে যখন লঞ্চ ছাড়ে তখন ঘটনাচক্রে অস্ত্রভর্তি ঐ লঞ্চে হাকিম, হারুন, সাইদুরসহ ছয়জন ইপিআর-এর সদস্য ওঠে। আর নেভাল সিরাজের সাথে ছিল মাত্র একজন সহযোগী। হাতিরদিয়া আসার পর অস্ত্রের মালিকানা নিয়ে নেভাল সিরাজের সাথে হাকিমের বিরোধ দেখা দেয়। হাকিমের বক্তব্য, যেহেতু অস্ত্রগুলো ইপিআর-এর সুতরাং তারাই ঐ অস্ত্রের মালিক। শেষ পর্যন্ত মান্নান ভাইয়ের মাধ্যমে একটা সমঝোতা হয়। মান্নান ভাই নেভাল সিরাজ ও হাকিমের দলকে একত্রে মনোহরদি থানার চালকচরে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার দায়িত্ব দেন। আমরা দুটো হালকা মেশিনগান ও ছয়টা রাইফেল নিয়ে শিবপুরে ফিরে আসি।

সার্বিক যুদ্ধের পরিকল্পনা ও চালকচরে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্য হাকিম, হারুন, সাইদুরসহ পাঁচ-ছয়জন শিবপুরে আসেন। ওদের সাথে মান্নান ভাই, তোফাজ্জল, কালা মিয়া, মজনু মৃধাসহ আরো কয়েকজন আলোচনায় বসেন। আলোচনার পর হাকিম আর তার লোকজন শিবপুর বাজারেই থেকে যায়। মান্নান ভাই তোফাজ্জলকে নিয়ে চলে যান নদীর ওপারে গফুরের বাড়িতে।

সে রাতেই শিবপুরে আর্মির তিনটা গাড়ি আসে। গাড়ির শব্দ পেয়ে মান্নান ভাই রব খানের বাড়িসহ আরো কয়েক জায়গায় খবর পাঠান সতর্ক করার জন্য।

আর্মির গাড়িগুলো চক্রধা গ্রামে ঢুকে প্রথমে যায় রফিক ডাকাতের বাড়ি। সেখানে কাউকে না পেয়ে আসে রব খানের বাড়ি। প্রথমে রফিক ডাকাতের বাড়িতে যাওয়ার ফলে যে সময়টুকু নষ্ট হয়, তাতেই আমরা রক্ষা পেয়ে

যাই। কোনো বাড়িতেই কাউকে না পেয়ে আর্মির গাড়িগুলো যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন বান্ধাইদা ব্রিজের কাছে মজনু মৃধা আর হারুন যৌথভাবে আর্মির গাড়ির ওপর আক্রমণ চালায়। এই অতর্কিত আক্রমণে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা গুরুতরভাবে আহত হয়। তারা বেশ বেকায়দায় পড়ে যায়। আমাদের পক্ষ থেকে গোলাগুলি বন্ধ করা হলেও পাকিস্তানি বাহিনী সারা রাত গুলি চালাতে থাকে।

খন্দকার মমতাজউদ্দিন নামে বিমানবাহিনীর একজন প্রাক্তন সদস্য শিবপুর বাজারে ঘোরাঘুরি করত। তার কিছুটা মস্তিষ্কবিকৃতি ছিল। প্রায়ই সে বাজারের উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খানকে গালাগালি করে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিত। ঘটনার পরদিন ভোরে সে পাকিস্তানি সেনাদের কাছে গিয়ে ইংরেজিতে চিৎকার করে বলতে থাকে, ব্লাডি পাকিস্তানি, তোমরা এত গোলাগুলি করছ কেন? গুলির শব্দে সারা রাত আমি ঘুমাতে পারিনি।

তখন কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা তাকে গাছের সাথে বেঁধে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে।

রব খানের বাড়িতে আর্মি আসার পর ওখানকার আস্তানা গুটিয়ে ফেলা হয়। এক সময়ে আমাদের পার্টির অন্যতম নেতা মাহফুজ ভূঁইয়ার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়। তার বড় ভাই মাহমুদ ভাই খবর পাঠিয়েছেন, তাদের এলাকায় (কিশোরগঞ্জে) কয়েকজন সশস্ত্র ডাকাত খুব লুটপাট করছে। আর স্থানীয়ভাবে কিছু পাকিস্তানি দালালও জনগণের ওপর খুব অত্যাচার করছে। এমনকি গ্রামের মেয়েদের ধরে ধরে আর্মির ক্যাম্পে দিয়ে আসছে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, শিবপুর থেকে একটা দল কটিয়াদিতে পাঠানো হবে। মাহফুজ ভাইয়ের সাথে মজনু মৃধা, মজিবুর রহমান, কনক খান, হযরত আলী, আব্দুল কাদিরসহ দশজনের একটা দল কটিয়াদিতে পাঠানো হয়। এই দলটা প্রথমে মাহমুদ ভাইয়ের বাড়িতে গোপনে অবস্থান নেয়। তারপর একদিন খুব ভোরে অতর্কিতে কুখ্যাত রহমান ডাকাতের ঘাঁটি আক্রমণ করে। এই আক্রমণ যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ছিল কারণ ডাকাতদের হাতেও যথেষ্ট অস্ত্র ছিল। কিছুক্ষণ গোলাগুলির পর রহমান ডাকাত তার সাত সহযোগীসহ ধরা পড়ে। এদের অনেকেই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ছিল।

উল্লসিত জনতা ডাকাতদের ঘাঁটি থেকে লুট করা সব মালামাল উদ্ধার করে।

পরে প্রমাণ সাপেক্ষে যার যার জিনিস তার তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দল শুধু উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়।

এই ঘটনার পর গ্রামবাসীদের নিয়ে একটা সভার আয়োজন করা হয়। জনতার আদালতে রহমান ডাকাতের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয় এবং তা কার্যকর করা হয়।

এর দু'দিন পরেই রাজাকার ও শান্তি কমিটির একটা ঘাঁটি আক্রমণ করে সেটা ধ্বংস করা হয়। সেখান থেকেও কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাওয়া যায়। স্থানীয়ভাবে দল গড়ার জন্য মাহফুজ ভাইয়ের কাছে কিছু অস্ত্র রেখে বাকি অস্ত্র নিয়ে আমাদের দলটা শিবপুরে ফিরে আসে। মাহফুজ ভাই নিজের এলাকায় কিছুদিন থেকে পরে মেঘালয় চলে যান এবং মুক্তিবাহিনীর পাঁচ নম্বর সেক্টরে যোগ দেন।

চার

মে মাসের মাঝামাঝি সম্ভবত ১৩ মে মান্নান খানের নেতৃত্বে তেরোজনের একটা দল আগরতলায় পাঠানো হয়। এই দলের সদস্য ছিল রশিদ মোল্লা, সেন্টু, নুরুল ইসলাম কাঞ্চন, গফুর, ঝিনুক, আব্দুল আলী মৃধা, চানমিয়া, বাদল, শাখাওয়াত প্রমুখ। এদের পথপ্রদর্শক হিসেবে থাকে কাজী গোফরান। দলটা নবীনগর পার হওয়ার পর যখন সিঅ্যান্ডবি রাস্তায় এসে পৌঁছায়, তখন হঠাৎ করে পাকিস্তানি টহলদার বাহিনী এসে হাজির হয় এবং গোলাগুলি শুরু করে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দলের কোনো ক্ষতি হয় নি। ওরা কসবার কাছে একটা রেলসেতুর নিচ দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে। দলটা প্রথমে গিয়ে ওঠে মতিনগর ক্যাম্পে। মতিনগরে এক রাত থাকার পর ওদেরকে পাঠানো হয় নির্ভয়পুর ক্যাম্পে। এ ব্যবস্থা ব্যারিস্টার মনসুর করে দেন।

ক্যাপ্টেন মাহবুবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমাদের ছেলেরা প্রশিক্ষণ পেতে থাকে। ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য ছেলেদের দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করিয়ে ছোটোখাটো অপারেশনও করানো হয়। এইভাবে ছেলেরা অল্প সময়েই গেরিলা কায়দা-কানুনে বেশ রপ্ত হয়ে উঠতে থাকে।

জুন মাসের প্রথম দিকে আমি আর একটা দল নিয়ে আগরতলায় যাই। এই দলে মিলন, ফজলু, মানিক, হান্নান ভূঁইয়া, আফসার উদ্দিন, সিরাজুল হক, সাউদ, হাবিবুর রহমান, কাদিরসহ মোট বারোজন সদস্য ছিল। আমরা

সবাই প্রথমে যশোর বাজারে মিলিত হই। যশোর বাজার শিবপুরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। পাশেই নদী। নদী পার হলেই রায়পুরা। রাতের অন্ধকারে আমরা রায়পুরা পৌঁছলাম। সেই রাতটা আব্দুল হাই ফরাজীর বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন সকালে রওনা দিলাম নবীনগরের পথে। পুরো পথটাই হেঁটে যেতে হলো। নবীনগরের কয়েক মাইল আগে লোকজনের কাছে শুনলাম, ওখানে কয়েকজন দালাল খুব সক্রিয় রয়েছে। তারা ভারতগামী শরণার্থীদের লুটপাট করে। মহিলাদের ধরে নিয়ে অত্যাচার করে। আর মুক্তিবাহিনীর লোক সন্দেহ হলে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। আপাতত আমাদের কিছু করার নেই। নবীনগরের ওপর দিয়ে সরাসরি না গিয়ে বেশ কিছুটা ঘোরাপথে সীমান্ত পার হলাম।

আগরতলা পৌঁছে আমরা সরাসরি চলে গেলাম নির্ভয়পুর ক্যাম্পে। ক্যাপ্টেন মাহবুবের সাথে আবার দেখা হলো। তিনি শিবপুরের ছেলেদের খুব প্রশংসা করলেন। ছেলেরা সাহসী ও পরিশ্রমী। মান্নান খানের নেতৃত্বে যে দলটা এসেছে তাদের প্রশিক্ষণের কাজ ভালোই চলছে। দলনেতা হিসেবে মান্নান খান যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

ক্যাপ্টেন মাহবুব আমাকে বললেন, আপনাদের এই নতুন দলটাকে একটা শর্ট কোর্স ট্রেনিং দেবো। আপনি দিন পনেরো পরে এসে দুই দলকে এক সাথে নিয়ে যাবেন।

আমি বললাম, আমাদের জন্য কিছু অস্ত্রের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

একটু মৃদু হেসে তিনি বললেন, আচ্ছা ব্যবস্থা হবে।

মনসুর ভাইয়ের সাথে প্রায় প্রত্যেক দিনই দেখা হচ্ছে। তাঁর সাথে একদিন মেলাঘর ক্যাম্পে গেলাম। সেদিন সৌভাগ্যক্রমে মেজর খালেদ মোশাররফের দেখা পেয়ে গেলাম। তিনি খুবই ব্যস্ত। অল্প সময়ের জন্য আলাপের সুযোগ হলো। তাঁকে সংক্ষেপে শিবপুরের অবস্থা বর্ণনা করে বললাম, আমাদের কিছু অস্ত্র প্রয়োজন। তিনি আশ্বাস দিলেন, আমাদের জন্য অস্ত্রের ব্যবস্থা তিনি করবেন। তারপর বললেন, আমি জানি, এই ক্যাম্পে তোমাদের দলের অনেক ছেলে আছে। তাদের চুপচাপ ট্রেনিং নিতে বলো। আর তুমি নিজে এই ক্যাম্পে আর এসো না। ব্যারিস্টার মনসুরের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখো।

ক্যাম্পে মেনন ভাইয়ের ছোটো ভাই শহিদুল্লাহ খান বাদল ও রুমির সাথে দেখা হলো। শহিদ জননী জাহানারা ইমামের ছেলে রুমী। সে ছিল কলেজের

প্রথম বর্ষের ছাত্র। বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী। ২৭ মার্চ সকালে কারফিউ উঠে গেলে সে আমাদের বাসায় এসেছিল। তারপর এই আবার দেখা। পরবর্তীকালে সে ঢাকায় অনেকগুলি বীরত্বপূর্ণ গেরিলা অ্যাকশন করেছিল। একসময় পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে ধরা পড়ে। আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। রুমী দুই-একদিন আগে মেলাঘরে এসেছে। বাদল অবশ্য বেশ আগে থেকেই মেলাঘরে আছে। সে ক্যাপ্টেন হায়দারের সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। মেলাঘর ক্যাম্পে বাদল বামপন্থী ছাত্র ও কর্মীদের ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করে। এই অপরাধে পরবর্তীকালে তাকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

ফেরার পথে মনসুর ভাই আমাকে কয়েকটা মুক্তিযোদ্ধার পাস দিয়ে বললেন, এগুলো সাথে রাখো। কাজে লাগবে। এখানকার প্রশাসন ও অনেক সামরিক কর্মকর্তাই বামদের ব্যাপারে বেশ স্পর্শকাতর।

আগরতলায় এসে সিপিআই (এম)-এর নেতা কমরেড নৃপেন চক্রবর্তীর কাছ থেকে শুনলাম, কলকাতায় বামপন্থীরা মিলিত হয়ে 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' গঠন করেছেন।

জুন মাসের মাঝামাঝি মনসুর ভাইয়ের সাথে নির্ভয়পুর ক্যাম্পে গেলাম। গিয়ে দেখি সেদিন সকালেই শিবপুর থেকে আরো বারোজনের একটা দল এসে হাজির হয়েছে। এই দলে রয়েছে নুরুল হক, জসীমউদ্দিন, সুলতানউদ্দিন, মাহবুব মোর্শেদ, রমিজউদ্দিন, আকিল, গিয়াসউদ্দিন, ফজলুল হক, সাহাবউদ্দিন, হিরা মিয়া প্রমুখ।

নির্ভয়পুর ক্যাম্পটা ছোট। আগের ছেলেরাই সব গাদাগাদি করে থাকে। তার মধ্যে এই নতুন দল এসে পড়ায় এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। ক্যাপ্টেন মাহবুবের সাথে মনসুর ভাই, মান্নান খান ও আমি আলোচনায় বসলাম। সিদ্ধান্ত হলো, মান্নান খান, আব্দুল আলী মৃধা, রশিদ মোল্লা, কাঞ্চনসহ সাতজনকে মেলাঘর ক্যাম্পে পাঠানো হবে। এই পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া। এদেরকে মেলাঘর ক্যাম্পে ঢোকানোর দায়িত্ব নিলেন মনসুর ভাই। বাকি আঠারোজনকে নিয়ে আমি শিবপুর ফিরে যাবো। আর নুরুল হকের নেতৃত্বে যে দলটা এসেছে তারা পনেরো দিনের ট্রেনিং নিয়ে শিবপুর ফিরে আসবে।

আগের পঁচিশজনের সাথে আজ যোগ হয়েছে আরো বারোজন। ছোট

ক্যাম্প। হিমশিম খাওয়ার অবস্থা। যারা নতুন এসেছে তাদের কাছ থেকে শিবপুরের শেষ অবস্থা জানলাম। এখন পর্যন্ত শিবপুরে পাকিস্তানি বাহিনীর স্থায়ী ক্যাম্প বসেনি। কিন্তু আর্মির গাড়ি ঘন ঘন শিবপুরে আসছে। তবে বড় কোনো সংঘর্ষ ঘটেনি।

আমরা পরদিন সকালে রওনা হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ক্যাপ্টেন মাহবুব বললেন, আমি ট্রাকের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা আজ রাতেই চলে যান।

রাত বারোটার দিকে শিবপুর ফিরে যাওয়ার দলটাকে জড়ো করা হলো। হান্নান, ঝিনুক, গফুর, সেন্টু, মিলন, ফজলু, মানিক, আফসার উদ্দিন, বাদল, চান মিয়া, সাখাওয়াত, সিরাজুল হক, সাউদ, হাফিজুর রহমান, কাদিরসহ মোট আঠারোজন। আমাকে নিয়ে উনিশজন। ক্যাপ্টেন মাহবুব একটা ছোটোখাটো বিদায়ী ভাষণ দিয়ে শেষে বললেন, তোমাদের যে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, বাস্তব যুদ্ধ তার চেয়ে অনেক কঠিন। তোমরা সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা নও। তোমরা রাজনীতি সচেতন মুক্তিযোদ্ধা। এলাকায় ফিরে গিয়ে তোমরা তোমাদের নেতাদের নির্দেশ অনুসারে কাজ করবে। আমি তোমাদের সাফল্য কামনা করি।

রওনা হওয়ার আগে ক্যাপ্টেন মাহবুব আমাদেরকে তিনটা স্টেনগান, দুই বাক্স গুলি, আটটা অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন, পঁচিশটা হ্যান্ড গ্রেনেড, দুই-তিন পাউন্ড পিকে বিস্ফোরক ও চার-পাঁচ ফুট ফিউজ দিলেন। ক্যাপ্টেন মাহবুবকে আমাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ট্রাকে উঠলাম। অন্ধকারে মনে হলো কয়েকজন চোখ মুছছে।

রাত তিনটার দিকে ট্রাকচালক আমাদের সীমান্তের কাছাকাছি একটা গ্রামে নামিয়ে দিলো। চারদিকে অন্ধকার। কোনো লোকজন নেই। এত রাতে সীমান্ত পার হওয়া কি ঠিক হবে? তাছাড়া যে এলাকায় আমাদের নামানো হয়েছে, সে এলাকা আমাদের পরিচিত নয়। সীমান্তের ওপারে পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে খোঁজখবর না নিয়ে গেলে বিপদ হতে পারে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, এখন সীমান্ত পার হওয়া যাবে না। সকাল হলে এলাকার লোকজনের সাথে আলাপ করতে হবে। তারপর ঠিক করব কীভাবে সীমান্ত পার হবো। আপাতত বিশ্রামের দরকার। একটা পুকুরপাড়ে গিয়ে সবাই বসলাম।

যদিও ভারতের মধ্যে, তবুও প্রকাশ্য জায়গায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বসে থাকার

বিপদ আছে। সীমান্তের ওপারে খবর হয়ে যেতে পারে যে, মুক্তিযোদ্ধারা ভিতরে ঢুকছে। ফলে ওত পেতে থাকা শত্রুর ফাঁদে আটকে যেতে পারি। তাই দিনের জন্য একটা আশ্রয় দরকার।

ভোর হতে শুরু করেছে। দুই-একজন লোকের দেখা পেলাম। তাদের কাছ থেকে শরণার্থী ক্যাম্পের সন্ধান পাওয়া গেল। ঠিক করলাম দুপুর পর্যন্ত ওখানেই থাকব। শরণার্থী ক্যাম্পের দায়িত্বে রয়েছেন স্থানীয় এক নেতা গোছের লোক। এত ভোরে তাকে ঘুম থেকে ওঠানোর জন্য একটু বিরক্তই হলেন। তারপর আমাদের জেরা শুরু করে দিলেন– কোথা থেকে আসছি? কোন ক্যাম্পে ট্রেনিং হয়েছে? বাংলাদেশে ফেরার অনুমতি আছে তো? ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার কাছে মনসুর ভাইয়ের দেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের পাস ছিল। সেটা দেখিয়ে বললাম, এর বেশি আপনাকে আর কিছু দেখানো যাবে না, বলাও যাবে না। এসব গোপনীয় ব্যাপার। আপনার আপত্তি থাকলে আমরা এখনই বর্ডার পার হওয়ার চেষ্টা করব। তবে আমরা যে আপনার সহযোগিতা পেলাম না, সেটা জায়গামতো অবশ্যই রিপোর্ট করব।

ভদ্রলোক একটু নরম হলেন। আমাদের জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা হলো। সাউদ আর ফজলুকে পাঠানো হলো সকালের নাস্তার ব্যবস্থা করতে। কাঁঠাল আর মুড়ি সবাই পেট ভরে খেলাম। দুপুরের জন্য এক দোকানের সাথে ব্যবস্থা হলো। পথের জন্য কিছু চিড়া আর গুড় কিনে নিলাম।

দুপুর পর্যন্ত সবাই পালা করে বিশ্রাম নিলাম। তারপর খেয়ে দেয়ে রওনা হওয়ার পালা। এর মধ্যে স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে কিছু কিছু খোঁজখবর নিয়েছি। প্রথমে রেললাইন পার হতে হবে। তারপর ছোটো-বড় কয়েকটা টিলা পার হয়ে সিএন্ডবি রাস্তা। রাস্তায় সারাদিন আর্মির গাড়ি টহল দেয়। রেললাইনেও মাঝে মাঝে আর্মি আসে। পথে কয়েক জায়গায় বাংকার আছে।

বিকাল তিনটা। সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছি। অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন, গুলির বাক্স আর গ্রেনেডগুলো সবার মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়েছে। মাইনগুলো বেশ ভারি। হাত থেকে পড়ে গেলে বা জোরে ধাক্কা লাগলে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই খুব সাবধানে নিতে হবে। আমাদের মধ্যে ফজলুই সবচেয়ে দুর্বল। তবু মনোবলের অভাব নেই। ও নিজেই একটা

মাইন তুলে নিয়েছে। তিনটা স্টেনের একটা আমার কাছে, বাকি দুটো মিলন ও ঝিনুকের হাতে।

মূল দল থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ আগে আগে চলেছে গফুর আর সাউদ। ওরা কিছুদূর গিয়ে গিয়ে থামছে। তারপর চারদিক ভালো করে দেখে আবার আমাদের চলার নির্দেশ দিচ্ছে। এভাবে এগোতে এগোতে আমরা রেললাইনের কাছাকাছি চলে এলাম। আর মাত্র বিশ-পঁচিশ গজ বাকি।

আর না এগিয়ে আমরা একটা বাঁশঝাড়ের মধ্যে জড়ো হলাম। রেললাইনটা প্রায় আট-নয় ফুট উঁচুতে অবস্থিত। ওপারের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কাদির গাছে চড়তে বেশ পটু। কাছেই একটা মাঝারি আকারের কাঁঠালগাছ ছিল। কাদিরকে তাতেই চড়ানো হলো রেললাইনের ওপারের অবস্থা দেখার জন্য। ও জানাল ওপারে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ছে না। তবুও খুব সাবধানে রেললাইন পার হতে হবে। কিছু বলা তো যায় না।

আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, চারজন করে এক এক বারে পার হবো। প্রথম দল পার হয়েই রেললাইন থেকে কমপক্ষে ত্রিশ-চল্লিশ গজ দূরে গিয়ে অবস্থান নেবে। পরবর্তী দল পার হওয়ার সময় কোনো বিপদ হলে তাদের সাহায্য করবে। একটা দল পার হওয়ার দশ মিনিট পরে পরের দল রওনা হবে।

প্রথম দলে থাকল মিলন। ওরা হামাগুড়ি দিয়ে রেললাইন পার হয়ে ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল। দশ মিনিট পরে দ্বিতীয় দল। আরো দশ মিনিট পরে তৃতীয় দল পার হলো। সব শেষে পার হলাম আমি, হান্নান, ঝিনুকসহ সাতজন।

সবাই নির্বিঘ্নে রেললাইন পার হলাম। ইতিমধ্যে দেখি মিলন আর গফুর গ্রামের দু'জন লোকের সাথে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। জানা গেল সিএন্ডবি রাস্তা ওখান থেকে প্রায় আধা মাইল দূরে। পথে ছোটো-বড় কয়েকটা টিলা পার হতে হবে। এই এলাকায় বসতি একেবারে নেই বললেই চলে। লোক দু'জন আরো জানাল, সকাল থেকে বেশ কয়েকবার আর্মির গাড়ি সিএন্ডবি রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেছে। তবে বাংকারের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে কোনো খবর ওরা দিতে পারল না।

ওদের অনুরোধ করলাম রাস্তা পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিতে। কিন্তু ওরা কিছুতেই রাজি হলো না।

প্রায় পাঁচটা বাজতে চলেছে। সন্ধ্যার আগেই সিএন্ডবি রাস্তা পার হয়ে গ্রামে

ঢুকে যেতে হবে। আবার সবাই তৈরি। গোনা হলো। আমাকে নিয়ে উনিশজন। সামনের রাস্তা বেশি প্রশস্ত না। পায়ে হাঁটা পথ। পাশাপাশি দুইজন করে চলেছি।

হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে রাস্তা পিচ্ছিল করে দিলো। পা টিপে টিপে হাঁটতে হচ্ছে। এত পিচ্ছিল পথে আমার হাঁটার অভ্যাস নেই। তাই প্রথম আছাড়টা আমিই খেলাম। অল্প পরে ফজলু পিছলে পড়তে পড়তে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিল। ফজলুকে খুবই পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিল। আমি সাউদকে ডেকে ওর কাছ থেকে মাইনটা নিতে বললাম।

না, না। আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। মাইনটা আমি ঠিকই নিয়ে যেতে পারব। ফজলু প্রতিবাদ করতে থাকে।

তবু অনেকটা জোর করেই সাউদ ওর কাছ থেকে মাইনটা নিয়ে নিল।

আমরা ছোটো একটা টিলা পার হলাম। সামনে ধানক্ষেত। তারপর অপেক্ষাকৃত বড় একটা টিলা। ধানক্ষেত পার হয়ে টিলায় উঠতে শুরু করলাম। পিচ্ছিল পথে হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। উপরে উঠে দেখি বেশ কিছুটা সমান জায়গা। দশ বারোটা কাঁঠালগাছও আছে। একটা গাছের তলায় বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম।

এবার টিলা থেকে নামতে হবে। বৃষ্টিতে ভেজা এঁটেল মাটি। খুব সাবধানে একজন একজন করে নামতে শুরু করেছি। এমন সময় হঠাৎ নিচ থেকে শুরু হয়ে গেলো মেশিনগানের গুলি। তখনই দেখতে পেলাম নিচের বাংকারটা। কোনোমতে হামাগুড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলাম। উপরে উঠে দেখি এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। সবাই আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছে। হান্নান তো প্রায় পাগলের মতো চিল্লাচ্ছে।

বহু কষ্টে টেনে হেঁচড়ে দলটাকে একটা বড় কাঁঠালগাছের পেছনে জড়ো করা হলো। ঝিনুক, সাউদ, মিলন আর আমি বাংকারের অবস্থান দেখার জন্য নিচু হয়ে এগিয়ে গেলাম। একটা মোটা গাছের আড়াল থেকে নিচে তাকিয়ে দেখি, একদল সৈন্য ঢাল বেয়ে উপরের দিকে উঠে আসছে। খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। আজ ফিরে যেতে হবে। সবাইকে বলা হলো টিলা থেকে নেমে ধানক্ষেতের মধ্যে আশ্রয় নিতে। আমি আর ঝিনুক দুটো গ্রেনেডের পিন খুললাম। প্রথমে ঝিনুক গ্রেনেডটা ঢাল বেয়ে উঠে আসা আর্মির দিকে গড়িয়ে দিলো। তার কয়েক সেকেন্ড পরে আমারটা। একটু পরেই অল্প

বিরতিতে দুটো গ্রেনেড ফাটার শব্দ পাওয়া গেলো।

আমি আর ঝিনুক দৌড়ে কাঁঠালগাছের কাছে ফিরে এলাম। মিলন আর সাউদ আগেই ওখানে পৌঁছে গেছে। বাকি সবাই নেমে যাচ্ছে। আমরাও নামতে শুরু করলাম। ইতিমধ্যে দেখি টিলার উপরে দুই ইঞ্চি মর্টারের গোলা ফাটতে শুরু করেছে। গোলাগুলো আসছে টিলার ডান-বাম দুই দিক থেকেই।

আমরা সবাই ধানক্ষেতের মধ্যে শুয়ে। কোনো কথা নেই। কোনো নড়াচড়া নেই। টিলার ওপারে সূর্য ডুবে গেছে। ইতিমধ্যে তিনদিক থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা এসে টিলার ওপর অবস্থান নিয়েছে। ধানক্ষেতের ওপর অন্ধকার নেমে এসেছে। তাই আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু টিলার ওপরে ওদের চলাফেরা ছায়ার মতো দেখতে পাচ্ছি।

ধানক্ষেতে প্রায় আধাঘণ্টা শুয়ে থাকলাম। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে সবাইকে জড়ো করা হলো। ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি। সবাই ঠিক আছে তো? আমাকে নিয়ে আঠারোজন। আঠারো কেন? উনিশ হবে। আবার গুনলাম। আঠারোজন। কে নেই? এক এক করে সবার নাম ডাকা হলো। হান্নানকে পাওয়া গেল না। তবে কি হান্নান ধরা পড়ল?

বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। পথ আরো পিচ্ছিল। চারদিকে অন্ধকার। এরই মধ্যে বহু কষ্টে আবার ফিরে এলাম ভারতের মাটিতে। সবাই পরিশ্রান্ত ও বিধ্বস্ত। হান্নানকে নিয়েও কম দুশ্চিন্তা নয়। কিন্তু কিছুই করার নেই। খোঁজ করারও কোনো উপায় নেই। আবার ফিরে গেলাম সেই শরণার্থী কেন্দ্রে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তিটি ঘুমিয়ে ছিলেন। তাঁকে ঘুম থেকে তোলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম। আমাদের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে বোধ হয় ভদ্রলোকের একটু করুণা হলো। তিনি আবারও রাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

পরদিন বিকেলে আবার সীমান্ত পার হলাম। এবার অনেক ঘোরাপথে চলেছি। সাথে একজন গাইড আছে। স্থানীয় লোক। পনেরো মাইল মতো হাঁটতে হবে। বাকি পথ নৌকায়। প্রায় দু'দিনের মতো লাগল যশোর বাজার পৌঁছাতে।

বাজারে শহীদ আর ইয়াসিন বসে ছিল। নৌকা থেকে আমাদের নামতে দেখেই দৌড়ে এলো। শহীদ একে একে সবাইকে জড়িয়ে ধরল। তারপর জানতে চাইল আমাদের সবাই ঠিক মতো ফিরে এসেছে কি না। আমরা

হান্নানের হারিয়ে যাওয়ার কথা বলতেই শহীদ হাসতে হাসতে বলল, হান্নান তো কাল সকালেই ফিরে এসেছে। আসার পর থেকে শুধুই হাউমাউ করে কাঁদছে আর বলছে, পাকিস্তানি আর্মি সবাইকে মেরে ফেলেছে। আজ সকালেই হান্নানকে মান্নান ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যশোর বাজারে সে রাতে একটা ভূরিভোজের ব্যবস্থা হলো। মনে হলো, অনেকদিন পরে পরিচিত রান্নার স্বাদ পেলাম।

পাঁচ

জুন মাসের মাঝামাঝি থেকেই শিবপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে ভাগ করে দেওয়া হয়। জয়নগর, কামরাবো, কোদালকাটা, ইটান প্রভৃতি জায়গায় আমরা ক্যাম্প বসাই। ক্যাম্প বলতে তাঁবু খাটানো ক্যাম্প নয়। একটা দুটো মাটির ঘরই আমাদের ক্যাম্প। দড়িপুরায় মহির ট্যাঁকে একটা ট্রেনিং সেন্টার খোলা হলো। দায়িত্বে আছে ইয়াসিন ও সিরাজ। ওরা দুজনেই পাকিস্তানি আর্মিতে ছিল।

শিবপুরের উত্তর অঞ্চল একটু উঁচু। বেশ বড় বড় টিলা আছে। বর্ষার সময় এই সব টিলার চারদিকে পানি থাকে। নৌকা ছাড়া যাওয়ার কোনো উপায় নেই। বিলশরণ গ্রামের এরকম একটা টিলার উপর খালেকের বাড়ি। জায়গাটা খালেকের ট্যাঁক নামে পরিচিত। সেখানেই আমাদের হেড কোয়ার্টার। হেড কোয়ার্টার যে সব সময়ই খালেকের ট্যাঁকে ছিল তা নয়, মাঝে মাঝে অন্যান্য জায়গাতেও হেড কোয়ার্টার সরিয়ে নেওয়া হতো। যুদ্ধের শেষের দিকে কামরাবোতে হেড কোয়ার্টার স্থানান্তরিত করা হয়। মান্নান ভাই বেশির ভাগ সময় হেড কোয়ার্টারেই থাকেন। মান্নান ভাইয়ের সাথে সব সময় থাকে তোফাজ্জল হোসেন আর তোফাজ্জল হোসেন ভূঁইয়া। আমি মাঝে মাঝে হেড কোয়ার্টারে থাকি। অন্য সময় বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে থাকতে হয়।

জুন মাসের শেষ দিকে মোস্তফা জামাল হায়দার শিবপুরে এসে উপস্থিত। পঁচিশে মার্চ জামাল ভাই দিনাজপুরে ছিলেন। শিবপুরে আসার পরে জামাল ভাই মান্নান ভাইয়ের সাথে হেড কোয়ার্টারে থাকতে শুরু করেন। হেড কোয়ার্টারে আরো একজন থাকতেন। তিনি রমিজ ডাক্তার। আমাদের মেডিকেল টিমের প্রধান। রমিজ ডাক্তার লোকটা বেশ দায়িত্বশীল। এক

ক্যাম্প থেকে আর এক ক্যাম্পে গিয়ে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করছেন। কোনো ক্লান্তি নেই। রমিজ ডাক্তারের সহকারী হিসেবে কাজ করছে জামালউদ্দিন। শেখ কাদেরকে ঢাকা পাঠিয়ে ডা. আজিজের কাছ থেকে ছোটখাটো অপারেশনের যন্ত্রপাতি, গজ, ব্যান্ডেজ ও ওষুধপত্র আনা হয়েছে। এ ব্যাপারে শিবপুরের থানা চিকিৎসা কেন্দ্র থেকেও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গেছে।

রমিজ ডাক্তার বেশ আলাপী লোক। অবসর সময়ে রমিজ ডাক্তার আমাদের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, আমি কমিউনিস্ট না। কিন্তু আপনাদেরকে আমার ভালোই লাগে। ক্যাম্পগুলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ট্রেনিং সেন্টারেও নতুন নতুন লোক আসছে। ক্যাম্পগুলোতে খাওয়া-দাওয়ার বেশ কষ্ট। বেশির ভাগ দিনই আমরা ভালোভাবে খেতে পেতাম না। মরিচ ভর্তা আর শুটকি ভর্তা খেতে খেতে অনেকেই রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হয়। অনেকেরই একটার বেশি লুঙ্গি, গামছা নেই। তেল-সাবানের ব্যবস্থা কদাচিৎ করা যায়। ক্যাম্পে ক্যাম্পে খাবার ও অন্যান্য জিনিসের এত সঙ্কট, কিন্তু মান্নান ভাইয়ের কঠোর নির্দেশ, কোনো ক্যাম্প থেকে কোনো ধরনের চাঁদা নেওয়া বা চাল-ডাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করা যাবে না। কেন্দ্রীয়ভাবেই এসব জিনিসপত্র সংগ্রহ করা হয়। এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন রব খান, বসিরুদ্দিন খান, তোফাজ্জল হোসেন, তোফাজ্জল ভূঁইয়া, কালা মিয়া, শহীদুল ইসলাম, খালেক, নুরুল ইসলাম, বাতেন ফকির, রণজিৎ, বাসু প্রমুখ।

শিবপুর সদরে ঘন ঘন আর্মি আসতে শুরু করেছে। কিন্তু বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল বস্তুত মুক্ত। এসব এলাকায় প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের মুক্তিবাহিনী। ছোটোখাটো বিচার-আচার স্থানীয়ভাবেই করা হচ্ছে। বড় কোনো সমস্যা দেখা দিলে হেড কোয়ার্টার থেকে মান্নান ভাই কাউকে পাঠিয়ে তার সমাধান করেন। শিবপুর সদরে যখন আর্মি আসত, সেই সময়টা ছাড়া অন্য সব সময়ই সদরে আমাদের অবাধ যাতায়াত।

ছয়

নরসিংদী পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি। সেখান থেকেই তারা শিবপুর

আসত। নরসিংদী-শিবপুর রাস্তার উপর পুটিয়া বাজারের পাশে একটা ব্রিজ ছিল। ব্রিজটা যদি ধ্বংস করা যায়, তবে পাকিস্তানি বাহিনীর ঘন ঘন শিবপুরে আসা একটু কষ্টকর হবে। তাই পুটিয়া ব্রিজ ধ্বংসের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সেটা আগস্ট মাসের প্রথম দিকের কোনো এক সময়।

রাত প্রায় তিনটা। একটা গোয়ালঘরের পাশে মজনু মৃধা আর আমি বসে আছি। ওখান থেকে ব্রিজটা আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। ব্রিজটি প্রায় ত্রিশ গজ মতো লম্বা। নিচে একটা ছোট নদী। আমাদের অবস্থান ব্রিজের উত্তর দিকে। ঝিনুক, আমজাদ, মিলন, ফজলু, বেণু, আফতাব, ইয়াসিন আর অন্যান্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে আঠারোজন।

দু'দিন আগে মান্নান ভাই, মজনু মৃধা, তোফাজ্জল আর আমি বসেছিলাম যোদ্ধা বাছাই করতে। প্রথম অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য সবারই প্রচণ্ড আগ্রহ। কাকে রেখে কাকে নেব, সে এক বিরাট সমস্যা। বহু কষ্টে বুঝানো গেল, এটা তো সবে শুরু। সামনে আরো যুদ্ধ আছে। প্রাথমিকভাবে যে দল ঠিক হয়েছিল, তাতে ফজলু ছিল না। এ কথা জানতে পেরে ওর সে কি করুণ আকুতি, ওকে দলে রাখতেই হবে। শেষ পর্যন্ত অনেকটা বাধ্য হয়েই ওকে নেওয়া হলো।

আমরা ভোর পাঁচটার দিকে ব্রিজটা উড়াব। আপনি ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিতে পারেন, আমি জেগে আছি। মজনু মৃধা আমাকে বললেন।

কী বলেন মজনু মামু? এই টেনশনের মধ্যে কি ঘুমানো যায়! আমি বরং মিলনকে নিয়ে একটু জায়গাটা ঘুরে দেখি। ফেরার রাস্তাটা আমাদের চেনা থাকা দরকার।

ছেলেরা সবাই বেশ উত্তেজিত। প্রথম অ্যাকশন। যুদ্ধের প্রথম স্বাদ। আনন্দ, ভয়, উদ্বেগ আর উত্তেজনার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এখানে আসার আগে সবাইকে ব্রিফিং দেওয়া হয়েছে। ব্রিজ উড়ানোর দায়িত্ব আমার আর ঝিনুকের। তারপর অপেক্ষার পালা। পাকিস্তানি সৈন্যরা ব্রিজের দিকে এগোতে থাকলেই আমরা এপার থেকে আক্রমণ চালাব। সার্বিক নেতৃত্ব দেবেন মজনু মৃধা।

সাড়ে চারটার দিকে মজনু মৃধার কাছে ফিরে এলাম। দেখি একই জায়গায় ঠায় বসে আছেন।

জুনো ভাই, চলেন কাজে নামা যাক। অন্ধকার তো ফিকে হতে চলেছে।

শিবপুরের ছেলেরা সবাই মজনু মৃধাকে মজনু মামু বলে ডাকে। আমিও ডাকি। কিন্তু মজনু মৃধা আমাকে আবার জুনো ভাই বলতেন।

আমাদের অস্ত্রের মধ্যে আছে পনেরোটা থ্রি নট থ্রি রাইফেল, একটা এলএমজি ও দুটো স্টেন। ব্রিজ উড়ানোর জন্য একটা অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন, কয়েকটা গ্রেনেড, কিছু পিকে ও ফিউজ। অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইনের উপর চাপ পড়লেই সেটা বিস্ফোরিত হয়। তাই এটা দিয়ে ব্রিজ উড়ানো সহজ নয়। কিন্তু কী করা। এর চেয়ে কার্যকর বিস্ফোরক তো আমাদের কাছে নেই। অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইনের উপরের মুখটা খুলে ফেললাম। সেখানে কিছু পিকে ঢুকিয়ে দেড় ফুট লম্বা একটা ফিউজ আটকালাম। পুরো মাইনটা ব্রিজের নিচের দিকে একটা পিলারের উপর বসালাম।

দেড় ফুট লম্বা ফিউজ পুড়তে কতক্ষণ লাগবে? এক মিনিট? দুই মিনিট? ফিউজে আগুন ধরিয়ে ব্রিজ থেকে নেমে আসতে কতক্ষণ লাগবে? আধা মিনিট? এক মিনিট? এত চিন্তা করার সময় নেই। পকেট থেকে লাইটার বের করে ফিউজের মুখে আগুন ধরিয়েই দিলাম দৌড়। না ফিউজটা জ্বলেনি। আবার ফিরে গেলাম। এবার একটু সময় নিয়ে ফিউজের মুখে লাইটারটা জ্বালালাম।

ফিউজ পুড়তে শুরু করেছে। ফিউজের দিকে তাকিয়ে আছি। প্রায় ছয় ইঞ্চি পুড়ে গেছে। আর বাকি এক ফুট। ফিউজটা পুড়তে পুড়তে মাইনের দিকে আরো কিছুটা এগিয়ে গেল। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মতো এক দৃষ্টিতে পুড়তে থাকা ফিউজটার দিকে তাকিয়ে আছি। আশেপাশের আর সবকিছু আমার কাছে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন ডাকছে, জুনো ভাই চলে আসেন। তাড়াতাড়ি।

দৌড়াতে দৌড়াতে ব্রিজ থেকে নেমে এলাম। তারপর লাফ দিয়ে একটা ঢিবির পেছনে কোনোমতে পৌঁছালাম। এদিকে মজনু মৃধা চিৎকার করছেন, সবাই মুখ হা করো, দুই কানে হাত দাও।

বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ। ব্রিজের এক অংশ উড়ে গেছে। কিন্তু যতটা আশা করেছিলাম ততটা না। বিস্ফোরণের শব্দে এলাকার লোকজনের ঘুম ভেঙে গেছে। একজন দু'জন করে আসতে শুরু করল। দেখতে দেখতে বেশ লোক জড়ো হয়ে গেল। ব্রিজটা দেখছে। ব্রিজের যেটুকু নষ্ট হয়েছে, তাতে পাকিস্তানি বাহিনীর পার হতে খুব কষ্ট হবে না। গ্রামবাসী স্বতঃস্ফূর্ত হয়েই

হাতুড়ি-বল্লম ইত্যাদি নিয়ে কাজে নেমে পড়ল। প্রায় আধা ঘণ্টার মধ্যে ব্রিজের মাঝের অংশটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

যে কোনো সময় নরসিংদী থেকে পাকিস্তানি বাহিনী চলে আসতে পারে। লোকজন সবাইকে সরে যেতে বলা হলো। কিন্তু তারা কি সরতে চায়!

আমাদের অস্ত্র দেন। আমরাও যুদ্ধ করব। গ্রামবাসীদের প্রবল আগ্রহ।

আগে ট্রেনিং নিতে হবে। শিবপুরে আমাদের ক্যাম্পে যোগাযোগ করতে বললাম।

বাজারে একটা খাবারের দোকান ছিল। দোকানদারকে আমাদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে বললাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চাপাতি আর ডিমভাজি এসে গেল। পেট ভরে খেলাম। কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে।

দোকানদারকে খাবারের দাম দিতে চাইলাম। কিন্তু বাজার কমিটির চেয়ারম্যান বলল, কমিটির পক্ষ থেকে খাওয়ার ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। দাম দিতে হবে না।

এবার প্রতীক্ষার পালা। মজনু মামু সবার জায়গা বুঝিয়ে দিয়েছেন। রাস্তার পশ্চিম দিকে একটা বড় বটগাছের গোড়ায় এলএমজি নিয়ে মজনু মামু, সাথে ইয়াসিন। আমার হাতে স্টেন। একই দিকে একটা ঢিপির পেছনে বসে আছি। আমার ডান দিকে ফজলু। বেণু আর মিলন আর একটু দূরে। সব শেষে ঝিনুক। ওর কাছেও স্টেন। আমজাদ রাস্তার পূর্ব দিকে ব্রিজের সাথে কোনাকুনিভাবে অবস্থান নিয়েছে। ওর সাথে আছে আরো তিনজন। অযথা গোলাগুলি নষ্ট করা যাবে না। আমাদের গুলি সীমিত। প্রথমে মজনু মৃধা শুরু করবেন। তারপর প্রত্যেকে টার্গেট দেখে দেখে গুলি করবে। বার বার সবাইকে কথাগুলো মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে। খবর পাওয়া গেল ওরা আসছে। প্রায় দেড়শ গজ দূরে একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে ছয়টা ট্রাক থেকে সৈন্যরা নেমেছে। একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে এগিয়ে আসছে। আমরা যে যার অবস্থানে বসে আছি– নিশ্চুপ। আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটাচ্ছে। দেখলাম মজনু মৃধা এলএমজির বোল্ট পরীক্ষা করে ম্যাগাজিনটা ঢুকালেন। পাশে দুটো স্পেয়ার ম্যাগাজিন। ছোটো একটা বাক্সে আরো শ'খানেক গুলি। আমার স্টেনটাও একবার দেখে নিলাম। একটা স্পেয়ার ম্যাগাজিন আর

পকেটে পনেরো বিশটা আলগা গুলি। প্রত্যেকটা ম্যাগাজিনে একুশটা গুলি ভরা আছে। খালি হতে আধা মিনিটও লাগার কথা না। স্টেনটা অটোমেটিক সেট করা ছিল। সিঙ্গেল মটে নিয়ে এলাম। আবার বোল্ট টেনে দেখলাম। আশেপাশে রাইফেলের বোল্ট টানার শব্দ শুনলাম। সবাই তৈরি হচ্ছে।

এসে গেছে। দেখা যাচ্ছে শত্রুপক্ষকে। ওরা কেউই আমাদের ব্যক্তিগত শত্রু না। তবু এদেরকে মারতে হবে। আক্রোশটা ব্যক্তিগত না। আক্রোশটা সমষ্টিগত। টান টান উত্তেজনা। মজনু মৃধা কি করছেন। এখনো গুলি করছেন না কেন? আর কত কাছে আসতে দেবে শত্রুদের? পাকিস্তানি সেনাদের চেহারা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দু'জন ব্রিজের গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখনই সময়। মজনু মৃধা কেন এত সময় নষ্ট করছেন? মনে হচ্ছে সময় যেন গতি হারিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ সব স্তব্ধতা ভেঙে শোনা গেল মজনু মৃধার হালকা মেশিনগান থেকে এক পশলা গুলির শব্দ। সাথে সাথে গর্জে উঠল আমাদের পনেরোটা রাইফেল ও দুটো স্টেন। কিন্তু আমাদের সব শব্দ ম্লান করে দিয়ে শুরু হলো প্রতিপক্ষের গোলাগুলি। বৃষ্টির মতো গুলি ছুটে আসছে এলএমজি আর অটোমেটিক চাইনিজ রাইফেল থেকে। ব্রিজের যে পাড়ে আমাদের অবস্থান, সেটা অন্য পাড়ের চেয়ে একটু উঁচু। এই অবস্থানগত সুবিধার জন্য, লোকবল আর অস্ত্র আমাদের কম থাকলেও, আমরা বেশ কার্যকরভাবেই প্রতিপক্ষের উপর আঘাত হানতে থাকি।

আমার স্টেনের একটা ম্যাগাজিন শেষ হয়েছে। সেটা খুলে স্পেয়ারটা ঢুকালাম। আধা ঘণ্টা গোলাগুলির পর মনে হলো একটু বিরতি হয়েছে। মনে হচ্ছে ওদের বেশ ক্ষতি হয়েছে। আমাদের সবাই অক্ষত। নিচু হয়ে মজনু মৃধার কাছে গেলাম। দেখি এলএমজিটা কাজ করছে না।

ওরা আবার আক্রমণের চেষ্টা করবে। কেউ যেন জায়গা না ছাড়ে। মজনু মৃধা চিৎকার করে নির্দেশ দিলেন। তারপর ইয়াসিনের হাতে এলএমজিটা রেখে অবস্থান থেকে নিচু হয়ে পিছিয়ে এলেন। ছেলেরা কে কেমন আছে একবার দেখা দরকার। নিচু হয়ে আমরা এগুচ্ছি। ফজলুর পেছনে আসতেই মজনু মৃধাকে দেখে সে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল।

জানেন মামু, আমি তিনটাকে শেষ করেছি। এই বলে ফজলু উঠে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত। তাকে যে উঠতে নিষেধ করব– সে সময় আর হলো না। একটা গুলি এসে লাগল তার পিঠে। মুখ দিয়ে একটু গোঙানির মতো শব্দ করে

মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ফজলু।

হঠাৎ করে আবার শুরু হয়ে গেল গোলাগুলি। প্রত্যেককে নিজের অবস্থান থেকে একটা দুটো করে গুলি চালাতে বলা হলো। বেণুকে দিয়ে আমজাদের কাছে খবর পাঠানো হলো, সে যেন রাস্তার পুব পাড়ে যারা আছে তাদের নিয়ে এদিকে চলে আসে।

আমরা কয়েকজন ফজলুকে ধরাধরি করে আস্তে আস্তে পেছনে চলে এলাম। কাছের স্কুল থেকে একটা বেঞ্চ জোগাড় করে তার উপর ফজলুকে শোয়ানো হলো। গুলি পিঠ দিয়ে ঢুকে সামনে দিয়ে বের হয়েছে। রক্ত গলগল করে পড়ছে। ফজলু কি বাঁচবে? ফজলুকে কি বাঁচানো যাবে? ধারে কাছে কোনো ডাক্তার আছে?

ওদিকে গুলির শব্দ স্তিমিত হয়ে আসছে। সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে সরিয়ে আনা হলো।

আমরা সবাই শিবপুরের দিকে ফিরে যাচ্ছি। মজনু মৃধা আর আমজাদ রয়ে গেছে পাকিস্তানি বাহিনীর কেমন ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তা জানার জন্য। তাছাড়া ওরা যদি কোনো অস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেলে যায়, তাও সংগ্রহ করতে হবে। ফজলুর বুকে-পিঠে কাপড় দিয়ে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে। কিন্তু রক্তপড়া বন্ধ হয়নি। একবার একটু ক্ষীণ শব্দ বের হলো মুখ দিয়ে। কিছু বোঝা গেল না। পথেই মারা গেল ফজলু। শিবপুরের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ।

সাত

প্রথম যুদ্ধেই বিরাট সাফল্য। প্রায় ত্রিশজনের মতো পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়েছে। এর মধ্যে একজন ক্যাপ্টেনও আছে। দুটো চাইনিজ রাইফেল, একটা পিস্তল ও ছয়-সাত বাক্স গুলি পাওয়া গেছে। নিহত ক্যাপ্টেনের নাম সেলিম। তার টুপি ও ব্যাজও উদ্ধার করা হয়েছে। এত সাফল্যের পরও সবার মনই বিষণ্ন। এত বড় বিজয়। কিন্তু তারপরও নেই কোনো উল্লাস। ফজলুকে তার গ্রামের বাড়িতে 'গান স্যালুট' দিয়ে সমাহিত করা হয়েছে। একটা মৃত্যু আমাদের এই বিজয়ের উল্লাসকে বিমর্ষ করে দিয়ে গেল।

পুটিয়া যুদ্ধের সাফল্য আমাদের যোদ্ধাদের মনোবল প্রচণ্ড রকম বাড়িয়ে দেয়। এলাকাবাসীর উপরও এর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। এমনকি শিবপুরের আশেপাশের অনেক এলাকা থেকেও লোকজন এসে আমাদের

সাথে নতুনভাবে যোগাযোগ করতে শুরু করে এবং তাদের এলাকায় যুদ্ধ করার আমন্ত্রণ জানায়। এই সুযোগে সে সব এলাকায় আমরা আমাদের সংগঠন গড়ার কাজে হাত দেই।

নুরুল হকের নেতৃত্বে শেষ দলটাও নির্ভয়পুর ক্যাম্প থেকে ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে মান্নান খানও মেলাঘর ক্যাম্পে ট্রেনিং শেষ করে শিবপুরে ফিরে এসেছেন। তিন নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর কে এম সফিউল্লাহ মান্নান খানকে শিবপুর থানার কমান্ডার নিয়োগ করেছেন। একই সাথে নেভাল সিরাজকে নরসিংদী, শিবপুর, রূপগঞ্জ, আড়াই হাজার এলাকার আঞ্চলিক কমান্ডার নিয়োগ করা হয়েছে। এতে আমাদের সুবিধাই হলো। কারণ, নেভাল সিরাজের সাথে আগেই আমাদের একটা সমঝোতা হয়েছিল যে, আমরা সমন্বয় সাধন করে কাজ করব। তিনি আমাদের এলাকায় কোনো অতিরিক্ত খবরদারি করতে যাননি। আমরা আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা মাফিকই কাজ করেছি। পরে তিনি আমাদের পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। স্বাধীনতার অল্প পরেই তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন।

তিন নম্বর সেক্টর থেকে মান্নান খানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল শিবপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে তাদের তালিকা পাঠানোর। তাছাড়া পনেরো দিন পর পর মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যক্রমের রিপোর্টও পাঠাতে বলা হয়েছিল। এই নির্দেশ অনুযায়ী মান্নান খানের ডেপুটি কমান্ডার নিয়োগ করা হয় মজিবুর রহমানকে। আর মজনু মৃধা, আওলাদ হোসেন খান, ঝিনুক খান, সেন্টু মোল্লা, আব্দুল আলী মৃধা, আব্দুর রশিদ মোল্লা ও নুরুল ইসলাম কাঞ্চন এই সাতজনকে গ্রুপ কমান্ডার নিয়োগ করা হয়।

পুটিয়া যুদ্ধের দুই-তিন দিন পরই পাকিস্তানি বাহিনী এসে পুটিয়া বাজারে আগুন লাগিয়ে দেয়। আমরা বুঝতে পারছিলাম এবার আর্মি শিবপুর সদরে স্থায়ীভাবে ক্যাম্প বসাবে। তাই আমরা শিবপুর থানায় যে পনেরো-ষোলোটা রাইফেল ছিল, তা নিয়ে নিই। আর থানায় আগুন লাগিয়ে দেই। এই কাজে নেতৃত্ব দেয় মান্নান খান, ঝিনুক, সেন্টু, আওলাদ প্রমুখ। শিবপুর থানার দারোগা ও পুলিশদের আমরা আমাদের মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করতে আহ্বান জানাই। কিন্তু পুলিশরা জানতে চায় যে, আমাদের সাথে থাকলে আমরা তাদের বেতনের ব্যবস্থা করতে পারব কি না। তাদের বেতন দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করায় সব পুলিশই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে

যায়। থানার দারোগা কয়েকদিন আমাদের সাথে থাকেন। কিন্তু পরে বুঝতে পারেন যে আমাদের কষ্টের জীবনযাত্রার সাথে খাপ খাইয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনিও শেষ পর্যন্ত শিবপুর থেকে চলে যান।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানি আর্মি শিবপুরে স্থায়ীভাবে ক্যাম্প বসায়। এসময় জামাত নেতা মোসলেউদ্দিন নোমানী এবং ওহিদ পাঠান, শহীদ পাঠান ও আব্দুল ফকিরসহ অল্প কয়েকজন দালাল শিবপুর সদরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই দালালদের পরামর্শে পাকিস্তানি বাহিনী মজনু মৃধা, বসিরুদ্দিন খান, রব খানসহ বেশ কয়েকজনের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই সময়ই শিবপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে হঠাৎ করে ডাকাতের উপদ্রব শুরু হয়। কেউ কেউ মান্নান ভাই ও অন্যান্য নেতাদের নাম করে অথবা সরাসরি মুক্তিযোদ্ধা সেজে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে চাঁদা নিতে থাকে। অনেকে আবার পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্পে দিতে হবে বলে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ছাগল, মুরগি, ডিম ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় এদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়। তারপরেও যারা অস্ত্রের জোরে ডাকাতি ও চাঁদাবাজি করতে থাকে তাদের ধরে এনে প্রকাশ্যে গুলি করা হয়। এদের মধ্যে সাবেদ আলী, নিজামুদ্দিন, উসমান ও কার্তিক উল্লেখযোগ্য। এর পরে শিবপুরে আর কোনো ডাকাতির খবর পাওয়া যায়নি।

ভারত থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সব মুক্তিযোদ্ধাই ফিরে এসেছে। স্থানীয়ভাবে অনেক যুবককে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। পুরানো ক্যাম্পগুলোতে আর জায়গা হচ্ছে না। তাই নতুনভাবে অঞ্চল ভিত্তিক ক্যাম্প বসানো হয়। শিবপুরের পূর্বাঞ্চলে যশোর, কোদালকাটা ও কামরাবোতে যে ক্যাম্পগুলো বসানো হয়, সেগুলোর কার্যক্রম রায়পুরা থানার অংশবিশেষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম অঞ্চলে দত্তের গাঁও, মিয়ার গাঁও আর দরিপুরাতে ক্যাম্প বসানো হয়। এখান থেকে কালীগঞ্জ থানার কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করা হতো। শিবপুরের দক্ষিণে সৃষ্টিঘর ও বিরাজনগরে দুটো ক্যাম্প বসানো হয়। বর্ষা শুরু হওয়ার ফলে শিবপুরের উত্তর অঞ্চল বেশ দুর্ভেদ্য ছিল। নৌকা ছাড়া যাতায়াতের কোনো সহজ রাস্তা ছিল না। তাই হেড কোয়ার্টার বিলশরণে খালেকের ট্যাকেই রয়ে যায়।

শিবপুর সদর পাকিস্তানি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসলেও বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল মুক্ত ছিল। আগস্ট মাসের শেষ দিকে কাজী গোফরান আগরতলা থেকে শিবপুরে আসে। সাথে নিয়ে আসে 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয়

কমিটি'র ঘোষণা ও প্রচারপত্র আর 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র কয়েকটা সার্কুলার। এরই ভিত্তিতে নৌকাঘাটা প্রাথমিক স্কুলের মাঠে শিবপুর থানা ভিত্তিক এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। প্রতিটা ক্যাম্প থেকে দশজন করে প্রতিনিধি এবং এলাকা ভিত্তিক কৃষক সমিতির প্রতিনিধিদের এই সভায় আনা হয়। এ সভায় রায়পুরা, মনোহরদি ও কালীগঞ্জের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিল। সমাবেশে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রায় দু'শজন। মান্নান ভাইয়ের সভাপতিত্বে এই সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন মোস্তফা জামাল হায়দার। এই সভায় রনো আর মেনন ভাইয়ের উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা আসতে পারেননি।

সভায় চীন সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। আমরা সাধারণ মানুষের কাছে চীনপন্থী বলে পরিচিত ছিলাম। তাই জনগণ ও কর্মীদের প্রশ্ন ছিল চীন কেন আমাদের পক্ষ নিচ্ছে না। আমাদের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়, চীন ভুল করেছে। চীন যাই করুক, আমরা আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। এই উত্তরে কর্মীরা বেদনার সঙ্গেই সন্তুষ্ট হয়েছিল। এই সভা মুক্তিযোদ্ধাদের এবং জনগণের মনোবল বাড়াতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

আট

পুরো বর্ষা চলছে। রাস্তাঘাট কাদায় প্যাচপ্যাচ করছে। ক্যাম্পে বর্ষাতি বা ছাতার কোনো বালাই নেই। ভেজা কাপড় গায়েই শুকোয়। এর মধ্যেও অস্ত্র নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে টহল দিতে হয়।

শিবপুরে ক্যাম্প বসানোর পর আর্মি শিবপুর থেকে হাতিরদিয়া যাতায়াত শুরু করে। আমরা ঠিক করেছি এই পথের কোনো একটা জায়গায় পাকিস্তানি বাহিনীর গাড়ি বহরের উপর আক্রমণ করব। এ কাজে অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন রাস্তায় পুঁতে রাখা হয়। উপর দিয়ে গাড়ি গেলে চাপের ফলে মাইন বিস্ফোরিত হয়। এই মাইন পাতার অসুবিধা এই যে, মালবাহী গরুর গাড়ির চাকা মাইনের উপর দিয়ে গেলেও মাইন ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে জন্য মাইন পাতা হলে গরুর গাড়িকে সাবধান করার জন্য সব সময় পাহারার ব্যবস্থা রাখতে হয়। ফলে মাইন পাতার ব্যাপারটা জানাজানি হবার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া গাড়ি বহর বা কনভয় থাকলে

শুধুমাত্র প্রথম গাড়িটাই বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু আমরা যদি শত্রুকে ভালো রকম ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাই এবং তাদের অস্ত্র সংগ্রহ করতে চাই, তবে বহরের মাঝামাঝি একটা গাড়ি ধ্বংস করা দরকার। সেজন্য আমরা বৈদ্যুতিক ডেটোনেটরের সাহায্যে মাইন বিস্ফোরণের পরিকল্পনা নিলাম।

কিন্তু বৈদ্যুতিক ডেটোনেটর তো আমাদের নেই। তাই নিজস্ব কায়দায় বৈদ্যুতিক ডেটোনেটর বানানো হলো। একটা টর্চের বাল্বে খুব ছোটো একটা ফুটো করে তার মধ্যে দিয়াশলাইয়ের কিছু বারুদ ভরা হলো। তারপর বাল্বের দুই প্রান্ত থেকে তার টেনে এনে ব্যাটারি সংযোগ করে দেখা গেল বাল্বটা ফট করে জ্বলে উঠছে। এরকম কয়েকটা বৈদ্যুতিক ডেটোনেটর আমরা তৈরি করে ফেললাম।

শিবপুর-লাখপুর রাস্তা আর চরসিন্দুর-হাতিরদিয়া রাস্তার সংযোগস্থানে দুলালপুর অবস্থিত। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম দুলালপুরের কাছাকাছি হাতিরদিয়া রাস্তায় মাইন পাতব। একটা পছন্দসই জায়গা পাওয়া গেল। রাস্তার এক পাশে ধানক্ষেত। তার পেছনে ডোবা মতো কিছুটা জায়গা। অন্য দিকটা একটু উঁচু টিলার মতো। আশেপাশে বেশ গাছপালাও আছে।

প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যেই কাজ করতে হচ্ছে। সারা রাত ধরে রাস্তায় মাইন বসালাম। শক্ত মাটির রাস্তায় গর্ত খুঁড়ে অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন বসাই। মাইনের উপরের মুখ খুলে কিছু পিকে বিস্ফোরক ঢুকিয়ে দিলাম। পিকের সাথে আমাদের তৈরি বৈদ্যুতিক ডেটোনেটর আটকানো হলো। তারপর ঐ ডেটোনেটর থেকে কুড়ি গজ মতো লম্বা তার ধানক্ষেতের মধ্যে টেনে আনলাম। এই তারের দুই প্রান্তে ব্যাটারি সংযোগ করলেই মাইন বিস্ফোরিত হবে। সঠিক ভোল্টেজ পাওয়ার জন্য দশটা দেড় ভোল্টের টর্চ ব্যাটারি পর পর একটা নলের মধ্যে বসানো হলো। রাস্তার গর্তটা আবার সুন্দর করে মাটি দিয়ে ভরে দিলাম যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে ওখানে কোনো খোঁড়াখুঁড়ির কাজ হয়েছে।

এই অপারেশনে ঝিনুক, মজিবুর রহমান, মানিক, আব্দুল আলী মৃধা, কাফিলুদ্দিন, শাহজাহান, সাহাবুদ্দিন, মিন্টু, সোলেমান, সিরাজসহ মোট বারোজন রয়েছি। অস্ত্রের মধ্যে একটা এলএমজি, বাকি সব থ্রি নট থ্রি রাইফেল আর ভারতীয় এসএলআর। সারা রাত কাজ করে সবাই পরিশ্রান্ত। তিনজনকে পাহারায় রেখে বাকিরা একটা গাছের তলায় একটু ঘুমিয়ে নিলাম।

মানিকের ধাক্কায় ঘুম ভাঙল। ভোরের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বেশ খিদে পেয়েছে। কাদিরকে বললাম, কিছু নাস্তার ব্যবস্থা করতে। ইতিমধ্যে গ্রামের লোকজন একজন দু'জন করে আমাদের কাছে জড়ো হতে শুরু করেছে। বয়স্ক একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কিও, আজকের যুদ্ধ কখন হইতো?

ঝিনুক সব সময়ই রসিকতা করতে পছন্দ করে। সে বলল, চাচা মিঞা, চাচিরে পাকসাকের ব্যবস্থা করতে কন। একটার মধ্যে যুদ্ধ শেষ করে আমরা হাজির হবো।

আর একজন লোক এসে বলল, আমরাও তো মুক্তি হইতাম চাই। একটা বন্দুক দেন না, দুই-তিনডা পাঞ্জাবিরে খতম করি।

তাদের গ্রামে পরে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হবে বলে তখনকার মতো তাকে নিরস্ত করা গেল। এভাবে লোকজন জড়ো হতে থাকলে অসুবিধা হবে। তাই সবাইকে সরে যেতে বললাম। তারপর আমরা আমাদের অবস্থান নিলাম।

ধানক্ষেতের মধ্যে ব্যাটারিতে তার সংযোগের দায়িত্ব আমার। আমার কাছে থাকছে মজিবুর। আমাদের দু'জনের কাছেই আছে এসএলআর। রাস্তা থেকে আমাদের দূরত্ব কুড়ি গজ মতো। আমাদেরকে কভার দেওয়ার জন্য একটু দূরে দু'জন রয়েছে। এলএমজি-টা রাখা হয়েছে রাস্তার ওপারে। কাফিলুদ্দিন একটা মোটা গাছের গুঁড়ির পেছনে ওটা নিয়ে বসে আছে। বাকি সাতজন রাস্তা বরাবর অবস্থান নিয়েছে। আর ঝিনুককে একটা বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দুলালপুর থেকে প্রায় পোয়া মাইল দক্ষিণে শিবপুরের রাস্তার উপর একটা কালভার্ট আছে। এখানে গোলাগুলি শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ঝিনুক ঐ কালভার্টটা বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেবে যাতে গাড়িগুলো ওপথে আর ফিরে না যেতে পারে।

আমরা আক্রমণের একটা মোটামুটি পরিকল্পনা নিয়েছি। গাড়ির বহরের প্রথম দুটো বাদ দিয়ে তৃতীয়টা যখন মাইনের উপর আসবে, তখন সেটা ফাটানো হবে। আর একই সাথে আমরা রাস্তার দুই দিক থেকে আক্রমণ করব। আমি তো ধানক্ষেতের মধ্যে শুয়ে থাকব। তাই গাড়ির সঠিক অবস্থান আমার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। মাথা উঁচু করে দেখা বিপজ্জনকও বটে। তাই ওপাশ থেকে মানিক প্রথম গুলিটা করবে। গুলির শব্দ পেলেই আমি ব্যাটারিতে তার সংযোগ করব।

বৃষ্টিভেজা ধানক্ষেতের মধ্যে বসে আছি। ছোটো ছোটো পোকা আর আর পিঁপড়া খুব জ্বালাচ্ছে। একটা বারো-তেরো বছরের বাচ্চা আমাদের জন্য চাঁপা কলা আর মুড়ি নিয়ে এসেছে। মুড়ি খেতে খেতে বাচ্চাটার সাথে একটু গল্প জুড়ে দিলাম। তার নাম আসমত আলী। পাশের গ্রামেই থাকে। ক্লাস ফোরে পড়ে। ছোটো আরো দুই বোন আছে। বাবা কৃষিকাজ করে। আসমত আলী জানাল তার 'মুক্তি' হওয়ার খুব শখ। কিন্তু মাঠে বাবাকে সাহায্য করতে হয়। তাই এখন 'মুক্তি' হতে পারছে না।

আমি বললাম, কে বলে তুমি 'মুক্তি' না। এই যে আমাদের জন্য মুড়ি নিয়ে এসেছ, এটা তো 'মুক্তি'দেরই কাজ। তুমি আর একটু বড় হও। তখন তোমাকে দিয়ে যুদ্ধও করাব। সকাল সাড়ে দশটার দিকে দেখা গেল আর্মির গাড়ি আসছে। গাড়ির সংখ্যা মাত্র তিনটা। তার আর ব্যাটারিগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে নিলাম। এসএলআর-এর বোল্ট টেনে সেফটি ক্যাচ্ ঠিক করলাম। তারপর ধানক্ষেতের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে ফেললাম। আমার কাছ থেকে তিন-চার ফুট দূরে মজিবুরও শুয়ে আছে।

গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। গাড়ির সংখ্যা তো মাত্র তিনটা। আগের সিদ্ধান্ত ছিল বহরের তৃতীয় গাড়িটা উড়ানো হবে। মানিক কি বুদ্ধি করে মাঝের গাড়িটা যখন মাইনের উপর আসবে তখন গুলি করবে? তাহলে বেশ সুবিধা হয়। গাড়ির শব্দ বেশ জোরালো হচ্ছে। এখনও গুলি হচ্ছে না কেন? অধৈর্য লাগছে।

শেষ পর্যন্ত গুলির শব্দ পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি ব্যাটারির দুই প্রান্তে তার সংযোগ করলাম। কিন্তু মাইন ফাটলো না। আবার নতুন ভাবে তার দুটো ব্যাটারির দুই প্রান্তে চেপে ধরলাম। কিন্তু কিছুই হলো না। ইতিমধ্যে গুলির শব্দে গাড়িগুলো থেমে গেছে। এখন আর পিছু হটার সময় নেই। আমি আর মুজিবুর আমাদের এসএলআর থেকে গুলি করা শুরু করলাম। রাস্তার ওপাশ থেকেও আমাদের এলএমজি আর রাইফেলের আওয়াজ পাওয়া গেল। আমার এসএলআর থেকে তিনটা গুলি বের হওয়ার পরই জ্যাম হয়ে গেল। শালার এসএলআর। এখন বোল্ট টেনে টেনে গুলি করতে হবে।

ইতিমধ্যে গাড়ি থেকে সৈন্যরা নেমে গেছে। রাস্তার দুই দিকে তারা সমানে গুলি করে চলেছে। ধানক্ষেতের উপর দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি ছুটে আসছে। গুলির শিস কাটার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মাঝে মাঝে দুই ইঞ্চি মর্টারের গোলাও

আসছে। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে কাদামাটি আর ডোবার মধ্যে পড়ায় একটাও ফাটছে না।

সৈন্যরা যদি ধানক্ষেতের মধ্যে নেমে আসে, তাহলে ধরা পড়ার খুবই সম্ভাবনা। যদিও পেছন থেকে দু'জন মাঝে মাঝে গুলি করে আমাদেরকে কভার দিচ্ছে, তবু ধানক্ষেত থেকে সরে যেতে হবে। খুব আস্তে আস্তে ক্রল করে পেছন দিকে সরে আসছি। এসএলআর-টা খুব ভারি মনে হচ্ছে। তবু ফেলা যাবে না। অস্ত্রই আমাদের জীবন। ধানক্ষেতের শেষ প্রান্তে একটু নিচু খাদ। সেখানে নেমে একটু স্বস্তি ফিরে পেলাম।

দূরে একটা বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেল। ঝিনুক তাহলে কালভার্টটা উড়িয়েছে। রাস্তার ওদিকে আমাদের গুলির শব্দও আস্তে আস্তে কমে আসছে। এসএলআর-এর বোল্ট টেনে টেনে গাড়ি লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি করলাম। তারপর আমরা এপারের চারজন রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে সরে এলাম। দূর থেকে লক্ষ্য করলাম, চার-পাঁচজন সৈন্যকে ধরাধরি করে গাড়িতে তোলা হচ্ছে। তারপর গাড়িগুলো মুখ ঘুরিয়ে শিবপুরের দিকে ফিরে গেল।

আমার মাথায় খালি ঘুরছে, মাইন ফাটলো না কেন। গাড়িগুলো চলে যাওয়ার পর পরই ফিরে এলাম ধানক্ষেতের মধ্যে। তার ধরে ধরে এগুতে গিয়ে দেখি রাস্তার ধারে এক জায়গায় তারটা ছেঁড়া। সম্ভবত মাইন পাতার পর আমরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন কোনো গরু-ছাগল তারটা ছিঁড়ে দিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ওপার থেকে মানিক আর সিরাজও এসেছে। গ্রামের কয়েকজন লোকের সাহায্যে খুব সাবধানে গর্ত খুঁড়ে মাইনটা তুললাম। তারপর আমরা ক্যাম্পে ফিরে গেলাম।

ক্যাম্পে ঝিনুকও ফিরে এসেছে। ঝিনুক বলল, সে বেশ সাফল্যের সাথেই কালভার্টটা উড়িয়েছিল। গাড়িগুলো কালভার্টের কাছে থেমে প্রথমে চারিদিকে সমানে গুলি চালায়। তারপর গাছের গুড়ি, ইট ইত্যাদি দিয়ে জায়গাটা ভরাট করে গাড়ি তিনটা পার করে। ঝিনুক আফসোস করে বলল, ওখানে আমাদের এলএমজি-টা থাকলে সব কটাকে শেষ করে দেওয়া যেত।

নয়

সেপ্টেম্বর মাস থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী তাদের আক্রমণ তীব্রতর করতে থাকে। আমাদের ক্যাম্পগুলোর সন্ধানে রাতের বেলাও কমান্ডো বাহিনী

পাঠাতে থাকে। রাতের যুদ্ধ আমরা সব সময়ই এড়িয়ে যাই। এজন্য সারা দিন এক জায়গায় ক্যাম্প করে সন্ধ্যার পর আমরা অন্য জায়গায় ক্যাম্প সরিয়ে ফেলতাম। কমান্ডো আক্রমণের ভীতি আমাদের যোদ্ধাদের মধ্যেও দেখা দেয় এবং তাদের মনোবল দুর্বল হতে থাকে।

একদিন সকাল দশটার দিকে খালেকের ট্যাঁকে খবর এলো পাকিস্তানি বাহিনীর দুটো দল দুই দিক থেকে এগিয়ে আসছে। আমি আর জামাল ভাই তখন শুটকি ভর্তা দিয়ে ভাত খাচ্ছি। মান্নান ভাই দাড়ি সেভ করছেন। আগের রাত থেকেই তোফাজ্জলের শরীর খারাপ। সে শুয়ে আছে। অন্যান্য ছেলেরা কেউ অস্ত্র পরিষ্কারের কাজে ব্যস্ত। আর কেউবা দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করছে।

খবর পাওয়ার সাথে সাথে জামাল ভাই খাওয়া ছেড়ে উঠে বললেন, এই মান্নান ওঠ। 'বসে খাওয়া শেষ কর। আমিও ততক্ষণে শেভ করা শেষ করছি।' মান্নান ভাই বললেন। 'তুই কি ক্লিন শেভ অবস্থায় ধরা দিতে চাস?' জামাল ভাই খেপে গেলেন।

আমি জানি, মান্নান ভাই তাড়াহুড়া করলে ক্যাম্পে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। মান্নান ভাই তাই সময় নিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর মান্নান ভাই কাদের আর হাবিবকে ক্যাম্পের অস্ত্রগুলো দুই নৌকায় তুলতে বললেন। তারপর ধীরে সুস্থে উঠে জামাল ভাইকে বললেন, চল এবার যাওয়া যাক।

পরে অবশ্য খবর পাওয়া গেল, পাকিস্তানি বাহিনী খালেকের ট্যাঁক পর্যন্ত না এসেই ফিরে গেছে।

পাকিস্তানি বাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণের ফলে জনগণের মধ্যেও ধারণা হতে থাকে যে, আমরা বোধ হয় পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের মুখে টিকতে পারব না। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আমরা একটা কৌশল অবলম্বন করি। জনসমক্ষে আমাদের শক্তি প্রদর্শন করতে থাকি। দুই-তিনটা ক্যাম্পের যোদ্ধাদের একত্রিত করে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে পাঠানো হতো। সাথে থাকত এলএমজি, স্টেন আর রাইফেল। গ্রামে গ্রামে মিটিং করে এই সব অস্ত্র গ্রামবাসীদের দেখানো হতো। এইভাবে একই অস্ত্র সারা শিবপুরের গ্রামাঞ্চলে দেখানোর ফলে জনগণের ধারণা হলো যে, আমাদের যথেষ্ট অস্ত্র আছে এবং আমরা পাকিস্তানি বাহিনীকে মোকাবেলা করতে সক্ষম। জনগণের এই মনোবল ফিরিয়ে আনাটা আমাদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

আমাদের যোদ্ধাদের মনোবল ঠিক রাখার জন্য রাজনৈতিক ক্লাসের পাশাপাশি মাঝে মাঝে গানবাজনার ব্যবস্থাও হতো। 'বাংলার কমরেড বন্ধু, এইবার তুলে নাও হাতিয়ার, গণযুদ্ধের ডাক এসেছে, কমরেড, কমরেড, কমরেড' এটা আমাদের খুব প্রিয় গান ছিল। এসব অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীরাও অংশ নিত।

পাকিস্তানি আর্মি যেমন কমান্ডো পাঠিয়ে আমাদের তটস্থ রাখত, আমরাও ঠিক করলাম ওদের রাতের ঘুম নষ্ট করতে হবে। পরিকল্পনাটা মজনু মৃধার। নরসিংদীর আর্মি ক্যাম্পটা ছিল টি এন্ড টি অফিসে। এর কাছেই পেতনীর বাজার। একদিন রাতে মজনু মৃধা, সেন্টু, শেখ কাদের আর আমি হাঁটতে হাঁটতে পেতনীর বাজার গেলাম। আমাদের সাথে দুটো এলএমজি আর দুটো স্টেন। টি এন্ড টি ক্যাম্পের উত্তর-পূর্ব আর উত্তর-পশ্চিম দিকে দুটো যুৎসই জায়গা বেছে নিলাম। তারপর সেখান থেকে ক্যাম্প লক্ষ করে আমাদের এলএমজি আর স্টেনের একটা করে ম্যাগাজিন শেষ করলাম।

আমাদের গুলি বন্ধ হওয়ার সাথে ক্যাম্পে হৈ চৈ বেঁধে গেল। ওদের ধারণা হলো, ক্যাম্প বুঝি আক্রান্ত হয়েছে। তাই তারা এলোপাথাড়ি গোলাগুলি শুরু করে দিলো। আমরা হাঁটতে হাঁটতে শিবপুরের পথে রওনা দিলাম।

নরসিংদী থেকে আমরা যখন তিন-চার মাইল দূরে চলে এসেছি, তখনও ওদের গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

এর কয়েকদিন পরে আমরা ঘাসিরদিয়ার রাস্তায় অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন বসাই। এই কাজের দায়িত্বে ছিল হাবিবুর রহমান, রমিজউদ্দিন আহমেদ রোমো আর নাজিমুদ্দিন। ওরা খুব গোপনে সারা রাত ধরে মাইনটা বসায়। পরদিন সকালে ঐ মাইনের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় একটা আর্মির ট্রাক ধ্বংস হয় এবং ট্রাক ড্রাইভারসহ আটজন সৈন্য নিহত হয়। এই ঘটনার পর পরই আর্মি এসে আশেপাশের অনেক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং সাতজন গ্রামবাসীকে হত্যা করে।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে পাকিস্তানি বাহিনীর উপর একটা বড় ধরনের অ্যামবুশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। নরসিংদী থেকে শিবপুর আসার পথে পুটিয়া বাজারের এক মাইল উত্তরে শাসপুর চৌরাস্তা। ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর মান্নান খানের নেতৃত্বে একটা বড় দল চৌরাস্তার দুই প্রান্তে সারা রাত অবস্থান নিয়ে বসে থাকে। মান্নান খানের দলকে সাহায্য করার জন্য মজনু মৃধার

নেতৃত্বে আর একটা দল চন্দরদিয়া পুলের কাছে অবস্থান নেয়। এই দলের দায়িত্ব ছিল দুটো। প্রথমত মান্নান খানের দল বিপদে পড়লে পাকিস্তানি বাহিনীকে পেছন থেকে আক্রমণ করা। দ্বিতীয়ত যদি পাকিস্তানি বাহিনী আক্রান্ত হয়ে চন্দরদিয়া দিয়ে পালাতে থাকে তবে তাদেরকে সেখানে আক্রমণ করা।

পরিকল্পনা অনুযায়ী দু'দলই যার যার অবস্থানে সারা রাত বসে থাকে। কিন্তু সম্ভবত আমাদের এই অবস্থানের কথা পাকিস্তানি বাহিনী আগেই জেনে যায়। তারা শাসপুরের রাস্তায় না এসে ভোরবেলা হঠাৎ করে চন্দরদিয়ায় অবস্থানরত মজনু মৃধার দলকে পেছন থেকে আক্রমণ করে বসে।

এই অতর্কিত আক্রমণে প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও পরে মজনু মৃধা, আবদুল আলী মৃধা, আমজাদ, মানিক, ইদ্রিস, নজরুল ও অন্যান্যরা অসীম সাহসিকতার সাথে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ মোকাবেলা করতে থাকে। আমজাদের রাইফেলের গুলি একটা আর্মির ট্রাকের ড্রাইভারকে বিদ্ধ করে। ফলে নিয়ন্ত্রণহীন ট্রাকটা রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে এবং চারজন সৈন্য নিহত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মজনু মৃধার দলের উপর পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ তীব্রতর হতে থাকে।

এক সময় মজনু মৃধা তার দলকে পিছু হটতে নির্দেশ দেন। পিছু হটতে গিয়ে প্রথমেই গুলিবিদ্ধ হয় মানিক। তার একটু পরেই ইদ্রিসের মাথায় গুলি লাগে। মজনু মৃধার দল আক্রান্ত হয়েছে শুনে মান্নান খান তার দলবলসহ ছুটতে ছুটতে চন্দরদিয়ায় এসে পৌঁছায়। এ অবস্থা মজনু মৃধা তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেন এবং প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে এসএমজি দিয়ে গুলি করতে করতে আবার পাকিস্তানি বাহিনীর দিকে এগিয়ে যান। তাঁকে পেছন থেকে কভার দিতে থাকে মান্নান খান, আমজাদ আর আব্দুল আলী মৃধা।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনী ও আমাদের যোদ্ধারা রাস্তার এপারে আর ওপারে মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসে। পাকিস্তানি বাহিনী চিৎকার করতে থাকে, সবকো জিন্দা পাকড়ো। মজনুকো পাকড়ো। ইতিমধ্যে মজনু মৃধাসহ বেশ কয়েকজনের গুলি ফুরিয়ে যায়। তখন আমজাদ, নজরুল ও আব্দুল আলী মৃধা একটা দুটো গুলি ছুঁড়ে কভার দিতে থাকে। আর বাকিরা পিছিয়ে আসে। প্রায় শেষ পর্যায়ে আমজাদের পায়ে গুলি লাগে। আব্দুল আলী মৃধার সাহায্যে আমজাদ পালিয়ে আসতে পারলেও নজরুল পাকিস্তানি

বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। দূর থেকে আমরা দেখলাম নজরুলকে ট্রাকের উপর তোলা হচ্ছে। কিন্তু তখন আমাদের কিছুই করার ছিল না।

এই যুদ্ধে আমরা হারালাম আমাদের দুই সাহসী যোদ্ধা মানিক আর ইদ্রিসকে। নজরুল একটা রাইফেলসহ ধরা পড়েছে। পাকিস্তানি বাহিনীর সাতজন মারা গেলেও আমরা কোনো অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারিনি। আমাদের যোদ্ধারা অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করলেও সার্বিকভাবে আমাদের ব্যর্থতার পাল্লাই ভারি। এরকম পরিস্থিতিতে সবার মাঝেই হতাশা সৃষ্টি হতে পারে। যোদ্ধাদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য নতুনভাবে অ্যাকশনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

ভরতের কান্দি সেতু উড়াতে হবে। মজনু মৃধার নেতৃত্বে বারোজনের দল বাছাই করা হলো। দুটো এলএমজি, দুটো স্টেন, একটা এসএমজি আর বাকি সব রাইফেল। সাথে কয়েকটা হ্যান্ড গ্রেনেড ও বিস্ফোরকও রয়েছে।

সেতুটা পাকিস্তানি বাহিনী দিনরাত পাহারা দেয়। সেতুর দুই পাশেই বাংকার আছে। আমাদের পর্যবেক্ষক দল আগেই খবর দিয়েছে, সাধারণত ভোর ছটার দিকে গার্ডরা বাংকার থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটাহাঁটি করে। আমরা ঠিক করি, ঐ সময় সেতুর দুই দিক থেকে এক সাথে আক্রমণ করা হবে।

শেষ রাতের দিকে আমরা ছয়জন করে দুই দলে ভাগ হয়ে সেতুর দুই দিকে অবস্থান নিলাম। ভোরবেলা দেখা গেল মজনু মৃধা যেদিকে অবস্থান নিয়েছেন, সেদিকের গার্ডরা বাংকার থেকে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু আমাদের দিকের বাংকারের গার্ডরা তখনও বাংকারেই রয়ে গেছে। ফলে মজনু মৃধার দল আমাদের আগেই আক্রমণ শুরু করে দিলো। প্রথম আক্রমণেই চারজন ধরাশায়ী। কিন্তু আমাদের দিকের বাংকার থেকে প্রতিরোধ শুরু হলো। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট প্রচণ্ড গোলাগুলি চলে। আমরা কয়েকটা গ্রেনেডও ব্যবহার করি। শেষ পর্যন্ত গার্ডরা আর প্রতিরোধ না করে পালিয়ে যায়। ফেলে রেখে যায় ছয়টা মৃতদেহ। বাংকার থেকে আমরা তিনটা চাইনিজ রাইফেল ও চার বাক্স গুলি উদ্ধার করি। ফিরে আসার আগে আমরা বিস্ফোরকের সাহায্যে সেতুটা ধ্বংস করে দেই।

সেতু থেকে তিন-চারশ গজ দূরে রাস্তার ধারে একজন পাকিস্তানি সেনাকে আমরা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বন্দি করি। তার বাঁ পায়ের উরুতে আর ডান কাঁধে গুলি লেগেছে। প্রচুর রক্ত ঝরছে। বাঁচার আশা কম। তবু তাকে ধরাধরি করে

কাছের একটা স্কুলঘরে নিয়ে এলাম। ঘণ্টা দুয়েক বেঁচে ছিল। মরার আগে সে একটা পোস্ট কার্ড আমাদের হাতে দিয়ে বলল, আমি জানি আমি আর বেশিক্ষণ বাঁচব না। আমার একটা অনুরোধ, আমার বিবির কাছে লেখা এই চিঠিটা পোস্ট করে দিও। আমার বিবি জানুক, আমি বেঁচে আছি।

দশ

আমরা যখন শিবপুরের মাটিতে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে মরণপণ যুদ্ধ করে চলেছি, তখন ভারতের মাটিতে আমাদের বিরুদ্ধে শুরু হয় এক গভীর ষড়যন্ত্র। শিবপুরে বামপন্থীরা যে একটা শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলেছে, এটা অনেকেরই সহ্য হচ্ছিল না। আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলতে থাকে যে, আমরা নাকি সারা শিবপুরে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছি। আমরা নাকি বাংলাদেশ সরকার বিরোধী এবং আওয়ামী লীগের লোকজনকে সব শেষ করে দিয়েছি। বস্তুত এ সময়ে শিবপুরে বড় বা মাঝারি মাপের কোনো আওয়ামী লীগ নেতাই ছিল না। তাছাড়া রাজনৈতিক লাইন হিসেবে আওয়ামী লীগ নেতা বা কর্মী হত্যা করার মতো কোনো আত্মঘাতী পরিকল্পনা আমাদের ছিল না।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকেই বিএলএফ-এর একটা দল শিবপুরে আসে। মুক্তি বাহিনী বা এফএফ থেকে এরা ছিল একটু ভিন্ন। মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের ট্রেনিং দিতেন বাঙালি সেনা সদস্যরা। কিন্তু বিএলএফ-এর সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। বিএলএফ-এর এই দলের সাথে ভারি অস্ত্রশস্ত্রও ছিল। এই দলের গোপন উদ্দেশ্য ছিল মান্নান ভাইকে হত্যা করা। কিন্তু শিবপুরে এসে এবং আমাদের কার্যক্রম দেখে তারা বুঝতে পারেন যে মান্নান ভাইকে হত্যার কোনো রকম প্রচেষ্টা নিলে তারা কেউ আর শিবপুর থেকে ফিরে যেতে পারবেন না। তাদের নেতা মান্নান ভাইয়ের সাথে দেখা করেন এবং আমাদের সাথে যৌথভাবে কাজ করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আমরা তাদের এই প্রস্তাবে সম্মত হই না। আমরা বলি, তারা স্বাধীনভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করুক। আমাদের পক্ষ থেকে কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হবে না।

আলোচনার ভিত্তিতে বিএলএফ-এর দলটা যশোর বাজারের কাছে তাদের ক্যাম্প বসায়। আমরা আমাদের ক্যাম্প যশোর বাজার থেকে তুলে নেই।

এর দুই তিন দিন পরেই এক রাতে পাকিস্তানি কমান্ডো যশোর বাজার আক্রমণ করে। তাদের হাতে বিএলএফ-এর তিন সদস্য ধরা পড়ে। এই ঘটনার পর বিএলএফ-এর দলটা তাদের ক্যাম্প গুটিয়ে রায়পুরার ভিতরের দিকে চলে যায়।

শিবপুরের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলতেই থাকে। এই অপপ্রচার ও রাজনৈতিক চাপের ফলে তিন নম্বর সেক্টর থেকে নির্দেশ আসে, শিবপুর থানা কমান্ডার মান্নান খান যেন তার দলবল ও অস্ত্রশস্ত্রসহ মেজর কে এম সফিউল্লাহর কাছে উপস্থিত হন।

এই নির্দেশ পালন করা হবে কি হবে না, এ নিয়ে আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, মান্নান খান একাই আগরতলা যাবেন এবং পুরো অবস্থা বুঝানোর চেষ্টা করবেন। এ সিদ্ধান্ত মান্নান খানের জন্য যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কারণ ওখানে পৌঁছানো মাত্র মান্নান খানকে গ্রেফতার ও হত্যা করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মান্নান খান অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সব কিছুর মোকাবেলা করেন।

অক্টোবরের প্রথম দিকে মান্নান খান আগরতলা পৌঁছান। প্রথমেই দেখা করেন ব্যারিস্টার মনসুরের সাথে। তিনি শিবপুরের ঘটনা বিস্তারিত শুনে মান্নান খানকে সঙ্গে করে তিন নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর কে এম সফিউল্লাহর কাছে হাজামারা ক্যাম্পে যান। মান্নান খানকে প্রথমেই দেরি করে আসার জন্য ও দলবল না নিয়ে আসার জন্য অভিযুক্ত করা হয়।

মান্নান খান খুব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, শিবপুর থেকে যুদ্ধরত সহযোদ্ধাদের আগরতলায় নিয়ে আসার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ শিবপুর ছেড়ে চলে আসার অর্থই হচ্ছে একটা বিশাল এলাকা পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া আর শিবপুরের দায়িত্ব অন্যান্য গ্রুপ কমান্ডারের কাছে ভালো মতো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই মান্নান খানের আসতে দেরি হয়েছে।

পরে মান্নান খান চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, শিবপুরে আমাদের হাতে যদি একজনও আওয়ামী লীগ নেতা বা কর্মী খুন হয়ে থাকে, তবে তার সব দায়িত্ব আমি নেবো। আমার কোর্ট মার্শাল করুন। শিবপুরে পাঁচজন ডাকাতকে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতারা শিবপুরে গিয়ে যদি প্রকাশ্যে বলতে পারেন যে, ঐ পাঁচ জনের একজনও আওয়ামী লীগের সদস্য, তাহলেও আমি আপনাদের শাস্তি মাথা পেতে নেবো।

এরপর মান্নান খান শিবপুরে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলো হয়েছে তার রিপোর্ট পেশ করেন। এ অবস্থায় মান্নান খানকে ক্যাম্পে আটকে রেখে গোপনে একটা সামরিক তদন্ত টিম শিবপুরে পাঠানো হয়। এই তদন্ত টিম শিবপুরে এসে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে যে রিপোর্ট পেশ করে, তাতে প্রমাণিত হয় যে, শিবপুরের বিরুদ্ধে যা প্রচার করা হচ্ছিল তা সবই চক্রান্তমূলক। তখন মান্নান খানকে শিবপুরে ফিরে গিয়ে আবার আগের মতো কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রায় পনেরো দিন পর মান্নান খান আবার শিবপুরে ফিরে আসেন।

এই সময়ই প্রায় অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা ঘটে। সেদিন সম্ভবত ২১ অক্টোবর। ঈদের আগের দিন। হঠাৎ দেখি নজরুল ফিরে এসেছে। সে চন্দরদিয়ার যুদ্ধে অস্ত্রসহ ধরা পড়েছিল। ওর আশা তো আমরা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

নজরুল ধরা পড়ার পর পাকিস্তানি বাহিনীর এক সদস্য তাকে রাইফেলের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করে। তারপর টেনে হিঁচড়ে তাকে ট্রাকে তোলা হয়। ট্রাকের মধ্যেই ও জ্ঞান হারায়।

নজরুলের জ্ঞান ফিরে আসে নরসিংদী হাসপাতালে। চার-পাঁচ দিন হাসপাতালে থাকার পর ওকে নিয়ে আসা হয় নরসিংদীর টিএন্ডটি-তে অবস্থিত আর্মি ক্যাম্পে। সেখানে আরো আটজন ছেলের সাথে তাকে একটা ছোটো ঘরে আটকিয়ে রাখা হয়।

বন্দি অবস্থায় ওদেরকে সারা দিনে একবার খাবার দেওয়া হতো–দুটো রুটি আর ডাল। তাছাড়া দিনের মধ্যে চার পাঁচবার চলতো ধোলাই। অফিসার বা সাধারণ সৈন্য যেই আসত, সেই ইচ্ছা মতো সবাইকে ঘুষি, লাথি আর লাঠির বাড়ি মেরে হাসতে হাসতে চলে যেত। একটু দূরে আরেকটা ঘরে কয়েকজন অল্প বয়সী মহিলা বন্দি ছিল। রাতের বেলা এই সব মহিলাদের আর্তচিৎকার আর সৈন্যদের পৈশাচিক হাসি ও উল্লাস শোনা যেত।

ক্যাম্পে যারা আটক ছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র নজরুলই যুদ্ধরত অবস্থায় ধরা পড়েছিল। তাই নজরুলের উপর ক্যাম্পকর্তাদের আক্রোশটা একটু বেশি ছিল। ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিল এক ক্যাপ্টেন। জাতে পাঠান। সে প্রায়ই নজরুলকে আলাদা ভাবে ডেকে এনে অমানুষিক নির্যাতন করত।

ক্যাম্পে আসার চতুর্থ দিনে বিকেলবেলা সব কয়জন বন্দিকে পেছনের মাঠে দাঁড় করানো হয়। তারপর ওদের মধ্যে থেকে তিনজনকে গুলি করে মারা

হয়। নজরুল সে যাত্রা রক্ষা পায়। পরের দিন সকালে ওদের ঘরে আরো পাঁচজন নতুন বন্দি ঢোকানো হয়। এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা খুবই কাহিল। সেদিন বিকেলেই আবার সব বন্দিদের মাঠে দাঁড় করিয়ে তিনজনকে গুলি করা হয়। এ যাত্রাও নজরুল রক্ষা পায়। এভাবে নজরুল তৃতীয় বারও মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসে।

২১ অক্টোবর সকালে ক্যাপ্টেন তার ঘরে নজরুলকে ডেকে পাঠায়। নজরুল দেখে ক্যাপ্টেন বিছানায় শুয়ে আছে। চেহারায় কেমন একটা বিষণ্ন ভাব। ক্যাপ্টেন নজরুলকে বসতে বলে। সে তো অবাক। যে ক্যাপ্টেন প্রায় প্রত্যেক দিনই তার উপর নির্যাতন চালিয়েছে, অশ্রাব্য গালি ছাড়া কথা বলেনি, সে তাকে বসতে বলছে!

ক্যাপ্টেন নজরুলের কাছে জানতে চায়, বাড়িতে কে কে আছে। মার কথা মনে আসতেই নজরুলের বুকটা হু-হু করে ওঠে। মার কথা বলতে গিয়ে নজরুলের গলা ধরে আসে।

ক্যাপ্টেন জানায় যে তারও মার কথা খুব মনে পড়ছে। প্রত্যেক বছর সে তার মার সাথে ঈদ করে। এবার আর মার সাথে ঈদ করা হবে না। সে জানে না মার কাছে আর কোনোদিন ফিরে যেতে পারবে কি না।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ক্যাপ্টেন নজরুলকে বলে, তুমি এখনই এই ক্যাম্প থেকে চলে যাও। দেরি করো না। আমার মত আবার পাল্টে যেতে পারে।

নভেম্বরের প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর তেজ কমে আসছে। তাদের হাবভাব দেখেও মনে হচ্ছিল, তারা আমাদের আক্রমণ করার চেয়ে নিজেদের ক্যাম্প গুটানোর দিকেই বেশি ব্যস্ত।

কুমড়োদি এতিমখানায় মিলিশিয়া ও রাজাকারদের একটা মাঝারি ধরনের ক্যাম্প ছিল। ওটা মূলত সৈন্যদের রসদ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের একটা গুদাম ছিল। ওখান থেকে বিভিন্ন ক্যাম্পে রসদ ও জিনিসপত্র সরবরাহ করা হতো। একদিন রাজাকার বাহিনীর এক সদস্য এসে আমাদেরকে জানায় যে, ওখান থেকে সব মিলিশিয়াদের নরসিংদী ক্যাম্পে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ক্যাম্পে শুধু বাঙালিরাই থাকবে। আমরা যদি শুধু বাইরে থেকে কিছু গোলাগুলি করি, তবে ওরা সবাই ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাবে। তখন আমরা ক্যাম্পের সব রসদপত্র দখল করতে পারবো।

প্রথমে আমাদের সন্দেহ হয়েছিল, এটা কোনো ফাঁদ কি না। পরে ঐ

এলাকার আমাদের বিশ্বস্ত লোকজনের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারি সত্যিই মিলিশিয়ারা ঐ ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মিলিশিয়ারা যেদিন ক্যাম্প ত্যাগ করে, সেই রাতেই আমাদের একটা দল ক্যাম্পে চড়াও হয়। তিন-চার রাউন্ড গুলি করার পরই রাজাকাররা সব ক্যাম্প ছেড়ে চলে যায়। আমরা ক্যাম্পটা দখল করি।

নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ফটিক মাস্টার ভারত থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত একটা দল নিয়ে যশোর বাজারে এসে পৌঁছান এবং ঐ এলাকায় একটা ক্যাম্প বসান। ফটিক মাস্টারের সাথে আগে থেকেই মান্নান ভাইয়ের যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। তিনি মান্নান ভাইয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। যুদ্ধের একদম শেষ পর্যায়ে আসা এই দলটা কয়েকটা অপারেশন করে।

এগারো

নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে আসছে। পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল ভেঙে গেছে। এই সুযোগে আমরা পাকিস্তানি বাহিনীর উপর বার বার আক্রমণ চালাতে থাকি। আক্রমণগুলো ছিল স্বল্পস্থায়ী এবং আচমকা। এইভাবে পাকিস্তানি বাহিনীকে আমরা বেশ ব্যতিব্যস্ত রাখতে সক্ষম হই। এই সময় তারা মানসিকভাবে আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। আগে কোনো জায়গায় আক্রান্ত হলে পাকিস্তানি বাহিনী পরে ফিরে এসে ঐসব জায়গায় গ্রামবাসীদের উপর নির্যাতন চালাতো। কিন্তু এখন দেখা গেল, তারা কোন রকমে আত্মরক্ষা করে পালিয়ে যাচ্ছে।

আমরা সিদ্ধান্ত নেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, শিবপুরকে মুক্ত করতে হবে। আমরা তাই আমাদের আক্রমণ তীব্রতর করতে থাকি। পর পর তিন রাত আমরা খুব কাছ থেকে শিবপুর ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালাই। এই আক্রমণের ফলে চারজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এর দু'দিন পর সকালে পাকিস্তানি বাহিনী শিবপুর থেকে তাদের ক্যাম্প গুটিয়ে নরসিংদী চলে যায়। সেদিন ছিল এক স্মরণীয় দিন। গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক এসে জমা হতে লাগলো শিবপুরে। জনতার সে কি বিজয় উল্লাস। এক বিশাল বিজয় মিছিল নিয়ে আমরা শিবপুর থানায় বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিলাম। শিবপুর মুক্ত হলো।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। সবার মাঝেই চরম উত্তেজনা। সন্ধ্যার পর সবাই মিলে রেডিওর চারদিকে বসে খবর শুনি। স্বাধীন বাংলা বেতার, আকাশবাণী, বিবিসি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধরি।

৪ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে এগিয়ে আসার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইন্দিরা গান্ধীও ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা দেন। ভারতের পূর্ব আর পশ্চিম উভয় প্রান্তেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ৫ ডিসেম্বর সকাল থেকেই শিবপুরের আকাশ দিয়ে ভারতীয় বিমান উড়তে দেখলাম। জঙ্গি বিমানগুলো খুব নিচু দিয়ে উড়ছিল। রাতের খবরে শুনলাম, কুর্মিটোলা বিমানক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। রানওয়েতে পঁচিশ ফুট ব্যাসের গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর শক্তি পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দিলেন।

সে রাতেই আমরা অনেকে বসে সিদ্ধান্ত নিলাম, এবার নরসিংদী মুক্ত করতে হবে। নেভাল সিরাজের সাথে আলোচনা হলো। আমরা নরসিংদীর উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করব। আর নেভাল সিরাজ তাঁর বাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালাবেন দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে। আমরা যৌথভাবে এই আক্রমণ চালাতে থাকি। আমাদের উপর্যুপরি আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় খবর পাওয়া যাচ্ছিল সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপাসাগরের দিকে এগিয়ে আসছে। আমেরিকা কি তাহলে পাকিস্তানের পক্ষে সরাসরি অবস্থান নিচ্ছে? যুদ্ধ কি তাহলে আরো দীর্ঘায়িত হবে? বাংলাদেশ কি ভিয়েতনাম হতে চলেছে? হলে মন্দ হয় না। দীর্ঘায়িত যুদ্ধে দেশের মধ্যে আমাদের ঘাঁটিগুলো আরো পোক্ত হবে।

৮ ডিসেম্বর খবরে শুনলাম সিলেট ও যশোর শহর হানাদার মুক্ত হয়েছে। ৯ ডিসেম্বরের খবর, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে হানাদার বাহিনী পালিয়ে গেছে।

১১ ডিসেম্বর আমরা নরসিংদীর টিএন্ডটি ক্যাম্প আক্রমণ করি। মজনু মৃধা, মান্নান খান, ঝিনুক, সেন্টু, আব্দুল আলী মৃধা, আওলাদ, সাউদ, ইকবালসহ আমরা প্রায় ত্রিশজন এই আক্রমণে অংশ নেই। কিন্তু ক্যাম্পের বাংকার থেকে ভারি মেশিনগানের গুলি বিরতিহীনভাবে বর্ষণ হতে থাকে। ফলে আমরা ক্যাম্পের কাছাকাছি যেতে ব্যর্থ হই। দূর থেকেই আমরা কিছু গ্রেনেড

ছুঁড়লেও তা বিশেষ কার্যকর হয় না।

পরের দিন আবার নতুনভাবে আক্রমণ চালাই।

একই সাথে আমরা মাইকে ঘোষণা দিতে থাকি, ক্যাম্পের সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করলে তাদের মারা হবে না। কিন্তু সেদিনও ক্যাম্প দখল করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ১৩ তারিখ আমরা প্রস্তুত হওয়ার আগেই খুব ভোরে পাকিস্তানি বাহিনী ক্যাম্প ছেড়ে ঢাকার দিকে পালিয়ে যায়। পথে পাঁচদোনায় নেভাল সিরাজ তাঁর দলবল নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ সময় একুশজন পাকিস্তানি সৈন্যকে নেভাল সিরাজের দল অস্ত্রসহ ধরে ফেলে। বাকিরা ঢাকার দিকে চলে যায়।

আমরা যখন নরসিংদী মুক্ত করি, ভারতীয় বাহিনী তখন নরসিংদী থেকে অনেক দূরে। মাত্র ভৈরব পর্যন্ত পৌঁছেছে। টিএন্ডটি ক্যাম্প দখল করে সেখানে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি। ক্যাম্প দখলের পর ভিতরে ঢুকে অস্ত্রের সম্ভার দেখে আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। ঘর বোঝাই হাল্কা ও ভারি মেশিনগান। থরে থরে সাজানো রকেট লাঞ্চার আর দুই ইঞ্চি মর্টার। অফুরন্ত গোলাগুলি আর গ্রেনেড। এত অস্ত্র আজ আমাদের হস্তগত। অথচ পুরো যুদ্ধের সময় অস্ত্রের কত অভাবই না আমরা বোধ করেছি।

কিন্তু এই অস্ত্র আমরা আমাদের দখলে রাখতে পারলাম না। কারণ অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা হেলিকপ্টার নামল। তাতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসার ও সৈনিক। তাঁরা আমাদের নরসিংদী মুক্ত করার জন্য ধন্যবাদ জানালেন এবং ঐ ক্যাম্পের দায়িত্ব তাঁদের হাতে ছেড়ে দিতে বললেন। আমরা দখল করা অস্ত্রসম্ভার ভারতীয় বাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে মনটা খারাপ করেই শিবপুর ফিরে এলাম।

’৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বামপন্থীদের ভূমিকা

অধ্যাপক আবদুস সাত্তার

[বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব প্রদান করলেও বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে তাদের এই ভূমিকাকে অস্বীকার করার একটি অশুভ তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এই প্রেক্ষিতে আমি মুক্তিযুদ্ধে বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের আঞ্চলিক বামপন্থীদের ভূমিকার একটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্যপট তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।]

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পরে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা জেনারেল ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ’৭১-এর ২৫মার্চ রাতে ঢাকা মহানগরীতে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা সংগঠিত করে। এ হত্যাকণ্ডের প্রতিবাদে ঢাকার পিলখানার ইপিআর সদর দপ্তর, রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মচারী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ছাত্র-যুবক, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ঢাকার নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষ ঐ রাত থেকেই ঢাকা ছাড়তে বাধ্য হন। জীবন বাঁচানো ও নিরাপত্তার জন্য গ্রামে চলে যান। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি জেলায় ঐ সময় থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ২৬শে মার্চ রাতে পাক বাহিনী শেখ মুজিবুর রহমানকে ৩২ নং ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেফতার করে।

বরিশাল শহর ও বরিশালের প্রত্যেকটি থানায় একই ভাবে যুবক, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ সেনা, পুলিশ, আনসার বাহিনীর সদস্যরাও স্বশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য সকল রকম রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন। আওয়ামী লীগের জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে আব্দুল মালেক খান, নুরুল ইসলাম মঞ্জু, এ্যাডভোকেট হেমায়েত উদ্দিন আহম্মেদ ও জালাল আহম্মেদ সরদার-এর নেতৃত্বে বরিশাল শহরে সরকারি বালিকা

উচ্চ বিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি অস্থায়ী সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উজিরপুর থানায় নিজ বাড়ীতে ছুটিতে অবস্থানরত পাকিস্তান সেনাবহিনীর তরুণ মেজর এম এ জলিল এই তৎপরতার সাথে যুক্ত হন। তার পরিচালনায় বরিশাল শহর, পার্শ্ববর্তী থানায় অবস্থানরত সেনা, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, ও ছাত্র যুবকরা সংগঠিত হন। প্রায় ১০০০ সদস্যকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার কার্যক্রম চলতে থাকে বরিশাল বঙ্গবন্ধু উদ্যানে (বেল্‌স পার্কে)।

অন্যদিকে কাজী জাফর আহমেদ, হায়দার আকবর খান রনো ও রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে পরিচালিত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটি, ন্যাপ ভাসানী ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন জেলা নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এই তৎপরতায় যুক্ত থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন ন্যাপ (ভাসানী) বরিশাল জেলার সভাপতি নুরুল ইসলাম খান (এন আই খান) সহ-সভাপতি, সুনীল গুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট সিদ্দিক হোসেন ও জেলা কমিটির সদস্য সামসুদ্দিন মানিক, ভাষা সেনিক আবুল হাশেম, ভাষা সৈনিক আব্দুল মোতালেব, কেরামত আলী সরদার, এ্যাডভোকেট শাহ আলম, সৈয়দ সালেহ আহমেদ এবং সমন্বয় কমিটির নেতা স্বপন আইস সরকার, ইকবাল হোসেন ফোরকান, মহিউদ্দিন মধু, শাহআলম (ছাত্রনেতা) মুজিবুর রহমান চাঁন, খোন্দকার আনোয়ার হোসেন। পরবর্তীতে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সমন্বয় কমিটির সদস্য ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই তৎপরতার সাথে যুক্ত হন। ২৫ এপ্রিল ’৭১ পর্যন্ত বরিশালে চরম উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। ঐ দিন দুপুরে পাকিস্তান বিমান বাহিনী দু’বার বরিশালে এলোপাথারি গুলি বর্ষণ করে। নদীপথে ঢাকা থেকে পাক হানাদার বাহিনী বরিশালের দিকে অগ্রসর হয়। বরিশালের অতি নিকটে জুনাহারে দুটি স্টীমার দিয়ে নদী পথে মেজর জলিলের নেতৃত্বে বাঁধা সৃষ্টি করা হলেও পাক বাহিনী গানবোট থেকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে জাহাজ দুটি ডুবিয়ে দেয় তারা। হেলিকপ্টার থেকে বরিশাল শহরে দ্রুত ছত্রীসেনা অবতরণ করায়। পাক সেনারা বরিশাল শহরে উত্তর প্রান্তে চরবাড়িয়া ইউনিয়েনের তালতলী, কাগাশুরা গ্রামে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৩০/৩৫জন নিরীহ মানুষকে নির্মম ভাবে হত্যা করে। প্রায় ২০০ লোককে আহত করে। মেজর জলিল ও

তার বাহিনী প্রতিরোধ যুদ্ধে টিকতে না পেরে বরিশাল থেকে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পরে শুনতে পেলাম ঐ বাহিনীর সদস্যসহ মেজর জলিল ভারতের পশ্চিম বাংলায় চলে গেছেন।

আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ, যুবক, ছাত্র ও সাংস্কৃতিক কর্মীরাও ভারতে চলে যাচ্ছেন। পাকিস্তানের সেনা সদস্যরা বরিশাল এসে মুসলীম লীগ, জামায়েত ইসলাম, নেজামে ইসলাম, কৃষক শ্রমিক পার্টি, ছাত্রসংঘ ও অন্যান্য ইসলামী ও পাকিস্তানপন্থী দলের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে জেলা, মহাকুমা ও থানা পর্যায়ে শান্তিকমিটি গঠন করে। তাদের পরিচালনায় রাজাকার, আলবদর, আলসামস্ বাহিনী প্রতিদিনই আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী ও মোজাফ্ফার), কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিসট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলায় সমন্বয় কমিটি, ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ও শিক্ষকদের গ্রেফতারের চেষ্টা চালায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘর, ব্যবসাকেন্দ্র, দোকান-পাটে, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ সহ তাদের গ্রেফতার, হত্যা, নারীদের উপর পাশবিক নির্যাতন করে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবুর রহমান কাঞ্চন মিয়াকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়ে বাসা থেকে তার বড় ছেলে সম্ভবত ৪র্থ শ্রেণির ছাত্রকে ধরে নিয়ে যায়। ঐ ছেলেকে বাঁচাতে মুজিবুর রহমান সেনা কর্মকর্তাদের কাছে আত্মসমার্পন করলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ মর্মান্তিক ঘটনায় বরিশালের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয় ও শোকের ছায়া নেমে আসে। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির ও (ন্যাপ ভাসানী) সহ অন্যান্য বাম সংগঠনের নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনীর সদস্যরা বরিশাল শহর ত্যাগ করে উজিরপুর ও বানারীপাড়ার বলহার ও খলিশা কোটায় ঘাঁটি স্থাপন করে। সেখানে আব্দুস শহীদ ও খোন্দকার আনোয়ার হোসেন বাহিনীর সদস্যদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে। এ বাহিনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তারা গ্রামের ভূমিহীন, গরীব ও বর্গা কৃষকসহ নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। তারা উজিরপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, চাখার ও বলহার এলাকায় শান্তি কমিটি ও পাক সেনাদের সমর্থনপুষ্ট দলের হামলা মোকাবেলা করেছেন। এর এক পর্যায়ে ইকবাল

হোসেন ফোরকানের নেতৃত্বে বাবুগঞ্জের রহমতপুর এলাকায় রাজাকারদের সংঘর্ষে ইকবাল হোসেন ফোরকান মারাত্বক ভাবে আহত হন। '৭১ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সমন্বয় কমিটির নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও শাহ আলম, মহিউদ্দিন মধু আমাদের গ্রাম কর্ণকাঠী এসে আমার সাথে যোগাযোগ করেন।

আমরা চার জন আলোচনা করে আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের একটি বাহিনী গড়ে তোলার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। প্রসঙ্গত আমি '৭১ সালে নাজিরপুরের মাটিভাংগা কলেজে অধ্যপনা শুরু করেছি। এ ছাড়া ছাত্রজীবন থেকেই ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এর একজন সমর্থক হিসাবে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। আমাদের এলাকায় আমার গ্রহণযোগ্যতা ও কৃষক ক্ষেতমজুর সহ গরীব মানুষের সুসম্পর্ক ছিল। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে আমাকে আমাদের এলাকায় বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মে মাসের ১০ তারিখ এলাকায় অবস্থানরত সেনা ইপিআর ও আনসার সদস্যদের নিয়ে সভা করি। এ সময়ে ৩০/৩৫জন সদস্য উপস্থিত ছিল। আমাদের অঞ্চলে এ ধরনের তৎপরতার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অনেকেই উম্মুখ হয়েছিল। কেননা ছুটিরত এ সকল সদস্যদের ছুটি বাতিল করে চাকরিতে যোগদানের জন্য পাক সরকার নির্দেশ দিয়েছিল। ঐ সময় আমাকে বাহিনীর প্রধান পরিচালক, নলছিটি থানার দপদপিয়া গ্রামের আব্দুল মান্নান হাওলাদারকে (সেনা সদস্য) ফিল্ড কমান্ডার, মহিউদ্দিন মধু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম (আলেকান্দা) ও শাহ আলমকে রাজনৈতিক প্রশিক্ষক করা হয়। আমাদের বাহিনীর সাথে মেজর এম এ জলিলের নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনীর বেশ কিছু সদস্য যোগ দেন। তার মধ্যে মেজর জলিলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ক্যাপ্টেন মাহফুজ বেগের সহযোগী পরিমল চন্দ্র দাসের (বাউফল) এর সহযোগিতা নিয়ে ঝালকাঠীর বাউকাঠী থেকে ২২টি রাইফেল ও প্রায় ২০০০ গুলি অতি গোপনে সংগ্রহ করে নৌকাযোগে আমাদের গ্রামে নিয়ে আসে। খুব সহজেই এই অস্ত্র পাওয়ায়, আমাদের বাহিনীর সদস্যদের মনোবল ও শক্তি সাহস বেড়ে যায়। এ ছাড়া আব্দুল মান্নান ও তার সাথে আগত মেজর জলিল কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোদ্ধারা বেশ কিছু অস্ত্র নিয়ে যোগ দেন। আমাদের অঞ্চলের বেশ কিছু লোকের নিকট থেকে ব্যক্তিগত বন্দুক সংগ্রহ করি।

আমাদের এই তৎপরতার সাথে যুক্ত হন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য নলছিটি থানার দেওপাশা গ্রামের মুজিবুর রহমান খান বাদশা, মহিউদ্দিন খান বাচ্চু ও সহিদুল ইসলাম চান আরও কয়েকজন সদস্য। আমরা লক্ষ করলাম যে, জেলার কোথাও আওয়ামী লীগ সহ অঙ্গ-সংগঠনের অধিকাংশ নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মী এলাকায় নেই। তারা অধিকাংশই দেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেছেন। অথচ বিভিন্ন থানায় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে মুক্তি বাহিনী গড়ে উঠেছে।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোঃ)-এর কেন্দ্রীয় সাবেক এমপি সৈয়দ আশ্রাফ হোসেন জেলার নেতা এ্যাড. মুজিবুর রহমান তালুকদারের সাথে আমাদের বাহিনীর পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে মহিউদ্দিন মধু, শাহআলম ও আমি বাকেরগঞ্জ বাদল পাড়ায় বৈঠকে মিলিত হই। তারা আমাদের জানালেন যে পৃথকভাবে বামদের নেতৃত্বে কোন বাহিনী গঠন করা ঠিক হবে না। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার পক্ষেই তারা অবস্থান নিয়েছেন। যা হোক '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তারা দেশের মাটিতে থেকেই যুদ্ধের সাথে যুক্ত ছিলেন। বরিশাল জেলার মধ্যে ঝালকাঠী মহকুমায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন অতি মাত্রায় বেড়ে যায়। হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করা সহ নারীদের উপর পাশবিক নির্যাতনের সংবাদ আমাদেরকে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এ সংকটজনক পরিস্থিতিতে আমাদের বাহিনীর পরিচালনা কমিটি ঝালকাঠী মহকুমার নলছিটি থানা আক্রমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নলছিটি থানার অবস্থান, থানায় পুলিশের সংখ্যা, তাদের যন্ত্রপাতি ও সেনা সদস্যদের অবস্থান, তাদের গতিবিধি, রাজাকার ও শান্তি কমিটির ভূমিকাসহ যাতায়াতের পথ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করেন। মুজিবুর রহমান খান বাদশা ও মহিউদ্দিন খান বাচ্চু। এ ছাড়া আমি নলছিটি থানা সংলগ্ন গ্রামে আমার বন্ধু ও আত্মীয় নলছিটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খোন্দকার আনিসুর রহমান ফারুকের বাড়ি গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাদের সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

আমাদের বাহিনীর মূল অংশ ২৫ মে ১৯৭১-এ আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে রাত ৯ টার সময় থানার কাছে দেওপাশা গ্রামে মহিউদ্দিন খান বাচ্চুর বাড়িতে অবস্থান নেন। বাহিনীর আরেক অংশ সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মফিজুর রহমান মফিজের নেতৃত্বে নলছিটির চাচৈর ও প্রেমাহর এলাকা থেকে এসে

মূল বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়। ৩০ জনের একটি সংগঠিত বাহিনী আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে বা কমান্ডে গত ১টায় নলছিটি থানা আক্রমণ করে এবং রাত ৪টা পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই হয়। ঐ যুদ্ধে আমাদের বাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য নলছিটি থানার নবগ্রাম ইউনিয়নের বাড়ৈয়ারা গ্রামের মোঃ ইউনুস হাওলাদার শহীদ হন। এ ছাড়া ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য কর্ণকাঠী গ্রামের সাহসী যুবক আবুয়াল হোসেন হাওলাদার ডান বাহুতে গুরুতর ভাবে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার পথে থানা সংলগ্ন মসজিদের ইমাম ও শান্তি কমিটির সদস্য তাকে ধরে ফেলে এবং থানায় নিয়ে যায়।

পাক সেনারা তার উপর নির্মম নির্যাতন চালায়। তারা নিকট থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে কোন তথ্য বের করতে না পেরে নদীর ঘাটে দাঁড় করিয়ে গুলি করে নদীতে ফেলে দেয়। অসম সাহসী দৃঢ়চেতা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আবুয়াল হোসেনের নিকট থেকে কোন তথ্য পাক সেনারা উদ্ধার করতে না পারায় আমরা শত্রু পক্ষের দ্বারা ঐ সময়ে আক্রান্ত হয়নি। এ যুদ্ধে বরিশাল হাসপাতাল রোডের বাসিন্দা ফেরদৌস আলম আহত হয়েছিলেন। আবুয়াল হোসেনের মা ছেলের মৃত্যু সংবাদে এক পর্যায়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। অথচ ঐ সময় তাকে শান্তনা দেয়ার মত অবস্থায় আমরা ছিলাম না। আবুয়াল ও ইউনুসের মৃত্যুতে আমাদের বাহিনীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আমরা তাদের জন্য গর্ববোধ করি। তাদের মতো অগনিত মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়েই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তারা আমাদের সকলের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আমরা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম মারফত জানতে পারি যে ১০এপ্রিল ১৯৭১ ভারতের সহযোগিতা ও পরামর্শে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এককভাবে অস্থায়ী সরকার গঠন করে। ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ায় মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় অস্থায়ী সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী পদে তাজউদ্দিন আহমেদ এবং মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে কর্ণেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীকে নিয়োগ দেয়া হয়। বৈদ্যনাথ তলার নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। বাংলাদেশ ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। বরিশাল, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা, ভোলা, খুলনা ও ফরিদপুরের একাংশ নিয়ে ৯ম সেক্টর গঠন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দকে সরকার গঠনে অংশীদার না করায় দেশের অভ্যন্তরে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া জন্ম দেয়। এ ছাড়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল যে, ভারতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষেত্রে বামপন্থীদের কোন সুযোগ নেই। এর মধ্যে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ ও ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বহুলাংশে স্পষ্ট হয়ে গেছে। দেশের ভিতরে আমরা কোন পথে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখবো তা নিয়েও আমাদের মধ্যে প্রশ্ন ছিল। নলছিটি থানা অপারেশনের কয়েকদিন পর সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাবুগঞ্জ সহ অন্যান্য থানায় যোগাযোগ ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য কর্ণকাঠী থেকে বাবুগঞ্জ যান। সেখানে তিনি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। যশোর আর্মি ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে তার উপর পৈশাচিক ও নির্মম অত্যাচার করা হয়। নভেম্বর-অক্টোবর মাসে তাকে ছেড়ে দেয়া হলেও নভেম্বরে আলবদর বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। বরিশালের ওয়াপদা কার্যালয়ে সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সারা দেহ রক্তাক্ত করে হাত-পা বেঁধে কীর্তনখোলা নদীতে ফেলে দেয়। পরের দিন ভোরবেলা চরআইছা খেয়াঘাট থেকে নৌকার মাঝিরা তাকে উদ্ধার করলে তিনি কেবল পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। তার শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যায়নি। আমাদের বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সেকান্দার আলী খান, ইয়াকুব আলী শরীফ, আলী আহম্মেদ খান, আব্দুস সালাম মল্লিক, আব্দুস সালাম সরদার ও আবদুর রহমান (সিংহেরকাঠী), আমার চাচাতো ভাই প্রয়াত আব্দুল জব্বার, বেলায়েত হোসেন খান, আলমগীর হোসেন হাওলাদার, আব্দুস ছাত্তার হাওলাদার, আবদুল আজিজ মাঝি, আপ্তার আলী হাওলাদার (নৌকা মাঝি), মোক্তার আলী, (নৌকা মাঝি), আব্দুল লতিফ মুনসী, আব্দুর রাজ্জাক মুনসী, হোসেন আলী সিকদার ও শামসুল আলম খান (চরকরমজী) আব্দুল জব্বার মৃধা, আব্দুল মালেক খান, গোলাম মাওলা ফারুকী, আবুল বাশার পরবর্তীতে (সেনা বাহিনীর লেঃ কর্ণেল) আব্দুল ওয়াহেদ হাওলাদার, হেমায়েত উদ্দিন, মোল্লা, আবুল হোসেন তালুকদার, মানিক তালুকদার, হাবিবুর রহমান (চরআইচা) সিরাজুল হক মুনসী, সুলতান আলম বকস্, সুলতান আহমেদ খান, আব্দুস ছাত্তার, (পরবর্তীতে পুলিশ হিসেবে কর্মরত), মোঃ সেলিম খোন্দকার, (দপদপিয়া) আইউব আলী (হরিণাফুলিয়া) চরাদী এলাকার আবদুর রশিদ হাওলাদার,

মোজাম্মেল হোসেন খান, শ্যামল চন্দ্র বিশ্বাস, আব্দুল লতিফ মোল্লা প্রমুখ অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা, ও সাহস নিয়ে যুদ্ধে ভূমিকা রেখেছেন।

নলছিটি থানা অপারেশনের পরে আমরা খবর পেলাম যে নবম সেক্টরের কমান্ডার এম এ জলিলের নির্দেশে বরিশাল ও পটুয়াখালীর সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর বরিশাল জেলার উজিরপুরের বড়াকোঠা ইউনিয়নের দরগা বাড়িতে ঘাঁটি স্থাপন করেন। তিনি সকল থানার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের তার সাথে দেখা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তার সাথে দেখা করার বিষয়ে আমাদের বাহিনীর পরিচালকেদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয়। আমি সহ সমন্বয় কমিটির সদস্যরা নির্দেশ মেনে যুদ্ধ করার বিষয়ে প্রথমে একমত হতে পারিনি। কমান্ডার আব্দুল মান্নান হাওলাদার তার এলাকার সদস্যদের নিয়ে ক্যাপ্টেন ওমরের সাথে দেখা করে বরিশাল সদরের বেইজ কমান্ডার হয়ে এলাকায় ফিরে আসেন। তিনি আমাদের এলাকা সহ থানার বিভিন্ন এলাকায় তৎপরতা চালাতে থাকেন। এর এক পর্যায়ে আমাদের বাহিনীর পক্ষ থেকে আমি ও রূপাতলী এলাকার বাসিন্দা সেনা সদস্য আব্দুল হক খানকে নিয়ে স্বরুপকাঠী বিন্না ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন ওমরের সাথে সাক্ষাৎ করি। ঐ সময় তিনি নৌকায় অবস্থান করতেন। বলা হয়ে থাকে, ধান-নদী, খাল এই তিন মিলে বরিশাল। তাই বরিশালের মুক্তিযোদ্ধারা এই পানিপথই বেশী ব্যবহার করতো। কেননা সড়ক পথ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিরাপদ ছিল না। আমরা উভয়েই পরস্পরকে চিনে ফেলি। ১৯৬৪ সালে ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর ও আমি বরিশাল ব্রোজমোহন মহাবিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্র ছিলাম। একই ছাত্রাবাসে থেকে লেখাপড়া করেছি এবং এক সাথে আমরা ইউও টিসিতে ১ বছর প্রশিক্ষণ করেছি। ফলে তিনি আমার রাজনৈতিক পরিচয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি আমাকে আব্দুল মান্নান বাহিনীর সাথে যুক্ত হতে পরমর্শ দিলেন। কিন্তু আমি আমাদের বাহিনীর নীতি ও কৌশল তুলে ধরে তাকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে গণসম্পৃক্ত থেকে মুক্তিযুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে গরীব ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক, দিন মজুর, ছাত্র ও নারীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা অত্যান্ত জরুরি। তিনি আমাদের বাহিনীর অনুমোদন দিলেন। আমাকে বেইজ কমান্ডার ও আব্দুল হক খানকে ফিল্ড কমান্ডার করে পটুয়াখালীর গলাচিপা থানার দায়িত্ব দিলেন।

আমি বাউফলের দাসপাড়ার মোঃ সুলতান আহমেদকে *(কর্ণকাঠি হাই স্কুলের শিক্ষক)* সদস্য সচিব করে ঐ অঞ্চলের ২০/২৫ জন সদস্যকে গলাচিপা পাঠিয়ে দেই। আমরা বরিশাল শহরে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পাক বাহিনী ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে যুক্ত ব্যাক্তি ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করার কাজ পূণরায় আরম্ভ করি। ঐ অপারেশনে আব্দুল জব্বার, সুলতান আহমেদ খান ও আলমগীর হোসেন সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এর এক পর্যায়ে বাহিনীর সদস্য আব্দুল মালেক খান বরিশাল পাক সেনাদের হাতে গ্রেফতার হন। নানা কৌশলে তাকে ছাড়িয়ে আনা সম্ভব হয়। তার কাছ থেকে জানতে পারি যে আমার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠী ও বন্ধু মেহেন্দীগঞ্জের মোস্তফা সফিকুল মান্নানকে আলবদর বাহিনী বরিশাল লঞ্চঘাট থেকে গ্রেফতার করে বরিশালের সেনা ক্যাম্পে আটক রেখেছে। পরে তাকে পাক সেনারা মেরে ফেলেছে।

আমরা ক্যাপ্টেন ওমর বাহিনীর সাথে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে যুক্ত হয়ে স্বরুপকাঠী, নলছিটির চাচৈর ও বাকেরগঞ্জ থানা আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছি। চাচৈর যুদ্ধে কে এম মহিউদ্দিন বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ক্যাপ্টেন ওমরের মূল বাহিনীর সদস্য ছিলেন।

ইতিমধ্যে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের নেতা সিরাজ সিকদার ঝালকাঠী আসেন। তিনি তার কর্মী বাহিনী নিয়ে ঝালকাঠী থানার সকল অস্ত্র হস্তগত করেন। ঝালকাঠী থানার দারোগা মুহাম্মদ সফিক তাকে পূর্ণ সহায়তা করেন। ইতিপূর্বে তিনি ঝালকাঠীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তারপরই ঝালকাঠী লঞ্চঘাটে পাকিস্তানের দালাল আদম আলী ও রুস্তম আলীকে সিরাজ সিকদারের বাহিনী প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে।

ঝালকাঠী সরকারি গুদাম ভেঙ্গে কয়েকশত মন চাল নিয়ে সিরাজ সিকদারের বাহিনী শহরের অদূরে পেয়ারা বাগানে ক্যাম্প স্থাপন করে। ২৭ এপ্রিল পাক-বাহিনী বরিশাল থেকে গানবোট নিয়ে ঝালকাঠী আসে। ঝালকাঠী নেমেই নির্বিচারে গুলি চালিয়ে কয়েকজন লোককে হত্যা করে। শহরের বাড়িঘরে ও দোকান পাটে আগুন লাগাতে থাকে। ঐ আগুন ৪/৫ দিন ধরে জ্বলতে থাকে। ঝালকাঠী তথা পেয়ারা বাগানে সিরাজ সিকদারের বাহিনীর অবস্থান ও প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ার মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ বাংলার মানুষদের সাহস ও শক্তি বাড়িয়ে দেয় এবং আমাদের বাহিনীর যোদ্ধাদের মধ্যেও

উৎসাহ উদ্দীপনা বেড়ে যায়। বিস্তীর্ণ পেয়ারা বাগান জুড়েই তিনি অনেকগুলো ক্যাম্প গড়ে তোলেন। শত শত ছাত্র-যুবক তার সাথে যোগ দেন। মেয়েদের দিয়েও তিনি বাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি প্রধান ক্যাম্প তৈরী করেন ভীমরুলীতে। পাকবাহিনী ঝালকাঠী আক্রমণ করলে থানার এস আই মোহাম্মদ শফিক ১০/১২জন পুলিশ ও অস্ত্র নিয়ে পেয়ারা বাগানে চলে যান।

আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী সংগ্রাম পরিষদের নিয়ন্ত্রনে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বাহিনীর সঙ্গে যৌথ কমান্ডে যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে মত পার্থক্য দেখা দেয়ায় মোহাম্মদ আলী পেয়ারা বাগান ত্যাগ করে ভারতে চলে যান। ফলে পুরো অঞ্চলের নেতৃত্ব চলে যায় কমান্ডার সিরাজ সিকদারের উপর। পাকবাহিনী ৩ মে স্বরুপকাঠী থেকে আটঘর কুরিয়ানা খাল দিয়ে ভীমরুলে প্রবেশ করে। তারা দিনভর এলাকায় হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। বিকেলে তাদের ফেরার পথে শতদশকাঠী গ্রামে ওৎ পেতে থাকা মুক্তিযোদ্ধারা আকস্মিক আক্রমণ চালায় পাক সেনাদের উপর। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা ২৪জন পাক সেনা খতম করতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধে পাক সেনাদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়। সিরাজ সিকদারের প্রত্যক্ষ কমান্ডে সংগঠিত হয় এই যুদ্ধ। এ যুদ্ধে কোন মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হয়নি।

পরবর্তী যুদ্ধ হয় মে মাসের ৭ তারিখে। এটি হয় মাদ্রা গ্রামে। এ সকল ঘণ বসতিপূর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে ৪৫জন পাক সেনা একটি লঞ্চে মাদ্রা আসে। রেজায়ে সাত্তার ফারুকের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা উক্ত পাক সেনাদের আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে ৭জন পাক সেনা নিহত হন। আর একজন ধরা পড়লে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কয়েকদিন পর পাক সেনারা আক্রমণ চালালে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের (সর্বহারা পার্টি) যোদ্ধারা পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে পাক সেনাদের অভিযান ব্যর্থ করে দেয়।

৩রা মে থেকে পরবর্তী ৬/৭ মাসে পাক বাহিনী অসংখ্যবার কীর্তিপাশা সহ ঝালকাঠীর পেয়ারা বাগান অঞ্চলে অপারেশন চালায়। ঝালাকাঠী থানার অংশ সহ বরিশাল ও পিরোজপুর জেলার পেয়ারা বাগান এলাকায় মুক্তিবাহিনীর একাধিক গ্রুপ তৎপর ছিল।

সিরাজ সিকদারসহ অন্যান্য বাহিনীর আক্রমণের শিকার হয়ে পাক বাহিনী

পেয়ারা বাগান ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে। জুন মাসের ১ম সপ্তাহে পাক সেনাদের এক বিশাল বাহিনী পেয়ারা বাগান ঘিরে ফেলে। কাউখালি, স্বরুপকাঠী, বানারীপাড়া ও ঝালকাঠী থেকে শত শত লোক ধরে এনে বাগান কেটে সাফ করার নির্দেশ দেয়। শর্ষীনা পীরের নির্দেশে তার মাদ্রাসার শত শত ছাত্র বাগান ধ্বংস করার কাজে লেগে যায়। ১০জুন রাতে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বধীন বাহিনী পাক সেনাদের একটি ক্যাম্প আক্রমণ করে ঘেরাও বলয় ভেঙে বের হয়ে আসেন। তাদের সাথে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আসা লক্ষাধিক মানুষ রাতের আঁধারে শত শত নৌকা করে ঘেরাও বলয় থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ পায়।

১৬জুন ভোর রাতে স্থানীয় দালালদের সহায়তায় পাক সেনাদের এক আকস্মিক অভিযানে রেজাউল করিম মানিকসহ ২৪ জন মুক্তিযোদ্ধা ধরা পড়ে এবং রেজাউল করিম মানিক ও তার ছোট ভাই সাইফুল করিম রতন সহ ২৪ জন মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে হত্যা করে। পাক বাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে সিরাজ সিকদারের ঘনিষ্ঠ সহচর সর্বহারা পার্টির অন্যতম নেতা ঝালকাঠীর মুজিব মেহেদী ও তার সাথে কনিকা রায় ও মনিকা রায় নামে দুই বোন মুক্তিযোদ্ধা কাউখালীতে ধরা পরে। মুজিব মেহেদীকে পাক সেনারা হত্যা করে। মনিকা ও কনিকা পরে মুক্তি পান।

ঝালকাঠীর পেয়ারা বাগানের যুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন তথা সর্বহারা পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে সেলিম শাহ নেওয়াজ, শশাংক পাল, তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হুমায়ুন কবির, এ্যাডঃ সৈয়দ তোফাজ্জল হোসেন, নুরুল ইসলাম পন্ডিত, মোস্তফা কামাল মন্টু, শ্যামল রায়, ইসকান্দার, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভাসানী রাজাপুরের শহীদ আব্দুর রহমান, নলছিটির খলিলুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কীর্তিপাশার যতীন কর্মকার মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে পাক সেনাদের হাতে ধরা পড়ে শহীদ হন। ন্যাপ (মোজাফ্ফর) এর ডাঃ লুৎফর রহমান এবং ছাত্র ইউনিয়নের নেতা আনোয়ার জাহিদ, আব্দুল মালেক, কালাচান প্রমূখ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন।

মেহেন্দীগঞ্জের শ্রীপুরে সর্বহারা পার্টির একটি গ্রুপ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ছিল। শাহআলম ও আমি চন্দ্রমোহন স্কুলের শিক্ষক ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ ইসরাইল মাস্টারকে নিয়ে প্রবল স্রোতের মধ্যে দীর্ঘ নদী পাড়ি দিয়ে

শ্রীপুর গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করি। তাদেরকে সতর্ক করা সত্বেও তারা পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন ওমরের বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে এবং কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্তের ভরপাশা, রঙ্গশ্রী, নেয়ামতি ইউনিয়ন ও পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ থানার বিস্তীর্ণ এলাকায় বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের বরিশাল জেলার নেতা সর্বহারা পার্টির সাথে যুক্ত হয়ে আব্দুস সালাম মাসুম ও তার ছোট ভাই মাহাবুবুল আলম মাহাবুব একটি বাহিনী গঠন করে গেরিলা কায়দায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। ঐ অঞ্চলে মাসুম ও মাহাবুবের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব থাকায় খুব সহজেই শতাধিক সদস্যের বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। ২৬ মার্চ '৭১ থেকে ১৫ অক্টোবর '৭১ পর্যন্ত বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল পাক হানাদার ও রাজাকার মুক্ত ছিল। ভরপাশা ইউনিয়নের কৃষ্ণকাঠীতে প্রধান ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল। ঐ বাহিনীর সাথে যুক্ত ছিলেন ছাত্র নেতা এনায়েত হোসেন ও ভাস্কর (রাজাপুর)। এদের নিয়েই পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ঐ অঞ্চলের সেনা, ইপিআর ও আনসার সদস্যরা যুক্ত হয়ে বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করে। মহসিনুল ইসলাম হাবুল, ফরিদ খান, কবির, শরীফ (নতুন বাজার, বরিশাল) দলের সাথে যুক্ত ছিল। বরিশালের সংবাদ নেয়ার জন্য আব্দুল জব্বার ও আব্দুল মালেককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ভরপাশার মোঃ তৈমুর, রঙ্গশ্রীর তৈয়ব আলী ও গৌরঙ্গ রাজাকার, শান্তি কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিল। এলাকায় গণআদালত করে স্বাধীনতা বিরোধী, চোর-ডাকাতসহ সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ায় জনগণের মধ্যে বাহিনীর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

পাদ্রীশিবপুরে খ্রিস্টানদের ৩৬৫টি বাড়িতে এ বাহিনীদের সদস্যদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে ফ্লাবিয়ান, ভুলু গোমেজ সহ অনেকে বাহিনীর সদস্য হয়েছিল। ১লা সেপ্টেম্বর মাসুমের নেতৃত্বে বাহিনীর সদস্যরা বাকেরগঞ্জ থানা আক্রমণ করে। আক্রমণে থানা পুলিশের গুলিতে মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সাইদ নামে এক যুবক গুরুতর আহত হয়। পাদ্রীশিবপুরের মেলকাম গোমেজের বাড়িতে মাসুম সহ নেতৃবৃন্দ অবস্থান করতেন। বাহিনীর অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে কাজে লাগিয়ে বাকেরগঞ্জ থানার

বেইজ কমান্ডার নাসির তার বাহিনী নিয়ে ১৫ই অক্টোবর রাতে ঐ বাড়ি ঘেরাও করে মাসুম ও ভাস্করকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। পরবর্তীতে বাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা ঐ এলাকা ত্যাগ করে বিভিন্ন বাহিনীতে যোগদান করে।

পিরোজপুর জেলার কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি ও ন্যাপ (ভাসানীর) রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তি তুলনামূলক ভাবে বেশি ছিল। ছাত্র ও যুবকের মধ্যে তাদের বেশ প্রভাব ছিল। ১৯৭১-এর ২৫মার্চ ঢাকায় নারকীয় হত্যাকাণ্ডের খবর পিরোজপুরে পৌঁছানোর সাথে সাথে সমন্বয় কমিটি ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের পিরোজপুর জেলার নেতৃবৃন্দ জরুরি ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেন যে, সংগঠনের নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা ও অস্ত্র সংগ্রহে নেমে পড়তে হবে। সমন্বয় কমিটির জেলা সমন্বয়কারী ফজলুল হক (ফজলু) নেতৃত্বে ৩০/৩৫ জনের একটি বাহিনী পিরোজপুর ট্রেজারী থেকে অনেকগুলো রাইফেল সহ অন্যান্য অস্ত্র, গোলাবারুদ ও টাকা পয়সা সংগ্রহ করে। এ অস্ত্রের একটি অংশ বিষ্ণুপুরে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির ঘাঁটিতে রফিকুল ইসলাম খোকনের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

এই অভিযানে একই পার্টির সদস্য ওবায়দুল কবির বাদল, নুরদিদা খালিদ রবি, জামালুল হক মনু, শামসুদ্দোহা মিলন, সহিদুল হক চাঁন, সমীর কুমার বাচ্চু, মন্টু প্রমূখ অংশ নেন। ৫ই মে মোঃ ফজলুল হক ও সমন্বয় কমিটির পুর্নেন্দু বাচ্চু, প্রবীর বাচ্চু, জাহাঙ্গীর, দেবুকে গ্রেফতার করে পাক বাহিনী তাদের ক্যাম্পে এনে গুলি করে হত্যা করে। এর কিছুদিন পরে পার্টির কর্মী বিধান চন্দ্র মন্টু শহীদ হয়েছিলেন। যুদ্ধের শুরুতেই নেতৃত্বেও বড় অংশকে এইভাবে হারাতে হয়। তারপর কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির পিরোজপুর শাখার নেতা ওবায়দুল কবির বাদলের নেতৃত্বে বাহিনীকে পুনর্গঠিত করা হয়। তারা নাজিরপুরের মাটিভাঙ্গায় কাজী মোসলেম উদ্দিন, আতিয়ার রহমান, ফরিদ খান, আইউব আলী, মোঃ মানিক, উকিল উদ্দিন ফরাজী, ধলু মিয়া, এবিএম জাহাঙ্গীর, আবদুল আউয়াল, আবুল হোসেন ফকির, আজাহার আলী, মোশারফ হোসেনকে নিয়ে একটি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে হয়। তারা মাটিভাঙ্গা ইউনিয়নের ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের কৃষক সংগঠনে সংগঠিত করেছিলেন। স্থানীয় জোতদার মহাজনদের দখলে থাকা খাস ভূমি উদ্ধারে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল।

এর এক পর্যায়ে নুরদিদা, খালেদ রবি, ওবায়দুল কবির বাদল, সমীর কুমার বাচ্চু, শহীদুল হক চাঁন, তোফাজ্জেল হোসেন মঞ্জু সামসুদ্দোহা মিলন সহ কয়েকজন বিষ্ণুপুরের ঘাঁটিতে অবস্থান নিয়েছিলেন।

আমি বিশেষ প্রয়োজনে জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে মাটিভাঙ্গা গিয়ে কলেজে ৯/১০ দিন ছিলাম। তখন সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনীর সদস্যদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। এদের মধ্যে কাজী মোসলেম, আতিয়ার, আউয়ুব আলী, আবুল হোসেন ফকির আমার ছাত্র ছিল। তারা আমাকে জানালো যে, পিরোজপুর জেলার সকল থানার অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী দেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেছেন। মাঠ পর্যায়ে বাম সংগঠনের নেতা কর্মীরাই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করছে। অনুরুপভাবে বরিশাল জেলার সকল থানায় মাঠ পর্যায় বাম ও প্রগতিশীল সংগঠনের নেতা কর্মী ও সমর্থকসহ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসংখ্য ব্যক্তি বিশেষ করে সেনা, ইপিআর, আনসার সদস্য মরণপণ যুদ্ধ করেন। নভেম্বরের দিকে ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে চলে আসে। কোনক্রমে ১৯৭১সালের মুক্তিযুদ্ধে বাম পন্থীদের গৌরবজ্জ্বল ভূমিকাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে খাটো করার কোন অবকাশ নেই। তাই নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস লেখার প্রয়োজন রয়েছে।

চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুরে মুক্তিযুদ্ধ

আসাদুজ্জামান

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগরের প্রবাসী সরকার পুরো কর্তৃত্ব নিজ হাতে রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকলেও দেশের অভ্যন্তরে বেশ কিছু অঞ্চলে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুক্তিবাহিনীর এসব সদস্যদের মুজিব নগরের প্রবাসী সরকারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। তারা দেশের অভ্যন্তরে ঘাঁটি স্থাপন করে ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। বাইরের সহায়তা ব্যতীত দেশের ভেতরে থেকেই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এক কঠিন কাজ। কিন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধারা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে এই যুদ্ধ শেষ অবধি চালিয়ে যান। বাগেরহাটের চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম এরকম একটি উদাহরণ। সে অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধারা মুজিবনগরের প্রবাসী সরকারের কোনরকম সহায়তা ব্যতীত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কয়েকটি দুর্ভেদ্য গেরিলা ঘাঁটি নির্মাণ করেন। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির অনুসারী এই গেরিলা যোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সম্পূর্ণ সময় এই অঞ্চল শত্রুমুক্ত রাখেন। স্বাধীনতা- পরবর্তীকালের ক্ষমতাসীন সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের এই গৌরবময় সংগ্রাম উপেক্ষা করেছে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুরের যুদ্ধের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুরের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয় কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির অনুসারী গেরিলা যোদ্ধাদের দ্বারা। বিষ্ণুপুরে গেরিলারা একটি শক্তিশালী অবস্থান অঞ্চল (lodgement area) গড়ে তোলে এবং কয়েকটি গেরিলা ঘাঁটিতে প্রতিরক্ষা ব্যুহনির্মাণ করেন।

বাগেরহাট শহরের বুক চিরে প্রবাহিত ভৈরবনদীর শহরসংলগ্ন তীরের বিপরীত তীরের বিষ্ণুপুর ছিল এই বিপ্লবী যোদ্ধাদের সদর দফতর। মুজিবনগর সরকারের কোনরকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই তারা মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ বর্গকিলোমিটার এলাকা শত্রুমুক্ত রাখতে সক্ষম হন।

প্রস্তুতিকালীন পর্ব ও বামপন্থীদের মধ্যে ভাঙন

বাগেরহাট ও সন্নিহিত অঞ্চলের রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতা যুদ্ধপূর্বকালীন অবস্থান ও তৎপরতা অনুসন্ধান করে জানা গেছে ভাসানী ন্যাপ ছিল

অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী অবস্থানে। আওয়ামী লীগের তৎপরতা (কনভেনশন) মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) ন্যাপ, (মো:) কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিং), জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী ইত্যাদি দলও সক্রিয় ছিল।

উল্লেখ্য, মধ্যষাটের চীনপন্থীদের মধ্যে ভাঙন সম্পর্কে এখানে সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন। ১৯৬৬ সালে সুখেন্দুর দস্তিদার-হক-তোয়াহা পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) গঠন করেন। পার্টি ১৯৬৭-৬৮তে আবার ভাঙনের মুখোমুখি হয় এবং কয়েকটি উপ-দলে বিভক্ত হয়। (১) আমজাদ-মাহাবুব উল্লাহ, (২) দেবেন সিকদার-আবুল বাশার, (৩) মতিন-আল উদ্দিন, (৪) জাফর-মেনন-রনো, (৫) সিরাজ শিকদার। জাফর-মেনন-রনো- কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি গঠন করেন এবং শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টি গড়ে তোলার বক্তব্য হাজির করেন। বাগেরহাটের রঘুনাথপুর-বিষ্ণুপুর পিরোজপুরের মাটিভাঙা চেচরিরামপুর-বাগেরহাটের বাহিরদিয়া এলাকায় কৃষক অঞ্চলে এদের যথেষ্ট রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল। তখন পার্টির স্লোগান ছিল 'কৃষক-শ্রমিক অস্ত্র ধরো পূর্ব বাংলা স্বাধীন করো'। 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার' স্লোগান নিয়ে তারা সংগঠিত হতে থাকে। বাগেরহাটে রফিকুল ইসলাম খোকন (ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি), পিরোজপুরের ফজলু-রবি বাহিরদিয়ায় মানস ঘোষ ও সিয়াসের নেতৃত্বে এরা সংগঠিত হতে থাকে। '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হতে থাকলে এরা কৃষক অঞ্চলে কাজ শুরু করেন।

গণ-হত্যাযজ্ঞের পরবর্তী পরিস্থিতি

'৭০-এর নির্বাচন-পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলনের ফলে পরিস্থিতির র‍্যাডিকালাইজড হয়। পাকিস্তানি বর্বর শাসকচক্র সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও প্ররোচণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাপ ভাসানীর শেখ আমজাদ আলী, মনসুর আলী (কমিউনিস্ট পার্টি), অ্যাডভোকেট সবুর (ন্যাপ মো:) ও আওয়ামী লীগের এনসিএ শেখ আবদুর রহমান, সৈয়দ অজিয়ার রহমানের নেতৃত্বে একটি পরিষদ গঠিত হয়। গণহত্যাযজ্ঞের পর আওয়ামী লীগ ও তার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠিত হতে থাকে। বাগেরহাট শহরের অদূরে

একটি বাড়িতে নিয়মিত বৈঠক বসে। ক্যাপ্টেন আবদুর রহমানের নেতৃত্বে একটি ক্যাম্প গঠন করা হয় এ বাড়িতে। এবং স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান একটি ক্যাম্প গঠন করেন বাগেরহাট উচ্চবিদ্যালয়ে। সংগ্রাম কমিটি আলোচনা করে তিনটি বাহিনী নিযুক্ত করে (১) হাবিবুর রহমান (আনসার কমান্ডার) চিতলমারী, (২) সোহরাব হোসেন, গোয়ালমাঠ, (৩) সোলেয়মান খোকন, তেলিগতি। মেজর জলিল একবার এই অঞ্চল পরিদর্শনে আসেন। মেজর মেহেদী আলী ইমামের নেতৃত্বে একটি দল দরগাহ ও ষাটগম্বুজ মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে কয়েকদিন অবস্থান করে। এখান থেকে বাগেরহাটের তৎকালীন এনসিএ অধ্যক্ষ আবদুর রহমান এবং কামরুজ্জামান টুকুর সহায়তায় খুলনার গল্লামারীর বেতার কেন্দ্র আক্রমণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। কিন্তু ৭ জুলাই এরা এ অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

বাগেরহাটের মুক্তিযুদ্ধ কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি

রফিকুল ইসলাম খোকনের নেতৃত্বে একটি অংশ পূর্ব থেকে সংগঠিত ছিল। তারা সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রশিক্ষণ গ্রহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ১৯ এপ্রিল রবিবার রফিকুল ইসলাম খোকন মোহাম্মদ যুবারের শংকর বিশ্বাস খসরুসহ ১১ জন রঘুনাথপুর কেষ্ট ডাক্তারের বাড়ি হয়ে বিষ্ণুপুরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান গ্রহণ করে অস্ত্র সংগ্রহ অভিযান শুরু করে। পার্টি কর্মী আসাদ একটি রিভলবার সংগ্রহ করে। বাহিরদিয়ায় মানস ঘোষ পূর্ব থেকেই প্রতিরোধ শুরু করে দেয়। পিরোজপুরের ফজলুল হক খোকনের নেতৃত্বে পিরোজপুরেও বাহিনী সংগঠিত হতে থাকে। ২৬ মার্চ পিরোজপুরের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয় এবং সেখান থেকে বিষ্ণুপুরের জন্য ১৯টি ৩০৩ রাইফেল সরবরাহ করা হয়। ডেমা থেকে ৬টি ৩০৩ রাইফেল এবং বারুইপাড়ার মোশারেফ মিঞার বাড়ি একটি ব্যাটগান ও কার্তুজ সংগ্রহ করা হয়। ২৭ এপ্রিল রফিকুল ইসলাম খোকন, গোলাম মোস্তফা হিল্লোল, শংকর বিশ্বাস নিশু, কটি গেরিলা পদ্ধতিতে ঝটিকা আক্রমণের মাধ্যমে ৬টি ৩০৩ রাইফেল সংগ্রহ করে। মুক্তিযোদ্ধারা নদী পার হয়ে মুন্সিগঞ্জ খেয়াঘাটে এলে একটি আরোহীহীন জিপ দেখতে পায়। হিল্লোল জিপটি চলন উপযোগী করতে সমর্থ হলে সকল মুক্তিযোদ্ধা জিপে চড়ে বসে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ছিল ৩টি রাইফেল ও একটি ব্যাটাগান এবং একটি রিভলবার। জিপে করে

তারা শহরের কেন্দ্রস্থল ফাইন আর্ট প্রেসের কাছে অবস্থান নেয়। ৫টার দিকে ৪ জন পুলিশসহ একজন আনসারের দেখা পেলে, রফিকুল ইসলাম খোকন দ্রুত জিপ থেকে লাফিয়ে পড়ে অস্ত্রের মুখে তাদের আত্মসমর্পণ করায়। অস্ত্র সংগ্রহের পরে জিপ পুনরায় স্টার্ট দিতে ব্যর্থ হলে তারা রেলপথ ধরে চলতে থাকেন। পথিমধ্যে তারা আর একজন আনসারের কাছ থেকে অন্য একটি অস্ত্র সংগ্রহ করেন। অতঃপর তারা নিরাপদে বিষ্ণুপুরে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ সুদূর মফঃস্বল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ২৫ এপ্রিল রবিবার অন্যান্য পথে প্রতিবন্ধকতা থাকায় হানাদার বাহিনী মোংলা থেকে গানবোটে চৌমহলার কাছ থেকে বাগেরহাটে আসে। এবং কাড়াপাড়া সড়ক ধরে বাগেরহাটে আসতে আসতে পথিমধ্যে অনেককে হত্যা করে। একটি বাজারে তারা গণহত্যা চালায়। স্থানীয় নাগের বাড়িতে তখন প্রতিরোধ শিবিরের একটি বাহিনী ছিল। সে বাড়ি আক্রান্ত হলে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন এবং মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাৎপসারণ করেন। বাগেরহাট শহরের মুক্তিযোদ্ধারা ও রাজনৈতিক দলের নেতারা চিতলমারীতে এবং স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যরা গোয়াল মাঠ ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। পাঞ্জাবী পুলিশ শহরে নিয়োগ করে ঐদিনই পাক বাহিনী চলে যায়।

রফিকুল ইসলাম খোকনের বাহিনীতে গ্রামের তরুণ ও পার্টির কর্মীরা যোগ দেয়। ২৭ এপ্রিল রাতে হাবিবুর রহমান হালি শহরের নৃপেনের বাড়িতে আসে এবং হুমকি প্রদান করে। বিষ্ণুপুর ক্যাম্পে সে খবর পৌঁছুলে গোলাম মোস্তফা হিল্লোল, ইকবাল হোসেন (মেঝে) মান্নান চৌধুরী, শংকর অন্যান্যারা হাবিবুর রহমানকে প্রতিরোধ করতে গেলে প্রতিপক্ষের আক্রমণে বেলা ১১টা ৫ মিনিটে হিল্লোল গুলিবিদ্ধ হন। ৪টার সময় তিনি মারা যান। ইতিমধ্যে বিষ্ণুপুরের ক্যাম্পে আশ্রয় নেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ অজিয়ার রহমান। পরে তিনি শহরে ফিরে আসেন এবং ধৃত হলে থানায় বন্দী অবস্থায় থাকেন। রফিকুল ইসলাম খোকন এবং তার বাহিনী, যা খোকন বাহিনী নামে পরিচিত ৩০ এপ্রিল রাতে থানা আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কামরুজ্জামান টুকু ও সোহরাব হোসেনের বাহিনী তাদের সাথে মিলিত হয়। ১ মে মধ্যরাতে তারা তিন দিকে দিয়ে আকস্মিকভাবে থানা আক্রমণ করেন। আক্রমণে দু'জন পুলিশ নিহত এবং ১০ হন আহত হয়। কামরুজ্জামান টুকুদের অনুসারি ২ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। কিন্তু

সৈয়দ আজিয়ার রহমানকে তারা উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে ঘাতকরা তাকে হত্যা করে। এই যুদ্ধে রফিকুল ইসলাম খোকন, মোহাম্মদ যুবায়ের, শহীদ গোবিন্দ মধু, আসাদ, খসরু, মুজিবুল, আনিসুর রহমান আনিসসহ ২০-২২ জন মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেন। সমন্বয় কমিটির অন্য দুইটি শাখা তখন বাহিরদিয়া এবং পিরোজপুরের দু'জায়গায়ও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। পিরোজপুরের ফজলুল হক খোকন মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তার গ্রুপের কয়েকজন সতীর্থসহ নিহত হন। ২ মে পিরোজপুর কোষাগার লুণ্ঠিত হবার পর ফজলুল হক খোকন জলাবাড়ির দিকে তাদের ক্যাম্পে যান। ঐ দিনই অন্য একটি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের পক্ষ থেকে টাউন স্কুলের কাছে সরকারি স্কুল থেকে বর্ষিত গুলিতে ফারুক ঘটনাস্থলে নিহত এবং বরুণ মিত্র আহত হন। ৫ মে ফজলুল হক খোকন, পুর্ণেন্দ্র সরকার, বাচ্চু জাহাঙ্গীর, প্রবীর কুমার মিত্র (বেল্ট বাচ্চু) দেবু, কেষ্টকে দালালদের সহযোগিতায় পাক সেনারা বন্দী করে এবং নির্মমভাবে হত্যা করে। পরবর্তীকালে বিধানচন্দ্র মন্টুও নিহত হন। পার্টির অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে ওবায়দুল কাদের বাদল, তোফাজ্জেল হোসেন মঞ্জু, নূর দিদা, খালেদ রবি, সমীর কুমার বাচ্চু, শহীদুল হক চান, শামশুজ্জোহা মিলন, শহীদুল হক মিলনসহ কয়েকজন বিষ্ণুপুর ক্যাম্পে যোগ নেন। এবং বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। মানস ঘোষ বিষ্ণুপুরের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ সমান্তরালভাবে রক্ষা করে চলতে থাকেন। এলাকা শত্রুমুক্ত করার প্রয়োজনে বিষ্ণুপুরে মুক্তিযোদ্ধারা পূর্ব থেকে দালাল নিধন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। শহরাঞ্চলে দালালদের তৎপরতা ও অত্যাচার বৃদ্ধি পেলে তারা প্রধান প্রধান দালালদের তালিকা প্রস্তুত করেন। শহরের প্রধান দালাল রজব আলীকে তারা প্রথম লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেন। ১৪ মে রাতে রফিকুল ইসলাম খোকন, মোহাম্মদ যুবারের, ওবায়েদুল কাদের বাদল, সমীর কুমার বাচ্চু ও মান্নান চৌধুরী শহরে প্রবেশ করেন এবং শিকারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ১৫ মে তারা বাগেরহাট দরগাহ সড়কের কাছে সুশিল দাশের পোড়া বাড়িতে অবস্থান নেয়। ১৭ মে দ্বিতীয় দফায় হানাদার পাকবাহিনী শহরে প্রবেশ করে। প্রায় তিন দিন অবস্থানের পর ১৭ মে সোমবার সকালে কয়েক ট্রাক আর্মি পরিবেষ্টিত অবস্থায় রজম আলী সড়ক অতিক্রম করলে মুক্তিযোদ্ধারা পরিকল্পনা মূলতবী করে বিষ্ণুপুরে ফিরে আসেন। শহরে এসে হানাদার

বাহিনী ব্যাপক অগ্নিসংযোগ, হত্যা, ধর্ষণ ও সংখ্যালঘুদের জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে থাকে। ১৭ মে দখলদার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রাজাকারদের সহযোগিতায় বিষ্ণুপুর ও গোট পাড়ায় ব্যাপক অগ্নিসংযোগ করে এবং গণহত্যা চালায়। দালালরা সুবিধা পেয়ে ব্যাপক হারে লুটপাট চালাতে থাকে। ক্যাম্পে ফিরে মুক্তিযোদ্ধারা লুটপাটে বাধা দেয় মুজিবুর নামে একজন লুণ্ঠনকারী নিহত হয়। কিন্তু দালালদের সহযোগীর লাশ শহরে আনতে সক্ষম হলে দ্বিতীয় দফায় হানাদার বাহিনী গানবোটে করে বাবুরহাট থেকে আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধা জঙ্গবাড়ী রঘুনাথপুরে আশ্রয় নেয়। ২২ মে মুক্তিযোদ্ধারা পুনরায় এলাকা শত্রুমুক্ত করার অন্য দালাল সত্তার লস্করকে হত্যা করে। ২৬ মে কামারঘতিতে খসরু, রাফিক, রতন মাস্টার, আওয়ামী লীগের হাবিবুর রহমানের দল কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই সময়ে দখলদার বাহিনীর আক্রমণের তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে মুক্তিযোদ্ধারা গা ঢাকা দিয়ে ভিতরে ভিতরে সংগঠিত হতে থাকে। ৬ জুন হাবিবুর রহমানের হাতে মজবুল শহীদ হন। মজবুল রফিক বাহিনীর সহযোগী সেলিম বাহিনীর সদস্য। রজব আলীকে হত্যা করার জন্য কেষ্ট ঘোষ ও ইসমাইল হোসেন মেঝে শহরে অবস্থান নেয় কিন্তু ব্যর্থ হয়ে বিষ্ণুপুর ফিরে যায়। ৯ জুন ইসমাইল হোসেন মেঝে *(পূর্ব পাকিস্তান রেজিমেন্টের সদস্য)* মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করেন। ১৬ জুন তাজুল ইসলাম *(প্রাক্তন বিমান বাহিনীর সদস্য ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি)* বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন। ১৮ জুন পাক বাহিনী পুনরায় আক্রমণ করে এবং গভীর জঙ্গলও তছনছ করে দেয়। কান্দাপাড়ায় গণহত্যা চালিয়ে ২৩ জনকে হত্যা করে। ২১ জুন চিতলমারীতে মুক্তিযোদ্ধাদের অন্য একটি ক্যাম্পে (সংগ্রাম পরিষদের অনসরী) কম্পিং অপারেশন চালায়। হানাদার বাহিনী কালিগঞ্জ চিতলমারী, খড়মখালি, দুর্গাপুর, খালিসাখালি, চিতলমারীতে ব্যাপক অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যা চালায়। পরে মোল্লাহাটে গণকবর আবিষ্কৃত হয়। এখান থেকে জুন মাসের প্রথম দিকে দুই-একটি প্রতিরোধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অতঃপর এরা ভারতে চলে যায়। মে মাসের মাঝামাঝি শহরে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয় এবং হানাদার বাহিনীর ব্যাপক তৎপরতা চলতে থাকে। বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধারা ঘাতক সর্দার এবং রাজাকার বাহিনীর প্রধান রজব আলীকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। এর জন্য ১১

জুন আফসার বেগের বাড়ি আক্রমণ করে ১টি বন্দুক ও ১টি রিভলবার সংগ্রহ করে। ৭ জুলাই কেষ্ট ঘোষ ও মোহাম্মদ যুবায়েরকে নিয়ে গেরিলা স্কোয়ার্ড গঠিত হয়। বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধারা পার্টির বিশেষ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়। ৯ জুলাই রাতে গেরিলারা শহরে প্রবেশ করে এবং সিরাজদের বাড়িতে কেষ্ট ঘোষ এবং মোহাম্মদ যুবারের আশ্রয় নেয়। সিরাজ এবং খোকনকে তথ্য সরবরাহের কাজে নিযুক্ত করা হয়। ১০ জুলাই গেরিলারা চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রজব আলীর আগমনের অপেক্ষা করতে থাকে। সংবাদ বাহক খবর দেয় যে শিকার ইতিমধ্যে রেস্ট হাউজে এসেছে। সংকেত ছিল শিকার পৌঁছলে সিরাজ জামার বোতাম খুলে সোজা হেঁটে যাবে। এই পূর্বনির্ধারিত সংকেত পেয়ে মোহাম্মদ যুবারের স্টেনগান ও কেষ্টদাশ রিভলবার নিয়ে অগ্রসর হয়। স্টেনগানের জন্য ১১টি গুলি ছিল, তবে ২টি গুলি ছিল অকেজো। রেস্ট হাউজের প্রধান ফটক তখন মানুষের ভিড়ে জনাকীর্ণ। কয়েক 'শ মানুষ রাজাকার কর্তৃক ধৃতদের জন্য সুপারিশ ও রজব আলীর কাছে অনুনয় বিনয়ের জন্য এসেছে। জনস্রোত অতিক্রম করে সোজা রেস্ট হাউসের ফটকের সামনে চলে যায়। পরিস্থিতির ভয়াবহ বুঝতে পেরে জনগণ স্তব্ধ হয়ে যায়। মোহাম্মদ যুবারের রজব আলীর মুখোমুখি হতেই রজব আলী নিশ্চিত মৃত্যু দেখতে পেয়ে নিশ্চল হয়ে যায়। নীরবতা ভঙ্গ করে জুবায়ের স্টেনগান তুলতেই রজব আলী একজন লোককে সামনে টেনে নিয়ে আসে। যুবারের দ্রুত স্টেনগানের গুলি ছোড়ে। হতভাগা লোকটিসহ দু'জন সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে। রজব আলী পিঠে ও বুকে গুলি নিয়ে পালাতে গেলে কেষ্ট পিছন থেকে রিভলবার দিয়ে পুনরায় গুলি করে এবং দু'জনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ হাতাহাতি হয়। রজব আলী মাটিতে পড়ে যায় এবং যুবারের স্টেনগান দিয়ে আঘাতে আঘাতে ঘাতক সর্দারের মাথা চূর্ণ করে দেয়। এ সময় কেষ্টকে লক্ষ্য করে ওয়াপদার জনৈক কর্মকর্তার ছেলে বন্দুকের গুলি ছোড়ে এবং তা কেষ্টর পিঠে বিদ্ধ হয়। এ অবস্থায় দ্রুত রিকশায় চড়ে গেরিলারা খেয়াঘাট হয়ে বিষ্ণুপুর ফিরে আসেন। খবর পেয়ে জনতা উল্লসিত হয়ে গেরিলাদেরকে ঘাড়ে করে ঘাঁটিতে নিয়ে যায়। কিন্তু এ যাত্রা রজব আলী রক্ষা পায় (স্বাধীনতার পরে সে আত্মহত্যা করে)। এই আক্রমণের ফলে হানাদার ও রাজাকাররা মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালায়। সমন্বয় কমিটি রজব আলীর নিহত হওয়ার খবর ছেপে প্রচারপত্র বের করে।

ইতিমধ্যে লে. শামছুল হক নামে একজন ভারত প্রত্যাগত মুক্তিযোদ্ধার নেতৃত্বে চিতলমারীতে একটি ক্যাম্প হয়। ২২ জুলাই হাবিবুর রহমানের সাথে বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি আপস আলোচনা হয়। ২৪ জুলাই বাহিরদিয়ায় একটি বিশেষ ট্রেন, যা রাজাকারদের নিয়ে শহরে ফিরছিল আক্রমণ চালানো হয়। এতে অংশ নেন মানস ঘোষ, যুবারের বিনয়, মোনতাজ মনসুর অন্যান্যরা। ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করে কচুয়া থানা দখল করা হয়। এই আক্রমণে ৮টি রাইফেল, দুটি স্টেনগান, একটি রিভলবার সংগৃহীত হয়। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তাজুল ইসলাম, যুবারের, কেষ্ট ব্যানার্জী, কান্ত, আবুল মনসুর, কুদ্দুস, হাবিব, নিরোদ, মুজিবুর, বাচ্চু, বাদল, নবিরউদ্দিন, শংকর, সিরাজ, তৈয়ব খাঁ, মালেক, খসরুসহ কয়েকজন। ১ আগস্ট দখলদার বাহিনী বিষ্ণুপুর আক্রমণ করে ব্যাপক অগ্নিসংযোগ করে এবং কান্তর দুই ভাইকে নিরোদ ও কালিপদকে নির্মমভাবে হত্যা করে। মুক্তিযোদ্ধারা হ্যান্ডবিল প্রচারপত্র ও যুদ্ধের নির্দেশিকা ছাড়তে থাকে। ৬ আগস্ট মাধবকাটি মাদ্রাসায় অবস্থান নেয়ার জন্য রাজাকার ও হানাদার বাহিনীর একটি দল সেখানে আসে। ৭ তারিখ হাবিবুর রহমানের দল তাদের ঘিরে রাখে। তার সঙ্গে বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল, শামছুর বাহিনী মিলিত হয়ে ৭ আগস্ট রাজাকারদের আক্রমণ করে। রাত ১২টায় তিন দিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়। পরদিন ৮ আগস্ট ২টা পর্যন্ত যুদ্ধ স্থায়ী হয়। দক্ষিণ দিকে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অগ্রবর্তী অংশ মাদ্রাসায় প্রবেশ করে। রাজাকাররা নদীর ঘাটে লঞ্চে উঠতে ব্যর্থ হয়ে মাদ্রাসার ভিতর অবস্থান নেয়। এই যুদ্ধে ৩ জন পাকিস্তানি সেনাসহ ১৬ জন রাজাকার নিহত এবং বহু আহত হয়। ১১ আগস্ট হক-তোয়াহা গ্রুপের প্রতিনিধি জীবন মুখার্জী, লেলিত মোহন বিশ্বাস বিষ্ণুপুরে আসেন এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ মোকাবেলার প্রস্তাব দিলে পার্টির কর্মীদের স্পষ্ট বিরোধিতার সম্মুখীন হয় এবং তারা ফিরে যায়। ১৫ আগস্ট লে. শামছুর বাহিনীর সাথে একটি সংঘর্ষে হাবিবুর রহমান নিহত হয়। অপরদিকে তখন পাক বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতার মুখে রফিকুল ইসলাম খোকনের বাহিনী কিছুটা অসহায় ও বিপন্ন অবস্থায় পড়ে যায়। অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রকট আকার ধারণ করে। ২৪ আগস্ট শহীদ (মানস ঘোষ)-এর কাছ থেকে প্রস্তাব

পেয়ে রফিকুল ইসলাম খোকন, কালিপদ ব্যানার্জী, রতন মাস্টার, বিনয় রওনা হন। তারা ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি কোন এক স্থান থেকে অস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন কিন্তু পথিমধ্যে শত্রুসেনা কর্তৃক আক্রান্ত হলে রফিকুল ইসলাম খোকন পশ্চাৎপসারণের সময় আহত হন। ঐদিনই দেবীবাজারের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ৫ জন রাজাকার ও পাকসেনা নিহত হয়। ২৫, ২৬, ২৭, ২৯ আগস্ট পুনঃ পুনঃ পাকিস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে চলে যায়। পাকবাহিনী সন্তোষপুর ক্যাম্প পুড়িয়ে দেয়। ৩০ আগস্ট আহত অবস্থায় রফিকুল ইসলাম ক্যাম্পে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে তাজুল ইসলাম ভারত চলে গেছেন। বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধারা পুনরায় সংগঠিত হয়ে শক্তি সংহত করে। ৯ সেপ্টেম্বর পানি ঘাটে শত্রুসেনারা জড়ো হতে থাকে। এই যুদ্ধে বিষ্ণুপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদী পাশ ঘিরে ২০০ শত গজ দূরত্বের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা ডিফেন্স লাইন নির্মাণ করে। এবং নদীর বাঁকে দু'দিকে ব্যাংকারে অবস্থান নেয়। নদীর বাঁকের গেডা থেকে গুলিবর্ষণ করে মুক্তিযোদ্ধা। এবং প্রবল বর্ষণের মতো গুলি করতে করতে পাকসেনা ও রাজাকাররা ঢুকে পড়ে বাঁকের মধ্যে। গুলি খেয়ে লঞ্চ ঘুরতে থাকে এবং ব্যাপকসংখ্যক শত্রু সেনা নিহত হয়। এই যুদ্ধে বিষ্ণুপুরের সকল মুক্তিযোদ্ধাই ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় পার্শ্ববর্তী ব্রিজের পথ ধরে সড়ক পথে পাক বাহিনী আসার চেষ্টা করলে বাধা পেয়ে ফিরে যায়। এই যুদ্ধে ১৬ জন পাক সেনাসহ অসংখ্য রাজাকার নিহত হয় এবং শহরে জরুরি অবস্থা জারি করে পাকবাহিনী সহযোগীদের লাশ তোলে। ইসমাইল হোসেন মেঝে, কেষ্টদাশ, যুবারের, সুশান্ত মজুমদার, সেলিম বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারাও এই যুদ্ধে অংশ নেন। ১৩ সেপ্টেম্বর দেপাড়া ব্রিজের কাছে পাকবাহিনী রাজাকারদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই যুদ্ধে বিজয় পাল পাক বাহিনীর হাতে শহীদ হন। এই যুদ্ধে ৫ জন রাজাকারসহ তিনজন পাকবাহিনীর সদস্য নিহত হন। ২৮ সেপ্টেম্বর বিনয় ও মানস ঘোষের সাথে তোয়াহা গ্রুপের জীবন মুখার্জী, লোহিত মোহন বিশ্বাস আসেন এবং পূর্বের প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করে, বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রত্যাখ্যান

করলে তারা ফিরে যায়। মানস ঘোষ ও তার সতীর্থরা এই লাইন গ্রহণ করে। ১৫ অক্টোবর ভেড়ামারা বাঁশতলা ব্রিজের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে শত্রুবাহিনীর যুদ্ধ হয়। ২১ অক্টোবর তাজুল ইসলাম, অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। এবং সন্তোষপুর ও বাধোখালীতে ক্যাম্প স্থাপন করেন। ২৭ অক্টোবর রাতে অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন আততায়ীর হাতে নিহত নন। ইতিমধ্যে কর্পোরেল আমজাদুল হকের একটি বাহিনী ভারত থেকে ফিরলে তার বাহিনী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আনোয়ার হোসেন ও আবুল হোসেনসহ ৭-৮ জন বিষ্ণুপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হয়। এই সময়ে তাজুল ইসলামের বাহিনী লে. সামছুর বাহিনীকে অস্ত্রসংবরণে বাধ্য করে। এর পরে তাজুল ইসলাম বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ ছাড়াই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৩০ অক্টোবর গোটা পাড়া বাবুরহাটে বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকবাহিনী, রাজাকার ও আল-শামসদের সম্মিলিত বাহিনীর একটি রক্তক্ষয়ী মুখোমুখি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ভৈরব নদী অতিক্রম করে পাক বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে বাবুরহাটে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। প্রথম বাহিনী পূর্বেই মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত হামলার মুখে টিকতে না পেরে পালিয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন অন্য অংশ বাবুরহাটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা ব্যাংকারে অবস্থান নেয়। মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারদের পোশাক পরিধান করলে এখানে পাকবাহিনী বিভ্রান্ত হয়। শত্রুবাহিনী মুক্তিবাহিনীকে নিজেদের বাহিনী মনে ভুল করতে থাকে। একটি ছোট ছেলের কাছে তারা কার্তুজের বাক্স তুলে দিয়ে এগোতে থাকে। ব্রিজের কাছাকাছি যেতেই ছেলেটি লাফিয়ে পড়ে এবং পাকবাহিনী চারদিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির মুখে পড়ে যায়। এই যুদ্ধে ১ জন ক্যাপ্টেনসহ ৪ জন পাকবাহিনী ও ৩ জন রাজাকার নিহত হয়। ইসমাইল হোসেন মেঝে, আকো ওহাব আকো (২) যুবারের, সুশান্ত মজুমদার এই যুদ্ধে অংশ নেয়। ৯ নভেম্বর তারিখে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বাবুরহাট অঞ্চলে শত্রুবাহিনীর একটি যুদ্ধ হয়। রাজাকার, আল-শামস ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কয়েক প্লাটুন নিয়ে প্রায় ৩ মাইল দূর থেকে ৩ ইঞ্চি মর্টার দিয়ে সেলিং করতে করতে অগ্রসর হতে থাকে। এই যুদ্ধ দেড় থেকে দু'ঘণ্টা স্থায়ী হয়। বাবুরহাট পৌঁছালে মুক্তিযোদ্ধারা তিন দিক থেকে শত্রুবাহিনীকে ঘিরে ফেলে।

শত্রুবাহিনী মরিয়া হয়ে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে আক্রমণ করলে সাঁড়াশি আক্রমণ রচিত হয়। এই যুদ্ধে ৫ জন পাকসেনাসহ অগণিত রাজাকার নিহত হয় এবং একজন আল-শামসকে জীবন্ত ধরে ফেলা হয়। এই যুদ্ধে ইসমাইল হোসেন মেঝে পশ্চাদপসরণ করে একটি এমএমজি রেখে দেন। এরপর আর কোন সম্মুখ সমর হয়নি। ৩ ডিসেম্বর ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান আর্মিকে খুলনায় নিয়োগ করা হয়। ইতিমধ্যে বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী এক মুক্তিযোদ্ধা মজিবুর রহমানের বাড়িতে মুজিব বাহিনীর সদস্যরা ভারতীয় বাহিনীর সহযোগে অগ্নিসংযোগ করলে মুজিবুর রহমান বাগেরহাট পিরোজপুরের সড়কে একটি ট্রাকে হামলা চালিয়ে দু'জন ভারতীয় সৈন্যকে হত্যা করেন। ১৬ই ডিসেম্বর বাগেরহাটের পতন হয়। ১৭ ডিসেম্বর বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধারা পি সি কলেজে ক্যাম্প করে। কামরুজ্জামান টুকুর নেতৃত্বে মুজিব বাহিনী শহরে অবস্থান নেয় এবং মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন মেজর জয়নুল আবেদিন। পরে আসেন ক্যাপ্টেন নোমান উল্লাহ। ২০ ডিসেম্বর বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধারা পুনরায় বিষ্ণুপুর অবস্থান নেয়। ইতিমধ্যে বিষ্ণুপুরের কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে রেস্ট হাউসের কাছে বন্দী করে রাখা হয়। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল হোসেন মেঝে অস্ত্রসহ দেবীবাজারের কাছ থেকে মুজিবুর বাহিনীর ৮-১০ জন সদস্যকে গ্রেফতার করেন। পানিঘাটের কাছে রেকি করতে আসা অশোক ও জাহাঙ্গীরকেও বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধারা গ্রেফতার করেন। তখন ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে পানিঘাটে পুনরায় বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গানবোটে করে ভারতীয় বাহিনী অবস্থান নেয় এবং মুক্তিযোদ্ধারাও বিপরীত তার থেকে আক্রমণ রচনা করে। মুক্তিযোদ্ধাদের উপর্যুপরি হামলায় ভারতীয় বাহিনী পিছু হটে। তবে উভয় পক্ষের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কিছুক্ষণ পরে রফিকুল ইসলাম খোকন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে ঢাকায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৩১ জানুয়ারি রাশেদ খান মেননের উপস্থিতিতে বাগেরহাট মহকুমা প্রশাসকের কাছে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র সমর্পণ করেন।

চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুরের মুক্তিযুদ্ধ : কয়েকটি তাৎপর্য দিক

বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যুদ্ধের কলাকৌশল, আক্রমণ

করার নির্দেশ ছিল কিছুটা ভিন্নধর্মী। যুদ্ধকৌশল ছিল পুরোমাত্রায় প্রথাবহির্ভূত যুদ্ধ। প্রথম দিকে চোরাগুপ্তা হামলার পাশাপাশি মূলত আগস্ট মাস থেকে সংঘটিত হয় শত্রুবাহিনীর সাথে সম্মুখ সমর। যুদ্ধ জয়ের অত্যাবশ্যকীয় শর্তের মধ্যে রয়েছে (১) জনগণের ব্যাপক সমর্থন, (২) মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক আশ্রয়স্থল, (৩) সমরাস্ত্রসহ বিভিন্ন উপকরণের নিয়মিত সরবরাহ। তৃতীয় শর্তটি ছিল দুর্লভ। মূলত জনগণের ব্যাপক সমর্থন নিয়েই বিষ্ণুপুরের মুক্তিযোদ্ধারা এই প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেন এবং পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাস্ত করেন। পার্টির যুদ্ধ সংগঠনের নীতি ও প্রস্তুতি সম্পর্কে রফিকুল ইসলাম খোকন বলেন, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল আমাদের পার্টির সিদ্ধান্ত ছিল বলে পূর্ব থেকেই আমরা প্রস্তুত ছিলাম। জনগণের শক্তিই ছিল আমাদের মূল রাজনৈতিক শক্তি এবং শত্রুর অস্ত্র দখলের মাধ্যমেই আমরা শত্রুকে খতম করেছি। জনগণের সঙ্গে আমরা সার্বক্ষণিকভাবে ছিলাম, কখনোই তাদের পরিত্যাগ করিনি এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রেও আশ্রয় নেইনি। শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্যই যুদ্ধ করেছিলাম এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় গণযুদ্ধের আবহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

পেয়ারা বাগান

মনির মুরশেদ

[১৯৭১ সালে বৃহত্তর বরিশালের চারটি থানা জুড়ে বিস্তৃত পেয়ারা বাগানের মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। ওই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টি (তখন নাম ছিল পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন)। মুনীর মোরশেদ তখন এই পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি 'সিরাজ সিকদার ও পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি ১৯৬৭-১৯৯২' এই শিরোনামে একটি বই লিখেছেন। বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। সেই বইয়ে পেয়ারা বাগান যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ আছে। সেখান থেকে কিছু অংশ ঈষৎ সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে তুলে ধরা হল।]

নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কেন্দ্রীয় কাজ বাহিনী গঠন ও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ সূচনার তাগিদ নিয়ে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদের সম্পাদক সিরাজ সিকদার '৭১-এর এপ্রিলের প্রথমার্ধে ঢাকা থেকে কেরাণীগঞ্জ থানা দিয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ি থানা হয়ে পার্শ্ববর্তী লৌহজং থানার পদ্মা তীরবর্তী রানাদিয়া গ্রামে যান। গাইড হিসেবে সে সময় তাঁর সাথে ছিলেন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং ঐ রানাদিয়া গ্রামের অধিবাসী মুজিবর রহমান ওরফে কালো মুজিব।

সে সময় পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন মুন্সীগঞ্জ শাখার পরিচালনায় লৌহজং-এর রানাদিয়া, গাঁওদিয়া, দক্ষিণ চারগাঁও নওপাড়া, রুসদি ও কোলা গ্রামে শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, শুভার্থী, সমর্থক ও জনগণের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ চলছিল। এই প্রশিক্ষণের নেতৃত্বে ছিলেন মুন্সীগঞ্জ শাখার পরিচালক মজিদ ওরফে নাসির এবং স্থানীয় নেতা রফিক ওরফে শাজাহান তালুকদার।

এই রানাদিয়া গ্রামে সিরাজ সিকদার সপ্তাহখানেক অবস্থান করেন মূলত শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিশালী অঞ্চল বরিশাল পৌঁছার উদ্দেশ্যে নিরাপদ পথের সন্ধানে। সপ্তাহখানেক পর নিরাপদে বরিশাল যাওয়ার সম্ভাব্য পথের খোঁজখবর নিয়ে সিরাজ সিকদার গাইড কালো মুজিবসহ পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে পায়ে হেঁটে মাদারীপুর, কালকিনী হয়ে '৭১-এর ১৮ এপ্রিল বরিশাল পৌঁছেন। বরিশাল জেলা তখন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রসর অঞ্চল হিসেবে খ্যাত এবং ঐ জেলার নেতৃত্বে ছিলেন মাহতাব ওরফে রামকৃষ্ণ পাল।

২৪ এপ্রিল সিরাজ সিকদার বরিশাল জেলার পরিচালক মাহতাব ওরফে রামকৃষ্ণ পাল, নেতৃস্থানীয় কর্মী ফজলু ওরফে সেলিম শাহনেওয়াজ এবং ঝালকাঠির মুজিবকে নিয়ে বরিশাল থেকে ঝালকাঠি পৌঁছেন। উদ্দেশ্য ছিল নদীমাতৃক বরিশাল জেলার সুদীর্ঘ ৭২ বর্গমাইলব্যাপী বিস্তীর্ণ পেয়ারাবাগানে গেরিলা যুদ্ধের অস্থায়ী প্রকৃতির কেন্দ্রীয় ঘাঁটি স্থাপনের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে দেখা।

ইতোপূর্বে পূর্ববাংলার শ্রমিক আন্দোলনের পূর্ব নির্ধারিত কেন্দ্রীয় গাইডের ভিত্তিতে পলাতক ইপিআর ও পুলিশের কাছ থেকে সংগৃহীত অস্ত্র দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের বরিশাল জেলার নেতৃত্বে পেয়ারাবাগানে গঠিত হয়েছে বেশ কিছু গেরিলা গ্রুপ।

ঝালকাঠি পৌঁছার সাথে সাথেই ঝালকাঠি থানার তৎকালীন ওসি মুহম্মদ শফিক থানার সমুদয় অস্ত্র সিরাজ সিকদারের নিকট অর্পণ করেন। ঐ দিন সিরাজ সিকদার এবং তার সফরসঙ্গীরা স্পীডবোট যোগে পেয়ারা বাগান এলাকা পরিদর্শন করেন এবং ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের সম্ভাব্যতা চূড়ান্ত করে দিনগত রাতেই কয়েক হাজার মণ চাল, ডাল, লবণ, গুড়, চিনি ও কয়েকশ' নৌকা সংগ্রহ করে পেয়ারা বাগানে প্রেরণ করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ এপ্রিল পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর ত্রিমুখী আক্রমণে বরিশাল শহরের পতন ঘটলে শহরের মানুষ দলে দলে বরিশালের গ্রামাঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের বহু নেতা ও কর্মী পেয়ারা বাগানের পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ ও গৌরনদীর থানাধীন শ্রমিক আন্দোলনের নিয়ন্ত্রিত গ্রামগুলোতে আশ্রয় নেয়। শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী ও জনগণ এই পলায়নপর আওয়ামী নেতা, কর্মী ও জনগণকে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় আশ্রয় দেয় এবং থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে।

বরিশাল শহরে কর্মরত পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী বরিশালের গৌরনদীর অধিবাসী আতাউর ওরফে খোরশেদ আলম খসরু বরিশাল শহরে কর্মরত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মীসহ প্রথমে 'সুগন্ধীয়া'য় পশ্চাদপসরণ করেন। সেখান থেকে কর্মীদের পেয়ারা বাগানে পাঠানোর ব্যবস্থা করে তিনি নিজ গ্রাম গৌরনদীর হোসনাবাদে চলে যান ভোলা ও বরিশাল জেলার অন্যান্য এলাকার কর্মীদের পেয়ারা বাগানে সমাবেশিত করার জন্যে। '৭১-এর ২৬ এপ্রিল পেয়ারা বাগানে পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বরিশাল

জেলার সমস্ত কর্মী ও গেরিলাদের সমাবেশিত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
৩০ এপ্রিল সিরাজ সিকদারের স্ত্রী, কথাশিল্পী ও পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী বেগম জাহানারা পেয়ারাবাগান এলাকায় পৌঁছলে ঐ দিনই পেয়ারাবাগানে সমবেত পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, গেরিলা ও লক্ষাধিক জনসাধারণের এক ঐতিহাসিক সমাবেশে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর নেতৃত্বাধীন 'পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী।'
কারণ, পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকেই উপলব্ধি করে যে, জনগণের সেনাবাহিনী ব্যতীত জনগণের কিছুই নেই। রাজনৈতিক ক্ষমতা বন্দুকের নলের মধ্য দিয়েই জন্মলাভ করে। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই পার্টির বিকাশ, সুসংগঠন। শ্রমিক আন্দোলন আরো উপলব্ধি করে যে, গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমেই জনগণকে জাগরিত, সংগঠিত ও জনগণের শক্তিকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়।
উদ্বোধনী বক্তৃতায় সিরাজ সিকদার প্রধান শত্রু পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার লক্ষ্যে পাকিস্তানী সামরিক ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের নিজস্ব সেনাবাহিনী দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। এর পর তিনি উপস্থিত কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে গঠন করেন 'পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী।'
একটি কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে বাহিনী পরিচালনার জন্যে গঠন করা হয় 'সর্বোচ্চ সামরিক পরিচালকমণ্ডলী।' এর সভাপতি নির্বাচিত হন সিরাজ সিকদার। সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন ফজলু ওরফে সেলিম শাহনেওয়াজ, মাহতাব ওরফে রামকৃষ্ণ পাল এবং বেগম জাহানারা প্রমুখ।
ভৌগলিকভাবে পূর্ব বাংলা যেহেতু সমতলভূমির এলাকা এবং উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত সরকারি বাহিনীর পক্ষে যেহেতু অধিকাংশ এলাকায় প্রবেশাধিকার সহজসাধ্য, সেহেতু 'ঘাঁটি এলাকার স্থায়ীত্ব ক্ষণস্থায়ী' এবং বিপরীতে জনগণ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে 'চলমান গেরিলা যুদ্ধ'-র বাস্তবতায় পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী সূচনা করে গেরিলা যুদ্ধ।

ঘাঁটি এলাকার সামরিক কাঠামো ও গেরিলা যুদ্ধের স্বরূপ

বরিশাল জেলার দক্ষিণাঞ্চলের ৪টি থানা ঝালকাঠি, বানরিপাড়া, স্বরূপকাঠি ও

কাউখালীর ৬২টি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত এই পেয়ারাবাগান। এর বিস্তৃতি ৭২ বর্গমাইল। '৭১-এর ২ মে এই পেয়ারাবাগানে স্থাপিত হয় পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্রীয় ঘাঁটি। যা ১ নং ফ্রন্ট এরিয়া হিসেবে পরিচিত ছিল। এর হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয় ভিমরুলীতে। অন্যান্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দফতর স্থাপিত হয় আটঘর, কুড়িয়ানা, পূর্ব জলাবাড়ি, বাউকাঠি, কীর্ত্তিপাশা ও ডুমুরিয়া-য়। পেয়ারাবাগান বা ১ নং ফ্রন্ট এরিয়ার পরিচালনা কমিটিতে ছিলেন বেগম জাহানারা (সভাপতি ও রাজনৈতিক কমিশার), ফজলু (সদস্য ও কমান্ডার), মাহতাব (সদস্য) এবং মুজিব (সদস্য ও গণসংযোগ সমন্বয়ক)।
পেয়ারাবাগান ঘাঁটি এলাকা বা ১ নং ফ্রন্ট এরিয়াকে ৮টি গেরিলা সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।
ঘাঁটি এলাকার বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডার ও গেরিলাদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্যে ভীমরুলীতে স্থাপিত হয় সামরিক স্কুল। এই স্কুল প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করতেন সিরাজ সিকদার। ঘাঁটি এলাকার গণসংযোগ কমিটিতে ছিলেন ঝালকাঠির মুজিব (সভাপতি), মনিকা রায় (সদস্য), আতাউর ওরফে খোরশেদ আলম খসরু (সদস্য)। উল্লেখ্য, আতাউর সারাদিন ৩ নং সেক্টর (আটঘর) পরিচালনা করে রাতে গণসংযোগ বিভাগে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতেন। গণসংযোগ বিভাগের দায়িত্ব ছিল দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে জনগণকে রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ করা, গ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে গ্রাম পরিচালনা কমিটি ও গ্রামরক্ষী ইউনিট গঠন। মধ্য মে'তেই এসব কাজ সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়।
ঘাঁটি এলাকার সাথে ঢাকার সংযোগ রক্ষা করতেন সুলতান ওরফে মাহবুব। ঘাঁটি এলাকার জনগণের সাথে গভীরভাবে মেশা ও জনগণের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসা এবং মাও সেতুং নির্দেশিত তিনটি বৃহৎ শৃঙ্খলা যথাক্রমে : ১. সকল কার্যক্রিয়ার আদেশ মেনে চলুন ২. জনসাধারণের কাছ থেকে একটি সুচ কিংবা সুতোও নেবেন না ৩. দখলকৃত সমস্ত জিনিস জমা দেবেন এবং মনোযোগ দেবার আটটি ধারা যথাক্রমে ১. ভদ্রভাবে কথা বলুন ২. ন্যায্যমূল্যে কেনাবেচা করুন ৩. ধার করা প্রতিটি জিনিস ফেরত দিন ৪. কোনো জিনিস নষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ করুন ৫. লোককে মারবেন না, গাল দেবেন না, ৬. ফসল নষ্ট করবেন না ৭. নারীদের সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করবেন না এবং ৮. বন্দি সৈন্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন না[২] ইত্যাদি কঠোরভাবে পালিত

হতো। ফলে কোনো কর্মী বা গেরিলা সারা দিন অনাহারে থাকলেও গাছ থেকে পেড়ে একটি পেয়ারাও খেতেন না।

সারণী ১ : পেয়ারাবাগান ঘাঁটি এলাকার গেরিলা সেক্টরসমূহ ও পরিচালকমন্ডলী

সেক্টর নং	সেক্টর এলাকা	রাজনৈতিক কমিশার	কমান্ডার
১	কীর্ত্তিপাশা	পণ্ডিত ওরফে নুরুল ইসলাম	ভবরঞ্জন
২	শতদশকাঠি	সেলিম ওরফে হিরু	মনসুর
৩	আটঘর	আতাউর ওরফে খোরশেদ আলম খসরু	রণজিত
৪	বাউকাঠি	আসাদ	আনিস
৫	পশ্চিম জলাবাড়ি	ফুকু চৌধুরী	শ্যামল রায়
৬	কুড়িয়ানা	রেজাউল	মানিক
৭	আতা	ফিরোজ কবির	নিলু
৮	পূর্ব জলাবাড়ি	মান্নান	শাহজাহান

'৭১-এর ৭ মে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি এলাকার নিয়মিত গেরিলা বাহিনীর সাথে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এক মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দেন সিরাজ সিকদার। ৭ মে কীর্ত্তিপাশা নদী দিয়ে পাকসেনারা পেয়ারাবাগানের গ্রামসমূহে প্রবেশ করে। সারাদিন লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে বিকেলে লঞ্চযোগে ফেরার পথে শতদশকাঠি এলাকায় ৮টি গেরিলা সেক্টরের সমস্ত গেরিলা একত্রিত হয়ে সিরাজ সিকদারের সরাসরি কমান্ডে ২০ গজ দূর থেকে আক্রমণ চালিয়ে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী সৈন্যদের সমূলে ধ্বংস করে। যুদ্ধে শত্রুপক্ষের নিহতের সংখ্যা ছিল ২৪ জন এবং হতাহতের সংখ্যা অসংখ্য। জাতীয় মুক্তিবাহিনী প্রথম যুদ্ধেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রচুর আধুনিক অস্ত্র দখল করে।

মাত্র এক মাসের মধ্যে সুদীর্ঘ ৭২ বর্গমাইলব্যাপী বিস্তৃত পেয়ারাবাগানে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধকে ধ্বংস করার জন্যে পাকিস্তানী বাহিনী মরিয়া হয়ে ওঠে। '৭১-এর ২৫ এপ্রিল বরিশাল শহরে পাকিস্তানী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হলে বরিশালের আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ভারতে আশ্রয় নেয়। বরিশাল শহরে সংকটমুক্ত পাকিস্তানী বাহিনী তখন

পেয়ারাবাগান আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। খুলনা, পটুয়াখালি, বরিশাল জেলা থেকে প্রায় এক বিগ্রেড সৈন্য পেয়ারাবাগানের চতুর্দিকে নিয়োজিত করা হয়। পেয়ারাবাগানের ৭২ বর্গমাইলব্যাপী মুক্ত এলাকায় প্রায় ১ লক্ষ শরণার্থী আশ্রিত ছিল। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন ও পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী তাদের সামগ্রিক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে। এ সময় পেয়ারাবাগানের অভ্যন্তরে কলেরা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়লে শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী ও গেরিলারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা মোকাবেলা করে।

অনুশীলনরত সামরিক লাইনের প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী কয়েক লক্ষ লোক অধ্যুষিত প্রায় ৪৮টি গ্রামে অস্থায়ী প্রকৃতির 'মুক্তি এলাকা' গঠন করে। নিয়মিত গেরিলা ইউনিট, বাহিনী, গ্রামরক্ষী ইউনিট ও স্থানীয় গেরিলা গ্রুপ গঠনের সাথে সাথে সেখানে সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা হয়। স্থানীয় জনগণকে কৃষক মুক্তি সমিতি, নারী মুক্তি সমিতিসহ বিভিন্ন গণসংগঠনে সংগঠিত করা হয়।

'৭১-এ গেরিলা যুদ্ধের বারুদের মধ্যেই পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির জন্ম।

বিবিধ প্রতিকূলতায় পেয়ারাবাগান ঘাঁটি অঞ্চলে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি প্রতিষ্ঠার পর পরই শুরু হয় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ধ্বংসপণ সামরিক অ্যাকশন। 'ঘিরে ফেলো ও দমন করো।' (step up encirclement and supression) রণকৌশলের ভিত্তিতে প্রায় এক বিগ্রেড পাকিস্তানী সৈন্য কাউখালি, ঝালকাঠি, স্বরূপকাঠি ও বানারিপাড়া থেকে হাজার হাজার লোক ধরে এনে পেয়ারাবাগান কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়। এ ক্ষেত্রে উপযাচক হিসেবে কাজ করে রাজাকার নেতা শর্ষীনার পীরের মাদ্রাসার ধর্মান্ধ রাজাকার ছাত্ররা। পেয়ারাবাগানের চতুর্দিকে প্রবাহমান কুরিয়ানা, গাবখান, বাউখাঠি নদীতে ৩৫টি স্পীডবোট ও সন্ধ্যা নদীতে ২টি গানবোট দিন-রাত পাহারায় থাকে; যাতে কেউ পেয়ারাবাগান হতে বের না হতে পারে। বহমান নদীগুলোতে চলমান পাহারাকে কভারে রেখে পাকসেনারা ৫০০ গজ পর পর ক্যাম্প স্থাপন করে।

প্রতিদিন পেয়ারা গাছ যতোটুকু কাটানো সম্ভব হয়, ততোটুকু ক্যাম্প এগিয়ে আনে পাকসেনারা। এভাবে প্রায় ৫ দিন চলে। কর্মী-গেরিলারা ক্রশমই তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে চলে আসছিল। ইতোমধ্যে প্রায় তিন-চার হাজার মানুষ

নিহত হন।

৯ জুন পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় ঘেরাও অভিযানকে কৌশলগত আক্রমণের মাধ্যমে ভেঙ্গে ফেলে কর্মী, গেরিলা ও জনগণ নিয়ে ঘেরাও বলয় থেকে বেরিয়ে আসার। পাকবাহিনী ভেবেছিল পার্টি সন্ধ্যা নদী পার হওয়ার ঝুঁকি নেবে না। কারণ, সন্ধ্যা নদী প্রচণ্ড খরস্রোতা ও প্রায় ২ মাইল চওড়া। গাবখান ও বাউকাঠি নদী ভৌগোলিকভাবে অসুবিধাজনক। কারণ, ঝালকাঠি থেকে পাঁচ-সাত মিনিটে এখানে ফোর্স সমাবেশ সম্ভব। এ সব কারণে পাকবাহিনী কুরিয়ানা নদীর ওপর বিশেষ জোর দেয়। তারা মনে করে পার্টি-বাহিনী কুরিয়ানা দিয়ে বের হবার চেষ্টা করবে। ৯ জুন রাতে সিরাজ সিকদার কমান্ডারদের নিয়ে সভা করেন। সিদ্ধান্ত হয় সন্ধ্যা নদী পেরোনোর। কিন্তু আক্রমণের সিদ্ধান্ত হয় কুরিয়ানা ও সন্ধ্যা নদীর মিলন স্থানের কাছাকাছি কোনো ক্যাম্পকে। এ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্যে মান্নান, রনজিত ও সোহেলকে নিয়ে ছোট একটি সুইসাইড স্কোয়াড গঠিত হয়। সব গেরিলা, কমান্ডার, এমনকি সিরাজ সিকদারও চেয়েছিলেন এই স্কোয়াডে যোগ দিতে। ১০ জুন রাত ৯টায় গেরিলারা কুরিয়ানার পাকসেনাদের ক্যাম্প আক্রমণ করে। আক্রমণের সাথে সাথে সমস্ত স্পীডবোট ও গানবোট হামলার স্থানে আসে। রাতের আঁধারে পাকসেনারা বের হওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে যার যার অবস্থান থেকে গুলি করতে থাকে। ফলে গানবোটের সার্চলাইটমুক্ত হয় সন্ধ্যা নদী। এ সময় অসংখ্য ছিপ নৌকায় প্রায় লক্ষাধিক জনগণ, কর্মী, গেরিলা সন্ধ্যা নদী পার হন। সেখান থেকে গাভারামচন্দ্রপুর হয়ে গুইঠ্যা থেকে সুগন্ধিয়ায় সহানুভূতিশীলদের বাড়িতে এসে ওঠেন। এখান থেকেই গেরিলাদের বিভিন্ন দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। গেরিলাদের একটি গ্রুপ গুইঠ্যা আসে। তাদের নিয়ে আতাউর গৌরনদী চলে যান। যা পরবর্তীতে ২ নং ফ্রন্ট এরিয়া গঠনে বিপুল অবদান রাখে। সেলিম শাহনেওয়াজ ও হিরু কিছু কর্মী, গেরিলা নিয়ে মঠবাড়িয়া চলে যান এবং নতুন আরেকটি সেক্টরের পত্তন করেন। পণ্ডিত ও ফিরোজ কবির কিছু কর্মী, গেরিলা নিয়ে পেয়ারাবাগানের আশেপাশে অবস্থান নেয়। মূলত প্রধান অংশই পেয়ারাবাগানের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান নেয় এবং বাকি অংশ অন্যান্য ফ্রন্ট ও সেক্টর গঠনে বা তার সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[২]

পাকিস্তানী আধুনিক সামরিক বাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণের চাপে কৌশলগত

কারণে পশ্চাদপসরণের বাস্তব প্রয়োজনীয়তায় ঘাঁটি এলাকার বিলুপ্ত ঘটে এবং ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে সংগতি রেখে জনগণের ওপর নির্ভরশীল চলমান গেরিলা যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় শুরু হয় দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ।

যুদ্ধের মাধ্যমে যুদ্ধ শিক্ষার অভিজ্ঞতার আলোকে সমতল ভূমির দেশের জনগণ নির্ভর চলমান গেরিলা যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় বাহিনী ছড়িয়ে দেয়া হয়। ফলে দেশের প্রায় সর্বত্র নতুন নতুন ফ্রন্ট এরিয়া গড়ে ওঠে। উল্লেখ্য, পেয়ারাবাগানে ঘাঁটি এলাকা গঠনের পূর্বেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন পাবনা, টাঙ্গাইল, সাভার, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্বনির্ধারিত কেন্দ্রীয় গাইড লাইনের ভিত্তিতে বিভিন্ন ফ্রন্ট গড়ে ওঠে এবং গেরিলা যুদ্ধ চলতে থাকে।

'৭১-এর ২৫ মার্চ ঢাকায় পাকবাহিনী নিরস্ত্র জনগণের ওপর সর্বাত্মক সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করার পরপরই দেশব্যাপী জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধ তথা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সাথে সাথেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পূর্বপ্রদত্ত গাইডের ভিত্তিতে অঞ্চলের স্থানীয় নেতৃত্ব অস্ত্র সংগ্রহ ও তা রক্ষা করার উদ্যোগ নেন, প্রচেষ্টা চালান। নজরুল, বাতেন ও হকের এলাকায় কিছু পরিমাণে অস্ত্র সংগৃহীত হয়। এ সময়ে কেন্দ্রীয় লাইনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির একটি দল টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বে পাবনা শহর দখল করে। এ লড়াইয়ে বাতেনসহ পার্টির (পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন) কয়েকজন অংশগ্রহণ করেন এবং কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করেন।

এ সময়ে পার্টির একক উদ্যোগে পাবনার সাঁথিয়া থানা অপারেশনের পরিকল্পনা করা হয়। গেরিলা সমাবেশ করা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অপারেশন স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তীতে টিপু বিশ্বাস গ্রুপের একাংশের সাথে যৌথভাবে সাথিয়া থানা অপারেশন করা হয়। থানাকে সারেন্ডার করানোর পর টিপু গ্রুপের অংশগ্রহণকারী একাংশের হঠকারিতার জন্যে সফলতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মার্চের ঘটনাবলীর ফলশ্রুতিতে অনেক অঞ্চলের মতো এই অঞ্চলটিও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সকল তৎপরতা স্থানীয় নেতৃত্বই চালাচ্ছিলেন পূর্বে দেয়া কেন্দ্রীয় মূল গাইডের ভিত্তিতে। সাথিয়া অপারেশনের ব্যর্থতার পর পাবনা শাখার পরিচালক বাতেনের সাথে পরবর্তী নেতৃত্ব মতিন প্রমুখের মধ্যকার সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মে মাসের প্রথমদিকে মাসুদের মাধ্যমে একটি অঞ্চলের সাথে কেন্দ্রের যোগাযোগ হয় এবং পেয়ারাবাগানের অনুষ্ঠেয় পার্টি গঠনের প্রস্তুতি কংগ্রেসে

প্রতিনিধিদের পাঠানোর জন্যে শাখার প্রতি আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু মে মাসের শেষ দিকে পেয়ারাবাগানের ওপর পাকবাহিনীর প্রচণ্ড ঘেরাও-দমন অভিযানের কারণে আরো কয়েকটি শাখার মতো এ অঞ্চলেরও কোনো প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেননি।

জুনের শেষ বা জুলাইয়ের প্রথম দিকে আতিক ওরফে চঞ্চলের মাধ্যমে পাবনার মতিনদের সাথে কেন্দ্রের যোগাযোগ হয়। তখনো বাতেনদের সাথে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। এ সময়ে এ শাখা শ্রমিক আন্দোলনের নামেই তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। আতিক পার্টি গঠন ও অন্যান্য অবহিত করেন।[৩]

পুনর্গঠিত ১ নং ফ্রন্ট এরিয়া

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরাটাকারের ঘেরাও-দমনের প্রেক্ষিতে পেয়ারাবাগানের অস্থায়ী ঘাঁটির লিপ্তি ঘটলেও এই পেয়ারাবাগান বা ১ নং ফ্রন্ট এরিয়া চলমান গেরিলা যুদ্ধের ফ্রন্ট এরিয়া হিসেবে পুনর্গঠিত হয়। পুনর্গঠিত ১ নং ফ্রন্ট এরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয় বরিশালের বানরীপাড়া, পিরোজপুর, স্বরূপকাঠি, ঝালকাঠি, পাথরঘাটা, মঠবাড়িয়া। এই পর্বে ফ্রন্ট এরিয়ার পরিচালনা কমিটিতে ছিলেন হিরু এবং তারেক ওরফে ফিরোজ কবির।

১ নং ফ্রন্ট এরিয়ার ঘেরাও-দমন ওঠে গেলে গেরিলারা গেরিলা যুদ্ধকে কাউখালি, রাজাপুর, স্বরূপকাঠি, ঝালকাঠি, বরিশাল সদর থানার বিস্তৃত এলাকায় সম্প্রসারিত করে। ইতোমধ্যে পাঁচজন গেরিলা বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলে মঠবাড়িয়া অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ বিস্তৃত করে। অচিরেই পাথরঘাটা, খেপুপাড়ার গেরিলা যুদ্ধ সম্প্রসারিত হয়। পাঁচজন থেকে গেরিলা সংখ্যা কয়েক শ'তে পৌঁছে এবং ৫টি রাইফেল থেকে ৮০টি রাইফেল ও বন্দুক সংগৃহীত হয়।[৪]

২ নং ফ্রন্ট এরিয়া

গেরিলা যুদ্ধকে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষে ১ নং ফ্রন্ট এরিয়া থেকে মাহতাব ওরফে রামকৃষ্ণ পালন, শাহীন ওরফে আলম, আতাউর ওরফে খোরশেদ আলম খসরু কয়েকটি গেরিলা ইউনিট ও বেশ কিছু কর্মী বরিশালের উত্তরাঞ্চলে চলে আসেন এবং গৌরনদী থানার হোসনাবাদ গ্রামে কেন্দ্র স্থাপন

করেন। এদের নেতৃত্বে গৌরনদী থানাসহ বাবুগঞ্জ, হিজলা, মুলাদি, মেহেন্দিগঞ্জ এবং বর্তমান মাদারীপুর জেলার কালকিনী, মাদারীপুর সদর, পালং, নড়িয়া ও জাজিরা থানা নিয়ে বিশাল বিস্তৃত ২ নং ফ্রন্ট এরিয়া গঠিত হয়।

গৌরনদী অঞ্চলে কর্মী ও গেরিলারা বহু জাতীয় শত্রু খতম করে এবং পাতারহাট, মেহেন্দিগঞ্জ, উজিরপুর, ধামুরা, মুলাদি, বাবুগঞ্জ, হিজলা, বামনা, গলাচিপাসহ বিস্তৃত এলাকায় গেরিলা যুদ্ধ সম্প্রসারিত করে। প্রায় ২০০ গেরিলা সংগৃহীত হয় এবং বিরাট এলাকা মুক্ত হয়।[৫]

'৭১-এর জুন মাসে ফ্রন্টে আওতাধীন মেহেন্দিগঞ্জ থানায় পাকিস্তানী দালালদের আখড়া মৃধাবাড়ি আক্রমণ ও স্থানীয় শান্তিবাহিনী প্রধানের খতমের মাধ্যমে এই ফ্রন্টে সূচিত হয় গেরিলা যুদ্ধ। শুধু তাই নয়, জনগণের কাছ থেকে লুট করা সম্পদ জনগণের মধ্যে ফেরত দেয়া হয়। এই অপারেশনে গেরিলাদের সাথে বিপুল জনগণও অংশগ্রহণ করে।

জুলাই মাসে ফ্রন্টের পরিচালকদ্বয় আতাউর ও শাহীনের নেতৃত্বে আক্রমণ করা হয় মুলাদি থানা। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে ফ্রন্ট এরিয়ার আশ্রিত ও যুদ্ধরত আওয়ামী লীগার কুদ্দুস মোল্লার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে অপারেশন ব্যর্থ হয়। তবে গেরিলাদের তাৎক্ষণিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে রক্তাক্ত বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়।

পরবর্তী পরিকল্পনায় এই ফ্রন্টে পর্যাপ্ত সফলতা আসে। কারণ, ইতোমধ্যে গেরিলারা যুদ্ধের মাধ্যমে যুদ্ধ শেখার প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। আগস্ট মাসে ফ্রন্টের অন্যতম পরিচালক শাহীন-এর নেতৃত্বে মাত্র একটি রাইফেল, একটি চাকু ও হাতে তৈরি বোমার সাহায্যে মাত্র তিনজন গেরিলা দখল করে গৌরনদী থানার মাহিলারা রাজাকার ক্যাম্প। এ রকম স্বল্পমাত্রার অস্ত্র ও সীমিত গেরিলা দিয়ে শুধু মাত্র সাহস-নির্ভর অপারেশনের সফলতার পশ্চাতে ছিল পরিচালক শাহীন উদ্ভাবিত 'দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রু অবস্থান দখল পদ্ধতি।'

২ নং ফ্রন্ট এরিয়ায় প্রতিরোধ যুদ্ধটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ অবস্থান যুদ্ধ। যা দেওলার যুদ্ধ' হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

২ নং ফ্রন্টের হিজলা-মুলাদী-মেহেন্দিগঞ্জ সেক্টরের কেন্দ্র মেহেন্দিগঞ্জে পার্টির প্রধান ক্যাম্পকে পাকসেনারা আক্রমণ করে। প্রধান ক্যাম্পের সহায়তায় শ্রীপুর

এলাকা থেকে আগত গেরিলাদের নদী পাড়ি দিতে পাকসেনারা গানবোট ও স্পীডবোটের সাহায্যে বাধার সৃষ্টি করে। প্রধান ক্যাম্পকে লক্ষ্য করে পাকসেনারা অনবরত মর্টার ও রকেটলাঞ্চার ছোঁড়ে। এক পর্যায়ে গেরিলারা প্রধান ক্যাম্প থেকে সরে এসে 'নকশালের জঙ্গল' বলে পরিচিত জঙ্গলে এ্যামবুশ তৈরি করে। পাকসেনারা প্রধান ক্যাম্প দখল করে পুড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে গেরিলাদের এ্যামবুশ টের পেয়ে দ্রুত মেহেন্দিগঞ্জ থানার দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় আওয়ামী মুক্তিবাহিনী হিজলা থানা থেকে নদী পাড়ি দিয়ে এসে পাকসেনাদের আক্রমণ করে। পাকসেনাদের পাল্টা আক্রমণে আওয়ামী মুক্তিবাহিনী দ্রুত পালিয়ে যায়। এ অবস্থায় এগিয়ে যায় জাতীয় মুক্তিবাহিনী। পাকসেনাদের পলায়নের কারণে গুরুতর সংঘর্ষ না হলেও পার্টির দখলে আসে পাকসেনা ও আওয়ামী মুক্তিবাহিনীর প্রচুর সামরিক উপকরণাদি।[৬]

এই ফ্রন্ট এরিয়ায় রাজাকারদের সাথে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ সংগঠিত হতো মাঝে মধ্যেই।

এ ছাড়া সর্বহারা পার্টির বরিশাল শাখার উদ্যোগে ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধে আক্রমণ করা হয় বরিশাল শহরের পুলিশ লাইন। এই আক্রমণ ছিল গেরিলা যুদ্ধের একটি উল্লম্ফন। এখানে গেরিলারা পুলিশ লাইন দখলে নিয়ে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করে। সমুদয় অস্ত্র সরিয়ে নেয়ার পর তারা অবস্থান ছেড়ে দেয়। এই পুলিশ লাইন অপারেশনের সফলতায় সর্বহারা পার্টির দখলে আসে সমগ্র '৭১ পর্বে সবচেয়ে বড়ো ধরনের অটোমেটিক অস্ত্র।

আত্রাইয়ের মুক্তিযুদ্ধ

ওহিদুর রহমান

[ওহিদুর রহমান যে আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ লেখেন, সেখান থেকে কিছু অংশ নেওয়া হয়েছে এই নিবন্ধে]

আত্রাই অঞ্চলের অর্থাৎ আত্রাই থানার চারপাশের থানাগুলোতে যে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল সে কথা বলতে গিয়ে পেছনের দিকে তাকাতে হবে।

'৭১-র ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণটি ছিল ঐতিহাসিক এবং দিকনির্দেশক। এটাকে একটি স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রামের একটি অনিবার্য মাইলফলক বলা যায়।

মুজিব তাঁর ভাষণে যে ঘোষণা করেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম," মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে এটাই তো চূড়ান্ত আহ্বান! এবং এই ভাষণেই পাকসেনার আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য "ঘরে ঘরে দুর্গ" গড়ে তুলতে বলেছিলেন তিনি। নির্দেশ করেছিলেন, "যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন।" তাহলে মুক্তিযুদ্ধের জন্য তাঁর এই ঐতিহাসিক ভাষণই যথেষ্ট। এটা ঠিক আওয়ামী লীগ একটি নিয়মতান্ত্রিক দল–বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সামলাতে প্রথম দিকে বেগ পেতে হয়েছিল, পরবর্তীতে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। মওলানা ভাসানী ৯ মার্চ পল্টন ময়দানে বিরাট জনসভায় পাকিস্তানকে ভাগ করে দুটো স্বাধীন দেশ গঠন করার দাবি জানান। আর শেখ মুজিবকে তিনি আখ্যা দেন নিজের পুত্র হিসেবে এবং প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন। তবে তিনি হুঁশিয়ার করে দিলেন যে, ইয়াহিয়ার সাথে আপোসের কোনো সুযোগ নেই।

মওলানা ভাসানী মার্চের মাঝামাঝি সময় কমিউনিস্ট নেতা আবদুল মতিনকে সাথে নিয়ে আত্রাই থানায় আমার গ্রামের বাড়ি রসুলপুরে আসেন। হুলিয়া থাকার জন্য পাশের বাড়িতে আমি লুকিয়ে ছিলাম। মওলানা ভাসানী আমার বাড়ির দরজায় এসে হাঁক ছাড়লেন 'ওহিদুর কোথায়?' আকস্মিকভাবে তাঁর এরূপ আগমণকে অবিশ্বাস্য মনে হলেও নিজেকে দ্রুত সামলিয়ে নিলাম, তাঁর পায়ে কদমবুচি করে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হুজুর বললেন 'ক্ষুধা লাগছে, কিছু খাওনের ব্যবস্থা করো'। তাঁর প্রিয় খাদ্য খিচুড়ি রান্না হলো। রাতে তিনি খিচুড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। পরের দিন সকালে তিনি আমার বাবার সাথে

কিছুক্ষণ আলাপ করেন। গল্পচ্ছলে তিনি বাবাকে বলেন, "বুঝলেন মাস্টার সাব দ্যাশটাকে স্বাধীন করা লাগবো। পাকিস্তানিরা হামলা করবো। আমাগো যুদ্ধ করা লাগবো। চীন দ্যাশের মতো যুদ্ধ। আপনার পোলাডারে আমি নিছি। হে যুদ্ধ করবো। আপনে ভাইবেন না। এ দ্যাশ স্বাধীনও হইবো আবার চীনের মতো সমাজতন্ত্রও হইবো।" মওলানা নির্দেশ দিলেন 'কালই কর্মীদের ও তার সাথে পাবলিক ডাকবা–মিটিং করবো।' যথারীতি আত্রাইয়ের ভবানীপুর বাজারে আটচালার বিশাল ঘরে এক/দেড় হাজার কর্মী-সমর্থকের মাঝে তিনি বক্তব্য রাখলেন–'যুদ্ধের জন্য তৈরি হও, আর কোনো রাস্তা নাই'। সন্ধ্যাবেলা ভাসানী সাহেব নৌকায় কিছু খাবার নিয়ে কোন নিরুদ্দেশে যাত্রা করলেন জানা গেল না। পরে শুনলাম তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্পটে এরূপ ঝটিকা সফর করছিলেন। এ ধরনের গণসংযোগ নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভিক লগ্নকে আরো শক্তিশালী করে। আমার বাবা মওলানা ভাসানীর খুব ভক্ত হয়ে গেলেন আর আমাকে প্রাণভরে দোয়া করলেন।

আত্রাইয়ের কর্মীরা যেন বিদ্যুৎতাড়িত হয়ে প্রাণের স্পন্দন লাভ করলেন। সবাইকে দ্রুত সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য চারদিকে ছড়িয়ে যেতে বলা হলো। সব থানায় সতর্ক অবস্থায় থাকার জন্য নির্দেশ পাঠানো হলো। আমি নিজে নওগাঁ শহরে গেলাম। তখন আর হুলিয়ার বালাই নেই। নওগাঁর জনগণকে সংগঠিত করা, আগামী দিনের সশস্ত্র লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। যার অগ্রভাগে ছিলেন ময়নুল হক মুকুল, জালাল হোসেন চৌধুরী, আবদুল মালেক, শফিক খান, মকলেছুর রহমান রাজা, আখতার আহমেদ ছিদ্দিকী, খায়রুল ইসলাম, জহুরুল ইসলাম ইদুল, আফজাল হোসেন, আনিছার রহমান তরফদার, রঞ্জু, হারুন, মন্টু মল্লিক, ফারুক, টুকু, সিরাজ, বিশুসহ অনেকে।

২৫ মার্চ মধ্যরাতে শুরু হল অপারেশন সার্চলাইট, নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করে পিলখানার ইপিআর সদর দফতর, রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। পাকবাহিনী ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। সাইক্লোস্টাইল করা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ২৬ মার্চ দেশের অনেক জায়গায় বিলি করা হয়। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। ২৭ মার্চ

কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াকে দিয়ে অনুরূপ একটি ঘোষণা পাঠ করানো হয় (*বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি কথা*, পৃ. ২৫)। এতে জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের উৎসাহ কিছুটা বেড়ে যায়। কিন্তু ভাষণ দেওয়ার সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল–এটা এক অবাস্তব কথা। আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান এবং মেজর জিয়া যদি রেডিওতে বক্তব্য না রাখতেন তাহলে কি দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ হতো না?

নওগাঁতে ২৬ মার্চ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ বয়তুল্লাহকে আহ্বায়ক, সদস্য জনাব এমএ রকিব (ন্যাপ মোজাফফর), সদস্য জনাব মোজাহারুল হক পোনা (ন্যাপ ভাসানী) এই তিনজনকে নিয়ে নওগাঁ মহকুমা সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ নওগাঁর প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা মো. আবদুল জলিল এবং ন্যাপের একেএম মোর্শেদ সংগ্রাম পরিষদে যুক্ত হন (এবিএম রফিকুল ইসলাম : *মুক্তিযুদ্ধে নওগাঁ*)। ২৬ মার্চ বার ভবনে পূর্ব বাংলার মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করা হলো। এরপর সকাল ৯টা ৪২ মিনিটে সংসদ সদস্য মোহাম্মদ বয়তুল্লাহ স্বাক্ষরিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হাজার হাজার জনতার সামনে পাঠ করে শোনানো হলো।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বের পটভূমি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের পরই আমাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এর মধ্যে কোনো আকস্মিকতা ছিল না। বৃহত্তর রাজশাহী জেলার আত্রাই থানাসহ পার্শ্ববর্তী থানাগুলোতে আমি নকশাল যুদ্ধ না করে কেন মুক্তিযুদ্ধ করতে গেলাম, সে উপলব্ধির জন্য অতীতকে ভালোভাবে জানতে হয়েছে। নেপথ্যর কাহিনী জেনেই তবে বর্তমানকে সুষ্ঠুভাবে জানা যায় এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ঠিক করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমার দল পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি তা উপলব্ধি করতে পারেনি যা আমি প্রথম অধ্যায়ে কিছুটা আলোকপাত করেছি।

১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ভারতের নকশাল নেতা চারু মজুমদারের রাজনৈতিক ও সামরিক লাইনকে পার্টির অন্যতম লাইন হিসেবে গ্রহণ করেন, ফলে এতে বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করার কোনো সুযোগ রইল না। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় কমরেড আবুল বাশারের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের তত্ত্বকে পার্টি প্রত্যাখ্যান

করলো। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জায়গায় শ্রেণী দ্বন্দ্ব অর্থাৎ আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো। আমরা আত্রাই অঞ্চলের অর্থাৎ বৃহত্তর রাজশাহী জেলার কমরেডরা 'মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে দুই কুকুরের মধ্যকার লড়াই' এই তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করি। এবং আওয়ামী লীগের সাথে ফ্রন্ট স্থাপন করে একসঙ্গে যুদ্ধ করি পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে।

আমরা চীনপন্থী হওয়া সত্ত্বেও নওগাঁর দক্ষিণাঞ্চল, নাটোরের উত্তরাঞ্চল এবং রাজশাহীর পূর্বাঞ্চলে বাহ্যিকভাবে ন্যাপ ও কৃষক সমিতি, গোপনে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি করলেও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আওয়ামী লীগের সাথে কখনো দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়নি। কেননা পাকিস্তানি শাসন শোষণকে মুখ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করলে এই উপনিবেশবাদ বিরোধী যাঁরা তাঁদের সাথে আমাদের মিল হতে বাধ্য। তার অর্থ এই নয় যে, আমরা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমরা কোনো লুটপাট, চাঁদাবাজি, জবরদখলের মতো কাজ বা কোনো খুন-খারাবিতে জড়াইনি এবং আওয়ামী লীগকে কখনো আক্রমণও করিনি। আমরা মাও সেতুংয়ের দশটি নির্দেশ পালনের চেষ্টা করেছি। যেমন–'জবরদস্তি করবে না, মিথ্যার আশ্রয় নিও না, মেয়েদের প্রতি শোভন আচরণ করবে, কারো ফসল নষ্ট করো না, শৃঙ্খলা মেনে চলবে, জনগণের ওপর নির্ভর করবে, শত্রুর মোকাবেলা করতে ঐক্যবদ্ধ থাকবে...' ইত্যাদি। 'শত ফুল ফুটতে দাও'–মাওয়ের এ শ্লোগানের মর্মার্থ আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করেছি যে, অন্যের ভিন্নমত থাকলে তা প্রকাশের সুযোগ রাখা। এভাবেই আমরা নিজেদেরকে লালন করেছি। কাজেই এলাকাগতভাবে আওয়ামী লীগের সাথে গণসংগ্রামে এবং মুক্তিযুদ্ধে আমাদের ফ্রন্ট গড়ে তুলতে কোনো অসুবিধা হয়নি। বামপন্থী যোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে এবং ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করতে এতটুকু সমস্যা হয়নি।

১৮ মার্চ পর্যন্ত নওগাঁ ইপিআর হেড কোয়ার্টারের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন পাঞ্জাবি মেজর আকরাম বেগ। ক্যাপ্টেন ছিলেন দুজন। একজন বাঙালি ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দীন, অপরজন অবাঙালি ক্যাপ্টেন নাভেদ আফজাল। ২০

মার্চের পর পর বাঙালি মেজর নজমুল হক মেজর আকরামের স্থলে ইপিআর কমান্ডিং অফিসার হিসেবে বদলি হয়ে আসেন। মেজর আকরাম বেগ মেজর নজমুলকে চার্জ বুঝিয়ে দিতে অস্বীকার করে। ফলে মেজর নজমুল হক ও ক্যাপ্টেন গিয়াস নওগাঁর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে বাঙালি ইপিআর জোয়ানদের নিয়ে ২৪ মার্চ মেজর আকরাম ও ক্যাপ্টেন নাভেদকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতার করা হয় নওগাঁ মহকুমা প্রশাসক অবাঙালি নিসারুল হামিদকে। ফলে নওগাঁ মহকুমা সাময়িকভাবে হলেও মুক্ত এলাকায় পরিণত হয়। থানাগুলোর একই অবস্থা। থানা প্রশাসন মূলত আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ পরিচালনা করছিলেন (শুধুমাত্র আত্রাই থানা বাদে)। ২৫ মার্চ রাত থেকে পাকবাহিনী রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা শুরু করে। এ খবর সবগুলো থানায় পৌঁছে যায় এবং সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

'৭১-এর মার্চের শেষের দিকে আমি নওগাঁ থেকে সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ পেয়ে আত্রাইতে চলে আসি এবং বিভিন্ন দলের নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এপ্রিলের প্রথম দিকে আত্রাইতে আওয়ামী লীগের ডা. সিরাজউদ্দীন, পাঁচপুরের মনোয়ার হোসেন, সাহেবগঞ্জের আজিমউদ্দীন ও আতাউর রহমান, পাঁচপাকিয়ার ডা. আবদুল খালেক, বিহারীপুরের আবুল হাশেম, মোজাফফর ন্যাপ নেতা তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী ও মধুগুরনইয়ের আবদুল গফুর, ভাসানী ন্যাপের আফতাব উদ্দীন মোল্লা ও ওহিদুর রহমান, কাশিয়াবাড়ির খায়রুল ইসলাম, ভোঁপাড়ার মজনু তরফদার এবং আত্রাই এমএম কলেজের অধ্যক্ষ মোতাহার হোসেন, ছাত্রনেতা বেলাল হোসেন ও সাজেদুর রহমান দুদু, প্রভাষক বাদল দত্ত, প্রভাষক আবদুল আজিজ ও প্রভাষক হুসেন আলী প্রমুখদের নিয়ে সংগ্রাম কমিটি গঠনের লক্ষ্যে বিহারীপুর গ্রামে আবুল হাশেমের বাড়িতে বৈঠক হয়। বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যক্ষ মোতাহার হোসেনকে আহ্বায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট আত্রাই থানা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সদস্যবৃন্দ হলেন–সর্বজনাব ডা. সিরাজউদ্দীন, ডা. আবদুল খালেক, তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, আবুল হাসেম, বাদল দত্ত, আফতাব উদ্দীন মোল্লা, ওহিদুর রহমান, খায়রুল ইসলাম, বেলাল হোসেন ও সাজেদুর রহমান দুদু।

আত্রাই থানার তেঁতুলিয়া গ্রামে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয়

রিলিফ কমিটির আঙ্গিনায় ঐ সংগঠনের তত্ত্বাবধায়ক ডা. নীরেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় আমাদের বামপন্থী কর্মীদের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভবত ৭১-এর এপ্রিলের ১০ তারিখের দিকে হবে। সেখানে পার্টির অন্যতম নেতা কমরেড আবুল বাশারের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের চিন্তার সাথে সবাই একমত হলেন। সেখানে শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে যে দিকনির্দেশনা ছিল তার একটি পর্যালোচনার ভিত্তিতে তাঁর বক্তব্যকে সঠিক ও যুগোপযোগী হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অপারেশন সার্চলাইট নামে সর্বত্র জনগণের ওপর নিষ্ঠুর হামলা, গুলি, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ফলে প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় লাভের জন্য জনসাধারণের পালিয়ে যাওয়া, এরূপ পরিস্থিতিতে এক কথায় পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের লড়াইকে প্রধান সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আসন্ন প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য রেড আর্মির আদলে একটি বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করি। পরবর্তীতে আমরা মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিবাহিনী হিসেবে পরিচিতি লাভ করি।

পার্টির ঐ কর্মীসভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সবার নাম স্মরণে নেই। তবে বিভিন্নজনকে জিজ্ঞেস করে যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন–রানীনগরের সাদ আলী, বক্কার, জরিপ, গামা, আনছার আলী, মতিয়ার, মাখন, ইয়াছিন গেদু, তাছির, আফজাল প্রমুখ; মান্দা থানার রিয়াজউদ্দিন (হো চাচা), নাজিম, নূরুল, মোহাম্মদ আলী প্রমুখ; বাগমারা থানার সামাদ, কাশেম, হামিদ, সাত্তার, নূর, গাজী, রফিক প্রমুখ; আত্রাই থানার রফিকুল ইসলাম পটল, এমদাদুর রহমান, হারু কাশেম, ফরিদ, হান্নান, হামিদুল হক, বাবলু, মফিজ, মালু, মজিবর, মতিন, শাহার, ওয়াজেদ, সৈয়দ আলী, ইয়াদ আলী, আবদুল জব্বার, মোতাহার হোসেন বাবলু, হেলু শেখ, শেখ আসাউদ্দৌলা, ফজলুর রহমান, মীরবক্স, ওহিদুর রহমান, একরামুর রহমান, শমশের আলী, খন্দকার মাহবুবুর রহমান, ছয়বর, আবদুল মান্নান, রাজ্জাক, চয়েনউদ্দীন, আফজাল হোসেন, সাখওয়াত হোসেন বাবু, আবদুল মতিন, আজমল শেখ, জেকের, আব্দুল সামাদ, আবু জাহেদ, নাছু, ঝড়ু, আবু বকর সিদ্দিক, আবুল কাশেম, মঞ্জুরুল তরফদার, আবদুল মালেক, আনোয়ারুল ইসলাম (টিপু), খায়রুল ইসলাম, সাজেদুর রহমান দুদু, আনোয়ার হোসেন বুলু, বেলাল হোসেন, মোজাহার হোসেন,

আবদুল আজিজ, আফজাল হোসেন, আবদুস সামাদ, মেহের আলী, আপিল উদ্দীন, জমশেদ ওরফে গাটু, খালেকুজ্জামান বুলু, জানবক্স, আবদুল জব্বার, চাঁদ মিয়া, আবদুর রহমান, মোহাম্মদ আলী, নজরুল ইসলাম, মোবারক আলী, খোদাবক্স, রসুলপুরের আহসান, সাইফুল ইসলাম এল্টু, ময়েন খাঁ, জসি খাঁ, আজিমুদ্দীন পাগলা, হাবিবুর, ওয়াহেদ, আবুল ওরফে হামিদুল প্রমুখ; নওগাঁ থানার অছিম, আলমগীর কবির, আনোয়ার হোসেন বুলু, আখতার, রুকু প্রমুখ; নাটোরের আবদুল কাইয়ুম, বাবলু, মনজুর আলম (হাসু), হাসেমসহ অনেক কমরেড। এঁরা অধিকাংশই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

যেহেতু পাকহানাদার বাহিনী ২৫ মার্চ দিবাগত রাত থেকেই সারা বাংলাদেশে জনগণের ওপর আক্রমণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আমাদের আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না। আমরা ঐ কর্মীসভাতে সিদ্ধান্ত নিলাম আত্রাই থানা দখল করতে হবে এবং তা সম্ভবত ১০ এপ্রিল। আমাদের অস্ত্র চাই। আমরা হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। উপস্থিত শত শত কর্মীদের মধ্যে আমরা ২৫ জনকে বাছাই করলাম। তাঁদের ক্ষিপ্রতা, সাহস ও পারদর্শিতার দিকে লক্ষ্য রেখেই খালি হাতে আত্রাই থানার আগ্নেয়াস্ত্র হস্তগত করতে দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। পরিকল্পনা করা হলো এই অপারেশনের নেতৃত্ব দেবেন ওহিদুর রহমান। ৪-৫ জন করে ভাগ ভাগ হয়ে থানার দিকে যাওয়া হবে। থানার মধ্যে ঢুকতে আবার ২৫ জন তিন ভাগ হবে। এক ভাগ থানার অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জন্য সেন্ট্রিকে কাবু করে ম্যাগাজিন রুম থেকে অস্ত্র-গোলাবারুদ বের করে আনা, আর এক ভাগ ডিউটি অফিসারকে কাবু করে পিস্তল কেড়ে নেওয়া, আর এক ভাগ থানার চারদিকে খেয়াল করবে যাতে থানার অন্য পুলিশদের কোনো তৎপরতা থাকলে তা যেন মোকাবেলা করা যায়। তখন বেলা ৩টা। আমরা ভাগ ভাগ হয়ে পথচারীর মতো স্বাভাবিকভাবে থানার দিকে রওয়ানা দিলাম। থানায় পৌঁছেই আমি এক দৌড়ে সাথীদের নিয়ে থানার মধ্যে ঢুকে পড়ি। ডিউটি অফিসারকে এক ঘুষি মারাতে সে চেয়ার নিয়ে উল্টে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমি পিস্তল কেড়ে নিই। তবে তাকে আটকানো যায়নি–এক দৌড় দিয়ে সে পালিয়ে যায়। সম্ভবত তার কাছে ম্যাগাজিন রুমের তালার চাবি ছিল। অন্য গ্রুপটি ততক্ষণে এক পুলিশ সেন্ট্রিকে কাবু করে তার রাইফেল কেড়ে নেয়। কিন্তু

সেও থানা থেকে পালিয়ে যায়। দারোগা ও কনস্টেবল পালিয়ে যাওয়ার পর থানার অন্য কোনো স্টাফকে খুঁজে পাওয়া গেল না। হাতুড়ি দিয়ে থানার অস্ত্রাগার ভেঙে ৩৪টি রাইফেল এবং দুই সহস্রাধিক গুলি পেলাম আমরা।

আমরা প্রতি মুহূর্তে খবর পাচ্ছি পাকহানাদার বাহিনী কিভাবে জনসাধারণের ওপর হামলা, অত্যাচার, নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণের মতো অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা থেকে তাদের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ার মুখে কোথাও কোথাও তারা প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। ৭ এপ্রিল ক্যাপ্টেন গিয়াসের নেতৃত্বে রাজশাহীর মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় নওগাঁর মুক্তিযোদ্ধারা সম্মিলিতভাবে পাকবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করেন এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। বহু পাকসেনা নিহত হয়। এ যুদ্ধের সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিচালনা করেন মেজর নজমুল হক। নওগাঁ থেকে দুই কম্পানি ইপিআর সদস্য রাজশাহীর এই যুদ্ধে অংশ নেন। এই যুদ্ধে পাক-আর্মি পক্ষান্তরে পরাস্ত হয়।

আমরা এপ্রিলের ১০ তারিখের দিকে আত্রাই থানা দখল করে যেসব আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করি তা দিয়ে দুই জায়গায় প্রশিক্ষণ শুরু করি। ডোঁপড়া গ্রামের আনসার কমান্ডার শেখ নাছির উদ্দিনের নেতৃত্বে সাহেবগঞ্জ মাঠে। এবং কয়সা গ্রামের সাবেক সেনা সদস্য এমদাদুর রহমানের নেতৃত্বে ভবানীপুর মাঠে। পাকসেনা আত্রাইতে আসা পর্যন্ত স্থানীয় কর্মীদের সামরিক প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। অস্ত্রগুলো তিন ভাগ করে এক ভাগ সাহেবগঞ্জ মাঠে, এক ভাগ ভবানীপুর মাঠে প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছিল। আর এক ভাগ আত্রাই সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে তোফাজ্জল চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আনসার-মুজাহিদদের কাছে থাকত।

পাকবাহিনী আত্রাইতে আসার পূর্বে আত্রাইতে কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায়। ৬ এপ্রিল রাজশাহীর জেল ভাঙার পর রাজবন্দিদের পাশাপাশি মারাত্মক দাগি আসামিরা বেরিয়ে আসে। এদের মধ্যে বরিশালের কুখ্যাত ডাকাত কুদ্দুস মোল্লা, রংপুরের ডাকাত সরদার পাশান চৌধুরী, আত্রাইয়ের ডাকাত সরদার বিজো খাঁ ও আকবর খাঁ, রানীনগরের ডাকাত সরদার আফছাররা তাদের দলবল নিয়ে আত্রাইতে মজিদ মোল্লার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। জাতআমরুল গ্রামের কৃতী সন্তান আজাদ মোল্লার হত্যাকারী তার চাচাতো ভাই মজিদ মোল্লা মার্ডার কেসের আসামি হিসেবে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকার

সময় এসব অপরাধীর সাথে তার সখ্যতা গড়ে উঠে। তাদেরকে মজিদ মোল্লা আত্রাইতে তার জাতআমরুল গ্রামের বাড়িতে অস্ত্রসহ জায়গা দেয়। তার বাড়িতে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করে। নিজে মুসলিম লীগের লোক হিসেবে সংগ্রাম কমিটি ও মুক্তিবাহিনীকে যাতে অঙ্কুরে বিনাশ করা যায় তার জন্য ঐ সব ডাকাতকে নিজ বাড়িতে রেখে চক্রান্ত আঁটতে থাকে এবং আকস্মিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের পাঁয়তারা করে। কিন্তু বিষয়টি সংগ্রাম পরিষদের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। আত্রাই সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির অন্যতম নেতা তফাজ্জল হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ছোটখাটো বাহিনী মজিদ মোল্লার বাড়ি ঘেরাও করলে বাড়ির ভেতর থেকে গুলি হতে থাকে। পাল্টা গুলি হলো। খিড়কি (গোপন দরজা) দিয়ে গুলি করতে করতে মজিদ মোল্লাসহ ডাকাতেরা পালিয়ে যেতে থাকে। উভয়পক্ষের গোলাগুলি ও ক্রসফায়ারে ঐ গ্রামের কিছু লোকজন হতাহত হন। ওদের দাবড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় আত্রাইয়ের পশ্চিমদিকে সিংসাড়া মাঠে একটি স্টেনগানসহ জনতার হাতে কুদ্দুস মোল্লা ধরা পড়ে। তার স্বীকারোক্তিতে মুক্তিবাহিনী ও সংগ্রাম কমিটি নিধনের ষড়যন্ত্রের কথা জানা যায়। এই ঘটনাকে নওগাঁর অ্যাডভোকেট মোজাহারুল ইসলামের লেখা 'আমাদের স্বাধীনতার সূচনা'তে মাওবাদীদের হামলা, ডাকাতি, লুটপাট ও হত্যাকাণ্ড বলে উল্লেখ করেন। এই কাহিনী লেখার আগে তাঁর উচিত ছিল স্থানীয় লোকজনের কাছে গিয়ে অনুসন্ধান করে প্রকৃত ঘটনা জানা। তা না করে নিজে উকিল হয়ে অন্য একজন উকিলের প্রতি সহমর্মী হয়ে একটি অসত্য তথ্য উপস্থাপন করেছেন। ওই দিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জাতআমরুল গ্রামের কাজেম উদ্দীন বলেন, "ঐ দিন মুক্তিযোদ্ধারা যদি মজিদ মোল্লার বাড়িতে হামলা করে ডাকাতদের নির্মূল না করতো তাহলে মুক্তিযোদ্ধাদের আত্রাইতে টিকে থাকা কঠিন হতো।" আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী একই গ্রামের ইয়াছিন আলী বলেন, "মুক্তিবাহিনীর লোকেরা মজিদ মোল্লার বাড়িতে বা কারো বাড়িতে ডাকাতি বা লুটপাট করেননি, যা করেছেন ডাকাতদের বিরুদ্ধে করেছেন।"

এই ঘটনার পরপর পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাংক আত্রাই শাখার একজন কর্মকর্তা প্রায় ৭৫ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের কর্মীরা টাকাগুলো আটকিয়ে দেন। সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক টাকাগুলো হেফাজত

করতে বা কাজে লাগতে আমাকে ও আফতাব মোল্লাকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। আমরা সংগ্রাম কমিটির নেতারা বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতে গিয়ে কিছু হাল্কা অস্ত্র সংগ্রহের জন্য আফতাব মোল্লা ও বাদল দত্তকে ৩০ হাজার টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কাপড় কিনতে খায়রুল ইসলাম, মজনু তরফদার ও মাধবনগরের (দুর্লভপুরের) বাবলু এই তিনজনকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। ১৫ হাজার টাকা জমা রাখা হয় বড়ভিটা গ্রামের শফিউদ্দীন সরদারের নিকট। ২০ হাজার টাকা থাকে আমার কাছে। আত্রাই থানার রাস্তা দিয়ে সাহেবগঞ্জ মাঠে ট্রেনিং সেন্টারে আমি একজন সহকর্মীকে নিয়ে যাওয়ার পথে সংগ্রাম কমিটির অন্যতম নেতা তফাজ্জল হোসেন চৌধুরী তার অনুগত ৫-৬ জন আনছার মুজাহিদদের নিয়ে থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে আমাকে হ্যান্ডসআপ করান এবং গ্রেফতারের হুকুম দেন। আমার নিকট রক্ষিত ২০ হাজার টাকা তিনি হাতিয়ে নেন। ইত্যবসরে আনছার কমান্ডার, মুক্তিবাহিনীর ইনস্ট্রাক্টর নাছিরউদ্দীন শেখের হস্তক্ষেপে এবং আমাদের কর্মীদের দ্রুত এগিয়ে আসাতে তফাজ্জল চৌধুরী আর এগোতে পারেননি। তবে টাকাগুলোর হদিস পাওয়া গেল না। পরবর্তীতে শফিউদ্দীন সরদার তাঁর কাছে গচ্ছিত ১৫ হাজার টাকা সংগ্রাম পরিষদের কাছে জমা দিয়ে দেন। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের হাতে সকল অস্ত্র সমর্পণ করো–এরূপ নির্দেশ তফাজ্জল চৌধুরী দিলে আমরা এই আদেশের বৈধতা দেখি না। কেননা সংগ্রাম পরিষদের তিনজন তখন ভারতে, আহ্বায়কসহ দুজন এলাকার বাইরে। ডা. খালেক, হাশেম, বেলাল, দুদু ও আমি একমত হয়ে সব অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করি। ফলে তফাজ্জল চৌধুরীর একক নেতৃত্বের সংগ্রাম পরিষদের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রশ্নই আসে না।

আত্রাইতে এই ডামাডোলের মধ্যে একটি বেদনাদায়ক ঘটনার অবতারণা হয়। সান্তাহারে বিহারী নিধনের ঘটনায় আত্রাইতে কারো কারো মধ্যে প্রভাব পড়ে। রাতের অন্ধকারে আত্রাইয়ের ২৫জন অবাঙালি আবালবৃদ্ধবনিতা নিধন হয়ে গেল। আমার অজান্তে ও অলক্ষে এটা ঘটেছে আমি বলতে পারি–কিন্তু স্থানীয় একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ছোটখাটো নেতা হিসেবে এর দায় এড়ানোর পথ খোঁজা বৃথা। মানুষের জীবনে না চাইলেও অনেক সময় ভ্রান্তিগুলো এসে ভর করে। ভুলগুলো শোধরানোর জন্য আত্মসমালোচনা ও আত্মদহনের পথেই মুক্তি। এটা আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের মুহূর্তে নওগাঁ ডিগ্রি কলেজে পড়ার সময় পাক সরকার ছাত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে–আমি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করি এবং সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করি। এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবী বাহিনী ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির লাল ফৌজ গঠন প্রক্রিয়ার যে ধারণা ছিল তার ওপর ভিত্তি করে আমি দ্রুত আমাদের দলের নিজস্ব বাহিনী গড়ে তুলতে মনোযোগ দেই। গত দু'সপ্তাহ ধরে যে এলোমেলো অবস্থা ছিল তা দ্রুত কাটিয়ে উঠি। থানা থেকে সংগ্রহ করা ৩৪টি রাইফেলের মধ্যে বিভিন্নজনের কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ২০টি রাইফেল উদ্ধার করি। বাকি ১৪টি পরে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে একটি সশস্ত্র টিম গড়ে তুলি। অভিন্ন চিন্তার ভিত্তিতে একটি নির্ভেজাল সশস্ত্র বাহিনী গড়তে ব্যর্থ হলে পরাজয় সুনিশ্চিত। অতএব, অতীতের ভুলগুলো দ্রুত শুধরিয়ে নিয়ে ধাবমান পাকবাহিনীকে আত্রাইতে প্রতিহত করার অপেক্ষায় রইলাম। ২২ এপ্রিল বিকেলের দিকে নাটোর থেকে ট্রেনযোগে আত্রাই নেমেই পাকবাহিনী প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু করে। আমরা আত্রাই থানার পূর্ব পাশে সাহেবগঞ্জ গ্রামে ২০/৩০ জন পজিশন নিলাম এই ভেবে যে আত্রাই থানা সাহেবগঞ্জ আসতে পথে যে নদী *(আত্রাই নদী যা পরবর্তীতে খাজুরা নদী নামে পরিচিতি লাভ করে)* তখন তার ওপর ব্রিজ ছিল না। নিশ্চয়ই পাকবাহিনী নৌকাযোগে নদী পার হতে যাবে এবং আমাদের অ্যামবুশের আওতায় পড়বে। কিন্তু সে চিন্তায় গুড়েবালি। সাহেবগঞ্জ অভিমুখে শত শত পাক আর্মি যেভাবে মেশিনাগন ও মর্টারের গোলাবর্ষণ করতে করতে আমাদের দিকে তাক করে এগোতে থাকল–আমরা প্রতিরোধ করা তো দূরের কথা পেছন ফিরে বীরদর্পে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করলাম। আমরা সন্ধ্যার মধ্যে আত্রাই থেকে ৭/৮ মাইল পূর্বে বিশা ইউনিয়নের মধ্যে কর্মীদের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। প্রায় ৫ দিন ঐ এলাকায় আমরা অবস্থান করি। ইসলামগাথীর গাজিভাই, সাইলাল, কাজেম, বিরাজ, খালপাড়ার সামাদ, আহাদ আলী, সাতনগর গ্রামের আবদুল আলিম, আবদুস সাত্তার, বিশা গ্রামের রমজান ভাইসহ অনেকেই সাহায্য-সহযোগিতা ও আশ্রয় প্রদান করেন। শুনে অবাক হলাম আমরা ঐ এলাকায় যাওয়ার দুদিন আগে পাশের সিংড়া থানার শান্তি কমিটির নেতা বর্জন বিশ্বাসের নেতৃত্বে নাটোর থেকে আসা শতাধিক পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে খালপাড়ার সামাদদের নেতৃত্বে হাজার

হাজার জনগণ লাঠি-ফালা-বল্লম নিয়ে লড়তে এগিয়ে যান। কিন্তু প্রচণ্ড গোলাগুলির সামনে টিকতে না পেরে পেছন ফিরে আসেন। পাঞ্জাবিরা কালবিলম্ব না করে জনরোষ দেখে ফিরে যায়।

যে দিকেই তাকাই দেখতে পাই দলে দলে মানুষ ভারতের দিকে স্রোতের মতো পালাচ্ছেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক আর থাকলেন না–তার সাথে মুসলমানেরাও অনেকে চলে গেলেন। আমাদের নিজস্ব বাহক মারফত পাকবাহিনীর তাণ্ডবের খবর প্রতিমুহূর্তে আমাদের কাছে আসছিল। খবর আসলো আমার গ্রাম রসুলপুর পাকবাহিনী মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে এবং আমার বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। অস্ত্রধারী কর্মী ছাড়া বাকি সবাইকে গোপনে এলাকায় লুকিয়ে থাকার পরামর্শ দিয়ে আমরা ২০টি রাইফেলসহ ২০/২৫ জনের একটি টিম আর্মি ক্যাম্পের দূর দিয়ে রেললাইন অতিক্রম করে নিজগ্রাম রসুলপুরের দিকে রওয়ানা দিই। পথে বড়ভিটার শফিউদ্দীন সরকারের নিকট থেকে গচ্ছিত ১৫ হাজার টাকা নিয়ে নিই। বাড়ির দিকে যাওয়ার পথে খবর পাওয়া গেল কাশোপাড়ার দবির সোনার পাকবাহিনীকে সাথে নিয়ে ২৩ এপ্রিল ১৯৭১ সিংসাড়া গ্রামের বামপন্থী ছাত্রনেতা মজিবর রহমানসহ ৩২ জনকে গুলি করে হত্যা করিয়েছে। ২৮ এপ্রিল এই অপরাধে পাকবাহিনীর দালাল হিসেবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তার বড় ছেলে আবুল কালাম আজাদ মুক্তিযোদ্ধা হতে চাইলে তাকে আমাদের সাথে রাখার সিদ্ধান্ত হয়। এই ঘটনার পর আত্রাই নদী পার হয়ে আমাদের গ্রাম রসুলপুরে আব্বার কবর জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে কমঘাট গ্রাম থেকে বার্নিতলায় পৌঁছলে রাজাকার কমান্ডার জানা'র নেতৃত্বে আজিম ও শাহজাহানসহ ১০/১২ জন রাজাকার আকস্মিকভাবে আমাদেরকে আক্রমণ করে। আমার সাথে থাকা নিজাম ও হাশেম শহীদ হন এবং গুলিবিদ্ধ হন নবাবের তাম্বুলের আব্দুল মান্নান *(মান্নানের পাঁজরে স্টেনগানের গুলি লাগে এবং তা প্রায় ৯ মাস পর অপারেশন করে বের করা হয় স্বাধীনতার পর)*। পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে জানার সাগরেদ শাহজাহান ও জব্বারকে নিধন করা হয়। অবশিষ্ট কয়েকজনকে নিয়ে জানা রাজাকার পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আমার নিজের গ্রাম রসুলপুরে পৌঁছলাম। গ্রাম প্রায় জনশূন্য, প্রায় সব বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমার বাবা পাকবাহিনীর গুলিতে মারা যাননি। পাকবাহিনী কর্তৃক ম্যাসাকারের দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা

গেছেন বলে অনেকের ধারণা। আমি তাঁর কবরে সঙ্গীদের নিয়ে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলাম। ঠিক করলাম অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রেখে আমরা অল্পসংখ্যক ক'জন ভারতে গিয়ে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। কয়সা গ্রামে একজনের খড়ের গাদার নিচে ২০টি রাইফেল চটের বস্তা দিয়ে মুড়িয়ে পুঁতে রেখে তার উপর আবার খড় গাদা করে দেওয়া হলো।

আমার সঙ্গী ছিলেন নাটোরের ৩ জন কমরেড। মনজুর আলম (হাসু), কাইউম এবং হাসেম। ওদের কারো কারো আত্মীয়স্বজন ভারতে আছেন, যেখানে প্রাথমিকভাবে আশ্রয় পাওয়া যাবে। অন্য দশজনের মতো আমরাও বডারের দিকে রওয়ানা হলাম। আত্রাই থেকে প্রায় ৫০ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে প্রায় অভুক্ত অবস্থায় বিকেল ৪টার দিকে ধামইরহাট থানার লক্ষণপাড়া গ্রামে আমার কলেজ জীবনের সহপাঠী সাইফুল ও রফিকুলের কাছে খাদ্য ও আশ্রয় চাইলাম। ওরা আমাদেরকে পুকুর দেখিয়ে দিল গোসল করার জন্য। আমরা চারজন এক সাথে পুকুরে নামার সাথে সাথে পুকুরের চারধার দিয়ে ১৫/১৬ জন রাইফেলধারী লোক আমাদের হ্যান্ডসআপ করালো। আমার শার্টের পকেট থেকে পিস্তলটি (যা আত্রাই থানার দারোগার নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়) বের করে বললো, এটা কাকে মারার জন্য এনেছ? নিশ্চয়ই নওগাঁ জেলার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট বদিউল আলমকে মারতে এসেছ? তোমরা ভারত থেকে আসা মুক্তিবাহিনী, তোমাদের আজ রাতেই শেষ করে দেওয়া হবে। বদিউল আলমের স্ত্রীকে দেখে বুঝলাম এ বাড়ি বদিউল আলমের। বদিউল আলম ও তার স্ত্রী আমার পূর্বপরিচিত। তিনি অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে তোমরা বদিউলকে মারতে পারো। আমরা বুঝিয়ে বললাম, আমরা ভারত থেকে আসিনি, ভারতে যাওয়ার পথে এখানে আশ্রয় নিয়েছি, কাউকে হত্যা করার পরিকল্পনা থাকলে এভাবে কেউ কি আসে। বদিউল আলমের স্ত্রী কথা দিলেন তাঁর স্বামী না আসা পর্যন্ত আমাদের হত্যা করা হবে না। পত্নীতলা থানার একজন দারোগা ১৪ জন কনস্টেবলসহ আমাদের গ্রেফতার করে বললেন, খেয়ে নাও, এখান থেকে ৭/৮ মাইল পথ হেঁটে নজিপুর থানায় পৌঁছতে হবে। খাওয়া কঠিন হলেও জোর করে কিছুটা ভাত খেয়ে নিলাম।

সন্ধ্যায় আমাদের চারজনকে হাত পিছমোড়া করে বেঁধে নজিপুর পুলিশ স্টেশনের দিকে রওয়ানা করল পুলিশেরা। আমাদের হাতের বাঁধন খুব শক্ত ছিল না–অনেকটা ঢিলা ছিল। এ অবস্থায় চারটা অস্ত্র চার সিপাইয়ের নিকট থেকে কেড়ে নেওয়া কঠিন হবে না। বিশেষ করে দারোগা সাহেবের নিকট থেকে স্টেনগানটি কেড়ে নেওয়া আমার পক্ষে সহজ মনে হয়েছিল। বিষয়টি কানে কানে আমার কমরেডদের বললে ওঁরা এরূপ ঝুঁকি নিতে রাজি না হওয়ায় এ পরিকল্পনা বাতিল করতে হলো। দ্বিতীয় পরিকল্পনা হলো, দারোগাকে কাজে লাগানো। আমি তার সাথে খাতির লাগালাম। বাঙালি হয়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়, তিনি স্বীকার করলেন। বললেন, বাধ্য হয়ে এ কাজে লিপ্ত হয়েছেন। তাহলে আপনি আমাদের বাঁচানোর জন্য পরোক্ষভাবে হলেও সহযোগিতা করতে পারেন। উত্তর দিলেন, কীভাবে? আমার আন্ডারওয়ারের পকেটে ১৫ হাজার টাকা ছিল তা তাকে নিতে বললাম। তিনি নিলেন। তিনি সহানুভূতির সুরে বললেন, বলুন কি করতে পারি। বললাম, দয়া করে দুটো কাজ করুন; প্রথমত, আমার কাছে পাওয়া পিস্তলের গুলি ফেলে দিন এবং আপনার স্টেনগানে চাপ দিয়ে ঐ পিস্তলের ফায়ারিং পিন ভেঙে ফেলুন, যাতে পাক-আর্মির মেজর বুঝবেন এ অস্ত্র কোনো কাজের নয়। দারোগা সাহেব আমার কথা রাখলেন। দ্বিতীয় কাজটি হলো আপনি আমার বাবার বন্ধু নজিপুর হাই স্কুলের শিক্ষক মজিবর রহমানকে সম্ভব হলে আজ রাতেই ডেকে দিবেন। তিনি এ কাজটি করেছিলেন। আমাদের রাতের বেলা থানা হাজতে ঢোকানো হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে একজন সম্ভবত পাঞ্জাবি সুবেদার আমাদের গুলি করে মারার জন্য খুব তৎপর মনে হলো। কিন্তু দারোগা কানে কানে কি বলাতে সুবেদারের গুলি করার কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা গেল না। ইতিমধ্যে মজিবর মাস্টার সাহেব প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে রাতেই আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন এবং আমাকে চিনলেন। তিনি আশ্বস্ত করলেন, যাতে আমাদের কোনো ক্ষতি না হয়। পরের দিন সকালে কিছু অস্ত্রধারী বিহারী আমাদের দেখতে এলো। তাদের মধ্যে দুজন আমার পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ। একজনের নাম কাউয়াল এবং আরেকজন তার ছেলে। এরা নওগাঁ শহরে আমার মামার লেদ ফ্যাক্টরির মিস্ত্রি ছিল। কাউয়াল বললো, আমরা মেজর সাহেবকে বলবো তোমরা নওগাঁর বাসায় রেখে আমাদের জীবন বাঁচিয়েছ।

সকাল ১০টার দিকে নওগাঁ জেলা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান বদিউল আলম জিপ থেকে নেমে হাজতে এসে জিজ্ঞেস করলেন–কোথায় ভাসানীর চেলা ওহিদুর রহমান! কি জন্য পিস্তল নিয়ে আমার বাড়িতে আসা হয়েছিল? আমাকে গুলি করার জন্য? আমার উত্তর ছিল এরূপ যে, আপনি তো আতাউর রহমানের দলের লোক, এক সময় আওয়ামী লীগও করেন। আপনি আমার পার্টিতে প্রায়ই চাঁদা দিতেন। আপনার সাথে আমার কিসের শত্রুতা? আপনার গ্রামের বাড়ি লক্ষণপাড়া তা আমার জানা ছিল না, আপনি শান্তি কমিটির নেতা তাও জানি না। কাউকে মারতে হলে এভাবে কেউ যায়? আর আমার পিস্তলটি অকেজো এবং গুলিও ছিল না। উনি বললেন, 'তা ঠিক। আমি তো হিসাব মেলাতে পারছি না। ঠিক আছে, মেজর সাহেবকে বলবো তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত যেন না নেয়। মেজর বেলুচিস্তানের লোক এবং মানুষ হিসেবে খারাপ না।'

মেজর সাহেব এলেন বিকেল ৪টায়। আমাদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে বললেন (ইংরেজিতে), আজ নয় কাল কিছু কথা হবে। সুবেদারকে আমাদের যত্ন নিতে বলে ক্লান্তিজনিত কারণে বিশ্রামে গেলেন। কাউয়াল বিহারী কিছু পরে এসে বললেন, 'মেজর সাহেবের সাথে কথা হয়েছে, তোমাদের কিছু হবে না।' পরের দিন সকালে বদিউল আলম (শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান) আবার আসলেন। বললেন, 'মেজর যে প্রস্তাব দিবে তা মানলে মুক্তি মিলবে।' কিছু পরে এসে মেজর খুব গরম মেজাজ দেখালেন। সুবেদারকে হুকুম দিলেন আমাদের গুলি করে মেরে ফেলতে। প্রথমে আমাকে বের করে নদীর ধারে বসিয়ে রেখে ফাঁকা গুলি করলো। আমাদের একটা করে দিন যাচ্ছে মনে হচ্ছে এক যুগ পার হয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় দিনে মেজর বললেন, আমি এ ধরনের অত্যাচার-অবিচার বাঙালিদের ওপর করতে চাই না। কিন্তু পাক সরকারের হুকুম। তোমাদের ছেড়ে দেব এক শর্তে, সরকার রাজাকার বাহিনী তৈরি করছে–তোমরা তাতে যোগ দেবে। বদিউল আলমের সাথে তোমরা নওগাঁ যাবে।

আমাদের নওগাঁ নিয়ে এসে বদিউল আলম তার গাঁজা সোসাইটির বাসায় তালা বন্ধ করে রেখে গেলেন। তখন রাত প্রায় ১২টা হবে। একজন অবাঙালি সেন্ট্রিকে পাহারায় রাখা হলো। সে মাতাল অবস্থায় ছিল। গান গাইতে গাইতে ঘুমে অচেতন হয়ে দরজার পাশে পড়ে রইল। শত বছরের

পুরাতন গাঁজা সোসাইটির এই বাসাগুলোর জানালা-দরজা পুরনো জংধরা নড়বড়ে। আমরা খাটের পায়া ভেঙে এবং তা দিয়ে জানালার শিকগুলো আলগা করে বেরিয়ে পড়লাম। রাতদুপুরে রাস্তা একেবারেই ফাঁকা। কাছেই চকদেবপাড়ায় মামার বাসা। মামাকে বাসায় পাওয়া গেল। তাঁর কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে সোজা বিল মনছুরের দিকের রাস্তা। আমার আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনে রাতের অন্ধকারে এসব রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হয়েছে। বিভিন্ন খানাখন্দক পেরিয়ে শেষ রাতে মিরাট গ্রামে আমাদের এক শুভানুধ্যায়ী আবদুল জব্বার প্রামাণিকের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। সারাদিন ঘুমিয়ে কাটালাম। সন্ধ্যায় ঐ গ্রামের কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে পথে ৪/৫টি গ্রাম থেকে আরো কিছু কর্মী সংগ্রহ করে সোজা কয়সা গ্রামে চলে এলাম। পরের দিন সন্ধ্যায় ঐ ২০টি পুঁতে রাখা থ্রি নট থ্রি রাইফেল তুলে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে অবস্থান করতে লাগলাম। আমার সঙ্গের নাটোরের তিন বন্ধু তাঁদের অঞ্চলে কাজ করার জন্য চলে গেলেন। পাকবাহিনী নেওয়ার আগেই আমরা আত্রাই, রানীনগর ও অন্যান্য থানার সচ্ছল কৃষকদের লাইসেন্সযুক্ত বন্দুক, পিস্তল ও টুটু বোর রাইফেল কিছু সংগ্রহ করে বাগমারার ঝিকড়া গ্রামে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। সেগুলো সহকারে পুরো মে মাস ছিল আমাদের কর্মী প্রশিক্ষণের কাজ। পুঠিয়া থানার ঢাকা রোড থেকে নওগাঁ থানার সরল শিকারপুর (প্রায় ৬৫ মাইল), মান্দা থানার প্রসাদপুর থেকে সিংড়া থানার কালিগঞ্জ পর্যন্ত (প্রায় ৫০ মাইল), এদিকে সান্তাহারের সান্ধিরা গ্রাম থেকে নাটোরের নলডাঙ্গা পর্যন্ত (প্রায় ৫০ মাইল) এই বিস্তীর্ণ এলাকায় আমরা বিচরণ করি। যেন কেউ লুটপাট, ডাকাতি ধরনের ঘটনা না ঘটাতে পারে, রাজাকার বাহিনী বা শান্তি বাহিনীতে যোগদান করতে না পারে সেসব ব্যাপারে জনগণকে সজাগ ও সাহসী ভূমিকা রাখার জন্য আমরা তাঁদের উদ্বুদ্ধ করছিলাম। এভাবে রাজশাহীর উত্তর-পূর্বাঞ্চল, নাটোরের উত্তরাঞ্চল এবং নওগাঁর দক্ষিণাঞ্চলে সক্রিয় প্রতিরক্ষামূলক সামরিক কার্যকলাপে লিপ্ত হই। আমরা শুরুতেই এই বিস্তীর্ণ এলাকায় গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক (রেকি পার্টি) গড়ে তুলি। আমরা এসব এলাকার যে কোনো স্থানে মিলিশিয়া, রাজাকার ও পাকবাহিনীর দালালদের খবর পাওয়া মাত্র পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করে আগ্নেয়াস্ত্রগুলো দখল করে নিই। ঝিকড়া, ভবানীপুর, শমসপাড়া, ভবানীগঞ্জ, দুর্লভপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে রেললাইন

ও ব্রিজগুলোতে পাহারায় নিয়োজিত বা ছোট ছোট দলের রাজাকারদের পরাভূত করে আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিতাম। এর মাঝে কিছু রাজাকারকে মুক্তিবাহিনীর চর হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল।

এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আত্রাই থানার গণ্ডগোহালীর বদর রাজাকার। সে কিছুদিন কৃষক সমিতির সদস্য হিসেবে যুদ্ধের আগে আমাদের সাথে ছিল। সে এমনিতে গরিব কৃষক। রাজাকার বাহিনীতে নাম লেখানোর পরে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা তাকে খবর দিয়ে সহযোগিতা করার প্রস্তাব দিই। তাকে মারা হবে না বা প্রয়োজনে মুক্তি বাহিনীতে নেওয়া হবে এ শর্তে সে পাকিস্তানিদের তৎপরতার খবরাখবর দিত। দেশ স্বাধীনের পর সে নক্সাল বাহিনীতে যোগ দেয়। গ্রেপ্তার হয়ে জেলও খেটেছে অনেকদিন।

ইতিমধ্যে আমরা অনেক প্রাক্তন বা পালিয়ে আসা সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসারদের আমাদের বাহিনীর সাথে যুক্ত করেছি। আবার এদের মধ্যে অনেকেই স্থানীয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের গড়ে তোলার সময় অনন্য ভূমিকা পালন করেন। নওগাঁর চণ্ডিপুর গ্রামের প্রাক্তন সৈনিক আবদুল মজিদ ও মুমিন, আত্রাইয়ের কয়সা গ্রামের প্রাক্তন সৈনিক এমদাদুর রহমান ও তাড়াটিয়া গ্রামের ইপিআর মগরেব, রানীনগরের ঝিনা গ্রামের প্রাক্তন সৈনিক মফিজার রহমান, রানীনগর থানার ইপিআর আশরাফ, বাগমারা থানার প্রাক্তন সৈনিক ইয়াছিন, আত্রাইয়ের ভোঁপড়া গ্রামের আনসার কমান্ডার শেখ নছিরউদ্দীনের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা রেগুলার সেনাবাহিনীর আদলে এক হাজারেরও অধিক লোকবলকে সেকশন, প্লাটুন, কোম্পানি ও ব্যাটেলিয়ন সিস্টেমে গড়ে তুলি। এছাড়া প্রায় এক হাজার অনিয়মিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করা হয়। আমরা পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করার পর প্রথমে 'আত্রাই কমিউনিস্ট পার্টি' পরবর্তীতে রাজশাহী জেলার 'আঞ্চলিক কমিউনিস্ট পার্টি' গঠন করি, যার নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক কমিশন তৈরি করা হয় যা আমাদের ফৌজকে রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। এছাড়া চারজনের হাইকমান্ড (ওহিদুর রহমানকে কমান্ডার-ইন-চিফ নির্বাচিত করে আলমগীর কবির, আবদুল মজিদ ও এমদাদুর রহমানকে সদস্য করা হয়) ট্রেনিং ইন্সট্রাকশন, রেকি পার্টি, কোথ, খাদ্যভাণ্ডার সিস্টেম চালু করা হয়েছিল। যদিও স্থায়ীভাবে

আমাদের কোনো হেড কোয়ার্টার ছিল না। তবে মনছুর বিলের মতো বড় বিলের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপের মতো গ্রামগুলোতেই প্রায় হেড কোয়ার্টারের মতো ভূমিকা পালন করত। ভ্রাম্যমাণ অস্ত্রাগার ও খাদ্যভাণ্ডার নৌকাতেই ছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আত্রাইয়ের ন্যাপ নেতা আফতাব মোল্লার নেতৃত্বে একটি টিমকে কিছু অর্থ দিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য ভারতে পাঠাই। তিনি ৭নং সেক্টর কমান্ডার কর্নেল (অব.) কাজী নুরুজ্জামানের নিকট থেকে এক ট্রাক অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বালুরঘাট হয়ে বর্ডারের দিকে রওয়ানা দেওয়ার সময় মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল জলিল খবর পেয়ে ওই ট্রাকটি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বলে আটকিয়ে দেন। আমরা অস্ত্রগুলো পেলে মুক্তিবাহিনীকে আরো ভালোভাবে গড়ে তুলতে পারতাম। জলিল সাহেব যদি জানতে পারতেন আমরা প্রকৃত অর্থে মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত তাহলে হয়তো তিনি আটকাতেন না। উনি পরে জেনেছেন আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং সাফল্য অর্জন করেছি।

আমাদের যুদ্ধাঞ্চলের এই এলাকা দিয়ে পাঁচটি নদী বয়ে গিয়েছে। আত্রাই নদী, ছোট যমুনা, ফকিন্নী (অপর জায়গায় বার্নই), খাজুরা ও নাগর নদী এবং বাগমারার রাণী নদী। আর ছিল বিশাল বিশাল বিল। তার মধ্যে রানীনগর-সান্তাহারের মধ্যে রক্তদহের বিল, নওগাঁ ও রানীনগর থানার বিল মনছুর, দিঘলীর বিল, গুটার বিল, নাটোরের হালতির বিল, আত্রাই থানা ও সিংড়া থানার চলনবিলের একাংশ এবং মান্দার বিলগুলো ছিল প্রাকৃতিক দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য চমৎকার টেরেন বা গেরিলা যুদ্ধের উপযুক্ত ক্ষেত্র। আর এগুলো ছিল পাকবাহিনীর জন্য প্রতিকূলে। সেজন্য এসব দুর্গম এলাকায় তারা ক্যাম্প করতে সাহস পেত না। তবুও পাকবাহিনী রাজাকারদের বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করার নির্দেশ দেয়। আত্রাই থানার গজমতখালিতে, বাগমারা থানার ভবানীগঞ্জে, মান্দা থানার মৈনমে পরীক্ষামূলকভাবে তারা রাজাকার ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয় এবং ব্যর্থ হয়। এ প্রসঙ্গে রাজশাহীর বাগমারা থানার রাজনীতিবিদ সরদার আমজাদ হোসেন *বাংলাদেশে জয় পরাজয়ের রাজনীতি* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে:

"ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বে গড়ে উঠা বাহিনীতে যাঁরা সেদিন আত্রাই, রানীনগর, বাগমারা, নাটোর এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তাঁদের মধ্যে

আত্রাইয়ের আব্দুল মজিদ, এমদাদ, মজিদ, আশরাফ, বেলাল, দুদু, গাঁটু, আকতার মোল্লা ওরফে আতা মোল্লা, আলমগীর, বাগমারার আব্দুল জব্বার সরদার, আবেদ আলী মৃধা, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইসমাইল হোসেন মৃধা, উত্তর একডালার লুৎফর রহমান শাহ, বিহানসীর সদর মৃধা, সেকেন্দার মরহুম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধ সুসংগঠিত হওয়ার পূর্বেই এ গ্রুপ দেশী বন্দুক এবং ছিনিয়ে নেওয়া দু-একটি ৩০৩ রাইফেল ও ছোরা নিয়ে নবগঠিত রাজাকারদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে। প্রথম অপারেশন করে বাগমারা থানার ভবানীগঞ্জে নবনির্মিত দালানঘরে ইউ.পি অফিসে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ভবানীগঞ্জ ও তাহেরপুর হাটে অপারেশনের পর মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল দারুণ ভাবে বেড়ে যায়। নওগাঁ, রাজশাহী, নাটোরের গ্রামাঞ্চলের থানাগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের এক যৌথ কর্মক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। এক থানায় এ্যাকশন করে অন্য থানায় শেল্টার গ্রহণ করার মাধ্যমে যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে জানাজানি ও নিবিড়তা বৃদ্ধি পায়।...বাগমারার প্রয়াত শাহ জাফরুল্লাহ (এম.এন.এ), মকবুল হোসেন এফএফ কমান্ডার, আব্দুল জব্বার সরদার (হাসানপুর) প্রমুখ ওহিদুর রহমানের সাথে যুক্ত হন।...১৬৮ নম্বর পার্টির এফএফ কমান্ডার আলী খাজা, ওহিদুর রহমান, মকবুল কমান্ডার, আত্রাই নাটোরের আবু হোসেন সরদার, সাহেব আলী, আখতারুজ্জামান কখনো যৌথভাবে, কখনো কখনো বা পৃথকভাবে উপরোল্লিখিত এলাকায় যুদ্ধে অংশ নেন। গ্রামাঞ্চলের থানাগুলোর মধ্যে দূর্গাপুর, মোহনপুর, বাগমারা, আত্রাই, রানীনগর, মান্দা, নিয়ামতপুর এবং নাটোরের উত্তরাঞ্চলের এলাকা মূলতঃ হালতী বিলসহ বড় বড় বিলের মধ্যে অবস্থিত। এ এলাকাগুলোতে মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তাঞ্চল হিসাবে ব্যবহার করে। মুক্তিযুদ্ধের শেলটার, প্লানিং, আক্রমণ, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা, প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক বিলাঞ্চলে একটি যৌথ কমান্ডে রূপান্তরিত হয়। ভারতের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং দেশের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোদ্ধারা একই সাথে যুদ্ধের মাঠে লড়াই করছে।" (পৃ. ৯৮-৯৯)

সরদার আমজাদ হোসেন উল্লেখ করেন যে, "যুদ্ধকালে ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বে ৮০০ জন সশস্ত্র বাহিনী এবং ১০০০ স্বেচ্ছাসেবকসহ ২০০০ মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলেন।" এখানেও একটু তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। আমাদের স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা মুক্তিবাহিনীর সদস্য প্রায় ১০০০ এবং

স্বেচ্ছাসেবক প্রায় ১০০০। এই দুই হাজার লোকবল নিয়ে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করি।

আমরা মে-জুন মাসে সামরিক প্রশিক্ষণ যেমন জোরদার করি, তেমনি পাকবাহিনীর দালাল ও সদ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত রাজাকারদের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণমুখী ভূমিকা পালন করে আত্রাই, রানীনগর, নওগাঁর দক্ষিণাঞ্চল, মান্দা, বাগমারা ও নাটোরের উত্তরাঞ্চলে সক্রিয় প্রতিরক্ষামূলক সামরিক কার্যকলাপে লিপ্ত হই। এসব এলাকার বিভিন্ন ধরনের অপারেশনের দিন তারিখ অনেক সময় সঠিক নাও হতে পারে–সেক্ষেত্রে কিছুটা আনুমানিকতার ছোঁয়া লক্ষ করা যাবে। যেমন সম্ভবত ৭ জুন রানীনগর থানার নলদীঘিতে পাকবাহিনীর সাথে আমাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। আগের দিন ৬ জুন আমরা শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা আত্রাই থানার তিলাবাদুরী গ্রামে আশ্রয় নিই। গ্রামবাসী আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। রাতেই বিশা ইউনিয়নের খালপাড়া গ্রামের সামাদ ও পঁইসাওতা গ্রামের সালেকুল খবর দেয় যে, পাকবাহিনী ৭ জুন শমসপাড়া বাজারে (আত্রাই আর্মি ক্যাম্প থেকে ১০ কিলোমিটার পূর্বে) অপারেশন চালাবে এবং রাজাকার ক্যাম্প স্থাপন করবে। ঐ রাতেই ৬০ জনকে বাছাই করে ৩টি পানসী নৌকায় ২০ জন করে শমশপাড়া বাজারের উজানে আত্রাই নদীর কিনারা দিয়ে অ্যামবুশ করার জন্য পাঠানো হয়। কেননা নদীপথে নৌকা করে আসা ছাড়া পাকবাহিনী আসার কোনো পথ নেই। সারাদিন তাঁরা অ্যামবুশ করেছিলেন। গ্রামের মানুষেরা যত্নসহকারে তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু পাকবাহিনী শমশপাড়ায় যায়নি। কিন্তু ঐ ৭ জুন ঘটনা ঘটলো তিলাবাদুরী গ্রামের পার্শ্বের গ্রাম রানীনগর থানার অন্তর্গত নলদীঘি গ্রামে। এই গ্রামটি খুব ছোট। মোট তিরিশ/পঁয়ত্রিশ ঘর মানুষের বাস এবং সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের। কেউ নেই। সবাই ভারতে গেছেন। আমরা তিলাবাদুরী গ্রামে রান্নার আয়োজন করছিলাম। দুপুরে রান্না প্রায় হয়ে এসেছে। শমশপাড়ায় যেসকল মুক্তিযোদ্ধা অপারেশনে গেছেন তাঁরা সন্ধ্যায় এসে খাবেন। আমরা দুপুর ৩টার দিকে খেতে বসবো ঠিক সেই সময় গ্রামের পূর্ব পাড়া থেকে দৌড়ে এসে সেন্ট্রি খবর দিলেন যে পাকবাহিনী দূরে নৌকা রেখে আধা-শুকনা মাঠ পেরিয়ে তিলাবাদুরী গ্রামটির দিকে এগিয়ে আসছে। কি করে তারা আমাদের এখানকার অবস্থানের খবর পেল? পরে শুনেছি তিলাবাদুরী অথবা জামগ্রামের কেউ আত্রাই পাক আর্মি ক্যাম্পে

খবর দিয়েছিল। তারা শমশপাড়া অপারেশনের পরিকল্পনা পরিবর্তন করে আমাদেরকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে। আকস্মিক আক্রমণের মুখে আমরা প্রায় অপ্রস্তুত ছিলাম। আমাদের ইন্সট্রাক্টর সাবেক সেনাসদস্য আবুল মজিদ দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে পার্শ্বের গ্রাম নলদীঘিতে একটি বিচ্ছিন্ন পাড়ার ঝোপঝাড় পরিবেষ্টিত পুকুরপাড়ে আমাদের অ্যামবুশ ধরনের পজিশন নেওয়ার পরামর্শ দিলে আমরা তা গ্রহণ করি। এবং তড়িৎ পজিশন নিয়ে ফেলি। নলদীঘি গ্রামটি পূর্ব-পশ্চিম লম্বা। আমরা পশ্চিম পার্শ্বে। ওরা পূর্ব দিক থেকে গুলি করতে করতে এগিয়ে আসছে। আমাদের পজিশন ওরা বুঝতে পারেনি। আমরা সুন্দর 'আড়' (গাছপালার পশ্চাতে) পেয়েছিলাম। ওদের মার্চ করে আসা দেখতে পেয়েই আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন এবং গুলি ছুঁড়তে শুরু করেন। অথচ কথা ছিল কমান্ডিং অফিসার হিসেবে আমি আমার হাতে থাকা চাইনিজ রাইফেল দিয়ে সেমি-অটোমেটিক কয়েকটি গুলি করলেই তবেই আক্রমণ করা হবে। খুব কাছে পেয়ে গুলি চালাতে পারলে ওদের প্রায় ১০০ জনের মধ্যে অর্ধেকই শেষ হয়ে যেত। ওরা গুলি খেয়ে মাত্র ৩ জন মারা গেল। পালাতে গিয়ে ২ জন পাক আর্মি পুকুরের পানিতে পড়ে ডুবে গিয়ে মারা যায়। সূর্য ডোবার আগেই ওরা ভেগে গেল। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার যুদ্ধে আমাদের অ্যামুনেশন প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও আলমগীর কবিরের এলএমজিটা হারিয়ে যায়। আমাদের খাবারগুলো পাকবাহিনী ডেকচি উল্টিয়ে দিয়ে নষ্ট করে ফেলে। আমরা সারা দিন অভুক্ত। শলিয়া গ্রামের আবুল মেম্বার এবং আমাদের কর্মীদের অনুরোধ করি 'ভাত রান্নার তর সইছে না চাল ভেজে দাও'। তাই খেয়ে আমরা রাত কাটাই। এদিকে শমশপাড়া বাজার থেকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা নলদীঘি গ্রামে এসে না পেয়ে শালিয়া গ্রামে খুঁজে পান। এ যুদ্ধে কিছু ভুলত্রুটি হলেও সম্মুখ যুদ্ধের এটাই ছিল আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। অল্প ক'জন ছাড়া সবারই মনোবল অটুট ছিল। বিশেষ করে প্রাক্তন সৈনিক আবদুল মজিদ, প্রাক্তন ইপিআর মগরেব, দুদু, বেলাল, রাজ্জাক, মান্নান, কাশেম, প্রাক্তন সৈনিক এমদাদুর রহমান, একরামুর রহমান, মোজাহার, আজিজ, আফজাল, পটল, হাবিল, হেলু শেখ, হারু কাশেম, ওয়াজেদ, সৈয়দ আলী, ইয়াদ আলী, টিপু খাঁ, আনিছার, মজিদ, বুদা, বুলু, আজিজ, বুলবুল খুব সাহসী ভূমিকা নিয়েছিলেন। চারদিকে হৈ হৈ

রৈ রৈ ব্যাপার। মুক্তিবাহিনীর জয় জয়কার। দুপুরে খাসির মাংস দিয়ে ভুরিভোজ হলো।

আমাদের গোয়েন্দারা খবর নিয়ে আসলো নাটোর থানার খাজুরা ইউনিয়নে রাজাকারদের উৎপাত শুরু হয়েছে–নির্মূল করতে হবে। আমরা সন্ধ্যা বেলা ছিপ নৌকাগুলো নিয়ে খাল বেয়ে নৌকাগুলো কোনোভাবে টেনে নিয়ে নাটোরের দিকে রওয়ানা দিলাম। এদিকে বন্যার ছোঁয়া তেমন লাগেনি। নৌকা নিয়ে খাল-নদী ছাড়া যাতায়াত করা কঠিন–না নৌকায়, না হাঁটাপথে। এরূপ এক সমস্যার মধ্য দিয়ে আমরা এগোতে লাগলাম। কাশিয়াবাড়ির কাছে আত্রাই নদী হয়ে ভাটির দিকে গিয়ে পাঁচুপুর পার হয়ে বড়ভিটার মুক্তিযোদ্ধা শাহাজান, তাছির ও খালেকদের কাছে পার্শ্বের নাটোর এলাকার খাজুরা ইউনিয়নে রাজাকারদের অবস্থান সম্পর্কে জেনে নিই। ভালো করে রেকি করার প্রয়োজনে ওদের এলাকায় একদিন থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। খাজুরা নদীর দক্ষিণাঞ্চলই খাজুরা ইউনিয়ন। আমাদের রেকি পার্টি মহিষডাঙ্গার ওয়াহেদ মাস্টার, সাত্তার ভাই, পলাশের বাবা আবদুল জব্বার ও মুক্তিযোদ্ধা তসলিম আমাদের সবরকম তথ্য সরবরাহ করেন। ঐ অঞ্চলের অর্থাৎ নাটোর থানার দুর্লভপুরের বাবলু ও সাইদুর রহমান, তেলকুপির রমজান, আমাদের সাথের ওয়াজেদ আলী, পশ্চিম মাঠনগরের আবুল কালাম আজাদ ও রিয়াজ খাঁ, কছির উদ্দীন, আ. মজিদ, পাঁচু, জহির মণ্ডল, এমএ মজিদ, হাসানুজ্জামান ভুলু, ছিদ্দিক সঙ্গীদের সারা দিনের মধ্যে খবর দিয়ে মহিষডাঙ্গা গ্রামে একত্র করা হলো। আমরা জানলাম, খাজুরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইয়াকুব আলী খাজুরার জঙ্গলে রাজাকার ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত করে যাচ্ছেতাই অত্যাচার জনসাধারণের ওপর চালিয়ে যাচ্ছে। জবরদস্তি করে খাসি-মুরগি খাওয়া, মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে আর্মি ক্যাম্পে জোগান দেওয়া এবং লুটপাট ও চাঁদাবাজি করছিল। বেশিরভাগ সময় তারা খাজুরার গহীন জঙ্গলেই অবস্থান করত। এই গ্রামে তখন ছিল বিশাল জঙ্গল বা বনাঞ্চল। প্রায় দেড় মাইল লম্বা এবং আধা মাইল প্রশস্ত গ্রাম। আমাদের মুক্তিবাহিনী সেই ইয়াকুব চেয়ারম্যানের প্রতিষ্ঠিত রাজাকার ক্যাম্প দখলের জন্য অপারেশন চালায়। কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা হলো, এসব স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে রাজাকারদের সাথে একটি ছোটখাটো সংঘর্ষে পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধা আয়ুব আলী রাজাকারদের গুলিতে শহীদ হন। তবে

ঐ এলাকার রাজাকারদের আমরা নির্মূল করতে সমর্থ হই। এখানে অনেক আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। আমরা পাকবাহিনীর আত্রাই আগমনের সময় আহসানগঞ্জ হাই স্কুল থেকে নেওয়া একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন খাজুরা জঙ্গলে পুঁতে রেখেছিলাম। এবার তা উঠিয়ে নিয়ে নৌকা করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অপারেশনের খবর মাঝে মধ্যে সাইক্লো করে প্রচার করতাম। এক পর্যায়ে কালি শেষ হয়ে যাওয়ায় এর কার্যকারিতা আর থাকে না।

নাটোরের মাধনগরে একটি ছোট্ট অথচ চমকপ্রদ ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। মাধনগর গ্রাম হয়ে বাগমারা এলাকায় যাওয়ার পথে আমার খুব পানি পিপাসা লাগে। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা মার্চ করে যাওয়ার পথে পানি দিতে অনেকে দ্বিধাবোধ করলেও কাঁপাকাঁপা হাতে পাঁচ বছরের এক শিশু এক গ্লাস পানি নিয়ে এসে বলে পানি খান। পানি খেয়ে জিজ্ঞাস করলাম, তোমার নাম কি? সে সাহসের সাথে উত্তর দিল–মামুন, সম্ভবত তার মা হবেন আড়াল থেকে বললেন ওর ভালো নাম আব্দুল্লাহ আল মামুন। ওর জন্য দোয়া করো বাবা। বললাম, সেতো 'শিশু মুক্তিযোদ্ধা'। নাটোরের মাধনগরে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে আমার জানা মতে, বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় বা তার আশপাশের জেলায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। মাধনগরের এক কৃতী সন্তান আবদুল আজিজ মৃধা (বাহার মৃধার ছোট ভাই) নাটোরে পাকবাহিনী আসার আগের দিন বাংলাদেশের ম্যাপ সম্বলিত পতাকাটি মাধনগর রেলস্টেশনে একটি বাঁশের সাহায্যে উত্তোলন করেন। আর ঐ পতাকা তৈরি করেন ওখানকার এক সাহসী দরজি আবদুস সামাদ। ২২ এপ্রিলে নাটোর থেকে আত্রাই অভিমুখে যাওয়ার পথে মাধনগর নেমে বাংলাদেশের সেই প্রথম পতাকা পাক আর্মিরা পুড়িয়ে দেয় এবং উন্মাদের মতো চারদিকে গোলাগুলি শুরু করে। স্থানীয় মুসলিম লীগের কর্মী পাঞ্জাবিদের দালাল পশ্চিম মাধনগরের মকলেছুর রহমানকে আচ্ছামতো পিটুনি দিয়ে বলে তোমরা থাকতে বাংলাদেশের পতাকা আসে কোত্থেকে–বলে তাকে সাথে করে নিয়ে যায়। নাটোর থেকে নিয়ে এসে তাকে আত্রাই এলাকার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান বানিয়ে দেয় এবং রাজাকার বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব দেয়। আমরা মাধনগরে দক্ষিণ দিক দিয়ে রেললাইনের ব্রিজের নিচ হয়ে নলডাঙ্গার ধার দিয়ে পশ্চিমে বাগমারা থানার দিকে রওয়ানা দিই। পথে মুক্তিযোদ্ধা

আবুল কালাম আজাদের সাথী রিয়াজউদ্দীন খাঁ, আয়েন উদ্দীন, ব্রহ্মপুত্রের আবু জাফর সিদ্দিক, বাঁশলিয়ার হুসেন আলী শেখ, হজরত আলী খাঁ, মকলেছুর রহমান, সিদ্দিক ইয়ারপুরের মিজানুর রহমান মজনু, তৌহিদুর রহমান, আরমান, নছির, শ্রীবর্দীপাড়ার করিম, ছামাদ, দুলু, রুবেল, হাফিজ, ছামাদ ফকিরসহ আরো অনেককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব মুক্তিযোদ্ধারা অক্টোবরের মাঝামাঝি বন্যার শেষে ব্রহ্মপুত্র হাটে রাজাকারদের ধাওয়া করে এবং ৬টি অস্ত্র কেড়ে নেয়। ভারতীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত এফএফ টিম লিডার রাজশাহীর জাহাঙ্গীর আলমের সাথে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মজনু, আরমান সিদ্দিক, নছির, নজরুল ইসলাম, মুহীত প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে এবং এদের কাউকে কাউকে আমাদের রেগুলার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নাটোর এলাকা ত্যাগ করে রাজশাহীর বাগমারা থানায় পা দিয়ে শুনতে পেলাম বাগমারা থানার বিহারী মিলিশিয়া ও কিছু দালাল পুলিশ খুব অত্যাচার করছে জনগণের ওপর। বাগমারা থানা দখলের পূর্বে আমরা খবর পেলাম আত্রাই থানার প্রায় শেষ মাথায় গজমতখালি বাজারে একটি অস্থায়ী ক্যাম্প রয়েছে–যা তারা আগামীকাল (আগস্টের প্রথম সপ্তাহের কোনো একদিন) গজমতখালি থেকে উঠিয়ে নিয়ে আত্রাই তাদের হেড কোয়ার্টারে ফিরে যাবে। আমরা জানি তাদের ফিরে যাওয়ার একটাই রাস্তা তাহলো বিলের মধ্য দিয়ে গোয়ালবাড়ী গ্রামের ধার দিয়ে আত্রাইয়ের দিকে রওয়ানা দেওয়া। ইতিমধ্যে আমাদের সুপরিচিত ঝিকড়ার আলী খাজা ভারত থেকে ট্রেনিং পাওয়া প্রায় এক কম্পানি মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে এলাকায় ফিরে এসেছে। আলী খাজা (১৬৭নং পার্টি, ১০৪ নং টিম, ভারতের পতিরামপুরে ট্রেনিংপ্রাপ্ত) ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। ১ কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধার (১০০ জনের কাছাকাছি) কমান্ডার। তিনি এসেই বাগমারার কমরেডদের কাছে একসাথে মুক্তিযুদ্ধ করার প্রস্তাব দিলেন। তাঁর পূর্বাপর ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করে আমার কাছে (জুলাই মাসের দিকে) নিয়ে আসা হয়। তিনি স্বীকার করেন আমাদের বামপন্থী গেরিলাদের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া তিনি রাজশাহী মহকুমার পূর্বাঞ্চলে কাজ করতে পারছেন না। আমরা হাই কমান্ড থেকে (ওহিদুর রহমান, আলমগীর কবির, হাবিলদার আব্দুল মজিদ, প্রাক্তন সৈনিক এমদাদুর রহমানের সমন্বয়ে) তাঁর প্রস্তাব বিবেচনা করি এবং যৌথভাবে

অপারেশনগুলোতে অংশগ্রহণ করি। একসাথে নাটোর সদরের গ্রুপ কমান্ডার রমজান ও লুৎফর রহমান আমাদের বামপন্থী গেরিলাদের সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তাব দিলে আমরা সম্মতি জ্ঞাপন করি। রাজশাহী সদরের সাইদুর রহমান এবং আব্দুস সালাম (এফএফ) গ্রুপও আমাদের বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে যৌথভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। বৃহত্তর রাজশাহী জেলার এসব অঞ্চলে বামপন্থীদের প্রাধান্য বেশি থাকায় ভারতীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করতেন।

রসুলপুরের আজমল শেখের গ্রুপ (স্থানীয়ভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত) আমার সাথে থাকা মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে আলী খাজার গ্রুপসহ গোয়ালবাড়ী গ্রামে আমরা অ্যামবুশ করি। আমাদের আকস্মিক গুলিবর্ষণে পাকবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে পালিয়ে যায়, তাদের বেশ কিছু হতাহত হয়। ১০টি রাইফেল ও একটি স্টেনগান এবং বেশ কিছু গুলি উদ্ধার করা হয়। এরপর আমরা বিজয়বেশে গজমতখালি ফিরে গেলাম। এই গ্রামে স্থান সংকুলান না হওয়ায় পাহাড়পুর গ্রামে এবং পাশেই বাগমারা থানার বাগান্না গ্রামে আমরা আশ্রয় নিলাম। এ ধরনের বিজয়ে যেমন আনন্দ আছে তেমনি পাওয়া যায় জনগণের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। গজমতখালির নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা শুকুর আলী (বাবাজী) ও তাঁর ছেলেরা এবং ফজলু, পাহাড়পুরের আশরাফ ডাক্তার ও ইসতুল্লাহ খান এবং বাগান্না গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা কফিল উদ্দীনের আতিথেয়তা ভোলার না। এঁরা আমাদের এত আপন করে নিতে পারলেন যে কয়েক শত মুক্তিযোদ্ধাকে তিন দিন ধরে থাকা-খাওয়ায় বিরক্ত তো হন নাই বরং আরো ২/৩ সপ্তাহ ধরে থাকলে তাঁরা খুশি হবেন বলে আমাদের থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। বাগমারা-মোহনপুর থানার জাতীয় সংসদ সদস্য জাফরুল্লাহ সাহেবের সঙ্গদান এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। তিনি আমাদের এই বিশাল বাহিনীর তদারকের দায়িত্ব যেন নিজে থেকেই পেয়ে গেছেন। তাঁর বিচক্ষণতা ও দক্ষতা আমাদের উপকৃত করে।

যে কোনো বড় ধরনের অপারেশনে যাওয়ার আগে আমরা হাইকমান্ড বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। তবে বাগমারা থানা দখল একটি মেজর অপারেশন বিধায় উপস্থিত গ্রুপ কমান্ডারদের মতামত নেওয়া হয়। গ্রুপ কমান্ডার হলেন–বাগমারা থানার আবেদ আলী, আবুল কাশেম ও আবদুল সামাদ, আত্রাই থানার গ্রুপ কমান্ডার দুদু শাহ, রফিকুল ইসলাম পটল, মোজাহার

হোসেন, খোদাবক্স, আবদুল আজিজ, মগরেব, আবুল কাশেম, আবুল কালাম, রানীনগর থানার গ্রুপ কমান্ডার শাহাদাত আলী (সাদ আলী ভাই), গামা, মফিজার রহমান, আশরাফ আনোয়ার হোসেন বুলু ও নওগাঁ থানার আনছার আলী। পরবর্তীতে আরো কয়েকজনকে গ্রুপ কমান্ডার করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, আমাদের চিকিৎসা বিভাগ, খাদ্য বিভাগ, পরিবহন বিভাগ, গোয়েন্দা বিভাগ, অস্ত্রাগার বিভাগ, অর্থবিভাগ ভাগ ভাগ করে দায়িত্ব দেওয়া ছিল। কমান্ডার এমদাদুর রহমান আর্মি মেডিকেল কোরের প্রাক্তন সৈনিক হওয়ায় চিকিৎসা বিভাগের দায়িত্ব নিলেন। এছাড়া সার্জারির ডাক্তার ছিলেন হাতিয়াপাড়ার ডা. নজর আলী এবং হাটকালুপাড়ার ডা. ধীরেন মৈত্র। এঁরা এলএমএফ ডাক্তার ছিলেন। এমদাদুর রহমান একই সাথে অস্ত্রাগারের দায়িত্বেও ছিলেন–যদিও অস্ত্রাগার বলতে একটি বড়সড় কোষা নৌকাই বোঝায়, যা ছিল ভ্রাম্যমাণ। খাদ্য বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন মহাদীঘির আবদুল মালেক, পরিবহনের দায়িত্বে ছিলেন কালিকাপুরের আবু জাহিদ ও নাসু, গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন আবদুল আজিজ কালু, অর্থ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন আটগ্রামের আবুল কালাম এবং দুর্গাপুরের জব্বার। আমাদের পাসওয়ার্ড একেক জায়গায় একেক রকমের ব্যবহার করা হতো। তবে অপারেশন শেষে সবাইকে ফিরে আসার সময় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা আনছার আলীর কণ্ঠে শিয়ালের ডাক ব্যবহার করা হতো। সে হুবহু শিয়ালের মতো চিৎকার করতে পারত। নতুবা আমার সাথে একটা হ্যান্ডমাইক থাকত তা দিয়ে ঘোষণা দেওয়া হতো।

রেকি পার্টি বা গোয়েন্দা বিভাগে যাঁরা কর্মরত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–আত্রাই থানার মীরাপুরের শাহাজান মাস্টার, মদন ডাঙ্গার গিয়াস, পাঁচুপুরের নজিবর রহমান, কাশিয়াবাড়ির কমলেন্দু কবিরাজ, আন্দারকোটার নূরবক্স ও আনিছার রহমান, জাতোপাড়ার নেজাম, বড় কালিকাপুরের লিয়াকত (বুদা) ও শফির, কয়সার মজিবর মাস্টার, দীঘার নাসিম মেম্বার ও এবাদুর রহমান, জাতআমরুল গ্রামের ইয়াছিন আলী, রসুলপুরের সাইদুর রহমান ও শেখ সাইদুজ্জামান, তিলাবাজুরীর মেছের আলী, সাহাগোলার রেডিও শিল্পী আজিমউদ্দীন, খালপাড়ার আবদুস সামাদ, পঁইসাতার সালেকুল, গজমতখালীর ফজলু, গোয়ালবাড়ীর জমির উদ্দিন, নাটোর থানার মাধনগরের পঁচু ভাই, বাগমারা থানার, দোগলাপাড়ার এম এ

খালেক, আবুল হাশেম ও রহমান, ভবানীগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমান, রানীনগর থানার কৃষ্ণপুরের মকলেছুর রহমান, সগরামপুরের মাখন, নওগাঁ থানার শাহজাহান (উকিলপাড়া), শিকারপুরের ঝনুভাই, মান্দা থানার চকভোলাই গ্রামের রিয়াজউদ্দীন (হো চাচা)সহ অনেকে। পরিবহন বিভাগ বলতে আমাদের কিছু নৌকাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। এগুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন বড় কালিকাপুরের আবু জাহিদ, নাসু, তৈয়বর, বুদা, লিয়াকত, চাঁদ, রকিম, আবুল সেকেন্দার, আশরাফসহ বিভিন্ন গ্রামের প্রায় ৪০০ জন নৌকার মাঝি। জানি না তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন কিনা। আমার মতে, তাঁরাও মুক্তিযোদ্ধা। কেননা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে যাতায়াত করিয়েছেন। এটাও এক ধরনের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা বোঝায়। কাজেই তাঁদেরকে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্র ট্রেনিংও দেওয়া হয় এবং মাঝেমধ্যেই তাঁরা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন।

১৪ আগস্ট পাকিস্তানিদের স্বাধীনতা দিবসে রাজশাহী জেলার বাগমারা থানা দখল একটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন। আগের দিন বাহিনী নিয়ে ভবানীগঞ্জের কাছে আমরা রাত্রিযাপন করি। সারা দিন আমরা শত্রুর গতিবিধির খোঁজ খবর নিই। জানা যায় যে, থানায় কোনো পাক আর্মি নেই। আছে কিছু বিহারী মিলিশিয়া এবং বাঙালি পুলিশ। তারা তথাকথিত পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে মগ্ন। আমরা রাত ২টার দিকে বারনই নদীর পূর্বপাশে পালোপাড়া গ্রামে পজিশন নিই। আমরা সংখ্যায় ১৫০ জন। অপারেশনে বাগমারার ডোগলপাড়া গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুস সাত্তার, নূর মোহাম্মদ, জিল্লুর রহমান, আব্দুল হামিদ, কাশেম (স্বপন), ইয়াছিন আলী, মনসুর রহমান, গাজি রহমান, ইয়াকুব আলী, ঝিকড়ার আব্বাস, ইয়াদ আলী মাস্টার, তাহেরপুরের আবেদ, মাধাইমুরির ডা. আফছার, গুপিনাথপুরের ছলিমত, হোসেন খান, রায়সেন পাড়ার গ্রুপ কমান্ডার আব্দুস সামাদ, সেকেন্দার, ভবানীগঞ্জের ডা. জালাল উদ্দীন, এবং আত্রাই-রানীনগরের শতাধিক কমরেডের ভূমিকা বীরত্বব্যঞ্জক। আমার কমান্ডে ওখান থেকে আমরা গুলি করতে করতে থানার দিকে এগোতে থাকি। আমাদের আকস্মিক হামলার জবাব দেয়ার কোনো সুযোগ শত্রুপক্ষ পায়নি। কয়েকজন

মিলিশিয়া ও পুলিশ মারা গেল, বাকিরা পালিয়ে গেল। একজন পুলিশ কনস্টেবল আমাদের হাতে গ্রেফতার হলো, পরবর্তীতে সে আমাদের সাথে থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বাগমারা থানা দখল করে আমরা ৪০টি আগ্নেয়াস্ত্র পেয়ে যাই। থানা দখল করার পর পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে আমরা বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি।

আমাদের রেকি পার্টি গোপন সংবাদ নিয়ে এসেছে রানীনগর থানার গোনা গ্রামের কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতা খবির মোল্লা আগামী কাল অর্থাৎ ১৬ আগস্ট তার নিজ গ্রামে পাক-আর্মি নিয়ে এসে অপারেশন করবে। আমরা ঝড়ের বেগে ছোট ছোট ছিপ নৌকা নিয়ে প্রায় ২০০ জন মুক্তিযোদ্ধা গোনা গ্রামের দিকে রওয়ানা দিই। পথে আমরা মুক্তিযোদ্ধা মগরেবের গ্রুপ, মোজাহারের গ্রুপ, গামার গ্রুপসহ প্রায় ২৫০ জনকে নিয়ে গোনা গ্রামে উপস্থিত হই। জানা গেল কতিপয় মুক্তিযোদ্ধা হিন্দুদের বাড়িঘর লুটপাটের অভিযোগে খবির মোল্লার বাড়ি ঘিরে রেখেছেন, আমরা তাঁদের চিনতে পারিনি। আমাদের জানার কৌতূহল হলো। আমরা দূর দিয়ে বাড়িটি ঘিরে ফেলি। তার মধ্যে কথিত মুক্তিযোদ্ধারাও পড়ে গেলেন। অভিযোগ শোনা হলো। হিন্দুদের গরু-টিন-ধান-চাল লুটপাটের। কোনো মালামাল পাওয়া গেল না এবং গ্রামের কেউ বললেন না যে খবির মোল্লার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সত্য। খবির মোল্লার পাকবাহিনীর কাছে যাওয়া বা শান্তি কমিটিতে যোগদানেরও কোনো অভিযোগ পাওয়া গেল না। অতএব, তাঁকে নির্দোষ বলে ঘোষণা দিয়ে আমরা বিদায় হওয়ার সময় শুনতে পেলাম ঝিনা গ্রামের আজিজার রহমান হিন্দুদের ধান-চাল-টিন-গরু, বাছুর লুট করেছেন। আমরা কালবিলম্ব না করে তাৎক্ষণিকভাবে ঝিনা গ্রামের দিকে রওয়ানা দিলাম। তিনি লুটপাট করেছেন এরকম কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না।

এরপর আমরা বিল মনছুর মিরাট ইউনিয়নের দিকে রওয়ানা দিলাম। এবং ওই গ্রামে ক্যাম্প স্থাপন করলাম। একদিকে গ্রামটি বেশ বড়সড় এবং গাছপালা ঝোপঝাড় প্রচুর। অনেক লোক নিয়ে লুকিয়ে থাকার সুবিধা হতো। অনেক বিত্তবান কৃষক আমাদের খাওয়া-থাকার ব্যাপারে খুব সহযোগিতা করেছেন। আমরা গোনা ইউনিয়ন থেকে এসে (প্রায় ২ শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা) মিরাট গ্রামে আশ্রয় নিলাম এবং গ্রামবাসীদের নিকট খাবার চাইলাম। মুক্তিযোদ্ধা গেন্দু, মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ওসমান গনি, রহমান,

ইব্রাহিম আকন্দ প্রমুখদের বাড়ি থেকে রান্না করে ভাত-তরকারি স্কুল মাঠে নিয়ে আসা হলো। দেখে অবাক হলাম ইব্রাহিম আকন্দের পুত্র ১০/১১ বছরের বালক আব্দুল কাদের আকন্দ (বর্তমানে কার্ডিওলজির বড় ডাক্তার) ভাত ভর্তি বড় বড় ধামা ঘাড়ে করে নিয়ে এসে আমাদের খেতে দিল। এরা মুক্তিযোদ্ধা না হলেও এদের সহযোগিতার কারণেই মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়েছে। ১৭ আগস্ট আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমাদের স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধারা বিশাল বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। কেউ কেউ এই বাহিনীকে ওহিদুর বাহিনী হিসাবে বলা শুরু করে দিল। নওগাঁর দক্ষিণাঞ্চল, রাজশাহীর পূর্বাঞ্চল, নাটোরের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি থানায় (আত্রাই ও রানীনগর থানায় পাক-আর্মির ক্যাম্প বাদে) আমরা শান্তি কমিটি ও রাজাকার মুক্ত করে ফেলেছি অনেকটা। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের ১৭ তারিখে ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকলেছুর রহমান রাজার একটি বার্তা আমাদের কাছে আসে। আমরা তখন মিরাট, ধনপাড়া, বরখোল, শেখারপুকুর গ্রামে প্রায় সহস্রাধিক মুক্তিযোদ্ধা আশ্রয় নিয়েছিলাম। কমান্ডার রাজা সাহেবের বার্তা দিল স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠা বামপন্থী মুক্তিবাহিনীর সাথে ভারত থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই করার প্রস্তাব। আমাদের হাইকমান্ড প্রস্তাবটিকে ইতিবাচক মনে করে। প্রস্তাবটি যাচাই করার জন্য আমাদের অন্যতম কমান্ডার আবদুল মজিদের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি টিম রাজা সাহেবদের সাথে সাক্ষাৎ করে আমাদের হাই কমান্ডে রিপোর্ট করেন যে তাঁরা আন্তরিক এবং যৌথ কমান্ডে কাজ করতে চান। বিষয়টি চূড়ান্ত করার জন্য আমরা কয়েকজন কমান্ডারদের নিয়ে তাঁদের হাই কমান্ডের সাথে হাসাইগাড়ির তেজবাইন গ্রামে বসে এক সাথে কাজ করার বিষয়টি পাকাপাকি করে ফেলি। বৈঠকে কমান্ডার রাজার সাথে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁর অন্যতম যুদ্ধকালীন কমান্ডারবৃন্দ সর্বজনাব আবদুল মালেক, সিরু মাস্টার, আবু রেজা বিশু, আখতার আহমেদ সিদ্দিকী, নার্গিস, ফারুক, খায়রুল ইসলাম, মহাদেবপুর থানার ময়েনউদ্দীন এবং আফজাল হোসেন প্রমুখ। রাজা আমাদের জানালেন ৭নং সেক্টর কমান্ড এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল জলিল খোঁজখবর নিয়ে জেনেছেন আমরা বামপন্থীরা প্রকৃত অর্থেই মুক্তিযোদ্ধা। যাহোক দুই পক্ষের সমন্বয় করে ঐক্যবদ্ধ মুক্তিসংগ্রাম করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বাঁকাপুরের লোকজন আমাদের থাকতে দিলেন এবং খেতে দিলেন। ওখানে এক রাত কাটিয়ে পরের দিন নওগাঁ থানার মধ্যে আস্তান মোল্লা খ্যাত হাসাইগাড়ি গ্রামে আমরা চলে এলাম। এই গ্রামটি তখন ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং স্থানীয়ভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের একটি মিলনমেলা হয়ে ওঠে। ভারত থেকে আসা কমান্ডারগণ হলেন সর্বজনাব নওগাঁর মকলেছুর রহমান রাজা, আবদুল মালেক, খায়রুল ইসলাম, সিরাজ আনছারী, ময়নুল হক মুকুল, আফজাল হোসেন, মোর্শেদ তরফদার, শফিক খান, শাহ আবু রেজা, আখতার সিদ্দিকী, সিরু মাস্টার, মহাদেবপুরের আবুল হাশেম ও ময়েন, নওগাঁর সামদানী, ইদুল, মন্টু মল্লিক, মুনির আহমেদ, ফারুক, লিডু, বেলাল, আলম, নার্গিস, সিরাজ, আবদুল ওয়াহাব, জাহাঙ্গীর আলম, বল্টু খান, মোয়াজ্জেম হোসেন, মো. সাহজাহান উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে টিম লিডার ইলিয়াসের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। নওগাঁর উত্তরাঞ্চলের প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা জালাল আহম্মদ চৌধুরী মকাই চৌধুরী, ইব্রাহিম হোসেন তারাসহ অনেকের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার খবর আমরা নওগাঁর দক্ষিণাঞ্চলে মাঝে মধ্যে পাচ্ছিলাম। নওগাঁর প্রখ্যাত আইনজীবী মরহুম ইয়ার আলী খাঁ মুক্তারের সুযোগ্য পুত্রগণের মধ্যে চার পুত্র শফিক খান, শহিদুল ইসলাম খান (বল্টু), শরিফুল ইসলাম খান ও সাজুল ইসলাম খান (বুলু) মুক্তিযুদ্ধে কমবেশি বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া নওগাঁ শহরের এবং নওগাঁ আশপাশের কতিপয় মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। তাঁরা হলেন রেজা কাজী, টুটুল, আলফাজ, আঞ্জু, চয়েন, রাজ্জাক, কাদের, পটু, মান্নান, বিশু মাস্টার, হুগলবাড়ির আব্দুল কাদের সিদ্দিকী এবং চকরদেব পাড়ার ফারুক (বাবলু) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। নওগাঁ মহকুমার অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করা, ট্রেনিং দেওয়া এবং সশস্ত্রভাবে তৈরি করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানোর ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন নওগাঁর তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ আব্দুল জলিল। এছাড়া ডেপুটি স্পিকার বয়তুল্লাহ এমপি এবং মান্দার এম.পি.এ এমাজ উদ্দীন প্রামাণিক নওগাঁ থেকে ভারতে আসা অসংখ্য শরণার্থীদের ভারত সরকারের সহযোগিতায় আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত হতে সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন জায়গায় অপারেশনের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য চকপাকুরিয়া, হাসাইগাড়ি, বরখোল,

শেখেরপুকুরসহ বিল এলাকার গ্রামগুলোতে আমাদের প্রায়ই এসে থাকতে হয়েছে। কে বা কারা বরখোলের সেফাতের বাড়িতে ৮টি ৩০৩ রাইফেল, ১০টি বন্দুক ও কিছু গুলি রেখে যায়। সেফাত সেগুলো আমাদের দিয়ে দেয়। চকপাকুরিয়া গ্রামের এক সময়ের মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা এলাহী বক্স এবং আস্তান মোল্লার নাতী মুক্তিযোদ্ধা হজরত আলী মোল্লা মুক্তিযুদ্ধে অনেক অবদান রাখেন। বিশেষ করে আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের দক্ষতা ও আন্তরিকতার অভাব ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় গরু-খাসি জবাই করে বড় বড় ডেকচিতে রান্না করে খাওয়া হতো। আমাদের অনেক লোকবল থাকায় কোনো কোনো সময় বড় বড় গরু জবাই করা হতো। ঝাল মসলাও প্রচুর দেওয়া হতো। আমি পেটের অসুখে খুব ভুগতাম। সেজন্য আমার নৌকায় টিনের চুলায় ঝাল-মসলাহীন রান্না তৈরি করা হতো। নওগাঁর মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ কমান্ডার আখতার আহম্মদ সিদ্দিকী ও পিরোজপুরের এফ.এফ সাহজাহান আমার এত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন যে প্রায়ই তাঁদের নিয়ে একসাথে খেতে হতো।

আমরা বিল মনছুরের মধ্যে কয়েকটি গ্রামে অবস্থান করছি। তারিখটি ছিল ১৯ সেপ্টেম্বর। আমাদের রেকি পার্টি ঝড়ের বেগে ছোট্ট পানসি নৌকাযোগে এসে খবর দিল পাকবাহিনী আত্রাইয়ের বান্দাইখাড়ায় বেলা ১০টার দিকে হত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণ শুরু করেছে। আমরা দুই বাহিনীর প্রায় দুই কম্পানি গিয়ে বান্দাইখাড়া বাজারের প্রায় ৩ কিলোমিটার ভাটিতে তারানগর বাউল্লাতে অ্যামবুশ করবো। আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে তাড়ানগর গ্রামে পৌঁছে গেলাম। গ্রামবাসী কোদাল দিয়ে অস্থায়ী বাংকার করার সময় যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করেছে। বিশেষ করে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা তারানগরের মজিবর রহমান ও লক্ষ্মীপুরের মোবারক খুব বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল। যুদ্ধকালীন কমান্ডার আবদুল মালেকের নেতৃত্বে এক প্লাটুন আগেই অ্যামবুশে অংশ নেয়–আমার ও আবদুল মজিদের নেতৃত্বে এক কম্পানির মতো মুক্তিযোদ্ধা অ্যামবুশে অংশগ্রহণ করি। তারানগর যুদ্ধে আমার গ্রুপের আরো যাঁরা অংশ নেন তাঁদের মধ্যে তাছির, ছামাদ, ছামাদ-২, আবুল জামাই, খোদবক্স, কালাম, সকিম উদ্দীন, দিদার, জব্বার, দুদু, মোজাহার, পটল, কালু, আফজাল, আজিজ, এমদাদ, একরাম, আলমগীর কবির, আনোয়ার(বুলু), আনছার, সাইফুল ইসলাম এলটু, গনি, আলী, গামা,

সান্টু, মফিজ, মফিজ আর্মি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। প্রায় এক ঘণ্টা আমাদের অবস্থান নিতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে এফ.এফ. গ্রুপ কমান্ডার শাহ আবু রেজার গ্রুপ এসে আমাদের সাথে যোগ দেন। একটি বড় কোশা ও ২০/২২টি পানসি নৌকায় প্রায় ২০০ জন পাক সেনা ও রাজাকার বান্দাইখাড়া থেকে ভাটির দিকে এসে আমাদের অ্যামবুশে পড়ে যায়। আমাদের গুলিতে ১টি কোশা ও ৯/১০টি পানসি নৌকা ঝাঁঝরা হয়ে যায়। শত্রুপক্ষের শতাধিক নিহত হয়। পাক বাহিনীর পেছনের ২টি নৌকায় হানাদার বাহিনী নদীর উত্তর পার্শ্বের গ্রাম বাহুল্লাতে নেমে পড়ে এবং আমাদের দিকে তাক করে গুলি ছুড়তে থাকে। গ্রামটি জ্বালিয়ে দেয়। ঐ গ্রামের একজন মারা যান এবং আরো একজন গুলিতে আহত হন (তিনি এখনো বেঁচে আছেন)। পাকবাহিনী গুলি ছুড়তে ছুঁড়তে ভাটির দিকে পালানোর সুযোগ পায়। (সম্প্রতি বান্দাইখাড়ার শহীদদের স্মৃতিফলকে ঘটনার তারিখ ভুল করে ২০ সেপ্টেম্বর লেখা হয়েছে–তারিখটি হবে ১৯ সেপ্টেম্বর।) এ যুদ্ধে জেতার পর আমরা বান্দাইখাড়া গ্রামে যাই। কি সে আহাজারি। সারি সারি লাশ পড়ে আছে, ৩১ জন মারা গেছেন, ৮ জন আহত। আহতদের আর্তনাদ ও ধর্ষিতাদের ক্রন্দনে যেন আকাশ ভারি হয়ে উঠেছে। গ্রামের প্রায় সব বাড়িঘর-দোকানপাট পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। চারদিকে এখনো আগুনের লেলিহান শিখা যেন সবকিছু গ্রাস করতে চাইছে। এর কিছুদিন আগে হানাদার বাহিনী প্রথম দফা ৭ জুলাই এই বান্দাইখাড়াতে লুটপাট, ধর্ষণ ও গোলাগুলি করে। ৮ জন নিহত হন। আমরা তখন যথাসময়ে খবর না পাওয়ার কারণে প্রতিরোধ করতে পারিনি। পরের বার বাগে পেয়ে তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হলো। এরপর পাঞ্জাবিরা আর তাদের ক্যাম্প থেকে নামার সাহস করেনি।

সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে আত্রাই থানার শুটকিগাছার হাটে পাক-আর্মি আসতে পারে শুনে আমরা হাটের মানুষের মধ্যে মিশে থাকি। হাটবাজারের ক্রেতা-বিক্রেতারা মুক্তিযোদ্ধাদের আপনজন মনে করতেন। আমাদের সশস্ত্র অবস্থা দেখে তাঁদের কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না, যেন এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা। সন্ধ্যা পর্যন্ত হানাদারদের দেখা না পেয়ে আমাদের যোদ্ধাদের তুলে নেওয়ার সময় ৪০ জন এফ.এফ ভারত থেকে এসে উপস্থিত হন। একজনের বাড়ি সিংড়া থানার গোয়ালবাড়িয়া গ্রামের মকলেছুর

রহমান সরকার, পাকিসা গ্রামের পংকজ কুমার ভট্টাচার্য এবং গুরুদাসপুর থানার আবু জাহেদ, রেফাত ও ইদ্রিস প্রমুখ। এদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পরের দিন আমাদের একটি বড়সড় বাহিনী (প্রায় ৩০০ জনের) ২৫/২৬টি পানসি নৌকা (মানুষজন বলতেন ঐ দেখ ওহিদুর বাহিনীর ৫২ পানসি, তার অর্থ আমাদের এক থেকে দেড় হাজারের লোকবল নিয়ে ৫২টি নৌকা কখনো কখনো একসাথে চলেছে) নাটোরের ৪০ জন এফ.এফ.সহ সিংড়া থানা দখলের অভিপ্রায়ে মাধনগরের ব্রিজের মধ্য দিয়ে হালতির বিল হয়ে যাওয়ার পথে চলনবিলে প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে পড়ে আমাদের একটি নৌকা ডুবে যায়। ঐ নৌকায় ৩০ জন যোদ্ধা ছিলেন। তাঁরা সাঁতরিয়ে বিভিন্ন নৌকায় উঠে আসেন। আমাদের ঐ নৌকার সবগুলো আগ্নেয়াস্ত্র নৌকার সাথে ডুবে যায়। বৈরী আবহাওয়ার জন্য বিশাল বিল পেরিয়ে থানা দখলের পরিকল্পনা বাতিল করে আত্রাই এলাকায় ফিরে আসি। পরবর্তীতে সিংড়া থানা আক্রমণ করা হয়।

বৃহত্তর রাজশাহী, তথা উত্তরবঙ্গের মধ্যে আমাদের বড় রকমের সাফল্য নওগাঁ মহকুমার আত্রাই থানার সাহাগোলা রেলওয়ে ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া এবং এর ফলে পাক-আর্মি বহনকারী স্পেশাল ট্রেন ধ্বংস হয়ে যাওয়া। খুব সম্ভব ৬ অক্টোবর আমরা যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করি। আমাদের গোয়েন্দা শাখার খবরের ভিত্তিতে মিরাট ইউনিয়ন থেকে আমরা সাহাগোলা ইউনিয়নের মধ্যে চলে আসি। দুই বাহিনীর দুই প্লাটুন ফৌজ নিয়ে আমরা রেললাইনের পাশের গ্রাম তাড়াটিয়া ও ঝনঝনিয়া গ্রামে আশ্রয় নিই। আমাদের কাছে মাইন বা বিস্ফোরক দ্রব্য ছিল না। মকলেছুর রহমান রাজা, আব্দুল মালেক, সিরু মাস্টার, শাহ আবু রেজা, খায়রুল ইসলাম, আফজাল প্রমুখ ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত এফ.এফদের কাছে এসব সরঞ্জামাদি ছিল। আমাদের দিক থেকে আমি এবং আমার বাহিনীর আবদুল মজিদ, প্রাক্তন ইপিআর সদস্য মাগরেব, হেলু শেখ, প্রাক্তন সেনাসদস্য এমদাদুর রহমান ও মফিজউদ্দীন, ফজল, হারু কাশেম, দুদু, ওয়াজেদ, বেলাল, মোজাহার এছাড়া পার্শ্ববর্তী শ্রীরামপুর গ্রামের লুৎফর, তাড়াটিয়ার সোবহান ওরফে লাকী, সাহাগোলার মকবুল হোসেন, আনিছার রহমান (জান্টু), ঝনঝনিয়া গ্রামের সৈয়দ আলী, সামছুল প্রমুখদের সাথে নিয়ে এগোতে থাকি। রাজাকারদের মধ্যে আমাদের গোয়েন্দা বাহিনীর লোক ছিল। তাঁদের খবর

অনুযায়ী পাক-আর্মির একটি স্পেশাল ট্রেন রাতদুপুরে সান্তাহারের দিকে রওয়ানা দেবে। তাড়াটিয়া থেকে যৌথভাবে ৩০/৩৫ জনের একটি গ্রুপ রাজা, মালেক ও আমার নেতৃত্বে রাত ১০টার দিকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে সাহাগোলা রেল স্টেশনের অর্ধকিলোমিটার দক্ষিণে ব্রিজ ও স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় নেমে পড়ি। নৌকা থেকে নেমেই ক্রলিং করে ব্রিজের কাছে গিয়ে ৭ রাজাকারকে আত্মসমর্পণ করাই। এবং খুব দ্রুত ব্রিজের উত্তর পাশের গার্ডারের গা ঘেঁষে ৪/৫ ফিট গর্ত খুঁড়ে এক্সপ্লোসিভ ঢেলে দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে ডেটোনেটর সেট করা হয়। এ কাজে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লেগে যায়। এর মাঝে অপর গ্রুপের ৮/১০ জন ব্রিজের দক্ষিণ পাশে হেভি অ্যান্টি ট্যাংক মাইন রেললাইনের দুই দিকে ফিট করে দ্রুত রেল স্টেশনে পৌঁছে ট্যাংক বিধ্বংসী রকেট লাঞ্চারসহ এলএমজি ও এসএলআর নিয়ে পজিশন নেওয়া হয়। এক্সপ্লোসিভ বার্স্ট করার পর তার শব্দে আশপাশের প্রায় ২/৩ মাইল এলাকা প্রকম্পিত হয়। কিন্তু বিস্ফোরণের শব্দ ছিল খুবই কম, যার জন্য আত্রাই পাকবাহিনীর ক্যাম্প ঘটনাটি আঁচ করতে পারেনি। পাক-আর্মি বোঝাই ৬টি বগিযুক্ত ট্রেনটি এগিয়ে আসছে। ট্রেনের ইঞ্জিনের হেডলাইট নেভানো ছিল। রাতের ঠাণ্ডা বাতাসেও আমরা ঘামছিলাম। হঠাৎ করেই ঘটে গেল ঘটনা। চোখের নিমিষে ভাঙা ব্রিজের ওপর ইঞ্জিনসহ ট্রেনটি উঠার সাথে সাথে আলোর ঝলকানি দিয়ে খাদের অথৈই পানিতে পড়ে ডুবে গেল। প্রায় সাড়ে তিনশত পাক সেনার সলিল সমাধি হয়ে গেল। কিন্তু যেসব সেন্ট্রি ট্রেনের দরজায় দরজায় দাঁড়িয়েছিল তারা কমান্ডো স্টাইলে মাটিতে লাফ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গোলাগুলি শুরু করল। আমরা অস্ত্র উদ্ধারের চিন্তা বাদ দিয়ে দ্রুত নৌকা করে আমাদের আশ্রয়স্থল তাড়াটিয়া গ্রামের দিকে রওয়ানা দিলাম। আত্রাই থেকে সার্চ লাইটে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠল। ২০/২২ মিনিটের মধ্যে আত্রাইয়ের দিক থেকে একটি হেলিকপ্টার ঘটনাস্থলে চলে আসে। এবং বেঁচে যাওয়া পাক-আর্মিদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। আমরা মনে করেছিলাম হানাদার বাহিনী সাহাগোলা রেল স্টেশনের চারধারের গ্রামাঞ্চলগুলো ম্যাসাকার করে ফেলবে। কিন্তু তার কোনো আলামত না দেখে আমরা বিল এলাকায় চলে যাই। কিন্তু ঘটনার পরের দিন দুপুর বেলা শতাধিক পাক-আর্মি ও দুইশোর মতো রাজাকার সাহাগোলা গ্রামে গোলাগুলি করে একজনকে হত্যা, ব্যাপক লুটপাট ও ধর্ষণ

করে। এমনিতে গ্রামটি প্রায় জনশূন্য ছিল। আমাদের উচিত ছিল পুরো এক ব্যাটালিয়ন যোদ্ধা নিয়ে এসে আশপাশে লুকিয়ে থেকে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। আমরা এড়িয়ে গিয়ে ভুল করেছি।

এদিকে আকস্মিকভাবে খবর আসে আত্রাই থানার মহাদীঘি গ্রামের চৌধুরীবাড়ির দুজন সহোদর ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজ ও আলমগীর ছুটিতে বাড়িতে মায়ের সাথে দেখা করতে এসে সুদুপুর গ্রামের রাজাকার কমান্ডার জানার নেতৃত্বে একদল রাজাকার কর্তৃক ধৃত হন এবং নির্মমভাবে তাদের হত্যা করা হয়। আমি ৪/৫টি ছিপ নৌকা নিয়ে প্রায় এক কম্পানি মুক্তিফৌজসহ মিরাট এলাকা থেকে মহাদীঘি গ্রামে যাই এবং শোকে পাথর হয়ে যাওয়া তাদের বাবা মায়ের সাথে দেখা করি। কিন্তু সান্ত্বনার কোনো ভাষা ছিল না। আলমগীর-ফিরোজের মা প্রায় মুর্ছা যাচ্ছিলেন। ঐ গ্রামের পাকবাহিনীর দালাল যে জানা রাজাকারকে খবর দিয়ে নিয়ে আসে তাকে খুঁজে বের করে হত্যা করা হয়। আমরা আবার ফিরে গেলাম অস্থায়ী হেড কোয়ার্টারে।

আমাদের দূত এসে খবর দিলেন বাঘমারা থানার বাঁইগাছা গ্রামে রাজাকার ক্যাম্প থেকে গ্রামগুলোতে অমানবিক অত্যাচার চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিষয়টি রাজা ও মালেককে জানালে তাঁরা যৌথভাবে আক্রমণে রাজি হন। আমরা দুই পক্ষ একত্র হয়ে অক্টোবর ১২ তারিখের দিকে আত্রাই থানার পশ্চিমে গজমতখালি ও পাহাড়পুর এবং বাঘমারা থানার বাগান্না গ্রামে একদিনের জন্য অবস্থান করি। ঐ গ্রামগুলোর লোকজনদের আতিথেয়তার কথা আগেই বলেছি। এবারো তাঁরা আমাদের যত্নের ত্রুটি করেননি। তিন/চার কম্পানিরও অধিক লোকজনের গোপনে রাখা ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা সহজ কাজ নয়। বাঁইগাছা রাজাকার ক্যাম্পটি রাজশাহী জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় রাজাকার ক্যাম্প বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। বাঘমারা থানায় জামায়াতে ইসলামীর শক্তি ভালো থাকায় ভবানীগঞ্জ, তাহেরপুর, বাঁইগাছা ও সোনাইডাঙ্গা ভরট্টো গ্রামে রাজাকার ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। আমাদের তৎপরতার কারণে বিশেষ করে বাঘমারার ঝিকড়ার এফএফ কমান্ডার আলী খাজার বাহিনী (এক কম্পানির মতো) বাঘমারা থানার সর্বত্র কখনো আমাদের বাহিনীর সাথে যৌথভাবে অথবা নিজের বাহিনী নিয়ে রাজাকারদের দাবড়িয়ে বেড়াতেন। বাঁইগাছা ক্যাম্প

আমরা ১৩ অক্টোবর আক্রমণ করি। এফএফ বন্ধুদের ৪টি এলএমজি ও ২ ইঞ্চি মর্টার, প্রায় ৩০টি এসএলআর সেখানে প্রচণ্ড ফায়ার করে। আমাদেরও অনেকগুলো ৩০৩ রাইফেল ও দুটি এলএমজি ব্যবহার করা হয়। আমাদের সাথে রাজা-মালেকের বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা যেমন ছিলেন, আবার বাঘমারা থানার স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা আলী খাজা, মুক্তিযোদ্ধা ফরহাদ মিয়া, রফিক, সাত্তার, নানছোরের কাশেম, দ্বীপপুরের হামিদ, রায়সেনপাড়ার আবদুস সামাদ, দোঘলপাড়ার সাত্তার, নূর, গাজী, হামিদ, ওমর আলী ও তার ভাই আমির হামজা এবং ইয়াকুবসহ ঐ এলাকার অনেকে, তাহেরপুরের গ্রুপ কমান্ডার আবেদ আলীসহ আমাদের শতাধিক ফৌজ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ভোর ৫টার দিকে আমরা আক্রমণ করি– বিকেল ৩ টায় শতাধিক রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। ৩০/৩২ জন নিহত হয়। বাকি ২৫০ জনের মতো পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পাকা বাংকার থেকে রাজাকারেরা আক্রমণ প্রতিহত করছিল। এলএমজির উপর্যুপরি ব্রাশফায়ার এবং মর্টারের গোলার আঘাতে তারা কাবু হয়ে যায়।

এরপর ২৫ অক্টোবর যৌথভাবে মান্দা থানার মৈনম ক্যাম্প আক্রমণ করা হয়। কিন্তু নিজেদের ভুলের জন্য অপারেশন পুরোপুরি সফল হয়নি।

নওগাঁ থানার ভীমপুর ও হাসাইগাড়ি ইউনিয়ন এবং রানীনগর থানার মিরাট ইউনিয়নের অনেকগুলো গ্রাম যেগুলো দেখতে সাগরের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপের মতো যেখানে আমরা অবাধে বিচরণ করতে পারি এবং যেখান থেকে সুযোগ মতো বিভিন্ন জায়গায় অপারেশন করে আবার ফিরে এসে আশ্রয় নিয়ে থাকি। একদিন রাজা, মালেক, সিরু মাস্টার, আফজাল, ফারুক, আখতার সিদ্দিকী, নার্গিস, খায়রুলসহ আমরা কয়েকজন দুটো ছোট ডিঙ্গি নিয়ে নওগাঁর দুর্গাপুর গ্রামের ধার দিয়ে নওগাঁ শহরের পশ্চিম পাশে চকদেবপাড়ার গোরস্তানের কাছাকাছি অবস্থান নিই। সেখান থেকে দুই ইঞ্চি মর্টার দিয়ে নওগাঁ শহরের মধ্যে তাঙ্গ (শত্রুকে ভয় দেখানো) করার জন্য কয়েকটি শেল নিক্ষেপ করা হয়। উদ্দেশ্য শত্রুপক্ষ যেন আতঙ্কিত হয় এই ভেবে যে শহরের আশপাশে আমরা অবস্থান নিয়েছি এবং ব্যাপক সমাবেশ ঘটিয়েছি। আমরা দ্রুত স্থান ত্যাগ করে মিরাট ইউনিয়নের বরখোল গ্রামে চলে আসি যেখানে মজিদ ভাই এবং আবু রেজা শাহর মুক্তিযোদ্ধারা বাংকার তৈরি করে দুবলহাটি ক্যাম্প থেকে পাকবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত

করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কেননা দুবলহাটির রাজবাড়ির ক্যাম্প থেকে পাকবাহিনী যত্রতত্র হামলা চালাচ্ছিল। ইতিমধ্যে ক্যাম্প থেকে গিয়ে পাকবাহিনী "পাকুরিয়া গ্রামের হাই স্কুল প্রাঙ্গণে ঐ গ্রামের লোকদের জমায়েত করে মেশিনগানের গুলি চালিয়ে প্রায় শতাধিক লোককে হত্যা করে।" (*মুক্তিযুদ্ধের ডাইরী*, শাহ আবু রেজা) যেজন্য সরল শিকারপুর, শেখেরপুকুর ও বরখোলসহ ৮/১০টি গ্রামে আমাদের প্রায় ১২০০ ফৌজ পজিশন নেয় যাতে শত্রুরা আক্রমণ করতে আসলে ফেরত যেতে না পারে। বরখোল গ্রামে আক্রমণ করার পাঁয়তারা করে তারা। ওরা দূর থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করলে আমরাও পাল্টা গুলি চালিয়ে তাদের অগ্রযাত্রা রুখে দিতে সক্ষম হই। এরপর তারা নওগাঁ শহরে চলে যায়– আর গ্রামে আসতে সাহস করেনি।

এরপর আমরা ঠাকুর মান্দার দিকে রাজাকারদের নির্মূল করতে রওয়ানা দিই। এই গ্রামে আক্রমণ চালিয়ে তাদের আত্মসমর্পণ করানো হয়। পরানপুরের খলিল রাজাকারের বাড়ি ক্ষিপ্ত জনগণ পুড়িয়ে দেয়। তারাপুর-ঠাকুর মান্দার শান্তি কমিটির টিয়ার শেখকে আমরা ধাওয়া করি। পরবর্তীতে সে কতিপয় মুক্তিযোদ্ধার কাছে আত্মসমর্পন করে। পরে খবর পাওয়া যায় কে বা কারা টিয়ার শেখকে মুক্তিযোদ্ধা বানিয়ে দেয়। খুব সম্ভব ১৪ অক্টোবর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় সোনাইডাঙ্গার ভরট্টো গ্রামে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আলীর বাড়িতে রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে ধূলিসাৎ করে দিই এবং ৭টি ৩০৩ রাইফেল হস্তগত করি। জনাব আলী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরপর কমান্ডার আলী খাজাকে সাথে নিয়ে তাহেরপুর রাজাকার ক্যাম্পে ১০ নভেম্বর হামলা চালিয়ে ক্যাম্প ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ৫টি ৩০৩ রাইফেল ও কিছু গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। ১২ নভেম্বর আলী খাজার সহযোগিতায় বাঘমারা থানার বিহানলী ইউনিয়নের শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ভূগিপাড়ার মীরের বাড়িতে অপারেশন চালানো হয়। কিছু সিভিল গান উদ্ধার হয়।

১৭ নভেম্বর আমাদের একক বাহিনী ও বাঘমারার কিছু স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আমার নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার বাঘমারা থানা দখলের জন্য আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। বাঘমারা থানার আলী খাজা ও তাঁর কম্পানি, রায় সেন পাড়ার আবদুস সামাদ ও আব্বাস, রণশীবারীর কাশেম, দবির,

মগা ও আবেদ, নামকানের আজাহার, ঝিকড়ার লুৎফর, ইজ্জত, সৈয়দ আলী, আকবর, সাত্তার, ভানশিপাড়ার ইয়াছিন, মধ্যঝিনার আনিছার ডাক্তার, ঝাড়গ্রামের আজিজ, ফজেল, করিম, দবির, কালু, রায়নগরের আমিন এবং গুলু, জিয়ানন্দপাড়ার আবেদ ও কায়েম, দ্বীপপুরের সৈয়দ আলী, খালিশপাড়ার ইয়াদ আলী মাস্টার ও আছির, যুগীপাড়ার হামিদ, নূর, মনছুর, ইয়াছিন মিলিটারি, নজরুল, সাত্তার (বিশু), গাজি এবং মকবুলের গ্রুপের কয়েকজনসহ আমরা বামনীগ্রামে পাকবাহিনী আসার সংবাদ পেয়ে ওঁৎপেতে অ্যামবুশ করি। ১১টি পাকবাহিনীর নৌকার মধ্যে অর্ধেকের বেশি নৌকা ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে ৪০/৫০ জন পাকবাহিনী হতাহত হয়। কিছু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। এর দু'দিন পর পাইকারা বড়াইকুড়ি হয়ে ভবানীগঞ্জের পারঘাটে ১৮ নভেম্বর পাকবাহিনীর সাথে একটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। শত্রুপক্ষের কিছু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তারা বাঘমারা থানায় আশ্রয় নেয়। আমরা ভবানীগঞ্জের আশপাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আশ্রয় নিই এবং রানীনগর আত্রাইয়ের দিক থেকে দুদুর গ্রুপ, আশরাফের গ্রুপ, পটলের গ্রুপ, মগরেবের গ্রুপ, মোজাহারের গ্রুপসহ উল্লিখিত বাঘমারা থানার মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে প্রায় ৩০০ জনকে ঐক্যবদ্ধ করে ভালোভাবে ব্রিফিং দিয়ে ২১ নভেম্বর বাঘমারা থানা তিন দিক থেকে আক্রমণ করি। আমরা অবাক হলাম শত্রুপক্ষ এক ঘণ্টাও প্রতিরোধ করতে পারেনি। পরে জানতে পারি পাকবাহিনী ভবানীগঞ্জে আমাদের হাতে মার খেয়ে মাত্র একদিনের জন্য বাঘমারা থানায় ছিল এবং সেখান থেকে মোহনপুর থানার দিকে চলে যায়। ফলে কিছু পুলিশ ও রাজাকার আমাদের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে থানা ছেড়ে পালিয়ে যায়। আমরা থানায় ৪/৫ জন পুলিশের লাশ দেখতে পাই এবং বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করি।

এর পরপর আমরা আত্রাই থানার মধ্যে গজমতখালি, পাহাড়পুর ও দ্বীপচাঁদপুর গ্রামগুলোর দিকে এসে আশ্রয় নিই। সেখানে আমাদের বাহিনীর দূত মারফত জানতে পারি ৭নং সেক্টর কমান্ড থেকে কিছু নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধের রণকৌশল পরিবর্তন করে সরাসরি থানা আক্রমণ ও দখল করার অভিযান চালাতে হবে। নভেম্বরের শেষের দিকে মান্দা থানার ঠাকুরমান্দায় থাকা অবস্থায় নিয়ামতপুর থানা দখলের জন্য মার্চ করি। ততক্ষণ অন্য পার্টির আক্রমণে শত্রুপক্ষ ঘায়েল হয়েছে। নিয়ামতপুর থানায় আমরা মাত্র

৮/১০টি সিভিল গান ও কিছু গোলাবারুদ হস্তগত করি। সেখানে থেকে আমরা অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার হাসাইগাড়ির দিকে ফিরে আসি। এফএফদের জন্য ভারত থেকে কিছু গরম কাপড় আসে। আমাদের স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু শার্টের কাপড় কেনার জন্য বেশ কিছু টাকা আস্তান মোল্লার নাতি শফিউদ্দীন মোল্লার ছেলে জহুরুল সিদ্দিকী মিলনকে (একজন বৃদ্ধসহ) দিয়ে নওগাঁ শহরে পাঠিয়ে দিই। হাসাইগাড়িসহ কয়েকটি গ্রামে তখন প্রায় ৩০/৩২ জন দর্জির বাস। তাঁরা ৩/৪ দিনের মধ্যে ৩শ'র মতো শার্ট বানিয়ে দেবেন বলে ধারণা দিয়েছিলেন। কিন্তু মিলন খালি নৌকা নিয়ে ফিরে এলো। রাজাকাররা সার্চ করে একটি কিশোরের কাছে এত টাকা (সম্ভবত দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা হবে) দেখে ছিনিয়ে নেয়। মুক্তিযুদ্ধে আস্তান মোল্লার গ্রাম হাসাইগাড়ি ইউনিয়নের মানুষের বলিষ্ঠ ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে মিলনের মায়ের রান্নার স্বাদ যেন এখনো আমার মুখে লেগে রয়েছে।

আমরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে আলমগীর কবিরকে এক কম্পানি ফৌজের দায়িত্ব দিয়ে রানীনগর থানা দখলের সম্ভাব্যতা যাচাই করি। অবস্থা অনুকূল প্রতীয়মান হলে তাঁরা আক্রমণ করবেন। গ্রুপ কমান্ডার আশরাফ, সাদ আলী, গামা, সান্টু, গ্রুপ কমান্ডার কাশিয়াবাড়ীর কাশেম তাদের সাথে মিলে ইয়াছিন, সিরাজ, আশরাফ, শফির, আমজাদ, হেলু, হারেস, শাহাদ, জসিমউদ্দীন, আনোয়ার হোসেন বুলু, বক্কার, আনছার আলী, আকু, জরিপ, রানীনগর থানার ওপর হামলা চালান। এ প্রসঙ্গে এবিএম রফিকুল ইসলাম লিখেন যে, "৯ ডিসেম্বর আখতারুজ্জামান রঞ্জু ও হারুন-অর-রশিদের নেতৃত্বে শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা রানীনগর থানা আক্রমণ করেন। প্রায় দুই দিন যুদ্ধ চলার পর ১০ ডিসেম্বর ৫টার দিকে রানীনগর থানা মুক্ত হয়। এ যুদ্ধে মালেক, ইলিয়াস হক এবং কমিউনিস্ট গেরিলা গ্রুপ অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষে ২৫/৩০ জন রাজাকার আত্মসমর্পণ করে এবং অসংখ্য বীরাঙ্গনা মেয়েকে মুক্তিযোদ্ধারা উদ্ধার করেন।" এ যুদ্ধে সবচেয়ে অবাক হতে হয় জনগণের বীরত্বপূর্ণ সহযোগিতা দেখে। এই প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে তাঁরা এসে নিয়মিত মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার ও পানির ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং শত শত মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এ যুদ্ধে আমাদের কমরেড বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদ আলী ভাই শহীদ হন এবং কাশিয়াবাড়ির

কাশেম পেটে গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর আত্রাই থানার মধ্যে হাতিয়াপাড়া গ্রামের ডা. নজরউদ্দীন (এল.এম.এফ) চিকিৎসা দিয়ে সারিয়ে তোলেন।

আমাকে আত্রাই থানা দখলের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। আমার সাথে ছিলেন বাছাই করা ৩ কম্পানিরও বেশি ফৌজ। এই আক্রমণের সময় আমার সঙ্গে ছিলেন মজিদ, দুদু, বেলাল, মোজাহার, আজিজ, সামাদ, আফজাল, আজিজ (কাশিয়াবাড়ি), বুলু (তাড়াটিয়া), বুলু (দাড়িয়াগাতি), এমদাদ, আপিল, মেহের, জানবক্স, মফিজ, মজিবর, মজিবুর (মীরাপুর), আনিছুর, পটল, হামিদুল, সৈয়দ, শাহজান মাস্টার, আবু জাহিদ, আমজাদ, ইয়াদ আলী, ওয়াজেদ, মন্টু, জব্বার, মোতাহার শেখ, ময়েন, বুদু প্রাং, আকবর, দেলবর, বজলুল, আবু কালাম, মনছুর, আজমল শেখ, হেলু শেখ, টিপু (বারী), শমসের, হারু কাশেম, মইনদ্দীন, হাবিল, মগরেব, মজিবর মৃধা, মাহমুদ খন্দকার, সাহার, মান্নান, রাজ্জাক, আকছার, আফজাল, জেকের, সামাদ, নজিবর, খলিল, আবুল, শাখাওয়াত (বাবু), রহিম, লতিফ, ছিদ্দিক, গোলাম, আনোয়ারুল, মনির, মোহাম্মদ আলী, রহমান, সাহেব আলী, আবুল কালাম আজাদ, জব্বার, খোদাবক্স, দিদারবক্স, মকিমউদ্দীন, গুলজার, মতিয়ার, হবিবর (হবি), গিয়াস, নাছের, মান্নান, রাজ্জাক, ওয়াজেদ, গাটু, রসুলপুরের দিদার বক্স মুহুরী, সাইফুল ইসলাম (এল্টু), সাইফুজ্জামান মুক্তা, শফিক ও পুকুরপাড়ার ফললু মোল্লাসহ অনেকে (যাঁদের সবার নাম আজ আর স্মরণে নেই)। এক বিশাল বহর নিয়ে ১৪ ডিসেম্বর আমরা আত্রাই থানা দখলে যাই। কিন্তু এ খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর রানীনগর ক্যাম্পের পাক বাহিনী ও আত্রাই ক্যাম্পের পাক আর্মিরা যৌথভাবে রাতারাতি নওগাঁর দিকে পালাতে শুরু করে। আমরা তাদের ধাওয়া করতে গিয়ে বশির খান নামে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক পাক সেনাকে ধরে ফেলি। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী তাকে হত্যা করা হয়নি। সে ভারতীয় সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। অনেক দিন ছিল সে আমাদের সাথে।

আত্রাই থানার কুখ্যাত রাজাকার কমান্ডার, অসংখ্য নর-নারী হত্যাকারী, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণের হোতা জানা রাজাকারকে আত্রাই থানা পতনের পর তন্ন তন্ন করে খোঁজা হচ্ছিল। বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল সারা এলাকায় আওয়াজ উঠল জানা রাজাকারকে ধরতে হবে। ১৪ ডিসেম্বর

আহসানগঞ্জ হাই স্কুল মাঠে আমাদের দুই হাজার মুক্তিযোদ্ধাসহ প্রায় ৮/১০ হাজার জনসাধারণের আগমন ঘটেছিল। এটা ছিল আমাদের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আত্রাইবাসীর প্রাণঢালা সংবর্ধনা। সেখানে রিয়াজউদ্দীন হেড মাস্টার সাহেব, আবদুল গনি শাহ, বিরিকুসো হাই স্কুলের হেডমাস্টার চয়েন উদ্দীন, ঝিকড়া হাই স্কুলের হেডমাস্টার আতাউর রহমান সাহেব প্রমুখ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রেখেছিলেন। রাতে জাতআমরুল গ্রামবাসী গরু জবাই করে আমাদের দুই হাজার মুক্তিবাহিনীর খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাতেই আমরা আমাদের বাহিনীকে কয়েক ভাগে ভাগ করে আত্রাই থানা, রানীনগর থানা, বাঘমারা থানা, নাটোর থানা, সিংড়া থানায় চিরুনী অভিযান চালানোর জন্য গ্রুপ কমান্ডারদের নেতৃত্বে দুই হাজার বাহিনীকে ছড়িয়ে দিই। নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে সবাই চারদিকে ছুটলেন।

১৫ ডিসেম্বর ভোর ৫টা। জানা রাজাকার মাধনগর রেল স্টেশন ঘরে চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছিল। চাইনিজ রাইফেল টেবিলের ওপর রয়েছে। মাধনগরের স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাগণ যেমন–হাসানুজ্জামান ভুলু, রিয়াজউদ্দীন, বাবলু, সাহজাহান, ওয়ালিউর, করিম, রাজ্জাকসহ আরো কয়েকজন স্টেশন ঘরটি ঘিরে রেখেছে। এমতাবস্থায় আত্রাই থেকে দুদু সাহাসহ ১০/১২ জন মুক্তিযোদ্ধা খবর পেয়ে যথাস্থানে উপস্থিত হন। জানা রাজাকার গ্রেফতার হলো। নির্দেশ ছিল জানা রাজাকারকে যেন হত্যা করা না হয়। প্রথমে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো আত্রাই থেকে ১৪/১৫ কিলোমিটার পশ্চিমে বান্দাইখাড়া বাজারে যেখানে সে পাকবাহিনীকে দুইবার নিয়ে গিয়ে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ করে। যেন লক্ষ মানুষের ঢল। জনতার বাঁধভাঙ্গা আক্রোশের সামনে আমাদের সহস্রাধিক মুক্তিযোদ্ধা হিমশিম খাচ্ছিলেন। আর ঢিল পাটকেলে তার মুমূর্ষু অবস্থা। তাকে কোনো রকমে ভারে করে বয়ে আত্রাই সাহেবগঞ্জ মাঠে নিয়ে আসা হলো। ১০/১২ ফুট উঁচু মঞ্চে জানাকে দাঁড় করিয়ে জনতাকে একনজর দেখানো হলো। মাইক্রোফোনের একটি মাত্র হর্ন ছিল। জনতাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'জানা রাজাকারের কী শাস্তি দেওয়া হবে?' জনতার এক আওয়াজ, 'শেষ করে দাও।' জানা শেষ হয়ে গেল। ব্রহ্মপুর নদীর ধারে ১৬ ডিসেম্বর রাতের প্রথম প্রহরে এলএমজির ব্রাসফায়ারে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বরের মহান বিজয় দিবসে জনতার রায় হলো রাজাকারমুক্ত বাংলাদেশ চাই। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি স্বাধীন দেশের

এই লাখো মানুষের ভালোবাসা অকল্পনীয়–অবিশ্বাস্য। নিজের চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। ফুলে ফুলে বিশাল মঞ্চে আমরা যেন ডুবে যাচ্ছিলাম। অগ্নিদগ্ধ আত্রাইয়ে এত ফুল কোথায় ছিল! কে একজন এসে আমার হাতে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীনতার পতাকা ধরিয়ে দিয়ে বললেন: কমান্ডার সাহেব পতাকা তুলুন। একটি লম্বা বাঁশে বাঁধা পতাকা আত্রাই সাহেবগঞ্জ মাঠে সিও অফিসের সামনে আমরা ক'জন মুক্তিযোদ্ধা মিলে উত্তোলন করলাম। মুক্তি-পাগল জনতার করতালি ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্যালিউট করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পতাকাকে অভিবাদন জানানো হলো। কারা যেন স্লোগান দিল "আত্রাইয়ের লালসূর্য– জিন্দাবাদ।"

একাত্তরের যুদ্ধে যশোর জেলা ইপিসিপি (এম-এল)-এর বীরত্বপূর্ণ লড়াই ও জীবনদান

নূর মোহাম্মদ

[লেখক নূর মোহাম্মদ সম্প্রতী একটি বই প্রকাশ করেছেন। বইটির নাম একাত্তরের যুদ্ধ : যশোরে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)-এর বীরত্বপূর্ণ লড়াই ও জীবনদান। বইটির বিভিন্ন জায়গা থেকে অংশবিশেষ একত্রিত ও কাটছাট করে লেখক নিজেই এই প্রবন্ধটির কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন।]

একাত্তরে ২৫ মার্চের পরপরই বৃহত্তর যশোর জেলায় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী/এম-এল)-এর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা অনেকটা স্বতস্ফূতভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ১৫ জুন জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ শুরু করা হয়। ঘোষিত এই যুদ্ধে আমারাও একটি পক্ষ– এর সোজা অর্থ হলো অন্যান্যদের মতো আমাদের কথাও বলবে এখন বন্দুকের নল। বুলেট, শব্দ, ধোঁয়া ও রক্ত। আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে একমটি সামরিক বাহিনীর অংশ হিসেবে বন্দুক হাতে তুলে নিলাম।

কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নন এমন ছাত্র-যুবক, কৃষক ও মধ্যবিত্তরাও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আমাদের যুদ্ধ ছিল মূলত গ্রামকেন্দ্রিক। ফলে কৃষকরা এই যুদ্ধের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। কৃষক পরিবারের তরুণ-যুবকরাও ব্যাপক হারে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল মার্চের পর স্বল্প অস্ত্র নিয়ে যে যুদ্ধ শুরু করা হয় তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের শত বাধা, শত নির্যাতন এবং শত হত্যাকাণ্ড মোকাবিলা করে প্রায় সাত মাস বহাল রাখতে পারা। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল 'বিপ্লবী কমিটি' গঠানের মধ্য দিয়ে কৃষকের ক্ষমতায়নের চেষ্টা।

শান্তি কমিটির আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে ৮ এপ্রিল কমরেড হানিফ গাজী শত্রুপক্ষের বোমা হামলায় শহীদ হন। সেই শুরু– এরপর পার্টির নেতৃস্থানীয় কমরেড, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীরা ক্রমাগত শহীদ হয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু অবাক করার মতো ঘটনা হলো সহযোদ্ধার মৃত্যু আমাদের বিচলিত করলেও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার শেষ ক্ষমতাটুকু বজায় থাকা পর্যন্ত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা। 'মৃত্যু' কাউকে হতাশায় ম্রিয়মান করেনি, বরং ঘটনাপ্রবাহকে আরো শক্তি যুগিয়েছে– অসম সাহসিকতায় যোদ্ধারা নির্দেশ

না পাওয়া পর্যন্ত পিছু হটতে চাননি। পশ্চাদপসরণের সময়ও ক্রমাগত আক্রমণ প্রতিহত ও জানমালের বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি উপেক্ষা করেই এগিয়ে যেতে হয়েছে।

পাক সেনাবাহিনীসহ শান্তি কমিটি– রাজাকারদের উদ্ভবের সময় থেকে তাদের বিরুদ্ধে এই যে যুদ্ধ শুরু হলো তা চলল অক্টোবর মাসের শেষ দিন পর্যন্ত। দেশের অভ্যন্তরে একটি জেলায় যোগাযোগবিচ্ছিন্ন অবস্থায় হলেও কয়েকটি স্থানে নির্মম এক ক্লান্তিহীন লড়াই চলেছে। মূল যুদ্ধের ক্ষেত্র বাদ দিয়েও দেখা গেছে অন্যান্য স্থানেও কমরেডরা জেলা পার্টির লাইনের ভিত্তিতে নিজেদের মতো করে নানাবিধ দুঃসহ বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে টিকে থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

পাকিস্তান রাষ্ট্র ও তার প্রধান স্তম্ভ সেনাবাহিনী, শান্তি কমিটি-রাজাকারদের বিরুদ্ধেই এই যুদ্ধ চলছিল কঠিন নির্মমতার মধ্য দিয়ে। জুতা নেই, জামা-কাপড়ের অবস্থা করুণ, অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, খাদ্য-বাসস্থানের ব্যবস্থা খুবই দুর্বল– এক কথায় অবর্ণনীয়। ডাল আর ভাত পেট ভরে খেতে পারলেই খুশি। কী দারুণ– কী নিদারুণ সেই কয়েক মাস। স্বাধীনতা ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র-বিপ্লবী উৎসবের মেজাজ– এই তো আমাদের পাথেয়।

এটা ঠিক, আমাদের কয়েকটি সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু সেটাই ছিল আমাদের রাজনৈতিক দিশার কারণও বটে; তা হলো– আমারা জনগণের সঙ্গেই থাকব, তাদের নিয়েই যুদ্ধ করব কিন্তু তাদের ছেড়ে ভারত বা অন্য কোনো দেশে যাব না। এবং এভাবেই মাসের পর মাস যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। কিন্তু আমরা আমাদের অবস্থান থেকে সরে যাইনি।

মার্চ-এপ্রিলে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের তো কোনো বিরোধ হয় নি, তারা ভারতে চলে গেল। কিন্তু সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে মুক্তিবাহিনী-মুজিববাহিনীর সঙ্গে আমাদের উদ্যোগে কোনো সংঘর্ষ এবং তার ফলে কারো জীবনহানির মতো ঘটনা না ঘটা সত্ত্বেও তারা আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিতেই থাকল। অনেক কমরেড শহীদ হয়ে গেলেন, এটাকে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা যাবে না।

প্রস্তাবনা :

মূল বইটি ৪ টি ভাগে বিভক্ত :

প্রথম ভাগ : ভূমিকা; প্রাককথন; পটভূমি; ভারতীয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধ-প্রস্তুতির ধরন ও আওয়ামী লীগ; মুজিববাহিনীর তৎপরতা, প্রবাসী সরকারের অসহায়ত্ব ও বাংলাদেশের জনগণ; দেশের ভেতর থেকেই যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল; দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও একাত্তরের যুদ্ধ; রাজাকার বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড; পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)-এর বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সুপরিকল্পিত আক্রমণ।

দ্বিতীয় ভাগ : যুদ্ধপর্ব; অবতারণা-ক; অবতারণা-খ; যুদ্ধ পরিস্থিতি : মার্চ-এপ্রিল যুদ্ধে অংশগ্রহণ– প্রথম পর্যায়; জেলা কমিটির নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ-দ্বিতীয় পর্যায়; যুদ্ধঃ তৃতীয় পর্যায়-ক; যুদ্ধঃ তৃতীয় পর্যায়-খ।

তৃতীয় ভাগ : পরিশিষ্ট-১; পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গে-ক; পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গে-খ; পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গে-গ।

চতুর্থ ভাগ : পরিশিষ্ট-২; পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী/এম-এল)-এর ১৯৬৭ সালের রাজনৈতিক রিপোর্টের অংশবিশেষ; ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টি সঙ্গে আমার সম্পর্ক: একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

অর্থাৎ মূল যে যুদ্ধপর্ব অধ্যায়টি তার অবস্থান হলো বইটির মাঝখানে।

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে, যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধ সমাপ্তির মধ্য থেকে উদ্ভূত জাতীয় জীবনের সুগভীর সব জটিলতা ১৬ ডিসেম্বের পর সমধান করা হয়নি– ক্রমাগত এইসব জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথমপর্বে ভবিষ্যতের দুর্বিসহ জটিলতা সমূহের মূল উপাদনগুলোর কিছু অংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হাজির করা হয়েছে। উদ্দেশ্যটা ছিল ও আছে পাঠক যুদ্ধের ভেতর প্রবেশ করার আগেই যুদ্ধ ও যুদ্ধের রাজনৈতিক জটিলতা সম্পর্কে যেন একটা নির্দিষ্ট পটভূমিতে অবস্থান নিতে পারেন।

যেমন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শুরু থেকে প্রায় ২৫ বছর পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এদেশের জনগণের রয়েছে এক দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। জেল, জুলুম ছিল নিত্যকার ব্যাপার। কমিউনিস্ট নেতৃত্বের প্রধান অংশই সব সময়ের জন্য হয় জেলে নতুবা পলাতক জীবন। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিরতিহীন সংগ্রামের একটা পরিণতি লক্ষ্য করা যাবে

১৯৭০-এর নির্বাচনের ফলাফলে। কিন্তু হলোটা কি? লক্ষ কোটি মানুষ যেখানে রাজপথে মুখর, চারিদিকে আমরা সবাই যেখানে মুহূর্তেই জীবন উৎসর্গ করার অবিরাম ঘোষণা দিয়ে চলেছি সেখানে পাক বাহিনী কর্তৃক ২৫ শে মার্চের রাতে রাজারবাগসহ ঢাকার বুকে ভয়াবহ সামরিক আগ্রাসন নেমে আসে তা ছিল শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে ঠাণ্ডা মাথায় তৈরি নীলনকশার ফল, বিপরীতে তেমনি ছিল আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ শাসকগোষ্ঠী বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের সামরিক অভিযান ও তার প্রতিরোধ করা সম্পর্কে এক ঐতিহাসিক নির্বিকার মানসিকতা। জীবন তো আমরা দেব কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সামরিক অভিযান শুরু করলে তা প্রতিহত করার কোনো ন্যূনতম পরিকল্পনা না থাকায় জনগণ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েন। আক্রমণের পর যে মনে হলো ২৫ ঘণ্টার মধ্যেই সব উত্তেজনা আতঙ্কে পরিণত হলো এবং ঢাকা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এবং এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা থেকে রাজনৈতিক নাট্যমঞ্চ চলে গেল কলকাতা–দিল্লি। আওয়ামী লীগ সহ অনেক রাজনৈতক দলই তাদের প্রায় সব অনুসারীদের নিয়ে ভারতে আছড়ে পড়ল।

এখানে প্রথম অধ্যায়ের দুটি অংশ উদ্ধৃত করা হলো :

কেনই বা যশোরে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) কয়েক মাস ধরে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারলো। এবং কেনই বা বাংলাদেশের মাটিতেই শেষ পর্যন্ত তাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে গেল তার একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা এখানে পাওয়া যাবে।

যুদ্ধের পটভূমি-১

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) পরিচালিত '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন রণাঙ্গনের সীমানা এবং কোথাও কোথাও এ যুদ্ধ ব্যাপক এবং কোথাও কোথাও তা বেশ সংকুচিত তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে লক্ষ করি– এই যুদ্ধ অবিভক্ত যশোর জেলার মাগুরা থেকে প্রায় সাতক্ষীরার তালা পর্যন্ত (মাগুরা, ঝিনাইদহ, যশোর ও নড়াইলের সব জায়গায় আমাদের পার্টির একই রকম প্রভাব ছিল না) এবং অন্যদিকে পূর্বে তা মধুমতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেখা গেছে, প্রধানত নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ, যশোরের মাইকেল মধুসূদন কলেজ ও মাগুরা শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ থেকে '৬২-র ছাত্র

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র আন্দোলনের মধ্য থেকে বের হয়ে আসেন তাঁরা এই যুদ্ধে এক বড় ভূমিকা পালন করেছেন। ৬৮, ৬৯ ও ৭০ সালেও যাঁরা এইসব কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন তাঁরাও যুদ্ধে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেন।

'৬২-র ছাত্র আন্দোলন ও '৬৯-এর ছাত্র গণ-আন্দোলনে যশোর এমএম কলেজ ছিল কেন্দ্রবিন্দুতে। এই কলেজে কোতোয়ালি, মহেশপুর, কোটচাঁদপুর, কালীগঞ্জ, শালিখা, বাঘারপাড়া, অভয়নগর, নওয়াপাড়া, মনিরামপুর, কেশবপুর এবং এই পথে তালা পর্যন্ত– ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা করতেন। '৬৯-এর ছাত্র গণ-আন্দোলনে যশোরের প্রধান চারটি কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

যা হোক, আমার জানামতে বৃহত্তর যশোর জেলার প্রধান ৩টি কলেজেই ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রশ্নে কেন্দ্রীয়ভাবে ১৯৫২ সালে ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে একচছত্র আধিপত্য বজায় রেখেছে। ঝিনাইদহ কেশবচন্দ্র (কেসি) কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬০ সালে। কিন্তু এখানেও সর্বক্ষেত্রে ছাত্র ইউনিয়নের আধিপত্য বজায় ছিল আগগোড়া। '৬২ পরবর্তী সব আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে ছাত্র ইউনিয়ন।

১৯৭২ পরবর্তী সময়ে ঝিনাইদহ, যশোর, নড়াইলসহ অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব নির্বাচন হয়েছে তার ভোট সংখ্যা ও নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, '৬০-'৭০ দশক পর্যন্ত ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ, কৃষক সমিতি, শ্রমিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা যাঁরা এক সময়ে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন এবং যুদ্ধে কোনো না কোনোভাবে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা কয়েক দশক ধরেই বিভিন্ন দলে বিভক্ত থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনী নেতৃত্বে পিছিয়ে থাকেননি। এবং তাঁদের সুস্পষ্ট সামাজিক ভিত্তি রয়েছে। তবে ঐ সময়কার অনেকেই ক্ষমতার রাজনীতির কাছে তাদের পূর্বের অর্জন ও পরিচিতিকে বিনিময় করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)-এর অস্তিত্ব অনেক বছর আগে থেকেই নেই, তবে পার্টিকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সাল থেকে যে বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মীরা অবিভক্ত যশোরে নানা সংগঠনের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন

তার সংখ্যা কয়েক সহস্র তো বটেই। প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণাসহ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা প্রধানত ১৯৬২ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত একটা সঙ্গতিপূর্ণ ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন। '৭১-এর যুদ্ধে প্রায় সমস্ত অঞ্চলে এই নেতা-কর্মীরা শান্তি কমিটি, রাজাকার ও পাক-বাহিনী মোকাবিলায় কোনো না কোনোভাবে অংশগ্রহণ করেন। শত শত নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা শহীদ হয়েছেন। যার পূর্ণ তালিকা এখনো যথাযথভাবে তৈরি করা যায়নি। ৮ এপ্রিল ১৯৭৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটি সারা দেশের শহীদদের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করে। সেখানে ১৯৭১ সালে যশোরে শহীদদের সংখ্যা বলা হয়েছে ১৯৬ জন। কিন্তু একাধিকবার ফটোকপি হওয়ার ফলে ও কোনো কোনো জায়গায় শুধুমাত্র নামের একটি অংশমাত্র দেয়া থাকায় ওই তালিকাটি অনুসরণ করা হয়নি। পরে তালিকাটি যাচাই-বাছাই করে প্রকাশ করা হবে। এছাড়া ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা কালীগঞ্জের মোফাজ্জেল হোসেন মঞ্জুও একটি তালিকা দিয়েছেন। কিন্তু সেটিও যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করা যায় নি বলে ওই তালিকা অনুসরণ করা হয়নি।

সম্ভব হলে এই অধ্যায়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখিয়ে দেয়া যাবে কেন যশোরের ব্যাপক অঞ্চলে পাক-বাহিনী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে বর্ণিত নেতা-কর্মীরা 'সহজাত-প্রতিরোধ' করতে পেরেছিলেন। রাজনৈতিক বিবেচনায় বলা যাবে, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা প্রধানত আইয়ুবি শাসনের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম করেছেন ও নির্যাতিত হয়েছেন। এমন একটা মনোভাব ছড়িয়ে যায় যে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানেই থাকে– শাসন-শোষণ সেখান থেকেই চলে। ফলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রায় সমার্থক হয়ে ওঠে– যার শুরু মূলত ভাষা আন্দোলন থেকে। ফলে শ্রেণি প্রশ্ন ক্রমান্বয়ে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং এক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ, কৃষক সমিতি ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকাণ্ড যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। এতে করে অবাঙালি তাড়ালেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে– এই অতি সরল বিভ্রান্তিকর এবং ক্ষতিকর প্রবণতাটি গভীরতা পেয়ে যায়; এবং প্রধান ধারায় পরিণত হয়। অর্থাৎ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। মনে হলো পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব

পাকিস্তানের জনগণের লড়াই– এই ধারাটিকে অনেকেই জাতীয়তাবাদ বলে সনাক্ত করলেন। 'একজাতি তত্ত্বের জাতীয়তাবাদ' ও দ্বি-জাতিত্ত্বের জাতীয়তাবাদ-এর উদাহরণ আমাদের সামনেই ছিল। কিন্তু ঐ জাতীয়তাবাদের সাথে ভাষাভিত্তিক জাতি ধারণার পার্থক্য থাকবে সেটাই কাঙ্ক্ষিত।

যদিও অসম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার যে রাজনীতি তা ক্রমাগত বেশি বেশি করে অনুশীলন হতে থাকে। এবং সমাজতন্ত্র ছাড়া যে মুক্তি নেই– এই প্রত্যয় ও ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক তথা ব্যাপক জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে কৃষক সমিতি ও ন্যাপের সুসংগঠিত বিস্তার ঘটতে থাকে। ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনে কৃষক সমিতি দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করে এবং আন্দোলনে বড় ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া রিকশা ইউনিয়ন, মোটর শ্রমিক ইউনিয়নসহ বিশেষ করে অভয়নগর, নওয়াপাড়া অঞ্চলের শিল্প এলাকায় পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। খেলাখুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও বড় ধরনের অগ্রগতি হয়েছিল। সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রভাব দ্রুতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

গড় একটা হিসাব করে দেখেছি ৭০-৭৫ জন যাঁরা '৭১-এর যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। ব্যক্তিগত ও গ্রুপ পর্যায়ে এসব আলাচনা করা হয়। প্রকল্পপন্থী বা আমলাতান্ত্রিক কায়দায় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রথাগত সাক্ষাৎকার পদ্ধতি পরিহার করা হয়েছে। প্রত্যেকে সহযোগিতা করলেও দুজন নাম প্রকাশে দ্বিধা বোধ করেছেন। আগেই বলে নিয়েছি আমার একটি গভীর অনুসন্ধান ছিল, এইসব অংশগ্রহণকারীর কাছে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আমরা দেশে থেকেই '৭১-এর স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য যে যুদ্ধ করেছিলাম তা কি প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে পড়েছে, তাঁরা কি মনে করেন বিরাট অসম যুদ্ধে অংশগ্রহণ যথার্থ ছিল– অথবা ছিল, বিশেষ করে যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বে। ঐ যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের আত্মপ্রত্যয়ে কি ফাটল ধরেছে?

আস্তে আস্তে আলাপ গভীরে গেলে তাঁদের চেহারায় যেসব প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠত সেসবও আমি লক্ষ করার চেষ্টা করি। সে বর্তমান এবং অতীত কেমনভাবে সমন্বয় করেছে ইত্যাদি। নিশ্চয়ই আমি আমার মতো করে একটি

পদ্ধতি অনুসরণ করতে চেয়েছি। কিন্তু আমি বিস্মিত হয়েছি, পুরোটা ভাবতেও পারিনি– তা হলো প্রায়শ কোনো পদ্ধতি প্রয়োগের দরকারই হয় নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে/তারা প্রবল বেগে জেগে উঠেছে। তাঁরা মনে করে জনগণের সামনে থেকে আওয়ামী নেতৃত্ব অপসৃত হওয়ার পরপর যশোরে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) ন্যায্য কাজটিই করেছে। ভয়াবহ বিপদের আশঙ্কার তোয়াক্কা না করে শান্তি কমিটি, রাজাকার ও পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই ছিল যথার্থ। অনেক মূল্যবান জীবন সরাসরি গুলি ও বর্বর নির্যাতনে চিরতরে হারিয়ে গেছে– এ বেদনা যেমন তীব্র, তেমনি মৃত্যুপণ করেই তো লড়েছি– এটাকে আত্মশ্লাঘার বিষয় বলে আজও মনে করে। সব যেন কেমন বর্তমান– আমাদের কারো যেন অতিক্রান্ত সময় গ্রাস করেনি। আমি তো আর আমি থাকছি না– 'আমরা'তে একাকার। এখানে যিনি সমৃতি, তিনিই তো ইতিহাস। এ হলো স্মৃতিময় ইতিহাস। পরিপূর্ণ ইতিহাস লেখা হয়ে ওঠেনি– অথচ স্মৃতির ভারে ন্যুব্জ নয়। আমি ইতিহাস– আমার পাশে বসা সে/তারাও ইতিহাস। এ কোন মৃত অতীত নয়। অবস্থার অনেক অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু আমরা নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে, জনগণের অংশগ্রহণ ও বিপুল সমর্থন না থাকলে অসম যুদ্ধে ছয়-সাত মাস ধরে টিকে থাকতে পারতাম না।

সব অতীত তো ইতিহাস নয়, এ হলো জাতীয় জীবনের ইতিহাসের সেই অধ্যায়, যা বর্তমানে প্রবহমান– অসমাপ্ত যুদ্ধ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে।

আজ সর্বস্তরের নেতা-নেত্রীদের মুখে শোনা যায়, মুক্তিযুদ্ধ এখনো শেষ হয় নি। একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ গড়ে তুলতে হলে '৭১-এর ন্যায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ত্যাগ স্বীকার করে, প্রত্যেককে তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী অবদান রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই কাজটি মুক্তিযুদ্ধের দাবিদারদের হাতে ছেড়ে দিলে চলবে না। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সত্য ও অসত্য উভয়ই জনসাধারণের জানা একান্ত প্রয়োজন। (কাজী নূর-উজ্জামান : *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : একজন সেক্টর কমান্ডারের স্মৃতিকথা*। নির্বাচিত রচনা, পৃ ৬৭, সংহতি প্রকাশন, ২০১৪)

যুদ্ধের পটভূমি-২

যশোরের মাগুরা থেকে সাতক্ষীরার তালা ও পুবে নড়াইল পর্যন্ত মার্চের শেষ

থেকে এপ্রিল মাসের শেষ বা কোথাও কোথাও মে মাস পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলিতভাবে বেশ কিছু জায়গায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা একসঙ্গে কাজ করেছেন।

'১৯৭১ সালে ৫০ মাইল লম্বা চওড়া এই বিস্তীর্ণ এলাকা আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত পার্টির নিয়ন্ত্রণে ছিল।' (বিমল বিশ্বাস, *উজান স্রোতের যাত্রী*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৬, পৃ. ১৬১)। এই বক্তব্য আংশিক ঠিক। কেননা ১৪ সেপ্টেম্বরের আগে মহম্মদপুর ও লোহাগড়ার কিছু অংশ বাদে পার্টি তার সব এলাকা রক্ষা করতে পেরেছিল। ওই ১৪ সেপ্টেম্বর লোহাগড়ার লাহুড়িয়ার ওপরে সম্ভবত ফরিদপুরের আশাশুনি ও লোহাগড়ার মুক্তিবাহিনী একত্রিত হয়ে ব্যাপক আক্রমণ করে এলাকাটি ভেঙে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাক সেনাবাহিনীরসহ শান্তি কমিটি– রাজাকারদের উদ্ভবের সময় থেকে তাদের বিরুদ্ধে এই যে যুদ্ধ শুরু হয় তা চলে অক্টোবর মাসের শেষ দিন পর্যন্ত।

২৫ মার্চের পরপরই আওয়ামী লীগের নেতারা আত্মরক্ষার তাগিদে দ্রুতই ভারতে চলে যেতে শুরু করেন। এই যে হুড়মুড় করে দল ধরে ভারতে চলে যাওয়া– এটা আওয়ামী লীগের পূর্বসিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করার তাগিদ থেকে হয়েছিল তেমন কোনো প্রামাণ্য দলিলাদি এখনো পাওয়া যায় নি। এসব কথা আমরা জেনেছি ওই যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উঁচু পদের অতি দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের লেখার মাধ্যমে। পরে ঘটনাবলি বিকাশ লাভ করেছে, তবে ততদিন যুদ্ধের চরিত্রও পাল্টো গেছে।

যা হোক, যশোর, মাগুরা, নড়াইলসহ অন্যান্য স্থানে ২৫ মার্চের পর পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) ছাত্র ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, ন্যাপ ইত্যাদি সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে আওয়ামী লীগ-ছাত্র লীগের কোনো সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। এমনকি লোহাগড়া থানা ও প্রথমবার খাজুরা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ একসাথেই হয়েছে।

যতই দিন যেতে থাকল আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও ভারতে পাড়ি দিলেন।

পরিস্থিতি ধীরে ধীরে গুণগতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছিল। ভারতে আওয়ামী লীগের অবস্থা দাঁড়াল ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ও ভারতের রাষ্ট্রের কাছে বলতে

গেলে শতভাগ নির্ভরশীলতা।

মঈদুল হাসান বলেন, প্রথম থেকেই পরনির্ভরশীলতা গড়ে উঠেছিল। যখন কোনো দেশের একটি বাহিনীর সংবাদ আদান-প্রদান ও আদেশ-নির্দেশ অন্য দেশের কোনো বাহিনীর মাধ্যমে করা হয়, তখন সেটা সর্বাংশে ওই বাহিনীর নিজস্ব নেতৃত্ব হিসেবে প্রতিভাত হয়।

এবং এ কে খন্দকার মনে করেন– আমি মনে করি, তাদের ওখানে আছি, তাদের অস্ত্র নিচ্ছি, তাদের রেশন খাচ্ছি। ওখানে আমাদের বলার কিছু ছিল না। *(এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এর আর মীর্জা– মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর, কথোপকথান, প্রথমা, ২০১১ পৃ ৫৯, ৫৮)*

সলিমুল্লাহ খান তার *বেহাত বিপ্লব ১৯৭১* প্রবন্ধে ভারতের জাতি সমস্যা ও বাংলাদেশ অধ্যায়ে আহমদ ছফার বক্তব্যের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "আহমদ ছফা এক নম্বর উপপাদ্যের প্রধান অনুসিদ্ধান্ত ভারতের উপর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রায় পূর্ণ নির্ভরশীলতা। মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্ব সংগ্রামের একেবারে শেষ মুহূর্তেও 'শ্রেণিগত দোদুল্যমানতা' ত্যাগ করতে পারে নাই। তার অনিবার্য পরিণতি হয় পাকিস্তানি শাসকদের হাতে আত্মসমর্পণ, নয় ভারতের শাসকশ্রেণির বুকে আশ্রয় গ্রহণ। জনগণের অবিরাম চাপের মুখে পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ প্রায় অসম্ভব হওয়ার ফলে বিকল্প পরিণতিটিই ফল উৎপাদন করেছে।" *(আহমদ ছফা সঞ্জীবনী, ২০১০, পৃ ১০৪)*।

'বাংলাদেশ একটি নতুন জাতি জন্মলাভ করার সংগ্রাম, কিন্তু তার ধাত্রীর কাজ করছিল ভারতের শাসক কংগ্রেস। শেক্সপীয়ার সরণিতে প্রায়-অন্তরীণ আওয়ামী লীগের তাজউদ্দীন মন্ত্রিসভা ছিল একটা উপলক্ষ মাত্র।' (আহমদ ছফা, *রাজনৈতিক প্রবন্ধ*, পৃ ২০১)

কারণ আওয়ামী লীগ সংগত কারণেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনার কথা যেমন ভাবতে পারে না, সেহেতু যুদ্ধের প্রস্তুতিরও কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় নি। এর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বছরের পর বছর প্রশ্ন তোলা হয়েছে– আমিও তুলেছি, আওয়ামী লীগের যুদ্ধ-প্রস্তুতি ছিল না। কথা হলো, থাকবেই বা কেন? আওয়ামী লীগ জনগণের কাছ থেকে ভোট নিয়েছে পাকিস্তান শাসন করবে বলে। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের পর ক্ষমতায় যেতে কেন আওয়ামী লীগ যুদ্ধ-প্রস্তুতি নেবে। ২৫ মার্চের

একটা সময় পর্যন্ত আওয়ামী লীগের আশা জীবন্ত থেকেছে, ইয়াহিয়া তাদের ক্ষমতা দিয়ে দেবে। যদি না দেয়? শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে আওয়ামী লীগ কী করবে? সে প্রশ্ন তো উত্থাপিতই হয়নি– যেখানে প্রশ্ন নেই, সেখানে উত্তর থাকবে কেন?

"মার্চের শুরুতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কখনো স্বায়ত্তশাসনের কথা, কখনো ছয় দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার কথা, কখনো-বা কনফেডারেশনের কথা বলতেন। মার্চের শুরুতে পাকিস্তানিদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতাদের অনেক আলাপ হয়েছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আলাপ কী হয়েছিল, তা কিন্তু সঠিকভাবে কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়নি। আলোচনার পর রাজনৈতিক নেতৃত্বও সংবাদ সম্মেলনে বা জনসমক্ষে খোলাখুলি কিছু বলতেন না। বিশেষ করে ১৬ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে ইয়াহিয়া বা ভুট্টোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কী আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, তা কখনো জানা যায় নি। সবকিছু খোলসাভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় কখনো কখনো রাজনৈতিক নেতাদের মন্তব্য জাতিকে আরও বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। ২১ মার্চ দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়, সেখানে উল্লেখ ছিল, 'সংগ্রামী বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল তাঁর দলের শীর্ষস্থানীয় অপর ৬ জন সহকর্মীকে নিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ১৩০ মিনিট আলোচনা শেষে তিনি ও তাঁর সহকর্মীগণ সহাস্যবদনে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে আসেন। পরে তাঁর বাসভবনে তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। শেখ সাহেব বলেন রাজনৈতিক সংকট সমাধানের পথে তাঁরা এগোচ্ছেন।" (এ কে খন্দকার, *১৯৭১ ভেতরে বাইরে*, ২০১৪, প্রথমা, পৃ. ৩৯)

'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম যে ভারতের নিজস্ব যুদ্ধে পরিণত হল তার পেছনে যে কারণটি সক্রিয় তা হল শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন মধ্যশ্রেণীভুক্ত আওয়ামী লীগের শ্রেণিচরিত্র। বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলধিতল মন্থিত করে ভূখণ্ড জেগে ওঠার মতো প্রতিরোধের প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের নিচের দিকের সামাজিক স্তরসমূহ ঠেলে উপর দিকে উঠে এসেছে। এই জাগরিত জনসংখ্যা এই নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা, দর্শন করে শেখ মুজিব আশান্বিত হওয়ার চেয়ে অধিক আতঙ্কিতই হয়েছিলেন। কারণ শেখ মুজিব তাঁর শ্রেণীর দৌড় কতদূর, লক্ষ্য কোথায়, এদের নিয়ে কতখানি যেতে পারবেন

জানতেন। এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে একচুল এদিক ওদিক হলে কাঁচের তৈজসপত্রের মতো নেতৃত্ব খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে। তিনি সেসব বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা অর্থাৎ যুদ্ধ করবার সংকল্প নিয়ে জেগে ওঠা জাতিকে যুদ্ধ করার প্রস্তুতির দিকে চালিত না করে, তিনি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনার পথে বেছে নিলেন। আলোচনার ছল করে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান থেকে নৌপথে, আকাশপথে সৈন্য এনে ব্যারাক ভর্তি করে চরম মুহূর্তটির অপেক্ষা করছেন। পঁচিশে মার্চের রাত্রে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিস্তব্ধ নগরীর নিরস্ত্র জনগণের উপর যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল কি? তথাপি বাংলাদেশের জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম নির্মূল করা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। জনগণ, হাতের কাছে যা পেয়েছে, তাই দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছে। কামান, বন্দুক, স্যাবর জেটের সামনে বলতে গেলে খালি হাতে কতদূর! খুনি, জল্লাদ ইয়াহিয়া বাহিনীর হাতে মারের পর মার খেয়ে উলঙ্গ অসহায় রিক্ত অবস্থায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। (আহমদ ছফা, *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১১, পৃ. ৩৮৭-৮৮)।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধ-প্রস্তুতির ধরন ও আওয়ামী লীগ

প্রথম পর্ব

'এপ্রিলের প্রথম দিকে প্রতিরোধ যুদ্ধ আস্তে আস্তে ঢাকা বা বিভিন্ন মফস্বল শহর থেকে সীমান্তের দিকে পিছিয়ে যেতে থাকে। স্বল্প শক্তি আর প্রস্তুতিহীন বাঙালি সেনাদের এর চেয়ে বেশি কিছু করার সামর্থ্যও ছিল না।' (খন্দকার, *ভেতর-বাইরে*, পৃ ৬২)

কিন্তু এই সেনাবাহিনী দিয়ে তো আর ভারতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধ শুরু করেনি– করবেই বা কেন?

পুরো ব্যাপারটা তখন ভারত সরকার ও রাষ্ট্রের অধীনে– যা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। তাছাড়া পরিস্থিতি এতটাই নাজুক ছিল যে, 'মোট কথা, যুদ্ধের প্রথম ৯০ দিন গত হয়ে যাওয়ার পরও আমরা নিজেদের গুছিয়ে উঠতে পারিনি। সবকিছুই কেমন খাপছাড়াভাবে চলছিল, অথচ কারোরই আন্তরিকতার অভাব ছিল না।' (ঐ, পৃ. ১১০)

'প্রথম দিকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা গেরিলাদের ভারতীয় বাহিনীর অধীনে রাখা হতো। কেন এটা করা হতো, আমি নিজেও বুঝিনি। এমনকি প্রশিক্ষণের পর গেরিলাদের যেসব অঞ্চলে, অর্থাৎ ভারতীয় সেক্টর এলাকায় পাঠানো হতো, তা আমাদের সদর দপ্তর জানতে পারত না। ভারতীয়রা এটা সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখত।' (ঐ, পৃ. ১০১)

'বিশেষত আমাদের সেক্টর অধিনায়কদের কাছে প্রথম দিকে কোনো অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়নি। ভারতীয়রা সরাসরি আমাদের গেরিলাদের ১০ জনের একটি দলে ভাগ করে প্রতিটি দলে একটি পিস্তল ও ১০টি গ্রেনেড দিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে, পরিকল্পনাহীনভাবে দেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে গেরিলাদের পাঠানোর ফল বেশ খারাপ হয়েছিল। কারণ গেরিলাদের সঙ্গে যে অস্ত্র দেওয়া হয়েছিল, তা দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে কোনোকিছু করা প্রায় অসম্ভব ছিল। আমরা জেনেছি, দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো এসব গেরিলার অনেকেই ভয়ে তার গ্রেনেডটি যেখানে-সেখানে মেরেছে বা ফেলে দিয়েছে। আবার শত্রুর লক্ষ্যবস্তুতে সামান্য একটি গ্রেনেড নিয়ে আঘাত হানতে গিয়ে ১০ জনের কোনো একটি দলের আটজনই শত্রুর গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন।' (*মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর : কথোপকথন*, *পৃ. ৪৬*)।

'ভারতীয়রা আমাদের সেক্টর অধিনায়কদের না জানিয়ে কাজ করত। তারা তাদের ওপরওয়ালাদের নির্দেশে কাজ করত। প্রথমেই তাদের সেক্টর অধিনায়কদের কাছে নির্দেশ পাঠানো হতো। এরপর তারা তাদের কাজ কর, অর্থাৎ এরপর তারা তাদের মতো করে অধীনস্থ অধিনায়কদের কাছে সেই নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য পাঠাত। এতে আক্রমণ তৎপরতায় অনেক অসুবিধা হতো। আমরা আমাদের এই অসুবিধার কথাগুলো বলতে পারতাম না। এটা অনেকটা লুকোচুরির মতো ছিল।' (ঐ, পৃ. ৫৭-৫৮)

'যে সকল তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ভারতের নানা স্থানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত, ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের হাতে কোন ভারী অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করত না। কংগ্রেস সরকার সব ব্যাপারে একটা সংযম রক্ষা করে আসছিল, যাতে করে আলোচনার মাধ্যমে একটা আপোস-নিষ্পত্তির পথ বন্ধ হয়ে না যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গামছাবাঁধা কয়েকটা গ্রেনেড এবং রাইফেল জাতীয় কিছু যন্ত্রপাতি সম্বল করে এপারে এসে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর

বিশেষ কোন ক্ষতিই করতে পারত না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধরা পড়ে প্রাণ দিতে হতো তাঁদের। যাঁরা সাহায্য করতেন তাঁরাও বিপদে পড়তেন। এই অবস্থা পৌনঃপুনিক চলতে থাকলে অবিশ্বাস এবং সন্দেহ তাদের ছেঁকে ধরে– হয়ত ভারত সরকারের পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনো অভিপ্রায়ই নেই। মাঝখানে তাদের প্রাণগুলো বলতে গেলে একরকম অকারণেই খোয়াচেছ।' (আহমদ ছফা, ঐ, পৃ ২০৯)

'সামান্য অস্ত্র দিয়ে ভেতরে পাঠানো এবং কিছু কিছু জায়গায় লুটপাটের জন্য ভারতীয় বাহিনী সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিল। গেরিলাদের যদি সত্যিকারভাবে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করা যেত, তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে তারা একটি কার্যকর বাহিনী হতে পারত। কিন্তু ভারতীয়রা সেটা করতে পারেনি।...

গেরিলাযোদ্ধাদের আমাদের নিয়ন্ত্রণে দেয়ার বিষয়ে শুরু থেকেই ভারতীয় বাহিনীর আপত্তি ছিল।

আমার অভিজ্ঞতা ও বিবেচনার ওপর আস্থা রেখে বলতে পারি যে যুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ বাহিনীর সঠিক নেতৃত্ব নির্ধারণে সক্ষম হয়নি।...

আগেই উল্লেখ করেছি যে ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযান ও লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করত। কেন্দ্রীয় পর্যায়ের হলে পূর্বাঞ্চল কমান্ড অভিযানের তালিকা তৈরি করত আর আঞ্চলিক পর্যায়ের হলে ভারতীয় সেক্টর সদর দপ্তর থেকে তা নির্ধারণ করা হতো। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তরে মুক্তিবাহিনীর অভিযান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ডিরেক্টর অব অপারেশনস মেজর জেনারেল বি এন সরকার। লক্ষ্যবস্তুগুলো জেনারেল সরকারের কার্যালয় থেকে ঠিক করা হলেও মাঝে মধ্যে আমাদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতেন। এ পরামর্শ কিন্তু যুদ্ধের কৌশলগত ছিল না। তিনি আসলে দেশের অভ্যন্তরের কোনো জায়গা বা নদী বা স্থানীয় মানুষজনের মনোভাব সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চাইতেই। সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধের গতি বৃদ্ধি পেলে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণে আমাদের সম্পৃক্ততা কিছুটা বেড়ে যায়। কিন্তু তা হলেও এটা দেখা যাচ্ছে ওয়ারলেসের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাহিনীগুলোর কোনো আলাদা ব্যবস্থা ছিল না।...

২৫ মার্চে পাকিস্তানিদের আক্রমণ এবং এর ফলে বাঙালিদের প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দুটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রথমত, এই যুদ্ধ

শুরু হয়েছিল কোনো প্রকার রাজনৈতিক নির্দেশ ছাড়াই। যদি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে যুদ্ধ শুরু হতো, তাহলে এই যুদ্ধের ফলাফল ভিন্ন হতো। দ্বিতীয়ত, বাঙালিদের আক্রমণের প্রথম দিকটি ছিল নিজেদের রক্ষার উদ্দেশ্যে।' (খন্দকার, ঐ, পৃ ১০৭, ১১৯, ১২৯, ৪৮)

'একটা বিশেষ বিধি যেমন রণক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগের বিঘ্ন ঘটলে যুদ্ধ পরিচালনা দুরূহ হয়ে ওঠে। মুক্তিবাহিনীর কোনো সংযোগই ছিল না। সেক্টরের সাথে সাব-সেক্টরের সংযোগ ছিল সংবাদবাহকের মাধ্যমে। এক সেক্টরের সাথে আরেক সেক্টরের কোনো সংযোগ ছিল না। মুক্তিবাহিনী ও গেরিলাদের একবার অপারেশনে নামিয়ে দিয়ে তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের কোনো সংবাদই পাওয়া যেত না। তবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের সিগন্যাল কোরের সাহায্যে ওয়ারলেসের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করে দেবার চেষ্টা করত। আমি কয়েকবার চেষ্টা করেছিলাম এই বেতার সংযোগের মাধ্যমে জেনারেল ওসমানীর হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করতে। আমার প্রেরিত সংবাদ ভারত কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত হলেই সেটা পাঠানো হতো।' (*কাজী নূর-উজ্জামান, নির্বাচিত রচনা*, সংহতি প্রকাশন, ২০১৪, পৃ. ১১১)

যদিও দেখা গেছে আরো পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে ভারতের যুদ্ধ পদ্ধতি সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

'প্রায় আগস্ট পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে ভারতের কৃচ্ছ্র এবং এর পাশাপাশি বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে গড়িমসির ফলে ভারতের প্রকৃত মনোভাব সম্পর্কে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর অনেকের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ভালোভাবেই দানা বেঁধেছে।' *(মঈদুল হাসান, মূলধারা '৭১, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমেটেড, ১৯৯৫, পৃ. ১৪২)*

'মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যাশিত সাফল্য না আসায় আমাদের নিয়মিত বাহিনীর সদস্যসহ অনেকের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবের জন্ম নেয়। বাংলাদেশের সেক্টর অধিনায়করা কিছুই জানেন না। অথচ গেরিলারা ভেতরে যাচ্ছে এবং অসহায়ভাবে নিহত হচ্ছে।' *(খন্দকার, ভেতরে-বাইরে, পৃ. ১০৮)*

'সেপ্টেম্বর মাসের শেষে গেরিলা যোদ্ধারা আমাদের সেক্টরের নিয়ন্ত্রণে আসার পর সংশ্লিষ্ট সেক্টর অধিনায়করা গেরিলাদের জন্য বাংলাদেশের

অভ্যন্তরে অভিযানের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ ও এর জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র প্রদান করতেন।' (খন্দকার, ঐ, পৃ. ১০৮)

মহিউদ্দিন আহমদের ভাষায়– 'পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে আসা সৈনিকরা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তি। তারা অধিকাংশই যুদ্ধ করেছেন ভারতের মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন শিবির থেকে। যুদ্ধের পর তাদের অনেকে প্রচণ্ড ভারতবিরোধী মনোভাব নিয়ে দেশে ফিরে আসে। ব্যতিক্রম ছিলেন জিয়াউর রহমান।' (মহিউদ্দিন আহমদ, *জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি*, প্রথমা, পৃ. ৫৫-৫৬)

এখানে কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলো স্বল্প সময়ের মধ্যেই তো সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের সব বুঝে যাওয়া উচিত যে, ভারতে তাদের অবস্থা কী? ভারতের সেনাবাহিনী কোনো দুর্বল সেনাবাহিনী নয়– পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে যাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছিলেন তাঁদের বড়জোর একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে দেয়া যেতে পারে। এর বেশি তারা ভাববে কেন। বরং মনে হয় সম্ভবত সেপ্টেম্বরের শেষ এবং অক্টোবর থেকে তারা মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রমকে বেশি গুরুত্ব দিতে পারে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ যে, ভারতের হাতে গিয়ে পড়েছিল সে সম্পর্কে সলিমুল্লাহ খান লিখছেন, "আহমদ ছফার মতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ফলাফল দেশের জনগণ বা জাতি নয়, অপরে আত্মসাৎ করেছে। তার কারণ? বড় কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গিয়ে পড়েছিল ভারতের হাতে। ছফার কথায় : 'ভারতের শাসকশ্রেণীর যুদ্ধে' পরিণত হয়েছিল। তার কারণ বাংলাদেশের শাসক মধ্যবিত্ত শ্রেণি শুরু থেকেই তার জাতিসত্তা চিনতে পারে নাই।" *(সলিমুল্লাহ খান সম্পাদিত, বেহাত বিপ্লব ১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ ১০২)*

আহমদ ছফার মতে, 'ভারত সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের চরিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে যায়।' তাঁর কথায় : 'শেখ মুজিবুর রহমানের দোদুল্যমান নেতৃত্ব জাতিকে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জনের পুরোপুরি গৌরব থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করেছে এবং ভারতের সহায়তায় স্বাধীনতা অর্জনের মাশুল অনেকদিন পর্যন্ত শোধ করতে হবে বাংলাদেশকে।' (ছফা, ২০০০ পৃ ২৯)

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে ভারতের শাসকশ্রেণীর নিজস্ব যুদ্ধে পরিণত হলো,

পরিণত হলো মার্কিন-রুশ দাবা খেলার টুর্নমেন্টে, তার কারণও আহমদ ছফা খুঁজেছেন সমাজবিজ্ঞানের পথে।' *(সলিমুল্লাহ খান, আহমদ ছফা সঞ্জীবনী, জাতীয় সাহিত্য ১, আগামী প্রকাশনী, ২০১০, পৃ ৬১)*

যাই হোক যুদ্ধের সার্বিক অবস্থার যে খোঁজখবর পাওয়া যায় সেখানে সেক্টর কমান্ডারদের বড় ধরনের সাফল্যের তেমন বিবরণ পাওয়া যায় না। দেখা যায়, ব্রিগেডগুলো মুক্তিযুদ্ধকালে প্রথাগত যুদ্ধ করতে গিয়ে বিপদ বেড়েছে। খন্দকার বলেন, 'ব্রিগেডগুলো মুক্তিযুদ্ধকালে প্রথাগত যুদ্ধ করেনি, যদিও তাদের সৃষ্টি হয়েছিল সে কারণেই। ব্রিডেগগুলোতে নতুন ও পুরনো ইউনিট ছিল আটটি। এগুলোর বেশিরভাগই ইউনিট হিসেবে যুদ্ধ করেনি। যে দু-তিনটি ইউনিট যুদ্ধ করেছিল, তাদের সাফল্যও খুব একটা উল্লেখযোগ্য ছিল না। বরং প্রথাগত যুদ্ধ করতে গিয়ে তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথাগত যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ায় আমাদের কী ক্ষতি হয়েছিল, তার একটি বর্ণনা দিলাম।

৩১ জুলাই জেড ফোর্স প্রথম বর্তমান জামালপুর জেলার কামালপুর বিওপি আক্রমণ করেন। আক্রমণের অংশ নেয় জেড ফোর্সের অধীন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। এই আক্রমণে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সফল হয়নি। উল্টো তাদের বহু সৈনিক শহীদ হন।... ১১ নম্বর সেক্টরকে নিয়ে মেজর তাহেরও এই কামালপুর বিওপি আক্রমণ করে সুবিধা করতে পারে নি। তিনিও ব্যর্থ হন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে শুরু হওয়ার পর কামালপুর দখল করতে ভারতীয় বাহিনীকেও বেশ বেগ পেতে হয়। এ ধরনের কনভেনশনাল যুদ্ধ আমাদের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে। দৃঢ়ভাবে প্রতিরক্ষায় থাকা শক্তিশালী শত্রু অবস্থান গেরিলা যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে সঠিক নয়। আমরা তা ভুলে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছি। কামালপুর ছাড়াও নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে ব্রিগেডের ইউনিটগুলো বেশ কয়েকটি আক্রমণ রচনা করেছে। দু-একটি ছাড়া কোনোটাতেই কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি। ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত ব্রিডেগগুলো যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য দেখাতে পারেনি।' *(খন্দকার, ঐ, পৃ. ১২৪-১২৫)*

"ভারত সীমান্ত থেকে গেরিলা অপারেশনের সময় আমি একাধিক সাব-সেক্টরে রাত্রিযাপন করে প্রত্যুষে অপারেশন শেষে ফিরে আসা ছেলেদের সঙ্গে গল্পের ছলে তাদের কাছ থেকে বিগত রাতের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা

করতাম। ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে জেসিও কর্তৃক বিবরণের সাথে ছেলেদের বিবরণে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। ভারত সীমান্তে প্রবেশ করে জেসিওরা একটি নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়ে ছেলেদের এগিয়ে দিত। অর্থাৎ তারা নিজেরা কোনো 'রিস্ক' নিত না এবং এ কারণে ছেলেদের অপারেশনের ওপরে জেসিওদের কোনো কর্তৃত্ব থাকত না। এসব দেখেশুনে আমি মেজর নাজমুল হুদাকে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের থেকে নেতা নিযুক্ত করে নেতৃত্বের দায়িত্ব তাদের দেয়ার পরামর্শ দেই।"

'একসময় আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে ইপিআরের এমনকি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মুষ্টিমেয় সদস্যের মধ্যে যারা যত সিনিয়র তারা তত কাপুরুষ। এরা ক্যাম্পে হম্বিতম্বি করে ছেলেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারদর্শিতা দেখালেও অপারেশনে না যেতে তারা বহু অজুহাত দেখাত এবং গেলে সাহসিকতার পরিচয় দিতে সক্ষম ছিল না। অবশ্য এ কথাও ঠিক, তারা সবাই যে কাপুরুষ তা নয়। ব্যতিক্রমও ছিল।' *(কাজী নূর-উজ্জামান : ঐ, পৃ. ৮০)*

সামরিক বিবেচনায় কে কতটা কাপুরুষ সেকথা একজন সেক্টর কমান্ডার নিজের ভাষায় বলতে পারেন। কিন্তু দেখা যাবে সমগ্র বিষয়ের মধ্যেই একটা রাজনীতি কাজ করেছে। সেটা হলো যুদ্ধপরবর্তী অধ্যায়কে বিবেচনায় আনা। মৃত্যু এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে কেন অহেতুক মৃত্যু?

'একাধিক এমপিকে সাব-সেক্টরে অবস্থান নেয়ার প্রস্তাব দিলেও তা তাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি। বলতে শোনা গিয়েছিল যে তাঁদের জীবন নাকি অনেক মূল্যবান। সাব-সেক্টরে গিয়ে তাঁরা তাঁদের জীবন বিপন্ন করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এই অনুপস্থিতির কারণে আওয়ামী লীগের রাজনীতি মুক্তিবাহিনী সদস্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অন্যদিকে সাব-সেক্টরের কমান্ডারদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি সংক্রান্ত তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছিল। এই পরিস্থিতিতে মুক্তিবাহিনীতে নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তা গড়ে উঠতে শুরু করে, যা আওয়ামী লীগের অনুকূলে ছিল না। ভারতের ইন্টেলিজেন্স বিভাগ ওটা আঁচ করতে পেরেছিল।

'উপরোক্ত কারণেই মুক্তিবাহিনীকে ভারি অস্ত্রাদি সরবাহ করা হতো না। স্বাধীনতা যুদ্ধ দীর্ঘায়িত না করার কৌশলই ভারতকে অবলম্বন করতে হয়। মুক্তিবাহিনীকে কন্ট্রোলে রাখা ছাড়াও বিশ্বপরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কালক্ষেপণ

না করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপও জরুরি হয়ে পড়ে।' (ঐ, পৃ. ১১৭)

আহমদ ছফাও মনে করেন, 'ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ পাকিস্তানি সৈন্যের কবলমুক্ত হয় এবং স্বাধীনতা লাভ করে।' (আহমদ ছফা, ২০১১, পৃ. ২২০)।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্পর্কে আমি মনে করি, সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাঁরা তাঁদের দক্ষতা দেখিয়েছেন। নভেম্বরের একেবারে প্রথম দিকে যৌথ অভিযান শুরু হলে বাংলাদেশ বাহিনী যুদ্ধে তাদের যথাযথ যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। অবশ্য এইসব সশস্ত্র শক্তি সঙ্গে নিয়েই আমরা ভারতে না গিয়ে দেশের মাটিকে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করতে পারতাম। ব্রিগেডগুলো যেসব ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে তার একাধিক কারণ রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্ব

'অক্টোবর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধি, অধিক সংখ্যায় অস্ত্রশস্ত্র প্রদান, সেই সঙ্গে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়।' (*মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর*, কথোপকথন, ২০০৯, পৃ. ৮৯)ৎ

এটা বলা যেতে পারে, প্রাথমিক পর্যায় শেষ হতে প্রায় ছয় মাস সময় পার হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পর্বের শুরুর পেছনে ৯ আগস্ট ১৯৭১ ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মৈত্রী চুক্তির প্রভাব থাকতে পারে। চুক্তিটির পুরো নাম হলো : The treaty of Pcace. Friendship and Cooperation between The Union of Soviet Socialist Republics and The Republic of India. New Delhi, August 9, 1971

Aricle IX-বলা আছে: Each High Contracting Party undertakes to abstain from providing any assistance to any third party the engages in armed conflict with the other Party. In the event of either Party being subjected to an attack or a threat thereof, the High Contracting Parties shall immediately enter into mutual consultations in order to remove such threat and to take

appropriate effective measurse to ensure peace and the security of their countries. [এই ধারা অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ দুই দেশের কারো বিরুদ্ধে যদি বহিঃআক্রমণের বিপদ দেখা দেয়, তবে এই বিপদ অপসারণের জন্য উভয় দেশ অবিলম্বে 'পারস্পরিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হবে' এবং তাদের 'শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে'।]

এটা ছিল আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি যৌথ বার্তা।

কিন্তু এই চুক্তি সত্ত্বেও ভারতের প্রত্যাশা মোতাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এগিয়ে আসেনি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন কতখানি এগিয়ে আসবে সেই প্রশ্নে ভারত সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ প্রশ্নে উঁচু মাত্রায় কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হলো।

২৮-২৯ সেপ্টেম্বর ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরকালে উভয় দেশের নেতৃবৃন্দের আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা এবং শীর্ষ বৈঠকের শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহার থেকে বাংলাদেশ প্রশ্নে সোভিয়েত ভূমিকার স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যুক্ত ইশতেহারে মূল অংশে বলা হয়, উপমহাদেশের 'শান্তি সংরক্ষণের স্বার্থে উদ্ভূত সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান অর্জনের লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার মানুষের বাসনা, অবিচ্ছেদ্য অধিকার ও আইনানুগ স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এবং শরণার্থীদের দ্রুতগতিতে ও নিরাপদে, সম্মান ও মর্যাদার পরিবেশে স্বদেশে ফেরত পাঠানোর উদ্দেশ্যে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যুক্ত ইশতেহারে আরও বলা হয় যে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে ওঠায় ভারত ও সোভিয়েত উভয় পক্ষ এ ব্যাপারে 'যোগাযোগ ও মতবিনিময় অব্যাহত রাখবে।' এই শেষোক্ত ঘোষণা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী-চুক্তিতে বর্ণিত যোগাযোগ ও মতবিনিময় সংক্রান্ত ধারা কার্যকর হবার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে বলে উভয় পক্ষ মনে করে।

বাংলাদেশ প্রশ্নে সোভিয়েত ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে ২৮ সেপ্টেম্বরে মস্কো শীর্ষ বৈঠকে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তিন সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ, পোদগর্নি এবং কোসিগিনের ছ'ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার ফলে। *(মঈনুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১-১০২)*

সামরিক প্রশ্নে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ প্রস্তুতির যে প্রক্রিয়া চলছিল তা অত্যন্ত দ্রুত মোড় নিল।

'সেপ্টেম্বরে ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ফিরে এসে অক্টোবরের

দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতীয় বাহিনীর ওপর থেকে তাদের সীমান্ত তৎপরতার ব্যাপারে বাধানিষেধ অনেকটা তুলে দেন। এর আগে সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সেনাদের চলাচল নিয়ন্ত্রিত ছিল। তারা যাতে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম না করে, এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। ইন্দিরা গান্ধী তখন সেনাবাহিনীকে সুস্পষ্টভাবে বলে দেন, যদি ঘটনার চাপে সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়, তাহলে তা তারা করতে পারবে।

'তাঁর ওই নির্দেশের পর অক্টোবর মাসের ১২ তারিখ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজেরাই যুদ্ধে নেমে পড়ে। আমাদের সেক্টর বাহিনীকে যে দায়িত্ব দেয়া হতো, তারা অনেক ক্ষেত্রেই পালন করতে পারত না। ফলে তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সেই দায়িত্ব পালনেরও নির্দেশ দেয়া হলো।' (*মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর, কথোপকথন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩-১০৪)

অর্থাৎ অক্টোবর ১৯৭১ থেকেই ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ে।

'বৃহত্তর ভূমিকার প্রস্তুতি হিসেবে অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানি অবস্থানের বিরুদ্ধে সীমান্ত সংঘর্ষে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে– প্রথমে ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে, পরে ব্রিগেড পর্যায়ে, ফলে তাদের কাছে বাংলাদেশের সেক্টর ইউনিটের গুরুত্ব দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে।' *(মঈদুই হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ ১১৫)*

পাকিস্তানও ভারতের বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। এবং সুযোগ খুঁজতে থাকে সঠিক সময়ের জন্য।

ভারতীয় এলাকার ভেতর থেকে পরিচালিত যুদ্ধ ঠিক ঠিক ৯ মাস ধরেই হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কেননা ঠিক নয় মাস ধরে যথার্থ রক্তাক্ত যুদ্ধ চলার মতো বাস্তবতাই তো ছিল না। প্রথমত ভারতে যাঁরা গিয়েছিলেন প্রথমে তাঁদের দরকার ছিল থিতু হওয়া, দ্বিতীয়তা এপ্রিল-মের মধ্যে পাক-বাহিনী নিজেদের বেশ গুছিয়ে নিয়েছিল। তাছাড়া রাজাকার বাহিনীও দ্রুত বিস্তার লাভ করছিল। প্রথম দিকে ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক নিজস্ব ছকে স্বল্প অস্ত্রে অতিশয় দুর্বল কিছু সশস্ত্র ইউনিট ভেতরে পাঠানো হয়। কিন্তু তারা প্রকৃত অর্থে কোনো সাফল্যই অর্জন করতে পারেনি।

ইতিমধ্যে বর্ণিত তথ্যে দেখা যায় প্রথম ৪-৫ মাস তো বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়েই কেটেছে।

'অক্টোবরে আওয়ামী লীগের উপদলীয় সংঘাত তীব্রতর হয়ে উঠলেও, এর ফলে সরকারের কাঠামো যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েনি সম্ভবত তার একটি কারণ ছিল নির্দলীয় প্রশাসন বিভাগের কর্তব্যবোধ এবং অপর কারণ ছিল, রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপটা থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সফল প্রয়াস।' (মঈদুল হাসান, ঐ, পৃ ১১৭)

এ ব্যাপারে এ কে খন্দকারের পর্যবেক্ষণের কিছু অংশ : 'যুদ্ধের আগে বা যুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত পরে তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগও দেননি। ফলে নেতাদের ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং নিজেদের মধ্যকার সমন্বয়হীনতা মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিন অবধি চলতে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা বাংলাদেশ বাহিনীর নেতৃত্ব ও কাঠামোকেও আংশিকভাবে প্রভাবিত করে। যদি আগে থেকেই সিদ্ধান্ত থাকত যে বঙ্গবন্ধুর ওপর কোনো প্রকার আঘাত এলে নেতারা অমুক জায়গায় মিলিত হয়ে তাজউদ্দীন সাহেব বা কোনো জ্যেষ্ঠ নেতার নেতৃত্বে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন, তাহলে হয়তো নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এত প্রকট হতো না। যুদ্ধের আগেই তাঁদের বলা উচিত ছিল, আমাদের লক্ষ্য কী এবং এই লক্ষ্য পূরণের জন্য কী কী প্রস্তুতি নিতে হবে। এটা হলে আমরা একটা সফল মুক্তিসংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারতাম। এ ছাড়া এ সংগ্রামে সহযোগিতার জন্য ভারত বা অন্য কোনো সরকারের সঙ্গে কী আলোচনা করতে হবে এবং তাঁদের কাছ থেকে কী ধরনের সাহায্যের অনুরোধ করতে হবে, তা আগেই নির্ধারিত থাকা দরকার ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা এই রকম কোনো পরিকল্পনা মার্চ মাসে নিয়েছিলেন বলে আমার জানা নেই।' *(এ কে খন্দকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬)]*

যুদ্ধপর্ব : প্রথম ভাগ

ঊনিশ শতকের ষাট দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে মহাবিতর্ক শুরু হয় তার পরিণামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, সর্বত্র তথাকথিত মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী–এই নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৬৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, সংক্ষেপে এম-এল)। 'জনগণতান্ত্রিক পূর্ব পাকিস্তান' ছিল এই

নবগঠিত পার্টির রণনৈতিক আওয়াজ। জনগণতান্ত্রিক পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ দাঁড়াল–পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাবে এবং নতুন রাষ্ট্র গঠিত হবে। অর্থাৎ স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি দেশের প্রত্যাশাই চিন্তা চেতনার কেন্দ্রে চলে আসতে থাকে। এখানে প্রথম ধাপে কায়েম হবে জনগণতন্ত্র ও পরের ধাপে সমাজতন্ত্র। শান্তিপূর্ণ পথের বিপরীতে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এই রণনৈতিক বিজয় অর্জন করতে হবে।

তখন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের অন্য কোন রাজনৈতিক দল এভাবে সরাসরি পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়নি। স্বভাবতই পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার কর্ম-কৌশলই কেন্দ্রীয় কাজ হিসাবে চিহ্নিত হয়। যদিও কিভাবে সেটা শুরু করা যেতে পারে তা প্রায় অমীমাংসিতই থাকে। পার্টি দ্রুতগতিতে বিকশিত হতে থাকে। কিন্তু অচিরেই পার্টি ভেঙ্গে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) গঠিত হয়। এই পার্টি একদিকে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের উপনিবেশ বলে ঘোষণা করল, অন্যদিকে কৃষিতে ধনতন্ত্র প্রধান হিসাবে তত্ত্বায়ন করল। এর আগ পর্যন্ত অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) কৃষিতে আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থা বিরাজ করছে বলে মনে করত। পূর্ব পাকিস্তান আধা-উপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী–কমরেড আবদুল হকের এ রকম বক্তব্য মস্কোপন্থীদের তেমন বিরোধিতায় পড়ে নি।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির (এম-এল) নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রধানত এ অভিযোগও তোলা হয় যে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বললেও পার্টি-নেতৃত্ব সংশোধনবাদী হয়ে গেছে। তারা গ্রামের কৃষকদের সংগঠিত করে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করার কর্মসূচি বাস্তবায়নে যেমন অনাগ্রহী তেমনি অযোগ্যও বটে। আর এমন এক সময় ঘটে যায় ভারতের নকশালবাড়ীর সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই অভ্যুত্থানকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখে 'বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ' যা পিকিং রেডিও থেকে ইংরেজি ও বাংলায় প্রচারিত হয়। চারু মজুমদার ও তাঁর শ্রেণীশত্রু খতমের লাইন এদেশের বিপ্লবী মহলে বেশ বড় রকমের প্রভাব ফেলে। উল্লেখ্য, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের অযোগ্যতা নিয়ে যে অভিযোগগুলো করা হচ্ছিল তা খণ্ডনের জন্য তারা বাস্তবে নতুন কোন সশস্ত্র যুদ্ধের লাইন প্রণয়ন করতে এবং তা সাফল্যের সাথে কার্যকর

করে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন নি। তারাও শেষ পর্যন্ত চারু মজুমদারের লাইনই গ্রহণ করেন।

২

পাকিস্তান কায়েমের আগে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে দ্বিজাতিতত্ত্বের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার যে গাঢ় মুসলিম উন্মাদনা, তা ১৯৪৮-৫২ সালের মধ্যেই শিথিল হয়ে আসতে থাকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ও পাঞ্জাবী নেতৃত্বে পাকিস্তানের শাসক ও শোষক গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর যে শাসন-শোষণ চাপিয়ে দেয়, তার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী পরিসংখ্যানে প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন আওয়ামী লীগের নেতা হিসাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, সে সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পাদিত সামরিক চুক্তি বাতিল, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে সামিল হওয়া ও পূর্ব পাকিস্তানসহ পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুঙ্গে। কমিউনিস্টদের সহযোগিতায় মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর জাতীয় দাবীতে পরিণত করেন। ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল, জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি ও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব করলে তার বিরোধিতা করেন প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী, পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান, শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতারা। পরবর্তীতে প্রস্তাবগুলো নাকচ হয়ে যায়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাফ জানিয়ে দেন– পূর্ব পাকিস্তানকে আটানব্বই ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়ে গেছে। তিনি সামরিক চুক্তি বাতিলসহ জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে হাজির করেন তার বিখ্যাত 'জিরো+জিরো' তত্ত্ব। আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি', সংক্ষেপে 'ন্যাপ'। আওয়ামী লীগ নয়, কমিউনিস্টদের সহযোগিতায় ন্যাপই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলে পরিণত হতে থাকে। এই সময়ে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যক কমিউনিস্ট নেতা-কর্মী ও মওলানা ভাসানী তাঁর

বেশ কিছু সহকর্মীসহ গ্রেপ্তার হন। বাদবাকির অধিকাংশই আত্মগোপন করেন।

পরবর্তী ধাপে আইয়ুব খানের বোগাস মৌলিক গণতন্ত্রসহ সামন্ত, আমলা-মুৎসুদ্দী পুঁজিপতি শ্রেণী, সামরিক-আধাসামরিক বাহিনী, ফড়িয়া-ব্যবসায়ী ও মুষ্টিমেয় গণবিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের একটি বিশেষ গোষ্ঠী দেশ শাসন করতে থাকে। কেন্দ্রীয় শাসকদের আজ্ঞাবহ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে মোনায়েম খাঁর নেতৃত্বে স্বৈরশাসকদের তাণ্ডব সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়।

৩

সামরিক শাসনের মধ্যেই ১৯৬২ সালে যে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন শুরু হয় তা তুঙ্গে ওঠে ১৯৬৯ সালে। ন্যাপ থেকে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) নেতা-কর্মীরা বের হয়ে আসেন। এর ফলে ন্যাপ যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে তেমনি পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

কিন্তু দল দুটি পূর্ব পাকিস্তানের জাতিসমস্যা সমাধানের ব্যাপারে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় আওয়ামী লীগের হাতেই এই নেতৃত্ব চলে যায়। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি অত্যন্ত সঠিকভবেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের শত্রু হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ (প্রধানত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ) ও সামন্ত-বুর্জোয়াদের (শক্তিশালী আমলাতন্ত্র ও শাসকবাহিনীসহ) শনাক্ত করতে সমর্থ হয়। পাকিস্তানের অবাঙালি শোষক-শাসক গোষ্ঠী প্রায় সব সময় 'প্রত্যক্ষ' শত্রু হিসাবে সামনে থাকায় আওয়ামী লীগ সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একমাত্র শত্রু হিসাবে তাদেরকেই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে পারে। শ্রেণীসমস্যা সমাধান ও সাম্রাজ্যবাদের ইস্যু বাদ রেখেই জাতিসমস্যা সমাধানের বিষয়টি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এমনভাবে রাজনৈতিক মূল স্রোতধারায় পরিণত হয় যে শ্রেণীসমস্যা ও জাতিসমস্যা সমাধানের যথাযথ বিকল্প বিপ্লবী কর্মসূচি প্রণয়নে (এম-এল) কমিউনিস্টদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এখানে জাতিসমস্যা ও জাতীয়তাবাদকে সমার্থক মনে করা হয়নি।

"১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়

জাতীয় চেতনার প্রধান ভিত্তি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'গণতন্ত্র'। 'জাতীয় চেতনা' ও 'জাতীয়তাবাদ' যে আলাদা ধারণা সেই কথা– নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই জানি– অনেকের কাছে পরিষ্কার নয়। এই অপরিচ্ছন্নতার সুযোগ নিয়েই বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা। জাতীয়তাবাদ মানে যদি কোন এক জাতীয় সম্প্রদায়ের নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা বোঝায়, তবে সেই মতবাদ গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করবে কী করে? অথচ জাতীয় চেতনার উৎপত্তি হয় গণতান্ত্রিক অধিকারের সংজ্ঞা ব্যক্ত থেকে জাতি পর্যন্ত প্রসারিত করার পথে।

'জাতীয় চেতনা' মানে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক চেতনা'। তাই এই চেতনা শেষ বিচারে জাতিনিরপেক্ষতা বা সকল জাতির সমানাধিকার নীতির প্রতিষ্ঠা দাবি করে। অপর দিকে, জাতীয়তাবাদ মানে 'জাতীয় একনায়কত্ব'। এ তো জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বেরই চেতনা। এই চেতনা ছোট ছোট জাতির উপর বড় জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। জাতীয়তাবাদের পালন মানে তাই গণতন্ত্রের দমন। এই ঘটনাই ঘটেছে। বাংলাদেশের।" (সলিমুল্লাহ, *বেতার বিহাত বিপ্লব*, পৃ. ১২১-১২২)

অবশ্য একটি কথা এখানে পরিষ্কার থাকা দরকার তা হলো 'জাতীয় গণতান্ত্রিক চেতনা'র মধ্যে কৃষক সমস্যার অনুপস্থিতি থাকলে জাতীয় চেতনা যতই গণতান্ত্রিক হোক না কেন শেষ পর্যন্ত ধনিক শ্রেণিই ঐ 'চেতনা' আত্মসাৎ করতে পারে।

ঔপনিবেশিকতার ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭-পরবর্তী কালে সাম্রাজ্যবাদের সাথে পুরোপুরি গাঁটছড়া বাঁধা পাকিস্তানের মত কোন দেশে বা পূর্ব পাকিস্তানের মত কোন প্রদেশে জাতিসমস্যা সমাধান সাম্রাজ্যবাদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন ব্যতিরেকে সম্ভব না বলেই কমিউনিস্টদের (এম-এল) সঙ্গত ধারণা সক্রিয় থাকে। তাছাড়া আওয়ামী লীগকে মনে করা হত–বাঙালি শোষকদের প্রতিনিধি। আওয়ামী লীগ আমূল কৃষিসংস্কার দূরের কথা, কোন মডারেট কৃষিসংস্কারও করবে না। উপরন্তু সাম্রাজ্যবাদের বাঙালি সহযোগী হিসাবে কাজ করবে।

১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে ফরিদপুরের প্লেনামে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি 'শ্রেণীশত্রু খতম'-এর লাইন গ্রহণ করে। দেখা গেল গ্রামাঞ্চলে প্রধানত মুসলিম লীগ নেতারাই শ্রেণীশত্রু হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে। গ্রামের জোতদার-

মহাজনদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দলগতভাবে মুসলিম লীগার হলেও ততদিনে আওয়ামী লীগের অনেকেই মুসলিম লীগারদের জায়গা দখল করে নিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে অবশ্য জোতদার-মহাজনদের একটি ছোট অংশ সম্প্রদায় বিবেচনায় হিন্দুও ছিল। দেশের প্রধান মোকাম ও গঞ্জে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি ভাল অংশ তাদের হাতে। এই সময় 'অ্যাকশন' বলতে যা বোঝায়, তা প্রায় শুরুই হয় নি।

আইয়ুব খানের পতন ও ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের অধীনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ফলাফলে অবস্থা আরো জটিল হয়ে গেল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত, কিছুটা বিরতি ছাড়া, পুরো সময় সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পন্থায় পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত জনগণ-থেকে-বিচ্ছিন্ন পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠী সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে তাদের একান্ত অনুগতদের সহযোগিতায় দেশ-শাসনে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে তারা ভাবতেই পারছিল না, পূর্ব পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক দল, শ্রেণী-চরিত্র বিচারে তাদের কাছের হলেও, পুরো দেশ শাসন করবে। এ সময় রাজনৈতিক সঙ্কট গুরুতর অবস্থায় পৌঁছে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যা দূর করতে শ্রেণীসমস্যার সমাধানই যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা তখন রাজনৈতিক এজেন্ডা হিসাবে দৃশ্যপট থেকে কার্যত পিছনে সরে যেতে থাকে। এক ধরনের উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণা প্রাধান্য পেতে থাকে। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে উদ্ভূত রাজনৈতিক সঙ্কটকে সামরিক সংঘাতে পরিণত করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্তায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের ওপর।

জাতি, জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে আহমদ ছফার চিন্তার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে সলিমুল্লাহ খান বলে, "আমার ধারণা তাঁহার চিন্তা ফ্রান্‌ৎস ফানোঁর আদর্শ বহুলাংশে ধারণ করিয়াছিল। এই আদর্শের গোড়ার কথা; 'জাতীয় পরিচয় বা সংজ্ঞা আর জাতীয়তাবাদ এক কথা নয়।' জাতীয় মর্যাদা দরকার। তাহা আমাদের সারা দুনিয়ার নিপীড়িত জাতির সহিত এক কাতারে দাঁড় করাইবে। এই পথ মিলনের। আর তথাকথিত জাতীয়তাবদ বর্জনীয়। এই পথ শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যলোভী ধনতন্ত্রের সেবক হইয়া দাঁড়ায়। স্বাধীন রাষ্ট্রকে হইতে হয় মক্কেল রাষ্ট্র।" (সলিমুল্লাহ খান, ঐ, ২০১০, পৃ. ২৮)।

১৯৪৭ সালের দ্বিজাতিতত্ত্ব তার জীবন্ত অস্তিত্ব নিয়ে যেন আত্মগোপনে চলে যায়। সব সমস্যা সমাধান হয়ে অবাঙালিদের হটিয়ে দিলে– এ রকম একটা

স্পর্শকাতর ও বিক্ষুব্ধ বাস্তবতা প্রধান রাজনৈতিক স্রোতে পরিণত হতে থাকে। এক সময় ব্রিটিশ ও হিন্দুদের অধীনতা থেকে বের হওয়ার জন্য যাঁরা গাঢ় মুসলমান হয়েছিলেন তাঁরা ও তাঁদের বংশধররা এখন প্রগাঢ় বাঙালি হয়ে অবাঙালিদের কব্জা থেকে বের হওয়াকেই শ্রেয় জ্ঞান করলেন। হিন্দুদের জায়গায় অবাঙালি। শুধু শ্রেণিসমস্যা ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্যাই নয়, আসলে জাতিসমস্যা যা জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নের সাথে জড়িয়ে গিয়েছিল, তার সমাধানও গড়ে উঠতে থাকে নিতান্তই নড়বড়ে ভিত্তির উপর। শতাব্দীকাল ধরে চলে আসা যেসব গুরুতর সমস্যার পাহাড় বাঙালি জনগোষ্ঠীসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মাথার উপর চেপে বসেছিল তা ঝেড়ে ফেলার প্রক্রিয়া ছিল জটিল ও বেশ দুরূহ– অন্তত আওয়ামী লীগ এই কাজ সম্পন্ন করার মত কোন দল ছিল না। এ আলোচনা অনেক বড়।

বাঙালি মধ্যশ্রেণির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বাঙালি লুটেরা ধনিকশ্রেণি। এদের কাছে জাতীয়তাবাদ ছিল শ্রেণিগত সাফল্য অর্জনে সব থেকে সুবিধেজনক হাতিয়ার। যে অখণ্ড অবাঙালি জাতিসত্তার অস্তিত্ব তখনো সুসংগঠিত রূপ নিতে পারেনি তাকেই ধারণ করতে হলো এমন এক ভাবাবেগের স্রোত যা সমাজের অনেক গুরুতর বিষয়কে অমীসাংসিত রেখেই অগ্রসর হলো।

বিপরীতে আরও একটি সম্ভাব্য প্রক্রিয়া ঘটনার তীব্রতার সামনে জবুথবু হয়ে গেল। এটা তাদের পরিষ্কার থাকা একান্তই দরকার ছিল, জনগণের নেতৃত্বে যথাযথ গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমস্যার একটা কম-বেশি সমাধান দিতে পারতেন। কিন্তু তাদের নিন্দাযোগ্য ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা ছিল, তারা পারেন নি– কেননা তাদের পারতেই হবে এই বোধদয়ই হয় নি। ফল হলো– 'একে তো নাচুনে বুড়ি তার ওপর ঢোলের বাড়ি'।

১৯৭১ সালের ২৪ শে মার্চ নাগাদ আওয়ামী লীগের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ও ভুট্টোর সমঝোতার যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ঢাকার বুকে ২৫ মার্চ রাতে নেমে আসে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ভয়ঙ্কর আক্রমণ।

পরবর্তী ধাপে আক্রমণ দ্রুতই বিস্তার লাভ করে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে। ২৯ মার্চ যশোর ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি সৈন্যদের সম্পূর্ণ নির্মূল করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সমগ্র যশোর।

যশোরে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির (এম-এল) সংগঠন ছিল শক্তিশালী। সারা দেশে ১৯৬৯ সালের অভ্যুত্থানে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণের ফলে গ্রামাঞ্চলে পার্টির প্রভাব উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বের হওয়া তরুণ-যুবকদের পার্টিতে যোগ দেওয়ার যে ঢেউ দেখা দিয়েছিল তা ২৫ মার্চের পর হঠাৎ অনেক গুণ বৃদ্ধি পেল। মেয়েদের মধ্যেও পার্টির আশাতীত প্রভাব পড়ে। এমন ঘটনা এর আগে দেখা যায় নি।

একটা বিষয় মনে রাখতে হবে–১৯৬০'র দশক হল সেই বিশেষ সময় যখন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমান পরিবার থেকে অসংখ্য শিক্ষিত তরুণ-তরুণী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

সাম্রাজ্যবাদ, শ্রেণী ও রাষ্ট্র বিরোধী প্রগতিশীল আন্দোলন গণচরিত্রে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ১৯৪৮-১৯৫২ সালে বাঙালি মুসলিম পরিবার থেকে, বিশেষ করে যাঁরা ছাত্রফ্রন্টের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ও অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের থেকে, ৬০ দশকের মুসলমান পরিবারের চিত্র ছিল অনেকাংশেই ভিন্ন। বাঙালি মুসলমান পরিবার থেকে এই দশকের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত তরুণ ও যুবকদের শুধু রাজনীতিতে নয়, কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল রাজনীতিতে অংশগ্রহণ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

যাই হোক, যশোর শহর থেকে যাঁরা পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের বড় একটা অংশ আগেই গ্রামে চলে যায়। মার্চের পর যাঁরা শহরে থাকতে পারেন নি তাঁরাও গ্রামে গিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করেন।

জেলার নেতৃস্থানীয় প্রাক্তন ছাত্রনেতাদের (যাঁরা পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন) প্রায় সকলেই অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কমরেড আবদুল মতিন ও কমরেড নূর মোহাম্মদ জেলা কমিটির সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আশু করণীয় প্রসঙ্গে আলোচনা চালাতে থাকেন এবং জেলা কমিটি কেন্দ্রীয় নির্দেশ না পাওয়ায় দ্বিধান্বিত থাকে।

শহরের প্রাক্তন ছাত্রনেতাদের অধিকাংশের ছাত্র রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিল ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে–১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়। ফলে 'আইয়ুব খান ধ্বংস হোক', 'শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যনীতি চলবে না', 'পাকিস্তানের ২৪ পরিবার ধ্বংস হোক', 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা

চালু কর', 'এক ইউনিট বাতিল কর', 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে', 'হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল কর', 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' ইত্যাদি স্লোগান এমন একটি পরিবেশ ও মানসিকতা তৈরী করে যা তাদের অসাম্প্রদায়িক-ধর্মনিরপেক্ষ করে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তানের সামরিক-স্বৈরতন্ত্রের ঘোর বিরোধী করে তোলে। পাকিস্তানের সামরিক শক্তির মোকাবেলার প্রশ্নে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাই কাজ করেনি। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া কমরেডরা সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ উৎখাতের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। কিন্তু মার্চের আগে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে এমন কোন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নি, যার উপর ভিত্তি করে ভিন্ন কিছু ভাবা যেত। বিদ্যমান এসব দ্বন্দ্ব যুদ্ধের সময় প্রকাশিত হয় বটে, তবে সমাধানের তেমন কোন পথ কেউ দেখাতে পারেন নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ যশোর সেনানিবাসে বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করে প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্য দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে যেতে সক্ষম হয়। আমি প্রকাশ্যে চলে এলাম। তখনকার পুলিশ সুপার আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের জন্যে পুলিশ লাইন উন্মুক্ত করে দিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সংবাদটা আমরা একটু দেরিতে পেয়েছিলাম। অল্পকিছু অস্ত্র আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের প্রতিরোধ ভেঙে গেল। শহর থেকে প্রথমে শেখহাটিসহ আশেপাশের গ্রামে ও পরে খাজুরা বাজারের পাশে বিশেষ করে লেবুতলা ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে উঠলাম। এর মধ্যে নেতৃস্থানীয় প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন দলেননগর গ্রামের অধ্যাপক গফুরের বাড়িতে একত্র হলাম। গ্রামটি ছিল খাজুরা বাজার থেকে তিন কিলোমিটার পশ্চিমে। এখানে কয়েক মাইলের মধ্যে থাকা অন্যান্য নেতা-কর্মীরা যোগাযোগ করলেন এবং সকলেই এখন করণীয় কি জানতে চাইলেন।

উপস্থিত নেতৃবৃন্দের কাছে এটা পরিষ্কার পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। যদিও জেলা পার্টি নেতৃত্ব থেকে আমাদের কাছে কোনো নির্দেশনা এসে পৌঁছায়নি। ঠিক হলো পায়ে হেঁটে ও সাইকেলে পুরো এলাকায় এই মুহূর্তে যোগাযোগ স্থাপন করা হবে হবে।

মে মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দলেনপুরে পুনরায় একত্রিত হলাম। জেলার

বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পুরনো কিছু কিছু নেতাকর্মী বাদ দিলে প্রাক্তন ছাত্রনেতাদের অন্তত চার-পাঁচজন পাওয়া গিয়েছিল। এদের কেউ কেউ পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল এবং যাদের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিল না তারা সকলেই নিশ্চিত ছিল যে, আমাদের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র। এবং একটা বিষয় অতিদ্রুততার সঙ্গে সকলেই অতিশয় গুরুত্বারোপ করলেন যে আমরা দেশ ত্যাগ করবো না–দেশের মানুষের পাশে এবং তাদেরই অংশ হিসেবে তাদের সঙ্গেই থেকে যাবো। যার যেখানে যতটুকু শক্তিসামর্থ আছে তা দিয়েই পাক বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে হবে। প্রথম থেকেই যে প্রশ্নটি নেতৃস্থানীয় সকলেরই ছিল–মে মাসে দলেনপুরে সকলে এক জায়গায় হলে তা বেশ জোরালো হল–সেটা হলো পার্টির মূল্যায়ন ও নির্দেশনা কি?

১৫ মে কমরেড আব্দুল মতিনসহ পুলুম গেলাম। সেখানে কমরেড শামসুর রহমান ও কমরেড হেমন্ত সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হলো। জেলা কমিটির দুজন নেতার সামনে আমি যে বক্তব্য দিলাম তার সারমর্ম:

ক. এখন আওয়ামী লীগ ইচ্ছে করলেও পাকিস্তানের যে রাজনৈতিক কাঠামো তার মধ্যে উদ্ভূত রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। সামরিক পন্থায় বা যুদ্ধের মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে।

খ. আওয়ামী প্রধান পাকিস্তানের কারাগারে এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্যসহ নেতৃবৃন্দ ভারতে গিয়ে উঠেছে। ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দও ভারতে চলে গেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক যে জটিলতা সেখানে ভারত সরকার নিজের স্বার্থের প্রশ্ন সামনে রেখেই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তৈরী করবে–হয়তো ইতিমধ্যেই তারা একটা রাজনৈতিক ছক তৈরী করে ফেলেছে।

গ. পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) তো সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে জনগণতান্ত্রিক পূর্ব পাকিস্তান কায়েমের পক্ষে, সুতরাং এরকম সুযোগ পার্টি বেশীদিন পাবে না। পার্টির প্রধান কাজ, জরুরি কাজ এবং এই মুহূর্তের কাজ হবে একটা বিপ্লবী সামরিক লাইন প্রণয়ন করা। সামরিক লাইনের ভিত্তিতে অতি দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে–একটি সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। চারু মজুমদারের লাইনের আলোকে এখন আর সব কাজ চালানো যাবে না। পরিস্থিতি চীনের মতোও নয়, তাছাড়া সশস্ত্র যুদ্ধের লাইন যদি পার্টির নাও থাকতো তবুও এখনকার পরিস্থিতি দাবী করে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের প্রধান স্তম্ভ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যুদ্ধকে

এড়ানো সম্ভব নয়। উচিতও নয়।

ঘ. যেসব আওয়ামী লীগের সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা দেশে আছেন তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাছাড়া যতদূর সম্ভব জনগণের বৃহত্তর অংশকে পার্টির কর্ম প্রক্রিয়ায় সামিল করাতে হবে।

জেলা কমিটির নেতারা জানালেন, এই মুহূর্তের করণীয় বিষয়ে সাধারণ কিছু সিদ্ধান্ত নিলেও সামরিক লাইন বিষয়ে তারা কিছু ভাবেন নি। যেহেতু এটা জাতীয় সমস্যা সুতরাং কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত জানতে হবে। (এ বিষয়ে কমরেড বিমল বিশ্বাস ও কমরেড বদরুদ্দীন উমরের দুটি বক্তব্য সংযুক্ত আছে)

আমি 'বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয় বিষয়ে ৩ পৃষ্ঠার একটা বক্তব্য রেখে আব্দুল মতিনসহ বলতে গেলে শূন্য হাতে খাজুরা ফিরে এলাম।

মে মাসের শেষে পার্টি হেডকোয়ার্টার থেকে বিশেষ জরুরি সংবাদ এল আমি যেন দ্রুতই পুলুমে পৌঁছে যাই এবং আমাকে কিছুদিন সেখানে থাকতে হবে। এবার হলো আমাদের মধ্যে গ্রুপে গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানের দায়িত্ব নিয়ে যাওয়ার পালা। আমরা পরস্পর থেকে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হলাম। খাজুরা-কালিগঞ্জকে একটি এলাকা করে কমরেড নূর জালাল ও কমরেড বিশ্বনাথ বসুকে দায়িত্ব দিয়ে আমরা ঐ এলাকা ছাড়লাম। ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা যোগ্য নেতৃত্বের প্রধান অংশ কমরেড আব্দুল মতিন, কমরেড মাশুকুর রহমান তোজো, কমরেড আসাদুজ্জামান, কমরেড শান্তি, কমরেড মানিকসহ আরো কয়েকজন যশোর শহর এলাকাকে পাশ কাটিয়ে যশোর থেকে দক্ষিণে কুয়োদা, মনিরামপুর, কেশবপুর, রাজগঞ্জ এইসব এলাকার দায়িত্ব নিয়ে গেলেন। কমরেড নজরুল ইসলাম প্রথমবার ঐ এলাকায় গেলে আর ফিরে আসেন নি। এসব এলাকায় সরকারী মদতে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় শান্তি কমিটির নেতৃত্বে প্রধানতঃ হিন্দু এলাকায় আক্রমণ আগেই শুরু হয়েছিল। আমাদের ঐ সব স্থানে থাকা পার্টির কর্মী, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ কৃষক সমিতির কর্মীদের সহায়তায় প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অস্ত্রের অভাব তাদেরকে বেকায়দায় ফেলে দিচ্ছিল।

তৃতীয় ভাগ

জুন মাসের প্রথম দিকেই পুলুম গেলাম। কমরেড আবু বকর জাফরুদ্দৌলা দীপু একাই আমার সঙ্গী। আমাকে কমরেড হেমন্ত সরকার ও কমরেড শামছুর রহমান বললেন আমার বক্তব্য পূর্ণ আকারে লিখিতভাবে তৈরী করতে। বলা হল ১৪ জুন জেলা কমিটির বৈঠক, ঐ দিন যেন আমি আমার বক্তব্য হাজির করি। এখানে নড়াইলের কমরেড বিমল বিশ্বাসের সঙ্গে আমার দেখা হলো। ৬/৭ দিন সময় লেগে গেল, আমি 'বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয়' বলে একটা দলিল তৈরী করলাম। মূল কথা হল পার্টির নেতৃত্বে একটি সুশৃঙ্খল ও রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ সেনাবাহিনী গড়ে তোলা। গেরিলা বাহিনী, চলমান বাহিনী ও নিয়মিত বাহিনী–এদের কঠোর ট্রেনিং, আলাদা ক্যাম্প, দায়িত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন সামরিক পদ, আলাদাভাবে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ–এবং এই বাহিনীর রাজনৈতিক লক্ষ্য কি সে বিষয়ে পরিপূর্ণ সচেতন করে তোলা ইত্যাদি–একটি প্রধান সামরিক ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা।

এই মুহূর্তে আমাদের অন্যতম কাজ হবে প্রথমতঃ সেনাবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় গঠিত শান্তিকমিটি, মিলিশিয়া, রাজাকার ও তাদের অন্যান্য সশস্ত্র শক্তি প্রথম পর্বে যারা প্রধানত হিন্দু এলাকাগুলোতে ও কমিউনিস্ট (এম-এল) দের প্রভাবিত এলাকার উপর হামলা চালাচ্ছিল তাদের প্রতিরোধ করা এবং দ্বিতীয়ত, বিপ্লবী কমিটির নেতৃত্বে ছোট বড় বিশেষ এলাকা গড়ে তোলা, শ্রমিক-কৃষক তথা মেহনতী জনগণের রাজ কায়েমের লক্ষ্যে।

আরো দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হলো :

১. গ্রামে গ্রামে গোপন ও প্রকাশ্য বৈঠক করা। বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করা ও এটা বোঝানো যে ইপিসিপি (এম-এল) জনগণের সঙ্গেই আছে এবং জনগণকে সঙ্গে নিয়েই শোষণমুক্ত স্বাধীন একটি জনগণতান্ত্রিক দেশ গড়ে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর। *(ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যশোরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষার লক্ষ্যে একেবারে প্রথম পর্বেই মুসলিম লীগ, তাদের গুণ্ডাবাহিনী ও শান্তি কমিটিকে প্রতিরোধ করতে এবং অজস্র মানুষকে সীমান্ত পার করে দিতে ইপিসিপি (এম-এল) ও তার সমর্থকরা কী কঠিন দায়িত্বই না পালন করেছে ও করে যাচ্ছে। তাছাড়া আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে একটা কমবেশী শূন্য অবস্থাকে আমরা আমাদের সক্রিয়*

উপস্থিতির মাধ্যমে জনগণকে সাহস জুগিয়ে যথাসম্ভব ভরাট করে যাচ্ছি। বলেছি, এখন আপনাদের পাশে কেউ না থাকলেও আমরা আছি। আমরা দেশ ত্যাগ করিনি, আমরা আপনাদের ফেলে রেখে ভারতে চলে যাইনি–যাবোও না।)

২. দেশে থেকে-যাওয়া আওয়ামী লীগের (দেশপ্রেমিক) নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার চেষ্টা চালাতে হবে। উস্কানীর মুখেও আমরা একান্ত বাধ্য না হলে এই লাইন কার্যকরী করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

১৪ জুন জেলা কমিটির বৈঠক। সারাদিন বৈঠক চলল এবং শেষ পর্যন্ত জেলা কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে আমার পেশ করা দলিল গ্রহণ করে। কমরেড শামছুর রহমান প্রস্তাব করেন আমার পার্টি সদস্যপদ সক্রিয় করে আমাকে জেলা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। জেলা কমিটি একবাক্যে এই প্রস্তাব সমর্থন করায় এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমি প্রস্তাব গ্রহণ করি। এরপর দলিলের প্রস্তাব অনুযায়ী একটি সামরিক কমিশন গঠিত হলো। সামরিক কমিশনের আহ্বায়ক নূর মোহাম্মদ অর্থাৎ আমি ও দুই জন সদস্য : কমরেড বিমল বিশ্বাস ও কমরেড খবির উদ্দীন। একই সঙ্গে আমাকে সেনাবাহিনীর প্রধান ও রাজনৈতিক কমিশারের দায়িত্ব দেওয়া হলো। কিন্তু ২০১২-এ একটি লেখায় কমরেড বিমল বিশ্বাস স্মরণ করিয়েছেন যে, কিছু দিন পর তাঁকে বাহিনীর কমান্ডার-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি বলেন, '১৯৭১ সালে ১৪ জুন জেলা কমিটির সভা হয়। কমরেড নূর মোহাম্মদ তাঁর লিখিত বক্তব্য উপস্থিত করেন। জেলা কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে ঐ দলিল গ্রহণ করেন। দলিলের মূল বক্তব্য যতদূর মনে পড়ে, পাকবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আওয়ামী লীগ-এর (দেশপ্রেমিকদের) সাথে ঐক্য গড়ে তোলা ও সংঘাত এড়িয়ে চলতে হবে। ঐ সময় কমরেড শামছুর রহমানকে সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কমরেড নূর মোহাম্মদ, কমরেড বিমাল বিশ্বাস ও কমরেড খবির উদ্দীনকে নিয়ে সামরিক কমিশন গঠিত হয়, যার আহ্বায়ক ছিলেন কমরেড নূর মোহাম্মদ। কমরেড নূর মোহাম্মদ পলিটিক্যাল কমিশার ও সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরেই বিমল বিশ্বাসকে বাহিনীর কমান্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয়।' (বিশ্বাস, ২০১২, পৃ. ১৮-১৯)

জেলা পার্টির সম্পাদক হিসেবে কমরেড শামছুর রহমান সামরিক কমিশনের

বৈঠকে প্রয়োজনে যে কোন সময় হাজির থাকবেন–এই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়।

২৯ জুন পুলুম স্কুলের শিক্ষক ও জননেতা কমরেড মোতালেব মাস্টার যশোর শহরের পথে নিহত হন।

পুলুম হলো পার্টি, প্রশাসন ও সেনাবাহিনী গড়ে তোলা ইত্যাদি বিষয়সহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হেড কোয়ার্টার। আমরা সুস্পষ্ট কর্মনীতির ওপর ভিত্তি করে একটি বিপ্লবী সামরিক লাইন বাস্তবায়িত করার কাজ শুরু করে দিলাম। শুরু হলো নতুন একটি পর্ব। যে পর্ব সম্পর্কে আমাদের না ছিল বাস্তব জ্ঞান, না ছিল দেশের অভ্যন্তরে এই ধরনের কোন অতীত অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত। নতুন শুরু হওয়া এই পর্বটিই আমাদের বক্তব্যের মূল অংশ।

চতুর্থ ভাগ

তবে এই পর্বে প্রবেশের আগে জেলার আরো কয়েকটি অঞ্চলের ইতিমধ্যে অর্জিত অভিজ্ঞতার বর্ণনা এই নিবন্ধেরই অপরিহার্য অংশ মনে করি। পার্টির মূল শক্তি ও কাজের এলাকা ছিল যশোর শহরের পূর্বে। পূর্বদিকে খুলনার পথে অভয়নগর ও নড়াইল রোড ধরে নড়াইল, লোহাগড়া, কালিয়াতে ইতিমধ্যেই অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। যশোরের বিখ্যাত তে-ভাগা আন্দোলন হয়েছিল নড়াইলে।

যশোর থেকে খুলনার পথে নওয়াপাড়া মোকাম। এর পর রাজঘাট। নওয়াড়াপাড়া থেকে রাজঘাট একটা শিল্প এলাকা গড়ে উঠেছে ভৈরব নদীর পাড় দিয়ে। এর ভেতর দিয়ে নদী পার হলে অভয়নগরের প্রধান পার্টি এলাকা। এখানে যশোর জেলা পার্টির সম্পাদক কমলেশ সুধাংশু দে'র বাড়ি এবং পার্টি হেড কোয়ার্টারে দীর্ঘদিন ধরে আমার যাতায়াত।

১৯৭০ নাগাদ পার্টির শক্তি ও প্রভাববলয় বৃদ্ধি পেয়ে যায়। প্রকাশ্যে বেশ কয়েকজন নেতা জনগণের মধ্যে তাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। শিল্পাঞ্চলে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠেছে। নদীর এপারে জোরদার শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক আন্দোলন, ওপারে কৃষক সমিতি ও কৃষক আন্দোলন।

বসুন্দিয়া-অভয়নগর

অভয়নগরের আগে রয়েছে বসুন্দিয়া-সিঙ্গিয়া এলাকা। নদীর এপারে

বসুন্দিয়া বাজার। ওপারে বাঘারপাড়া এবং তার পাশে নড়াইল সীমান্ত। এখানে একটি বৈঠকে পার্টি নেতা-কর্মীরা ঠিক করেন, প্রধানত সংখ্যালঘু হিন্দু গ্রামের উপর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে। এই আক্রমণে তখন ছিল অবাঙালি ও কিছু দরিদ্র উদ্বাস্তু পরিবারের লোক নিয়ে গঠিত মিলিশিয়া নামে পরিচিত একটি দল। এদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু গ্রামে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও নারী নির্যাতন। এ এলাকাটিকে দ্রুততার সঙ্গে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে সংঘবদ্ধ করা হয়। এর মধ্যে ছিল বসুন্দিয়া, জঙ্গলবাদাল, ভাঙ্গুড়া, জগন্নাথপুর, আফরা, বাসুড়ি, বারভাগ, নিত্যানন্দপুর, বাবরা, ভিটেবল্লা, জামদিয়া, রাধানগর, বাগডাঙ্গা, ওয়াদিপুর ও জামালপুর সহ আরো কয়েকটি গ্রাম। এখানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন, কমরেড নাজিমুদ্দীন মোল্লা ওরফে নাজিম। তার নেতৃত্বে নূরুল ইসলাম, ইসহাক, ছাত্তার, নূরুল (২), শওকত ও গোলাম রসুলকে নিয়ে একটি সেল কাম গ্রুপ তৈরী হয়। নাজিমদের কাছে তখন একটি মাত্র আগ্নেয়াস্ত্র। আর রয়েছে দা, বল্লম, ছুরি ইত্যাদি।

এপ্রিলের একেবারেই প্রথম দিকে মিলিশিয়াদের একটি আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে গ্রামবাসীর সহায়তায় তাদেরকে ঘিরে ফেলা হয়। শেষ পর্যন্ত আক্রমণকারীদের ৭ জন নিহত হয়। আস্তে আস্তে এলাকার উপর আক্রমণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সামরিক চাপ পার্টি ও সমর্থকদের সহ্যসীমা অতিক্রম করে। তাছাড়া অনেক হিন্দু গ্রাম ফাঁকা হয়ে যেতে থাকে।

সরাসরি সামরিক বাহিনী এলাকার উপর চড়াও হলো। প্রবল চাপের মুখে কমরেডরা এলাকা ছাড়তে বাধ্য হলেন এবং অভয়নগর পার্টির সঙ্গে যোগ দিলেন। সময়টা ছিল মে মাসের শেষের দিক। অভয়নগর এলাকাটা ছিল বেশ বড়। সংক্ষেপে বলা যায় অভয়নগর, বাঘুটিয়া বানীপুর, মধ্যগ্রাম, কুদলা, হরিশংকরপুর, পাথালিয়া, বর্নী, কামকুল, বনগ্রাম, বিছালী, আকবপুর, রুন্দিয়া, মালাধরা, চাকই, মধুরগাতী, হিদিয়া, ইছামতি, জামরিল, গাজীর হাটসহ আরো অনেকগুলি গ্রাম। পেড়লি ছিল অভয়নগরের পূর্ব দিকের শেষ প্রান্তে। এই পেড়লিকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পার্টির শক্তিশালী একটা সামরিক এলাকা।

অভয়নগর একটি বড় এলাকা হলেও এখানে সেই একই দৃশ্য। যশোরের কয়েকটি বিশাল অঞ্চলে ইপিসিপি (এম-এল)-এর নেতৃত্বে জনগণের সক্রিয়

সহযোগিতায় অসংখ্য হিন্দু গ্রামের উপর আক্রমণ প্রতিহত করা হয় এবং গ্রামের পর গ্রাম মানুষ যখন ভারতে চলে যেতে চাইল তাদেরকে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পার্টির নেতা-কর্মীরা ক্লান্তিহীনভাবে সহযোগিতা করে গেছেন। অসহনীয় কষ্ট ও মৃত্যু কিছুদিনের মধ্যে স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। আমরা জানতাম লড়াইয়ের মাঠ আমরা সহজে ছেড়ে দেব না ঠিকই তবে তার জন্য আমাদের অভাবনীয় খেসারত দিতে হতে পারে এবং তা জীবন উৎসর্গ করেই।

অভয়নগরে মার্চের শেষ এবং এপ্রিল থেকেই আক্রমণকারীদের চাপ বেড়ে চলল। তারা যে কখন আক্রমণ করবে তাও বুঝা যাচ্ছিল না। আক্রমণকারীরা ক্রমেই হিংস্র হয়ে উঠছিল। তাদের নেতারা ক্রমাগত তাদের সংঘবদ্ধ করে তুলতে থাকে এবং তারা ঘোষণা করে যে পাকিস্তান রক্ষার জন্য এক পবিত্র দায়িত্ব পালন করে চলেছে অর্থাৎ লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন এবং নির্বিচারে হত্যা এসব ছিল পবিত্র দায়িত্ব পালনেরই অংশ। অর্থাৎ আক্রমণের পেছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আদর্শগত ভিত্তি তৈরী করে দেয়া হচ্ছিল যে এই আক্রমণ-ধ্বংস লীলা ন্যায্য।

পুরাতন পার্টি নেতা সুধাংশু দে'কে কেন্দ্র করে হানিফ গাজী, জবেদ আলী, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, খবিরউদ্দীন, সামাদ ভাই, আলাল, নিরাপদ বিশ্বাস, জমশেদ মোড়ল, রবিন বিশ্বাস, গোলাম, বক্কর সর্দার, হাতেম মাস্টার, মিজানুর রহমান মাজেদ, হাসান, নূর মোহাম্মদ (২) সহ আরো কয়েকজন পার্টির নেতা-কর্মী ঐক্যবদ্ধ ভাবে মার্চ থেকেই আক্রমণ প্রতিহত করার নেতৃত্ব দিতে থাকেন। এরই এক পর্যায়ে বাঘুটিয়ায় শান্তি কমিটির আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে ৮ এপ্রিল কমরেড হানিফ গাজী শত্রু পক্ষের বোমা হামলায় নিহত হন। তিনি শত্রুর আক্রমণে নিহত পার্টির প্রথম শহীদ। এই এপ্রিলে শংকরপুরের কমরেড আলাল ও কুদলার কমরেড নিরাপদ বিশ্বাস রাজাকারদের হাতে শহীদ হন। এপ্রিল মাসের শেষ চন্দ্রপুরের কমরেড গোলাম মুস্তফা ভারতগমন করেন। ভারতে গমনকারী তাঁর মতো আরো অনেকেরই কোনোদিন আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি।

তাছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার সমস্ত পরিস্থিতি এমনভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে গেল যে দেশের মাটিতে কমিউনিস্টদের সম্মিলিত শক্তি যেমন পর্যায়ে ছিল তা মাত্র নয় মাসের মধ্যে অর্থবহ সশস্ত্র শক্তিতে পরিণত

হতে পারতো বলে আমার মনে হয় নি। যে বিরাট অঞ্চল জুড়ে আমরা প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে তা চালিয়ে যাচ্ছিলাম তার মধ্যে একমাত্র পুলুম ও পেড়লী ভৌগলিক অবস্থার বিন্যাসের কারণে বেশ কিছুটা সুরক্ষিত ছিল–এই দুটি এলাকার প্রায় সবদিকে নদী, খাল বিল দিয়ে এমনভাবে ঘেরা ছিল যে শত্রু ইচ্ছে করলেই যখন তখন এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারতো না। তবে দেখা গেছে, পাকবাহিনী প্রায়শ নদী পথে গানবোট নিয়ে এসে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পেড়লীতে ডাঙ্গার কিছু দূর পর্যন্ত যেতে পারতো, যদিও টিকে থাকতে পারে নি। যা হোক জুলাই মাসের প্রথম দিকে অভয়নগর এলাকার পতন ঘটার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে চলা শুরু হলো পেড়লী অভিমুখে।

নড়াইল ও লোহাগড়ার পথে

নড়াইলের বেশ বড় এলাকা জুড়ে ইতিমধ্যে ইপিসিপি (এম-এল) বিস্তার লাভ ও গণভিত্তি অর্জন করে। এছাড়াও লোহাগড়ার বেশ কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পার্টির ভিত্তি মজবুত হয়। কালিয়া অঞ্চলে পার্টি কেবল নিজেদেরকে গুছিয়ে তুলছিল। কমরেড বিমল বিশ্বাসসহ কমরেড মমতাজউদ্দীন, কমরেড সবুর, কমরেড হাফিজ ও কমরেড মনু জমাদার এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

২৬ মার্চ, ১৯৭১

পাকবাহিনীকে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে নড়াইলে পার্টির সাথে সম্পর্কিত প্রাক্তন ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও প্রধানত তৎকালীন ছাত্র নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে গণসমর্থনের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে একত্রে কোর্টে সংরক্ষিত অস্ত্রগার থেকে যথেষ্ট পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। ঐ মুহূর্তে নড়াইলের এসডিও কামাল সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন না। ভারপ্রাপ্ত এসডিও দায়িত্বে ছিলেন গিয়াসউদ্দীন আহমেদ। এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব নূর মোহাম্মদ মিঞাও উপস্থিত ছিলেন। কিভাবে বেশী পরিমাণ অস্ত্র দ্রুত হস্তগত করা যায় সে ব্যাপারে শহীদ মমতাজউদ্দীন ও হাফিজুর রহমান খোকন সতর্ক ছিলেন। জনাব গিয়াসউদ্দীন লিখিত অনুমতি

ও কোথের চাবি দিতে বাধ্য হন। পরে কামাল সিদ্দিকী হাজির হন এবং স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

এই অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপার পার্টির পক্ষে মূল নেতৃত্ব দেন শহীদ কমরেড মমতাজউদ্দীন ও কমরেড হাফিজুর রহমান খোকন। এঁদের সঙ্গে দলের আরো যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন : মিজানুর রহমান, মুনীর শরীফ, গোলাম মোস্তফা, মাহমুদ, মফিজুর রহমান, আসাদ, আফছার, কাজী মোহন, ইদ্রিস আলী, কমরেড সরোজ বোস, সরদার জহিরউদ্দীন, লতিফুর রহমান, পাগলা সিরাজ, জহুরুল কামাল ও মনু জমাদারসহ বিপুল কর্মীবাহিনী ও সমর্থকবৃন্দ। মনু জমাদার রূপগঞ্জে ছিলেন এবং শেষের দিকে এসে অংশগ্রহণ করেন।

২৬ মার্চ, রাতে দরিদ্র দর্জী কমরেড দারাউদ্দিন আহমেদকে দিয়ে খোকনসহ আরো কয়েকজন পাকিস্তানী পতাকার বিপরীতে কতকগুলি জাতীয় পতাকা তৈরী করিয়ে নেয়।

২৭ মার্চ, কমরেড আব্দুস সবুরের নেতৃত্বে সরুশুনা-লাহুড়িয়া থেকে এক বিশাল জঙ্গি মিছিল পার্টি লাল পতাকা নিয়ে নড়াইলে উপস্থিত হন।

২৭ ও ২৮ মার্চ, এখন যেখানে বিদ্যুৎ অফিস সেখানে ফাঁকা মাঠ ছিল, ঐখানে প্রাক্তন সৈনিক লাহুড়িয়ার সৈয়দ জনাব আলী ও জনাব জহরুল হক, কমরেড মমতাজ ও কমরেড হাফিজের নেতৃত্বে অনেক নেতা-কর্মীদের এই প্রথম যতদূর সম্ভব প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ দেন।

২৮ মার্চ, রাতে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, ইপিসিপি (এম-এল)-এর নেতা-কর্মীরা ও এদের সহযোগী ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের বেশ বড় একটি অংশ সশস্ত্রভাবে বাকড়ী স্কুলে অবস্থান নেন। সঙ্গে ইপিআর-এর কিছু লোকও ছিল।

২৯ মার্চ, ১১ খান অঞ্চলের স্বতঃস্ফূর্ত জনগণের এক বিরাট মিছিল লাঠি, রামদা, সড়কী, ঢাল, বল্লম, ঢাক-ঢোল নিয়ে এদের সঙ্গে যোগ দেন।

কমরেড বিমল বিশ্বাসের ভাষায়, '২৯ মার্চ ইপিআর বাহিনী ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও আমাদের পার্টির নেতা-কর্মীরা যৌথভাবে যশোর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।' (বিশ্বাস, ঐ, পৃ ১৭)

যশোর শহরের পুব দিক থেকে শহরে প্রবেশের মুখে নদীর উপর একটি ব্রিজ। ব্রিজের আগে হাতের ডানে ইপিআর ক্যাম্প। যা ঝুমঝুমপুর ক্যাম্প

বলে পরিচিত। এর পাশ দিয়ে শুরু হয়েছে এক অবাঙালি পল্লী–বিহারী পল্লী বলে খ্যাত। সূত্র মতে বিহারী পল্লী থেকে বাধা দেবার চেষ্টা হলে এই পল্লী আক্রান্ত হয় এবং এটা প্রচারিত আছে যে, বেশ কয়েকজন অবাঙালি নিহত হন। মিছিলে সেনানিবাস থেকে মর্টার আক্রমণ হয় (সূত্র : কমরেড বিমল বিশ্বাস)। সে-বাধা অতিক্রম করে এই বিরাট মিছিলটি শহরের ভেতর দিয়ে ঘোপ এলাকায় অবস্থিত জেলা কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে পৌঁছায়। কিছুটা টালবাহানার পর জেল কর্তৃপক্ষ আত্মসমর্পণ করে। মিছিলের নেতৃবৃন্দ জেল থেকে কমরেড অমল সেন, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, এ্যাড. সৈয়দ গোলাম মোস্তফা ও গোকুল বিশ্বাসকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন।

এপ্রিল মাসের ৮/৯ তারিখে নড়াইলে বম্বিং হয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি সেনাবাহিনী নড়াইল শহর নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেয়। শান্তিবাহিনী থেকে রাজাকারবাহিনী পাকিস্তানী সৈন্যদের ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠে।

২৩ এপ্রিল আউড়িয়া থেকে আগত বড়ন্দার গ্রামে অবস্থানকারী এক হিন্দু ভদ্রলোককে পাকবাহিনীর প্রথম গড়ে-ওঠা শান্তি বাহিনী ধরে নিয়ে যায়, কিছুক্ষণ পর আমরা খবর পেয়ে সশস্ত্র শান্তি কমিটির লোকদের আক্রমণ করে ঐ হিন্দু ভদ্রলোককে মুক্ত করতে সক্ষম হই।

'এ ঘটনার পরে ২৪ এপ্রিল সূর্য্য ওঠার আগেই পাক হানাদার রেঞ্জার বাহিনী রকেট লাঞ্চারের গোলা বর্ষণ করতে করতে গোরবার রাস্তা ধরে বড়ন্দার দিকে এগোতে থাকে। আমাদের মাত্র ১৩ জন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ছিল। প্রবল আক্রমণে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বড়ন্দারের খাল পেরিয়ে বীড় গ্রামে যখন পৌঁছাই তখন রেঞ্জার বাহিনী গোবরার রাস্তা ধরে বীড় গ্রামে ঢুকে জ্বালাও পোড়াও শুরু করে। সেদিন সাইদ হাফিজুর রহমান খোকন, সুধাংশু রায়, সরোয়ার জান মোল্লা, ইমরান, বট্ট, হাফিজ ও আমি ওদের আক্রমণের মাত্র ৫০ গজের মধ্যে থেকেও বেঁচে গেছিলাম, যা ভাবতেও অবাক লাগে। কয়েকটি বাড়ী-ঘরের আড়ালের কারণে আমরা বেঁচে যাই। পরে ধান খেতের মধ্য দিয়ে ক্রলিং করে গোয়াইল বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে হিজলতলায় ১৩৪ জন একত্রিত হই। তার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে রামনগরচরের স্কুল মাঠে এসে প্রয়াত ডা. জ্ঞানেন্দ্র নাথ বালা, প্রফেসর হরিপদ বিশ্বাস, ভবেশ বিশ্বাস সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম এই সংখ্যালঘু অঞ্চলে জনগণের নিরাপত্তা দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, বরং শরণার্থী

হয়ে ভারতে চলে যেতে সাহায্য করা উচিত হবে। সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে যশোরের বাঘারপাড়া থানার ভাঙ্গুড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আমরা পোড়াডাঙ্গায় এসে বর্তমানে ইংরেজীর শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাসের সাহায্যে নৌকায় নদী পার হয়ে তারপর নড়াইলের আরেকটি নদী পার হয়ে শালিখা থানার বামনখালি গ্রামে পৌঁছাই।' (বিশ্বাস, ঐ, পৃ ১৮) বামনখালি হলো পরবর্তীতে ইপিসিপি (এম-এল)-এর মূলঘাঁটি পুলুম-এর মূল এলাকার সর্বশেষ দক্ষিণের গ্রামটি। নড়াইল-রূপগঞ্জ ও গোবরা এলাকার পতনের পর পার্টির নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী চিত্রানদীর পূব দিক ও লোহাগড়া থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। নড়াইলের পতনের পর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ দেশত্যাগ করেন। লোহাগড়া থানার কয়েকটি ইউনিয়নের মধ্যে রয়েছে উত্তরে নলদী, শালনগর, লাহুড়িয়া, নোয়াগ্রাম এবং দক্ষিণে দিঘুলিয়া, ইতনা ও মল্লিকপুর। লাহুড়িয়া আসলে সারা দেশের অন্যতম বৃহৎ একটি গ্রাম। ১৪-১৬টি বড় পাড়া নিয়েই একটি ইউনিয়ন। লাহুড়িয়ার পর কল্যাণপুর-কামারগ্রাম। এর পরই আর একটি বিখ্যাত গ্রাম সরুশুনা। লাহুড়িয়াতে কমরেড তবিবর রহমান ওরফে মনু জমাদারের নেতৃত্বে যেমন পার্টির বিস্তার লাভ করতে থাকে তেমনি সরুশুনাতে কমরেড আব্দুস সবুরের নেতৃত্বে পার্টি মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যায়। উত্তরে কুমড়ী-শিয়েরবর অঞ্চলেও পার্টি সেল গঠিত হয়েছে। যা হোক, পুরো অঞ্চলে পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি বিষয়ে আমি আগেই উল্লেখ করেছি। প্রকৃত অর্থে এই পুরো অঞ্চলটিতে শান্তি কমিটির, রেঞ্জার বা রাজাকার বাহিনী–এমন কি পাকসেনারাও ঢুকতে পারে নি।

১৪ জুনের জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের পর পার্টি প্রভাবিত অঞ্চলগুলির বেশ কতগুলি গ্রামে 'বিপ্লবী কমিটি' গঠিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষে এইসব কমিটি গ্রামের প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। বিভিন্ন ভাবে সংগৃহীত ধান, চাল, ভূমিহীন গরীব কৃষক ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হতো। আরো নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের শ্রমিক-কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ভ্রূণ হিসেবে বিপ্লবী কমিটি কাজ করতে থাকে। তবে সর্বদাই এই সময়ে আমাদের প্রধান দায়িত্ব থেকেছে পাকবাহিনী ও তার দোসরদের মোকাবেলা করা ও ধ্বংস করা।

কোতয়ালী, বাঘার পাড়া ও কালিগঞ্জের অংশ বিশেষ নিয়ে

একটি এলাকার গতি-প্রকৃতি

একদিকে দক্ষিণে নওয়াপাড়ার (যশোর পৌরসভা সংলগ্ন) অংশ বিশেষ থেকে শুরু করে উত্তরে চৈত্রবাড়ী-মল্লিকপুর পর্যন্ত ও পূবে খাজুরা-সিমাখালি থেকে পশ্চিমে দুলাল মন্দির পর্যন্ত এলাকাটি ছিল বেশ বড়। অথচ এই বিরাট অঞ্চলটিতে সেনাবাহিনী তো দূরের কথা শান্তি কমিটি থেকে শুরু করে রাজাকার বাহিনী এদের কারো আক্রমণ হয় নি। পার্টি প্রভাবাধীন কিছু কিছু গ্রাম মাঝে মধ্যে ছিল আর ছিল প্রায় পাঁচ শতাধিক সক্রিয় কর্মী। ছাত্র-কৃষকদের নিয়েই এই কর্মীবাহিনী গড়ে ওঠে। এই অঞ্চলের পার্টির মূল নেতা ছিলেন কমরেড নূর জালাল মাস্টার ও বিশ্বনাথ বসু। দলেননগরের অধ্যাপক আব্দুল গফুর এপ্রিলের প্রথম দিক থেকে নিজ বাড়িতে বিভিন্ন অঞ্চলের নেতা-কর্মীদের নিয়মিত চাপ সহ্য করে আসছিলেন। তিনিও এই অঞ্চলের বড় একটি অংশে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন এবং বর্ণিত কমিটির সঙ্গেই সর্বদা নেতৃত্ব দিয়েছেন। এছাড়া ছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় ঘুনু ভাই। দীর্ঘদিন ধরে পার্টির সঙ্গে যুক্ত ও কৃষক সমিতির একজন নেতা সুইতলা মল্লিকপুরে প্রবীণ কমরেড ইমান আলী মাস্টার যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন।

কালিগঞ্জের দিকটাতে কমরেড ওয়াজেদের নেতৃত্বে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছিল। তিনি এম এম কলেজের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন এবং বেশ আগেই পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। কমরেড ওয়াজেদের নেতৃত্বে ছিল ছাত্র-কৃষকদের নিয়ে অত্যন্ত সক্রিয় একটি কর্মীবাহিনী। তাঁর ছিল অতুলনীয় সাংগঠনিক দক্ষতা। কমরেড ওয়াজেদকে পরবর্তীতে রক্ষীবাহিনী হত্যা করে। এই অঞ্চলে ইপিসিপি (এম-এল)-এর রাজনৈতিক বিভাগ পরিচালনা করতেন কমরেড নূর জালাল মাস্টার এবং সামরিক বিভাগের পরিচালনা করতেন কমরেড বিশ্বনাথ বসু।

এলাকার প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল তেলকুপ বাজার, দামোদরপুর বাজার ও মনোহরপুর বাজার। চাপরাইল স্কুলকে কেন্দ্র করেও একটা শক্তির এখানে বিকাশ ঘটে, তবে তারা সকলেই ছিলেন প্রায় নিরস্ত্র। এই এলাকা সব থেকে যে তাৎপর্যপূর্ণ কাজটি করেছে তা হলো শরণার্থীদের বিশ্রাম, খাওয়া ও ভারত অভিমুখে যশোর কালিগঞ্জ প্রধান সড়কটি পার করিয়ে দেওয়া। পুলুম হয়েও বিভিন্ন দল এই পথ দিয়েই ভারতে চলে যেত।

পেড়লী

পেড়লী ছিল পার্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। '৭১-এর মার্চের শেষ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অনেক ছোট-বড় খণ্ড যুদ্ধের মধ্য দিয়েও অঞ্চলটিতে নিজেদের রক্ষা করা হয়েছিল। পেড়লী কালিয়া থানার অন্তর্গত। কিন্তু পেড়লী গ্রামটি ছিল অভয়নগর-খুলনা-কালিয়া থানার একটি মিলিত স্থান। আসলে তিনটি অঞ্চলেরই গ্রামটি ছিল সীমান্ত।

একদিকে মধুমতী-নবগঙ্গা অন্যদিকে চিত্রা আতাই নদীর পাড়ে পেড়লী অবস্থিত। বিল, নদী, বড় মাঠ, ঘন গ্রাম। এখান থেকে খুলনা শহরের দূরত্বই বোধ হয় সব থেকে কম। যেখান থেকে নিয়মিত পাকবাহিনী ও রাজাকারদের আক্রমণ হতো। খুলনার ফুলতলাও কয়েক মাইলের মধ্যে। পেড়লী বাদ দিলে এই অঞ্চলটি প্রধানত চন্দ্রপুর, শীতলবাড়ী, জামরিল, সাতবেড়ে, খড়রিয়া গাজীরহাট, বুদিখালী, মহিষখোলা, যাদবপুর, বিষ্ণুপুর, হিদিয়া এবং কাছাকাছি আরো কয়েকটি কম প্রভাবিত গ্রাম নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এখানে ১৯৭১-এর আগ থেকেই পার্টির যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু শক্তিশালী সেল বা লোকাল কমিটি ছিল না।

মার্চের পর কমরেড বৈদ্যনাথ বিশ্বাস ও কমরেড গোলাম মোস্তফার উদ্যোগে পার্টির সদস্য ও গ্রুপ সদস্যদের নিয়ে একটি পার্টি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। এরমধ্যে কমরেড জাকির হোসেন হবি, কায়সার, বাকী বিল্লাহ, নিয়াজ ওরফে মঞ্জুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পেড়লী নেতৃবৃন্দ প্রথমে অবাঙালি বিহারীদের উপর যে আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড চলছিল তা কিছুটা প্রতিহত করেন। এ সময় পুলিশ-ইপিআর কর্তৃক পরিত্যক্ত কিছু আগ্নেয়াস্ত্র পার্টির নিয়ন্ত্রণে আসে। এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। পরে অবশ্য অবাঙালি বিহারীরা পেড়লী এলাকায় মাঝে মাঝে যে আক্রমণ হতো তাতে অংশগ্রহণ করতো। ক্রমে এই এলাকা প্রায় ১২-১৫ মাইল জুড়ে বিস্তৃত হয়। এখানে বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটির মাধ্যমেই জেলা কমিটির নির্দেশিত পথে কার্যক্রম শুরু হয়। সংখ্যালঘুদের ফেলে যাওয়া ধান-চাল বেশ পরিমাণ সংগৃহীত হয় এবং ভূমিহীন-গরীব কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

পরবর্তী অধ্যায় শুরু হলো অস্ত্রসহ একটা বাহিনী নিয়ে অভয়নগরের নেতা-কর্মীদের ও খুলনা অঞ্চলের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কমরেড ও অস্ত্রসহ কিছু

পার্টি সেনাদের আগমনে। অভয়নগর অধ্যায়ে যে সব নেতাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের প্রায় সকলেই এখন পেড়লীতে। দীর্ঘসময় ধরে জেলা পার্টির সম্পাদক হিসেবে থাকা প্রবীণ কমরেড শুধাংশু দে তো আছেনই।

খুলনা থেকে ৪-৫ জন নেতৃস্থানীয় কমরেড পেড়লী আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কমরেড রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কমরেড সাহেব আলী, কমরেড রুহুল আমিন ও কমরেড রফি। কমরেড সাহেব আলী দেহরক্ষীর বিশ্বাসঘাতকায় শহীদ হন ও কমরেড রুহুল আমিন একটি প্রায় দুর্ভেদ্য রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে তাদের প্রায় পরাজিত করার মুখে অকস্মাৎ একটি গুলিতে নিহত হন।

আগস্ট মাসের ১৬-১৭ তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা কমরেড আব্দুল হক অভয়নগরের একটি পথে নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় পেড়লী পৌঁছান। এখানে তিনি সিনিয়র পার্টি সদস্যদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। ১৯ আগস্ট কমরেড নাজিমের নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র ইউনিট কমরেড আব্দুল হককে পুলুম পৌঁছে দিয়ে আসেন।

ফুলতলার কমরেড রফি শহীদ হলেন। কমরেড রফি ছিলেন অত্যন্ত সুপরিচিত একজন শ্রমিক নেতা। তিনি পেড়লীতে যাতায়াত করতেন। ফুলতলায় গিয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। হঠাৎ রাজাকারদের হাতে গ্রেফতার হয়ে যান এবং তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তাঁর খণ্ডিত মস্তকটি বাজারে ঝুলিয়ে রাখা হয় অনেক দিন।

মাগুরা-মহম্মদপুর

১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পর মাগুরাতে আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলিতভাবে পার্টির নেতা-কর্মীরা শত্রুর মোকাবেলা করতে থাকেন। আওয়ামী লীগ দেশত্যাগ করলে কমরেড আলী কদর ও কমরেড রায়হান অন্যান্য নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মহম্মদপুর থানার গ্রামের ভেতরের দিকে চলে যান ও পাক-বাহিনী মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এর মধ্যে রাজাকারদের উদ্ভব ঘটলে পার্টির নেতৃত্বে তাঁরা ইতোমধ্যে যে ছোট একটি বাহিনী দাঁড় করাতে পেরেছিলেন সেই শক্তি দিয়েই অকস্মাৎ মহম্মদপুরের রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করেন। বেশ কয়েকজন রাজাকার নিহত হয় এবং তাঁরা ক্যাম্প দখল করে মহম্মদপুর থানাও আক্রমণ করেন। থানাও দখল

হয়ে যায়। সম্ভবত এটা মে মাসের শেষ অথবা জুনের প্রথম দিকের ঘটনা। এর ফলে পার্টি অনেকগুলি রাইফেল দখল করে নেয় এবং পুরো এলাকা পার্টির নিয়ন্ত্রণে আসে। এক ধরনের মুক্ত এলাকা হয়ে যায়। গ্রামে-গ্রামে বিপ্লবী কমিটি গঠনের কাজ শুরু হয়। অবশ্য এই আক্রমণে লাহুড়িয়া থেকে একটি সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করা হয়।

তিন মাসের অধিক সময় এলাকাটি তারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। গোপনে কমরেড রায়হানের নেতৃত্বে একটি বাহিনী রেখে কমরেড আলী কদরসহ বাকী সেনা সদস্য ও নেতা-কর্মীরা সেপ্টেম্বরের শেষে পুলুমে চলে আসেন। এদিকে মাগুরা শহরে বেশ কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল ব্যক্তি ও আওয়ামী লীগের দুইজন নেতা-কর্মী পাকবাহিনীর হাতে নিহত হন। আওয়ামী লীগের দুজন ছিলেন হাদেক আলী ও কাদের খান। প্রগতিশীল হিসেবে পরিচিতদের মধ্য থেকে সিরাজুল ইসলাম, লুৎফর রহমান লুতু, কবির ও কোন দল-না-করা মন্টুকে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে মাগুরাতে আরো অনেককে হত্যা করা হয়। ১২ জুন নিরো ভাইদের ধরতে রাজাকাররা তাঁদের বাড়ি আক্রমণ করে, তবে তাঁরা গোপনে সংবাদ পেয়ে আগেই পালিয়ে যান। নিরো ভাই পুলুমে চলে যান। নিরো ভাইয়ের পুরো নাম মোঃ মাহফুজুল হক নিরো–কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একজন খ্যাতনামা ছাত্রনেতা ও রাজনৈতিক কর্মী; পরে মাগুরা কলেজে অধ্যাপনা করেন। নিরো ভাইয়ের এক ছোট ভাই দাদু তখনো স্কুলের ছাত্র, তাকে রাজাকাররা গ্রেফতার করে বর্বর উপায়ে নির্যাতন করে। দাদু একটু দুরন্ত ছিল। রাতে তাকে খুন করা হবে সেটা সে টের পেয়েছিল–ঐ অবস্থায় কৌশলে হাতের বাঁধন খুলে সে পালিয়ে যায়।

হেলেন ছিলেন শিক্ষিকা, ১৯৬৮ সালে বিএ পাস করে তিনি মাগুরা গার্লস হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। সংসার, চাকরি, সন্তান পালন ও পার্টির কাজ–সব সামাল দেবার অসাধারণ যোগ্যতা তাঁর ছিল। তাকে আমি তাঁর স্কুল জীবন থেকেই চিনতাম। মার্চের পর শুরু হলো তার দূরূহ জীবন। গোপনে সে সব কাজই চালিয়ে যাচ্ছিল। নিরো ভাইদের আদি নিবাস মহম্মদপুরের হরেকৃষ্ণপুর। হেলেনের এখানে যাতায়াত বাল্য বয়স থেকেই। সুযোগ পেলে সে একাই তার ছোট সন্তানটিকে সঙ্গে নিয়ে মহম্মদপুর চলে যেত। এবং পরে ঐ এলাকাতেই থেকে গেল। কমরেড আলী

কদর ও তার সহকর্মীরা পুলুমে যাওয়ার পর হেলেনকে রাজাকাররা গ্রেফতার করে মাগুরা নিয়ে এসে হত্যা করে–সে, ছিল এক মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক হত্যাকাণ্ড। মানুষ মারার ঐ সময়েও এই ধরনের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্ত দেশে খুব কমই ছিল। হত্যা ও হত্যার পরের দৃশ্য ছিল অন্যান্য হত্যাকাণ্ডের থেকে বেশ আলাদা। হেলেনের পুরো নাম লুৎফুন নাহার হেলেন। হেলেনের স্বামী কমরেড আলী কদরের ভাষায়, 'হেলেনের মৃত্যুর ঘটনা ছিল করুণ ও মর্মান্তিক। অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে আমাদের মহম্মদপুর এলাকার বাহিনী পুলুম এলাকার মহম্মদপুর থানার এক গ্রামে অবস্থানকালে ঘাতকদালালদের গুপ্তচরের সহায়তায় হেলেন ২ বছর ৫ মাস বয়স্ক শিশুপুত্র দিলীরসহ রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ে গেলে তাকে সরাসরি নিয়ে আসা হয় মাগুরা শহরে। এরপর পাকবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে তাকে সোপর্দ করা হয় জিজ্ঞাসাবদের জন্য। হেলেনের এই দুঃসংবাদে তার বৃদ্ধ পিতা ও কতিপয় আত্মীয়স্বজন দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতা হেলেনের মুক্তির জন্য শত অনুরোধ করলেও মাগুরার জামাতপন্থী ঘাতক দালালরা তার মুক্তির ব্যাপারে সব চাইতে বেশি বাধা সৃষ্টি করে। আলোচনায় পাকবাহিনী কর্মকর্তা জানায় যে, হেলেন মাগুরার বামপন্থী নেতা মাহফুজুল হক নিরোর বোন এবং মহম্মদপুর এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনীপ্রধান বামপন্থী নেতা আলী কদরের স্ত্রী। সুতরাং তার মুক্তির প্রশ্নই ওঠে না। তাই চরম সাম্প্রদায়িক, বাংলার স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক দালালদের ইচ্ছাই কার্যকর হলো। হেলেনের মৃত্যু হয় ১৯৭১-এর ৫ অক্টোবর রাত্রিবেলায়। ঐ রাত ছিল সকল মুসলমানদের পবিত্র রাত–শব-ই-বরাত-এর রাত। ঐ রাতেই তারা হেলেনের শিশুপুত্র দিলীরের করুণ কান্নাকে উপেক্ষা করে তাকে মায়ের কোল থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাঠিয়ে দেয় নানা বাড়ীতে। তারপর অমানবিক নির্মম শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে হেলেনকে। আর তার লাশ জীপের পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাস্তার উপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যায় মাগুরা শহরের অদূরে নবগঙ্গার নদীর ডাইভারশান ক্যানেলে।' *(স্মৃতি একাত্তর–৮ম খণ্ড, ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী। সম্পাদক, রফিক হায়দার)*

কমরেড রায়হানকে মুক্তিবাহিনী গ্রেফতার করে। দীর্ঘদিন তাকে তারা জীবিত রাখে। অবশেষে তাকে তারা হত্যা করে।

কপালিয়া-মনোহরপুর অঞ্চল

মনোহরপুর-কপালিয়া অঞ্চলটি ছিল খুলনা জেলার সীমান্তের কাছে। এখন থেকে চেচুড়িয়ার দূরত্ব বেশি নয়। চেচুড়িয়ার ভৌগোলিক অবস্থান হলো নওয়াপাড়া, ফুলতলা, মনিরামপুর ও কেশবপুর থানার সংযোগ স্থানে। এই কয়টি স্থানই প্রায় সমদূরত্বে অবস্থিত। অর্থাৎ চারটি থানার মিলনস্থল। এপার-ওপার মাঝখানে শ্রী নদী। শ্রী নদীর ওপরে রয়েছে ডুমুরিয়া, রুদঘরা, ধামালিয়া ইত্যাদি কয়েকটি গ্রাম। এই জায়গাটি ছিল খুলনা পার্টির একটি শক্তিশালী এলাকা। যা হোক, কমরেড আব্দুল মতিন, কমরেড আসাদ, কমরেড তোজো, কমরেড শান্তি ও কমরেড মানিক নওয়াপাড়ায় মোশাররফ হোসেনের বাড়িতে দুই-তিন দিন অপেক্ষা করে মনোহরপুর-কপালিয়া এলাকাকেই তাঁদের কাজের মূল ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। কিন্তু এই সময় পুরো অঞ্চলটি ধরে রাজাকাররাও দ্রুত সংঘবদ্ধ হয়। তারা একটি বড় বাহিনী গড়ে তোলে এলাকাটি ধ্বংস করে দেয়ার জন্য। সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে ইপিসিপি (এম-এল)-এর সশস্ত্র প্রতিরোধ ঘটনাপ্রবাহের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। এর পরে ক্রমাগত চলতে থাকে সেনাবাহিনীর সমর্থনসহ রাজাকার ও কখনো কখনো যথেষ্ট শক্তিশালী রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই। এই যুদ্ধ ছিল একেবারেই অসম। পার্টির কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল খুবই কম ও নিম্নমানের। এখানে এই যুদ্ধে পার্টি ও পার্টির সমর্থক শহীদ কমরেডদের একটি ছোট তালিকা দেওয়া হলো :

১১ আগস্ট ১৯৭১-এ শহীদ ভাইয়েরা হলেন– ১. কমরেড সরোয়ার, পিতা-হাজের আলী সরদার, সাং-মনোহরপুর। ২. কমরেড মশিয়ার, পিতা-শের আলী তরফদার, সাং-মনোহরপুর। ৩. কমরেড আকবর আলী সরদার, পিতা-পরশউল্যা সরদার। ৪। শওকত সরদার, পিতা-মোবারক আলী সরদার। ৪. জয়নাল গাজী, পিতা-আবেদ গাজী। ৬. শামসুর মহলদার, পিতা-নৈমুদ্দিন মহলদার। ৭. সোহরাব বিশ্বাস, পিতা-মনোছোপ বিশ্বাস, সর্ব সাং-মনোহরপুর, ডাক : মনোহরপুর, মনিরামপুর, যশোর। ৮. আতিয়ার রহমান, পিতা-অজ্ঞাত। এলাকায় নিযুক্ত সরকারি কৃষি কর্ম/সেক্রেটারি। স্থানীয় লোকজন বলতো সেকটার সাহেব।

৫ অক্টোবর '৭১-এ কপালিয়ার শ্রীহরি নদীতীরে শহীদ ভাইদের নাম– ১. ফজলুর রহমান সরদার, পিতা- এনায়েৎ আলী সরদার। ২. নূর মোহাম্মদ,

পিতা-জোনাব আলী গাজী। ৩. আব্দুস সালাম সরদার, পিতা-গহর আলী সরদার। ৪. গোলজার সরদার, পিতা-হাশেম আলী। ৫. আনছার মোল্যা, পিতা-পরশউল্যা মোল্যা। ৬. ইকবাল হোসেন, পিতা-আনসার গাজী। ৭. মনোরঞ্জন মণ্ডল, পিতা-সনাতন মণ্ডল। ৮. চিত্ত সরকার, পিতা-অমূল্য সরকার। ৯. ঠাকুর দাস সরকার, পিতা-সুধন্য সরকার। ১০। রাজেশ্বর দেবনাথ, পিতা-যোগেন্দ্র দেবনাথ। ১১. ওয়াজেদ আলী মোল্যা, পিতা-কালু মোল্যা। ১২. জোনাব আলী মোল্যা, পিতা-আব্বাস মোল্যা। ১৩. জবা রানী ওরফে ফুটকুলি মণ্ডল, পিতা-শিশুবর মণ্ডল। (সূত্র : সনজিত বিশ্বাস)।

কোতোয়ালি, বাঘারপাড়া ও কালীগঞ্জের অংশবিশেষ নিয়ে একটি এলাকার গতি-প্রকৃতি

এই অঞ্চলের উপর কোনো আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা যাচ্ছে না। তবে এই এলাকার প্রায় ৫০ জন কমরেড শহীদ হয়েছিলেন। আগস্টের একটা পর্যায়ে বর্ণিত অঞ্চলের কমরেডরা জানতে পারেন এলাকার উপর বড় ধরনের সামরিক অভিযান যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে। এলাকাটির শুরু যশোর শহর থেকে এবং এই আশঙ্কায় বড় একদল বাহিনী নিয়ে নেতৃবৃন্দ যুদ্ধের মূলকেন্দ্র 'পুলুম-এ' চলে আসেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তৃতীয়বারের মতো শালিকা থানা আক্রমণ করতে গিয়ে আমরা ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছিলাম। এর মধ্যে এই এলাকার কয়েকজন কমরেডও ছিলেন। সেপ্টেম্বরের শেষে আমাদের কিছু না জানিয়ে খাজুরা কোতোয়ালির প্রায় ৫০ জন কমরেড নৌকায় করে গোপনে তাঁদের নিজেদের এলাকায় ফিরে যাচ্ছিলেন। আড়পাড়া ব্রিজ অতিক্রম করার সময় রাজাকারদের হাতে গ্রেফতার হন। যশোর জেলা ন্যাপ (মোজাফফর)-এর সভাপতি নূর জালাল সাহেবের মতে ২ জন বেঁচে যান। এবং বিমল বিশ্বাসের মতে, ৪৬ জনকে পাকবাহিনী ও রাজাকাররা হত্যা করে। 'সেপ্টেম্বরের কোনো এক সময়ে খাজুরা ও কালীগঞ্জের বাহিনীর সদস্যরা ফেরার পথে সীমাখালীতে ৪৮ জন গ্রেফতার হয় এবং রাজাকাররা তাদের মধ্য থেকে ৩৩ জনকে হত্যা করে। কয়েক দিনের ব্যবধানে আড়পাড়ার পথে খাজুরা অঞ্চলের কমরেডদের যাবার সময় আরো ১২ জনকে রাজাকাররা হত্যা করে।' *(বিমল বিশ্বাস, ঐ, পৃ-১৬৫)*

উপসংহার

এই প্রবন্ধে মূল বইটি "একাত্তরের যুদ্ধ : যশোরে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)-এর বীরত্বপূর্ণ লড়াই ও জীবনদান" এর প্রথম অধ্যায় থেকে যেমন মাত্র দুটি অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তেমনি তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ পরিশিষ্ট-১ ও ২ থেকে কোনো অংশই অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এছাড়া 'নওয়াপাড়া-কুয়োদা-মনিরামপুর- কেশবপুর-ডুমুরিয়া-তালা' ও 'কোতোয়ালি, বাঘারপাড়া ও কালীগঞ্জ' এলাকার ওপর আলোচনা থেকে কোনো অংশ এই প্রবন্ধে অংশগ্রহণ করা হয়নি।

আমরা যে যুদ্ধ চালিয়েছিলাম তা ছিল একান্তই অসম যুদ্ধ। একদিকে শক্তিশালী পাকিস্তান রাষ্ট্র ও উন্নত অস্ত্র প্রযুক্তিসহ তার বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যদিকে মহা শক্তিশালী ভারত রাষ্ট্র তাদের দ্বারা প্রশিক্ষিত বিভিন্ন বাহিনী ও উন্নতমানের অস্ত্র প্রযুক্তি। আমরা একেবারেই প্রথম দিকে ভারত থেকে যারা প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তাদের দ্বারা আক্রান্ত হইনি। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে যারা মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনী নামে দেশের ভেতরে প্রবেশ করেন তারা বিনা প্ররোচনায় আমাদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চাপিয়ে দিতে থাকে। যেখানে মাসের পর মাস আমরা শক্তিশালী পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নির্মম ও অসম যুদ্ধে লিপ্ত এবং ক্রমাগত শহীদ হয়ে চলেছি, আমাদের কমরেডরা সেখানে ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তি ও মুজিববাহিনীর আক্রমণের ফলে আমাদের অস্তিত্ব দূরতই নিঃশেষের পথে অগ্রসর হয়। দেশের ভিতরে থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার চরম খেসারত আমাদের দিতে হয়েছে। কিন্তু আমরা ছিলাম নাছোড়বান্দা। দেশ স্বাধীন হবে, মানুষ মুক্ত হবে এবং কায়েম হবে সমাজতন্ত্র– এই প্রতিজ্ঞা ও অবস্থান থেকে আমরা কখনোই সরে যাইনি।

এখানে একটি বিষয় আমি সকলের দৃষ্টিআকর্ষণ করছি : আমাদের দেশে সমর সাহিত্য ও সামারিক ঐতিহাসিকদের লেখা বিষয় নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না। তা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি বইয়ের প্রকাশনা আমাদের যথেষ্ট উপকারে এসেছে। উন্নতমানের সমর সাহিত্য ও সামরিক ঐতিহাসিকদের আরো প্রকাশনার জন্য অপেক্ষা করে থাকছি।

পুলুম হেডকোয়ার্টার, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অজানা পথ

পুলুম গ্রামটি শালিখা থানায় অবস্থিত। পুলুম থেকে থানা বেশী দূরে নয়। আবার নড়াইল থানাও কয়েক মাইলের মধ্যেই। যশোর শহর ও সেনানিবাসের দূরত্ব খুব যে বেশী তাও বলা যায় না। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পুলুমে হঠাৎ করে কোন বাহিনীর পক্ষে হাজির হওয়াটা সহজ ছিল না।

যশোর শহর থেকে এর দূরত্ব ২২-২৫ মাইল উত্তর পূর্বে, নড়াইল থেকে ৮-১০ মাইল উত্তর পশ্চিমে, মাগুরা থেকে ১৬-১৮ মাইল দক্ষিণে।

পুলুম বেশ সুপরিচিত একটি গ্রাম। এর অন্যতম একটি কারণ হলো পুলুম হাইস্কুল। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঘোষগাতীর কমরেড শামছুর রহমান। যার পিতা ছিলেন কবি শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন।

স্কুলের মাঠটি এতটাই বড় ছিল যে, সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ (পেড়লী বাদে) জেলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে কর্মীরা পুলুমে পৌঁছানোর পরেও স্থান সংকট দেখা দেয় নি। তখন পার্টি নেতা-কর্মী ও সমর্থক সকলে (১৪-১৫ শত) স্কুলের এই মাঠেই দিনের অধিকাংশ সময় সমবেত হতো।

এই স্কুল ও তার মাঠকে কেন্দ্র করে হেডকোয়ার্টারের কাজ শুরু। –লক্ষ্য ছিল জনগণতান্ত্রিক পূর্ব পাকিস্তান। আমি প্রথম থেকে ভেবে এসেছি এবং আস্থা রেখেছি পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রথমপর্ব হিসেবে জনগণতন্ত্র কায়েম হওয়া মানেই তা হবে একটি স্বাধীন সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক দেশ। ফলে যেন-তেন প্রকারের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম নয়, প্রয়োজন সরাসরি শ্রমিক-কৃষক তথা মেহনতী মানুষের রাজ কায়েম এবং সেই অর্থেই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা। একেবারে প্রথম পর্বেই এই চিন্তা ছিল, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করার মধ্য দিয়েই হয়তো এই প্রত্যাশা পূরণ হবে।

আমরা আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়িত করতে একটি বিপ্লবী সামরিক লাইন প্রণয়ন করেছি–কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়াই। এখানে তো একটা ঘাটতি থেকেই গেল। লাইনটি প্রণয়নের সময় আমি সচেতন ছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তান চীন বা রাশিয়া নয়, ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানও নয়। কোন সন্দেহ নেই আমি মাও-সে-তুংয়ের ছয়টি সামরিক প্রবন্ধের সাহায্য নিয়েছি। জেলা কমিটির কাছে বক্তব্য তুলে ধরার সময় সব কথাই বলেছি। জেলা কমিটির প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন, ব্যাখ্যা চেয়েছেন, এমন

কি একাধিকবারও কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জেলা কমিটি গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে– তাদের জ্ঞান এবং কাণ্ডজ্ঞান বাস্তবানুগ হওয়াতে সুবিধে হয়েছে।

অনেকগুলি সিদ্ধান্তের মধ্যে আমরা প্রথমে বেছে নিলাম নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে সেনাসদস্য রিক্রুট শুরু করা, সামরিক ট্রেনিং ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ একই সঙ্গে দেওয়া, স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় বাহিনী গঠন প্রক্রিয়া চালু করা। দ্বিতীয়ত, মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রভাবিত গ্রামে বিপ্লবী কমিটি গঠন। তৃতীয়ত, এই উদ্দেশে সারা জেলায় ১৪ জুনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া এবং প্রথমেই পুলুম থেকে শালিখা, নড়াইল ও মহম্মদপুর থানার অংশবিশেষ এবং পুরো লোহাগড়া থানা চষে ফেলা।

কমরেড বিমল বিশ্বাস ছিলেন নড়াইল-লোহাগড়ায় বিশেষ পরিচিত। এই অঞ্চলেই তাঁর প্রধান কাজের এলাকা। আমি ও বিমল বিশ্বাস বেরিয়ে পড়লাম। সামরিক কমিশনের কমরেড খবিরউদ্দীন হেডকোয়ার্টারে বেশীর ভাগ সময় থাকবেন ঠিক হলো। তাছাড়া জেলা পার্টির সম্পাদক কমরেড শামছুর রহমান ও কমরেড হেমন্ত সরকার তো গোপনে এই এলাকাতেই থাকবেন। ঐ অঞ্চলে পুলুম স্কুলকে কেন্দ্র করে পার্টির সৈন্য হিসেবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রিক্রুট শুরু করা হলো।

আমরা ১০-১২ মাইল পথ পায়ে হেঁটে পৌঁছালাম লাহুড়িয়া। কমরেড তবিবর রহমান মনু জমাদারের বাড়ীতে উঠলাম। ওদের বাড়ীর সামনে একটি প্রাইমারী স্কুল ও একটি মাঠ। এখানে ঐ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জেলা পার্টির সিদ্ধান্ত নিয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হল। রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লালবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগে গেরিলা বাহিনী গঠন এবং ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া ও বিপ্লবী কমিটির মাধ্যমে তথা শ্রমিক-কৃষক রাজ কায়েম। পাক সেনা ও শান্তিবাহিনীর (রাজাকার বাহিনী সেই সময় গড়ে উঠছিল) আক্রমণ প্রতিহত করা ও এলাকাকে সম্প্রসারিত করা। পার্টির সদস্য ও ঐ অঞ্চলে সরুশুনা গ্রামে বাড়ী হওয়ার দরুন বিশেষ প্রভাবশালী নেতা কমরেড আব্দুস সবুরের নেতৃত্বে সরুশুনাতেও বৈঠক ও দীর্ঘ আলোচনা হলো জেলা পার্টির নতুন সিদ্ধান্ত নিয়ে। স্থির হলো মুক্তিকামী মানুষের জন্য শোষণমুক্ত একটি সমাজ গড়ে তোলার এই সুযোগকে পরিপূর্ণভাবে কাজে

লাগাতে হবে। পুরো লোহাগড়া থানা আমরা যতদ্রুত সম্ভব যোগাযোগ করে ফেললাম। তাছাড়া পুলুমের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা ও নিয়মিত সামরিক কমিশনের বৈঠকের জন্য আমরা এক সপ্তাহের বেশী বাইরে থাকতাম না।

ওদিকে জুলাই মাস নাগাদ পুলুমের পশ্চিমে নারকেলবাড়িয়া পর্যন্ত আমাদের দখলে। অজস্র কর্মী ও সমর্থক। এখানে লোকবলের ঘাটতি নেই। ঘাটতি হলো নেতৃত্ব ও অস্ত্রের।

পার্টির রাজনীতির সঙ্গে জুনের পরের অধ্যায়েই একটা গণযোগাযোগ হয়ে গেল। বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হলো ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের কাছে পার্টির রাজনীতি নিয়ে যাওয়া এবং তাদের সাথে গভীর ভাবে মিশে যাওয়াকে।

আমাদের প্রধান অভাব আগ্নেয়াস্ত্র। আমাদের দখলে প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য অস্ত্র। একটি গ্রামে হয়ত দুই-তিনটি করে রাইফেল। এ ঘাটতি কিভাবে মেটাবো?

জুলাই মাসে কমরেড দীপুর নেতৃত্বে শালিখা থানা দখল হল। কিছু অস্ত্র পাওয়া গেল– কয়েকটি রাইফেল ও কিছু গুলি। কিন্তু একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। থানাতে আগুন লাগাতে দাহ্যপদার্থ দরকার। গ্রামের সাধারণ মানুষ অল্প অল্প করে নিজেদের বাড়ী থেকে একত্রিত করে ২-৩ টিন কেরোসিন যোগাড় করে ফেললেন। এইসব থানা ছিল সাধারণ কৃষকের কাছে মূর্তিমান অভিশাপ। কয়েকশ' লোক জড়ো হয়ে গেল। দাউ দাউ করে থানার প্রধান অংশই পুড়ে গেল। পুলিশরা কিছুটা বাধা দিতে গেল, তবে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হল আত্মসমর্পণ করতে।

এই থানায় আমরা নিজেরা কোন ঘাঁটি স্থাপন করি নি। আগস্টের প্রথমে রাজাকাররা কয়েকজন পুলিশসহ নদী পথে রাতে এসে হঠাৎ শালিখা থানা দখল করে বসল। আবারো আক্রমণ– আবারো দখল। কিন্তু খুব গোপনে স্থানীয় পাকিস্তানী দালালদের সহযোগিতায় দ্বিতীয়বার শালিখা থানা হাতছাড়া হলো– এবার রাজাকারদের বড় বাহিনী– তাদের সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তানী সেনাদের বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত বাহিনীর অংশ। আমাদের পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিকদের তখনো অভাব।

মর্মান্তিক এক হত্যাকাণ্ডের কাহিনী

আগেই বলেছি পার্টির সেরা কয়েকজন কমরেডের নেতৃত্বে কুয়োদা, মনিরামপুর, রাজগঞ্জ ও কেশবপুরে প্রথমে এপ্রিল-মে এবং পরে এলাকা ভাগ করে দিলে মে'র শেষে ঐ সব অঞ্চলে ব্যাপক কর্মী-সমর্থকদের সহায়তায় কাজ শুরু হয়ে যায়। প্রথম থেকেই প্রধান কাজ হয়ে পড়েছিল সংখ্যালঘু এলাকার উপর হামলা প্রতিরোধ ও পরে তাদেরকে ভারতে চলে যেতে সাহায্য করা। নিরেট সমতলভূমি এবং আগ্নেয়াস্ত্রের অভাব নিয়েই তাঁদেরকে শান্তিবাহিনী থেকে শুরু করে রাজাকার-রেঞ্জার ও পাক সেনাদের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে ক্রমাগত। শুরু হলো পিছু হটা। মূল নেতৃত্ব প্রথমে চলে যেতে বাধ্য হয় কেশবপুরে। সেখান থেকে পাঁজিয়া এবং পাঁজিয়া থেকে খুলনার ডুমুরিয়া পার্টির সঙ্গে একযোগে কাজ করে যেতে থাকেন। এই দলটির সঙ্গে জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মহিউদ্দীন আলী আকতারও কিছুদিন ছিলেন। দলের থেকে বেশ কিছু দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কমরেড হাফিজ। তাঁকে সেপ্টেম্বরে মুক্তিবাহিনী সাতক্ষীরা এলাকায় হত্যা করে।

সম্ভবত মে মাসের শেষের দিকে অথবা জুনের প্রথম দিকেই রাজগঞ্জ এলাকা থেকে পার্টির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যশোর এম. এম. কলেজের ১৯৬৬-৬৭ সালে ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কমরেড নজরুল ইসলাম পাকবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। তাকে তারা অবশ্য তৎক্ষণাৎ হত্যা না করে যশোর সেনানিবাসে অনেকদিন বন্দী রাখে এবং পরে হত্যা করে। এই ক্যান্টনমেন্টে বন্দী অনেক যোদ্ধা, এমনকি মুসলিম লীগ ও কোন কোন অবাঙালিদের ব্যক্তিগত আক্রোশের শিকার সাধারণ মানুষকেও নিহত হতে হয়েছে। এই ক্যান্টনমেন্টে প্রথম গ্রেফতার হয়ে আসেন আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী সাংসদ এ্যাডভোকেট মশিউর রহমান। শুনেছি তাঁকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। কারো লাশেরই সামান্যতম খোঁজ পাওয়া যায় নি।

যা হোক, পার্টি নেতৃত্বের যে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি শেষ পর্যন্ত যশোর সীমানা অতিক্রম করে খুলনার ডুমুরিয়া গেলেন তাঁরা সেখানে বেশীদিন থাকতে পারেন নি। এই সময় এক দূরূহ সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। ঠিক করেন তাঁরা গোপনে যশোর শহরে ফিরে আসবেন। যেসব স্থানে তাঁরা টিকতে পারেন নি প্রায় সেই সব পথ ধরেই তাঁদের ফিরে আসতে হবে। তাঁরা অনেক কৌশলে,

দুই-তিন বার চরম বিপদের মুখে পড়তে পড়তে শেষ পর্যন্ত কেশবপুর ও চিনেটোলার মাঝামাঝি প্রধান সড়ক অতিক্রম করে লক্ষণপুর গ্রামে গোপনে এক শুভানুধ্যায়ীর বাড়ীতে অবস্থান করেন। বিশ্বাসঘাতকতা করে এদেরকে রাজাকার বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। ২৩ অক্টোবর লক্ষণপুর থেকে এদেরকে ধরে নিয়ে আসা হয় চিনেটোলার রাজাকার ক্যাম্পে এবং ঐ রাতেই তাঁদেরকে প্রথমে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পরে ব্রাশ ফায়ারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

সারা জেলার এমন কি সমস্ত দেশের মধ্যে সেরাদের সেরার মধ্যে গণ্য করা যাবে এই সব শহীদদের। এই হত্যাকাণ্ডে শহীদ হন যশোর জেলার ১১ দফা আন্দোলন-এর আহ্বায়ক ও কলেজ ছাত্র সংসদের সভাপতি কমরেড আসাদুজ্জামান, যশোর জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড আহসানউল্লাহ খাঁন মানিক, গণসংগঠন বন্ধের আগে জেলা কৃষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কমরেড সিরাজুল ইসলাম শান্তি ও কমরেড ফজলু দফাদার, যিনি সেনাবাহিনী ত্যাগ করে গ্রামে ফিরে এসে পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। এবং আরো শহীদ হন কমরেড মাশুকুর রহমান তোজো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাবল অনার্স–গণিত ও পদার্থবিদ্যা, ছাত্র ইউনিয়ন করতেন এবং কারাবরণ করেন। পদার্থবিদ্যায় মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ। তোজো কিছুদিন বুয়েটে শিক্ষকতা করেন, অতঃপর উচ্চতর গণিতসহ এ্যাকচুয়ারী পড়তে লন্ডনে যান। শিক্ষা শেষে দেশে এলে বড় কোম্পানীতে চাকরী পান। গাড়ী-বাড়ী পেলেন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিলেন; প্রথমে পূর্ব বাংলা (এম-এল) পরে পূর্ব পাকিস্তান (এম-এল)। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ভাই বোন মা চাচা কাউকে কিছু না বলে দেশের মাটিতে যুদ্ধ করতে চলে এলেন। পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। শহীদ হলেন, ২৩ অক্টোবর ১৯৭১-এ। যশোরে কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল সংগঠনসমূহ দিবসটি এযাবৎকাল নিয়মিত পালন করে আসছেন।

আবার পুলুম এবং শেষ অধ্যায়ের দিকে যাত্রা

আগস্টের প্রথমে মুক্তিবাহিনী ও সেপ্টেম্বরের প্রথম দিক থেকে মুজিববাহিনী ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রসহ দেশের অন্যান্য অংশের মতো যশোরে আমাদের এলাকাগুলো দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা শুরু

করল। এবং পূব দিকে মধুমতি নদী এলাকা ধরে সুসংগঠিত হতে থাকল। কয়েক মাস আমরা এমনিতেই পাকবাহিনী, শান্তিকমিটি, রাজাকার, রেঞ্জারদের ক্রমাগত আক্রমণ প্রতিরোধ ও পরাভূত করতে গিয়ে যথেষ্ট বিপর্যস্ত হয়েছি এবং একই সঙ্গে ইতিমধ্যে আমরা হারিয়েছি অনেক নেতৃস্থানীয় কমরেডদের। এই সময় পুলুমের উপর তীব্র চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পুলুমের দক্ষিণ পশ্চিম ছিল আমাদের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সংবাদ পাচ্ছিলাম পাক-বাহিনী-রাজাকার মিলিতভাবেই এলাকা ধ্বংস করার পরিকল্পনা করছে। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি এলাকার দক্ষিণ সীমান্তে নড়াইলের অংশে মাইজপাড়া গ্রামে প্রায় হঠাৎ করেই এক বড়সড় রাজাকার ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সুযোগ পেলেই রাতে মাঝে মধ্যে এলাকার উপর গুলি ছোড়া শুরু করতো। এদিকে শালিখা থানাকে কেন্দ্র করে রাজাকারদের দ্রুত শক্তি সমাবেশ বেড়েই চলছিল–চিত্রা নদীর পাড়েই থানাটির অবস্থানের কারণে ও নারকেলবেড়ে আমাদের হাতছাড়া হওয়াতে স্থলপথে ও নদীপথে শালিখা থানাকেই সব দিক দিয়ে প্রস্তুত করা হচ্ছিল পুলুম আক্রমণের জন্য।

আগস্টের ২০ তারিখে কোতয়ালী বাঘারপাড়া ও কালিগঞ্জ থানার সমন্বয়ে গঠিত এলাকা ঐ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ ভেঙ্গে দিলেন। প্রায় ৬০ জন নেতা-কর্মী এলাকা পরিত্যাগ করে পুলুমে চলে এলেন। মহম্মদপুর থানা এলাকা থেকেও বেশ কিছু কর্মী পুলুমে চলে এলেন। আগস্টের মাঝা-মাঝি মাগুরার মাহফুজুল হক নিরো ভাই পুলুমে এলেন। পার্টি লাইন নিয়ে তাঁর মতভিন্নতা ছিল। তিনি একটি লিখিত বক্তব্য সম্পাদক বরাবর লিখে পুলুম ত্যাগ করেন।

২৪ আগস্ট তারিখে আলফাডাঙ্গার মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা শিয়েরবরের অঞ্চলের রঘুনাথপুর গ্রামে আমাদের পার্টি কর্মী মাহাবুল ও সাহাবুল দু'ভাইকে হত্যা করে। ২৮ আগস্ট তারা কমরেড মমতাজউদ্দীন ও কমরেড মাহমুদকে গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে লোহাগড়ায় আড়িয়ারা স্কুল মাঠে হত্যা করে। আমরা মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সংঘাত এড়াতে চেয়েছি কিন্তু বাস্তবে মুক্তিবাহিনীর সাথে লাহুড়ি অঞ্চলেও সংঘর্ষ হয়েছে। (বিশ্বাস, ঐ, পৃ. ২১)

ইতিমধ্যে পুলুম হয়ে দাঁড়িয়েছে মধুমতির ওপার থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসা শরণার্থীদের অন্যতম নিরাপদ বিশ্রাম কেন্দ্র। যথাযথ পরিচর্যার

পর তাদেরকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে সীমান্ত অতিক্রম করার উপযুক্ত স্থানে নিয়মিত পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পার্টি গ্রহণ করে। এছাড়া প্রথম থেকেই জেলা পার্টির প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোর কর্মী ও জনগণ শরণার্থীদেরকে সীমান্ত অতিক্রম করানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করে গেছে। নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর সীমান্ত অতিক্রম করতে পূর্ণ সহযোগিতা করা হয়েছে।

দেশমুখ পাড়া-গ্রামে পার্টির প্লাটুনের প্রধান দায়িত্ব ছিল কমরেড দীপুর উপর। সেখানে খাজুরা এলাকা থেকে আসা কমরেড বিশ্বনাথ বসুকে কমরেড দীপুর সহযোগী করা হলো। প্রথমে কমরেড দীপু ও পরে কমরেড বিশ্বনাথ বসু যৌথভাবে যুক্তি দিলেন– অনতিবিলম্বে শালিখা থানা আক্রমণের, নতুবা চিত্রার পশ্চিমের সীমান্তে চৌকিগুলো হুমকিতে পড়বে এবং নদী ও স্থল পথে বড় ধরনের কোন আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে না। তাঁদেরকে পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হলো– তাঁরা রিপোর্ট দিলেন থানা আক্রমণ করে উচ্ছেদ করা সম্ভব। কমরেড বিমল বিশ্বাস জানিয়েছেন তিনি থানা আক্রমণের আগেই এর বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁকে দ্রুত পুলুমে চলে আসতে আমি চিঠি লিখি বলে তিনি তাঁর লেখাতে জানিয়েছেন। তিনি একটি বাহিনী নিয়ে ফাজারখালি রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করতে যান, কিন্তু প্রবল বৃষ্টির কারণে অভিযান বাতিল করতে হয়।

শালিখা থানা তৃতীয়বারের মতো আক্রমণের বিষয়টি নিয়ে শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা চলছিল। পার্টি সম্পাদক ও কমরেড হেমন্ত সরকার পুলুমে ছিলেন। পরিস্থিতি এমন নয় যে আমি একাই সিদ্ধান্ত দিতে পারতাম। দীপু ও বিশ্বনাথ নেতৃস্থানীয় সকলের সঙ্গেই আলাপ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ৪ সেপ্টেম্বর থানা আক্রমণের অনুমোদন দেয়া হয়। আক্রমণে বিপর্যয় ঘটে। ইটের পাকা ব্যাংকার দিয়ে অতি গোপনে যে দুটি পরিবেষ্টনী তৈরী করা হয়েছিল–তা তদন্ত রিপোর্টে আসেনি। আমাদের আক্রমণে রাজাকার ও তাদের সঙ্গে থাকা অন্যান্য সামরিক ইউনিটের ব্যাপক ক্ষতি হয়। হতাহতের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু প্রায় দুর্ভেদ্য করে তোলা ক্যাম্পটির পতন ঘটানো সম্ভবপর হয় নি। আমাদেরকে হারাতে হলো কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পার্টি কমরেডদের যাঁরা যুদ্ধবিদ্যায় ইতিমধ্যে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কমরেড বিশ্বনাথ বসু, মেধাবী ছাত্র

হরিরামপুরের কমরেড বাশার, এলএমজি ব্যবহারে বিশেষ পারদর্শী কমরেড মুরাদ, নড়াইলের কমরেড ইমরান। নড়াইলের আর একজন বিশিষ্ট যোদ্ধা বট্ট, ইমরানকে উদ্ধার করতে গিয়ে আহত হন। আরো ২-৩ জন কমরেড নিহত হন, কিন্তু তাঁদের নাম উদ্ধার করা যায় নি। ইমরান আমার কোলের উপর মৃত্যুবরণ করেন। আহত অবস্থায় তাঁকে পুলুমে আনা হয়েছিল। তিনি মৃত্যুর আগে বলেন, 'ইন্দ্রদা আপনাকে বলে যাচ্ছি–রশিদ (বিমল বিশ্বাস) ভাইকেও বলবেন, আপনারা এই হত্যার প্রতিশোধ নেবেন'। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি বেলা ১১ টার দিকে উপস্থিত হই। অংশগ্রহণ করি। পুরো অবস্থাটা পর্যালোচনা করি। বিকেলেই পাকবাহিনী অতিরিক্ত রাজাকারসহ নদী পথে শালিখা থানায় হাজির হয়। প্রবল আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণে চলতে থাকে। সন্ধ্যার বেশ কিছু পরে আমরা পিছু হঠলাম।

২৮ আগস্ট মুক্তিবাহিনীর হাতে বিশেষ করে কমরেড মমতাজউদ্দীনের হত্যাকাণ্ড ও ৪ সেপ্টেম্বরের বিপর্যয় আমাকে দ্রুত পরিবর্তিত পরিস্থিতির মূল্যায়নে সাহায্য করে। একেতো ৪ সেপ্টেম্বরের বিপর্যয়ের দায় আমি কখনোই এড়াতে পারি না– দ্বিতীয়ত, লোহাগড়াতে আমাদের ওপর সম্পূর্ণ বিনা কারণে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ; এই দুই কারণে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে বলে আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম। কমরেড মমতাজ উদ্দীনকে আমি ১৯৬৩ সাল থেকে চিনি। চমৎকার কমরেড, অসাধারণ মানুষ। শুনেছি হত্যাকাণ্ডের আগেও তিনি বৈঠক করতে চেয়েছিলেন। আক্রমণকারীরা তাঁর অচেনা নয় বলে অনুমান করি।

আমি কিছুটা বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। আর যুদ্ধ চালানো যাবে না। যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। যুদ্ধনীতি অনুযায়ী পশ্চাদপসরণ। এর পর পরই এলাকার পূর্বদিকের প্রধান অঞ্চল ভেঙ্গে গেল। ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত প্রত্যাগত মুক্তিবাহিনী পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মাকড়াইলে সমবেত হয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং বিরাট এক বাহিনী নিয়ে দক্ষিণে ডহরপাড়া ও পুবে এগারো নলি দিয়ে মূল লাহুড়িয়া আক্রমণ করে। বীরত্বের সঙ্গেই কমরেডরা লড়ে যান–একমাত্র আমাদের পার্টির নেতা-কর্মীদের হত্যা করা ছাড়া এই আক্রমণের অন্যকোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় নি।

আক্রমণকারী প্রতিপক্ষের শক্তির তুলনায় লাহুড়িয়ার কমরেডদের বাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। তবুও প্রায় পাঁচ ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে

লাহুড়িয়ার আহম্মদ শহীদ হন। লাহুড়িয়া থেকে বাহিনী পিছু হটে সরুশুনাতে চলে যায় এবং যথাসম্ভব গুছিয়ে নিয়ে শেষ রাতে পুলুমে চলে আসে।

১৪ সেপ্টেম্বর রাতে মনু জমাদারের বড় ভাই বাদশা জমাদার ও তার আর এক ভাই ওহাব জমাদারকে হত্যা করা হয়। অর্থাৎ আমাদের পশ্চিমে-দক্ষিণে পাক-বাহিনী ও তাদের দোসররা এবং পূর্বে ভারত থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও ভারতীয় অস্ত্রেসজ্জিত মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনীর শুরু হলো এক ধরনের যৌথ আক্রমণ।

পুলুম এলাকায় এখন নড়াইল, লোহাগড়া, খাজুরা-কালিগঞ্জ ও মহম্মদপুর এলাকা থেকে আগত পার্টি নেতৃবৃন্দ, বাহিনী ও একান্ত সমর্থকদের একাংশ এসে একত্রিত হল। বাস্তবে ঘটনা এই রকম যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাদে প্রায় সকলেই পার্টির নেতা-কর্মী-বাহিনীরই অংশ হয়ে গেছে।

সেপ্টেম্বরের একেবারেই শেষে আমাদের কিছু না জানিয়ে খাজুরা কোতয়ালীর প্রায় ৫০ জন কমরেড নৌকায় করে গোপনে তাদের নিজেদের এলাকায় ফিরে যাচ্ছিলেন। আড়পাড়া ব্রিজ অতিক্রম করার সময় তাঁরা রাজাকারদের হাতে গ্রেফতার হন। নূর জালাল-এর মতে ২ জন বেঁচে যায়, এবং বিমল বিশ্বাসের মতে ৪৬ জনকে পাক-বাহিনী ও রাজাকাররা হত্যা করে।

পুলুম-এলাকার উপর বিরাট চাপ। আক্রমণ প্রতিহত করারই যে প্রধান সমস্যা সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রায় ১৫০০ লোকের দুই বেলা খাওয়া, থাকা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াল। আগে থেকেই কমরেড সামাদ শিকদারকে প্রধান করে একটি খাদ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সামাদ ভাই পার্টির পুরনো ও অভিজ্ঞ কমরেড, কিন্তু হিমশিম খাচ্ছিলেন। অবশ্য পুরো বাহিনীকে আংশিক সক্রিয় রাখা হয়েছিল কিছু ট্রেনিং, অস্ত্র পরিষ্কার রাখা ও রাজনৈতিক আলোচনার মধ্য দিয়ে।

এই সময় নড়াইলের কমরেড সুধাংশু, কমরেড সরেজাহানসহ কয়েকজন কমরেড আমার সঙ্গে আলাদা বসতে চাচ্ছেন বলে বিমল বিশ্বাস বলেন। কমরেড বিমল বিশ্বাসসহ এঁদের সঙ্গে বৈঠক হলো। সুধাংশু ছিল অত্যন্ত মেধাবী কমরেড। মনে হলো সে সকলের পক্ষ থেকেই বক্তব্য দিচ্ছে। সে ঘাঁটি এলাকার শর্ত নিয়ে আলাপ করলো, এবং বলল ইতিমধ্যে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি বোমারু বিমান যশোর ফরিদপুর সীমান্তে বোম্বিং

করেছে। সুতরাং একে কি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় যুদ্ধের আলামত মনে করা যাবে না? এ সবই ছিল গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক প্রশ্ন। আলাপের বিবরণ এখানে দেয়া সম্ভব হলো না। সেই সময় এইসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল–আলাপও হয়েছিল। বিষয়টি এখানে শুধু নথিবদ্ধ করে রাখলাম।

এলাকা ভেঙ্গে দেয়া অর্থাৎ পশ্চাদপসরণের জন্য আমি মনস্থির করে ফেলেছি। সংক্ষেপে বিমল বিশ্বাসকে বিষয়টি অবহিত করি।

২০ অথবা ২১ সেপ্টেম্বর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড শামসুর রহমান আমার সঙ্গে একান্তে জরুরী বৈঠক করলেন। তিনি সরাসরি জানালেন–আমি বিমর্ষ থাকি এবং বাহিনীর উপর এর প্রভাব পড়ছে বলে তিনি রিপোর্ট পেয়েছেন। আমি বললাম অভিযোগ সত্য। প্রধান কারণ? বললাম– এলাকা ভেঙ্গে দিতে হবে, তবে অস্ত্র রক্ষা করে এবং গোপনে। কারণ কি? বললাম জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি পর্যবেক্ষণে এবং দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির দ্রুত পট পরিবর্তনে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অনিবার্য–এটাই এখন ঘটনার প্রধান দিক। ফলে এই দেশের জনগণের আশু ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটির ফয়সালা হবে দুই দেশের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। তাছাড়া ইতিমধ্যে আমাদের পক্ষে এই যুদ্ধকে যে আর সম্প্রসারিত করা সম্ভব নয় তা প্রমাণিত। আমাদের এই পর্ব ঐতিহাসিক ভাবেই শেষ হয়ে গেছে।

৪/৫ দিন পর তিনি আবার বৈঠক করলেন– বললেন, আপনি কি মনে করেন শেষ পর্যন্ত আমরা পরাজিত হব? আমি বললাম, আমরা ইতিমধ্যেই পরাজিত হয়ে গেছি। তিনি বিরক্ত হলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, আপনি যদি যুদ্ধ নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েন সেক্ষেত্রে কি আপনি বাহিনী প্রধানের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন? বললাম আপনি জেলা কমিটির বৈঠক ডাকুন, আমাকে সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিন।

১২ অক্টোবর, ১৯৭১

এরই মধ্যে একদিন প্রায় সকাল থেকেই চিত্রা নদীর দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে পাক-বাহিনী ও রাজাকারদের বিরাট এক বাহিনী আমাদের এলাকার পতন ঘটাতে তীব্র আক্রমণ শুরু করে। একনাগাড়ে গুলি বর্ষণ করে চলল। আমরা সংগঠিতভাবে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যেতে

থাকলাম। পাকবাহিনীর পক্ষ থেকে এলএমজি ও অন্যান্য উন্নতমানের অস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার হতে থাকল। আমাদের বাহিনী বেলা ৩টা পর্যন্ত একনাগাড়ে আক্রমণ অব্যাহত রাখল। সুইতলাতে যে দুটো ইউনিট ছিল তারা পাক সেনাবাহিনীর লম্বা লাইন দেখে দ্রুততার সঙ্গে নদী পার হয়ে চলে আসে। দেশমুখ পাড়াতে পুরো একটি প্লাটুন ও আরো দুটো ইউনিট থাকায় তারা তিন ঘণ্টার মতো আক্রমণ প্রতিহত করতে পারল, তারপর কৌশলে নদী পার হয়ে এপারে চলে এল। সন্ধ্যার দিকে জেলা কমিটির জরুরী বৈঠক। এলাকা পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত হল। পুরো জেলা কমিটিসহ অজানার উদ্দেশ্যে রওনা। রাজাকারদের হাতে নিহত হলেন মধুখালির লাল মিয়া ও কমরেড ওহাব। এই রাতের বর্ণনার এক স্থানে কমরেড বিমল বিশ্বাস লিখেছেন, 'এই যাত্রাপথে সম্মুখ সারিতে আমি, কাফি, মিজানুরসহ একটি শাক্তিশালী প্লাটুন নিয়েছিলাম, পেছনে কমরেড নূর মোহাম্মদের নেতৃত্বে যে প্লাটুন ছিল তার মধ্যে নূর মোহাম্মদ ভাইকে বিশাল ওজনের এক খোঁড়া কমরেডকে সারা পথ কাঁধে নিয়ে আসতে হয়।' (বিশ্বাস, ঐ, পৃ ২০) আমার কাছে একটি এস.এল.আর., একটি রিভলবার ও একটি পিস্তল, কোমরে ২-৩ পেটি গুলি ও ১টা অতিরিক্ত ম্যাগাজিন। আমি খোঁড়া কমরেড মুনীরকে কয়েকবার মাটিতে নামিয়ে দিলাম এবং পথ হারিয়ে ফেললাম। আমার সঙ্গে থাকা একটি সেকশন-এর কমরেডরা ২-৩ বার আবার ফিরে এসে আমাকে উদ্ধার করে। আমি মুনীরকে বললাম, 'বল তুই কেন এসেছিলি লাহুড়িয়া থেকে।' বলল, 'বিপ্লব করতে'। বললাম এখন বিপ্লবের স্বার্থেই তোকে গুলি করা দরকার। বলল, 'আপনার এই কষ্ট দেখে আমারো তাই মনে হচ্ছে।' গর্জে, উঠলাম চুপ। বলে ওর মাথায় রিভলবার চেপে ধরলাম। কয়েকদিনের চাপ ও সারাদিনের ক্লান্তি তার উপর আমার অস্ত্রের ওজন, রক্তাক্ত পা। আবার মুনীরকে কাঁধে তুলে নিলাম।

পরদিন ১৩ই অক্টোবর। মিঠাপুরের পরিত্যক্ত একটি পাড়ার ২-৩টি বাড়ী বেছে নিলাম। বিমল বিশ্বাস বলছেন, 'সমস্যা হলো নৌকা থেকে খাদ্য, অস্ত্র, গোলাবারুদ, নামিয়ে আনা এক কঠিন ব্যাপার হয়ে গেল। কারণ ফাজারখালি রাজাকার ঘাঁটির রাজাকাররা নদীর ওপারে অবস্থান নিয়ে নেয়। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা নেমে এল, নৌকা থেকে গোলাবারুদ ও খাদ্য নামাবার জন্য নূর মোহাম্মদ ভাই নৌকার কাছে চলে গেছেন (সে সময় ওপার থেকে আমাদের

দিকে গুলি বৃষ্টি হচ্ছিল)। আমি খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরণখোলার ভূমিহীন কমরেড আকরকে নিয়ে এক দৌড়ে নদী ঘাটে গিয়ে নূর মোহাম্মদ ভাইকে বললাম, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? শিগ্রীই উপরে উঠে আসুন।' একটি নারকেল গাছকে আড় করে দাঁড়িয়ে নূর মোহাম্মদ ভাইকে একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াতে বললাম। কমরেড আকর সমস্ত গোলাবারুদ ও খাদ্য তুলে দিল এবং কয়েকজন কমরেডের সহযোগিতায় ঐগুলো যথাস্থানে পাঠিয়ে দিলাম' (বিশ্বাস, ঐ, পৃ ২০)

সন্ধ্যার পর পরই হঠাৎ আমাদের অবস্থানের উপর তিন দিক দিয়ে গুলি বর্ষণ হতে থাকল। গুলির ধরন দেখে নিশ্চিত হলাম–শুধু রাইফেল নয়, এলএমজিও হতে পারে–নিদেন পক্ষে সাব মেশিন গান। পাল্টা গুলি চালানো দরকার। চরম ক্লান্ত বাহিনী হঠাৎ কেমন যেন পাথরের মতো হয়ে গেছে। তবু তাদেরকে উজ্জীবিত করে পাল্টা আক্রমণ শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ ওরা থেমে গেল। চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে বিছিন্ন হয়ে পড়া বাহিনী একত্রিত করে পাড়ার বাইরে এক জায়গায় একত্রিত করা হলো।

সবাইকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দেয়া হলো। ভোর রাতে আবার রওনা। নলদী-বারুইপাড়া। এখানে রান্নার ব্যবস্থা হল। কিন্তু রান্না তখনো শেষ হয় নি, বলতে গেলে খিচুড়িতে তখনো চাল রয়েছে– কিন্তু কমরেডরা একেবারে গরম খাবার তুলে তুলে খাওয়া শুরু করল– আগের রাতে খাওয়া হয় নি।

বেলা ২.৩০-৩টার দিকে নড়াইল থেকে আরো অধিক সংখ্যক পাকবাহিনীর একটি দল এবং সঙ্গে কিছু রাজাকারসহ ৩-৪টি বড় লঞ্চ ভর্তি হয়ে আমাদের অবস্থানের খুব কাছেই লঞ্চ থেকে ডাঙ্গায় নেমে সন্তর্পণে আমাদের লক্ষ্য করে এগুতে থাকে। গুলি-পাল্টা গুলি। আমাদেরকে পিছু হটতে হল। হঠাৎ কিছুক্ষণ গুলি বন্ধ। আমি আমার কমান্ডের জায়গায় দাঁড়িয়ে। চারিদিক নিস্তব্ধ। আমি বুঝতে পারি নি যে অন্যরা সব পিছনে হটে গেছে। আমার সঙ্গে লাহুড়িয়ার জাফর। হঠাৎ দেখি আনুমানিক দু'শো ফুট দূরে জঙ্গলের মধ্যে ৩০-৪০ জন পাক-সেনা। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে সামনে এগুচ্ছে। আমি জাফরকে নিয়ে নিঃশব্দে পিছনে দৌড়াতে শুরু করলাম এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফাঁকা বিলের মধ্যে এসে পড়লাম। খুব সামান্য পানি। ২-৪ ইঞ্চি মাত্র। কোথাও কোথাও বেশ শুকনো–তবে মাটি শক্ত। কিছুদূর চলে আসার পর অবিরাম গুলি। কানের পাশ দিয়ে, মাথার উপর

দিয়ে চারদিকে গুলি। কাছে অস্ত্র-গুলি রয়েছে। একটি বিষয়েই শুধু যেন ভাবতে পারছি–এই বুঝি পিঠ অথবা মাথা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল। সামনে-পাশে দ্রুত খুঁজছি, একটু আড়াল দরকার। পাল্টা গুলি শুরু করতে পারলে বেঁচে যেতেও পারি। হঠাৎ একটা খাল। সেই সময় খেয়াল হল কিছুক্ষণ ধরে বিলের পাশের একটি টিলার উপর থেকে কাভারিং ফায়ার হচ্ছে। দেখি ছুটে আসছে আকর। আমি এবং জাফর কিভাবে বেঁচে গেলাম তার কোন ব্যাখ্যা নেই। *(পরবর্তীতে জাফরকে রক্ষীবাহিনী হত্যা করে)*। আমরা পাল্টা গুলি শুরু করলাম। হাফিজুর রহমান খোকন জানাল–সেও ঐখানে এসে পড়ে। ম্যাগজিনে সে গুলি ভরে দিচ্ছিল বারবার। অন্তিম গোধূলি। বিলের মধ্যে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নেমে আসবে অন্ধকার। পাক-সেনারা গুলি বন্ধ করেছে। আমাদের দুই পক্ষের প্রবল গুলিবর্ষণের মাঝে একটি কুড়ে ঘর আগেই দেখেছিলাম। একটি ছোট রাস্তার পাশে। গুলি থেমে গেলে হঠাৎ দেখি ঐ ঘর থেকে একজন মহিলা একটি শিশুকে নিয়ে আমাদের দিকে ধীরে ধীরে আসছে। হতভম্ব হয়ে গেলাম। কমরেড সবুরের স্ত্রী–আমাদের জলী ভাবী এবং তাদের প্রথম কন্যা।

কমরেড বিমল বিশ্বাস ঐ স্থান ত্যাগ করে পিছু হটে বাহিনীর আরো কয়েকজনকে নিয়ে গাছবেড়ে খালের পাড়কে আড়াল করে পাক-সেনাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। উদ্দেশ্য তাদের ঠেকিয়ে দেয়া, যেন আর সামনে না আসে। অল্পের জন্য যশোরের দীপু আর্মির গুলি থেকে বেঁচে যায়। *(রক্ষীবাহিনী কমরেড দীপুকে ১৯৭৪ সালে হত্যা করে, তার লাশ খুঁজে পাওয়া যায় নি)* কমরেড বিশ্বাসের বাম দিকে পাকবাহিনীর একবারে সামনে পড়ে যাওয়ায় যশোবন্তপুরের কমরেড পল্টুসহ নয় জন পাকবাহিনীর ব্রাশফায়ারে শহীদ হন। শহীদ হন তরুণ যোদ্ধা নড়াইলের কমরেড কাবিল। কমরেড শামছুর রহমান, কমরেড আব্দুস সবুর ও কমরেড খবিরউদ্দীন বাহিনীর একটা বড় অংশ নিয়ে কমরেড সবুর নিজ গ্রাম সরুশুনাতে গিয়ে মুজিববাহিনীর নেতাদের কাছে এক প্রকার আত্মসমর্পণই করেন। তাদের সঙ্গে সালিশ ও চুক্তি হয়। নিশ্চয়তা দেওয়া হয় অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণকারীদের কাউকে হত্যা করা হবে না। তবে কিছুদিন পর একে একে ঐ অঞ্চলের কমরেডদের প্রধান অংশকেই মুজিববাহিনী হত্যা করে। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় পার্টি কমরেড ছিলেন বেশ কয়েকজন। তাদের নেতৃবৃন্দ

জানতেন পুলুম থেকে নলদী পর্যন্ত রাজাকার ও পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে এক পর্যায়ে পিছু হটতে গিয়ে তাদের সঙ্গে সমঝোতা করেই সালিশ হয়েছে, চুক্তি হয়েছে। এ সবের কোন মূল্যই তারা দেয় নি।

বিমল বিশ্বাস কমরেড হেমন্ত সরকার যাতে নিরাপদে অন্যত্র চলে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করেন।

নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতেই বেশ সময় ব্যয় হলো। খুব ভোরে একত্রিত হলাম। যাঁরা যাঁরা থেকে যাবেন এবং যাঁরা আমাদের সঙ্গে অজানার পথে পাড়ি জমাবেন সে-ব্যাপারে উন্মুক্ত আহ্বান করা হলো। প্রায় ৭০ জন আমাদের সঙ্গে যাবেন বলে সম্মতি দিলে বেলা ওঠার আগেই আমরা কয়েকটি নৌকায় পেড়লীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

পেড়লীর পথে–শেষ ঘাঁটির পতন

বিমল বিশ্বাস লিখেছেন, '১৪ অক্টোবর রাতে ব্রাহ্মণডাঙ্গার নদী পার হয়ে ভোরে কামাল প্রতাপ গ্রামে কাফিদের বাড়িতে পৌঁছার সাথে সাথে সাতটি নৌকা যোগে কালিয়ার পেড়লী অঞ্চলের দিকে রওয়ানা দেই। প্রথম নৌকায় কোটাখোলার কমরেড আজিজ, কমরেড নূর মোহাম্মদ ও আমিসহ কয়েকজন ছিলাম। প্রত্যেক নৌকায় সকলকে বলা ছিল যে, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে হবে আমরা পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছি। ভাগ্য ভাল যাবার পথে চাচুড়ী রাজাকার ঘাঁটি পড়লেও ঐ সময়ে তারা ছিল না; নড়াইল শহরে চলে গিয়েছিল।'

বিমল বিশ্বাসের বিররণে আছে, 'পেড়লীর সাতবাড়িয়া গ্রামে নৌপথে আমরা যখন পৌঁছাই তখন ইপিসিপি (এম-এল)'র বাহিনী আমাদেরকে আক্রমণের জন্য গুলি ছুড়তে গিয়ে আমাকে দেখে ফেলে। দ্রুততার সাথে ঐ সময়ই গাজীরহাটের মধুমতি নদী দিয়ে চিত্রার পাড়ে পেড়লীর দিকে যখন এগোয় তখন গানবোট নিয়ে পাকবাহিনী আক্রমণে এগিয়ে আসে। তখন আমরা অনন্যোপায় হয়ে ধান ক্ষেতে আশ্রয় নেই। ঐ অঞ্চলে কমরেড সুধাংশু দে, কমরেড বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, খুলনার কমরেড রণজিৎ চক্রবর্তী ও বাচ্চু, কমরেড হাসান, কমরেড নাজিম, জবেদ আলী, জাকির হোসেন হবি ও মঞ্জু কায়সারসহ স্থানীয় বাহিনীর একটি অংশকে পেলাম।

'ঐ সময়কালে আমি ও কমরেড নূর মোহাম্মদ বারবার বলার চেষ্টা

করেছিলাম, এই অঞ্চলে প্রতিরোধ গড়ে তুলে শেষ রক্ষা হবে না। বাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে যার যার মতো আত্মরক্ষার কৌশল নিতে হবে। কিন্তু কেউই রাজি ছিল না। শেষ পর্যন্ত ৩১ অক্টোবর তারিখে সকাল বেলায় জামিলডাঙ্গার পথে ও বিষ্ণুপুর-এর দিক থেকে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে সাতবাড়িয়া গ্রামের বড় অংশ মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে যায়। ঐ দিন যুদ্ধে কমরেড আকর শহীদ হন এবং কমরেড নাজিমউদ্দিন গুরুতর আহত হন। ঐদিন সন্ধ্যায় কমরেড সুধাংশু দে, কমরেড বৈদ্যনাথ বিশ্বাস ও কমরেড মঞ্জু খুলনার ডোবা অঞ্চলের দিকে চলে যান। কমরেড আকরের সমাধি হয় রাত প্রায় তিনটায়। ঐ রাতেই পেড়লী অঞ্চল ত্যাগ করব এ কারণে পার্টির স্থানীয় একটি অংশ আমাকে এবং নূর মোহাম্মদ ভাইকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। সন্ধ্যার দিকে আমাদের নৌকা নিখোঁজ, যে নৌকার দায়িত্বে ছিলেন মোহাম্মদপুর-এর হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের কমরেড আলী কদর। এ ঘটনার পর রাগে ক্ষোভে আমি যখন নৌকা উদ্ধারে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন কমরেড হাসান ও জবেদ আলী আমাকে এসে প্রশ্ন করে, "আপনি কি কিছু বোঝেন না?" উল্টো আমি প্রশ্ন করি, আপনারা কেন আমাকে ঘিরে আছেন? তখন কমরেড হাসান ও জবেদ আলী আমাকে বলে, আপনাকে এবং নূর মোহাম্মদ ভাইকে হত্যার জন্য ভিমরুলসহ কয়েকজনকে দায়িত্ব দিয়েছে।

'শোনার সাথে সাথে যেহেতু কমরেড নূর মোহম্মদ একটি মাত্র এলএমজি নিয়ে লাহুড়িয়ার কমরেড জাফরসহ কয়েকজনকে নদীর ওপার সাতবাড়িয়া থেকে পার করে আনার জন্য পেড়লীর খাল পাড়ে অবস্থান করছেন সেখানে আমি দৌড়ে গিয়ে কমরেড নূর মোহম্মদকে ঘটনা বলি। কাকতালীয়ভাবে কমরেড জাফররা ঐ সময়ে এসে হাজির হয়। কমরেড আকরকে কবরস্থ করতে করতে রাত তিনটা বেজে যায়। *(এই যুদ্ধে কমরেড নাজিম গুরুতরভাবে আহত হয় এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাকে ঐ অবস্থায় আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাই।)* ফলে ওখান থেকে রওয়ানা দিতে শ্যামনগর খালপার হতে সকাল সাতটা বেজে যায়। এবং শেষ পর্যন্ত আকরপুর ধানক্ষেতে সারাদিন কাটাই। পেড়লী থেকে কায়সার খড়রিয়ার মুক্তিবাহিনীকে আমাদের ঐ পথে যাবার খবর জানিয়ে দিয়েছিল। যদি বিলম্ব না হত তা হলে আমাদের মৃত্যু ছিল অবশ্যম্ভাবী।

'১ নভেম্বর রাতে আকরপুরের এক পরিত্যক্ত বাড়ীতে রাত যাপন করি। ২

নভেম্বর রাতে বন খলিশাখালী গ্রামে অবস্থান করি। ৩ নভেম্বর বিকাল বেলা বাহিনীর সদস্যদের বুঝাবার চেষ্টা করি– এখন বাহিনীরূপে থাকার কোন যুক্তি নেই। সেই সময় ইব্রাহিম ও শাহজাহান বলেন, আপনারা যারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, তারা আপনাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে আশ্রয় পাবেন, কিন্তু আমাদের মতো ভূমিহীন ও কৃষক কর্মীদের বুকে ইপিসিপি (এম-এল)'র পোস্টার লাগিয়ে নওয়াপাড়া রাজাকার ঘাঁটিতে যেয়ে হাজির হওয়া ছাড়া পথ নেই। যদিও ইব্রাহিম পাকা বাড়ী করে এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। শ্রমিক নেতাও হয়েছেন, কিন্তু মার্কসবাদী রাজনীতিতে নেই। উল্লেখ্য, আহত কমরেড নাজিমকে কিছু টাকা দিয়ে কোলার ডাক্তার বৈদ্যনাথ বিশ্বাস-এর উপর ছেড়ে দিয়ে বলেছিলাম বেঁচে থাকলে দেখা হবে। ৩ নভেম্বরেই আনুষ্ঠানিকভাবে বাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে এবং সকলকে কিছু কিছু টাকা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে বলি। বেঁচে থাকলে দেখা হবে এটাই ছিল শেষ কথা।' (বিমল বিশ্বাস, ঐ, পৃ ২১-২২)

এরপর মুক্তিবাহিনীর হাতে সামরিক কমিশনের সদস্য কমরেড খবিরউদ্দিন ও কমরেড রফিক নিহত হন। পেড়লী অঞ্চল থেকে ১ নভেম্বর তারিখে পেড়লী পীর পরিবারের কমরেড আজিজুর রহমান, কমরেড বাকী বিল্লাহ, গোলাম মোস্তফা (দর্জি), মফিজ ফকির, নওশের, হালিম, ইতিম সরদার, সাতবাড়ীয়ার টুকুসহ ৩৩ জনকে মুক্তিবাহিনী গ্রেফতার করে কালিয়ার কলাবাড়িয়া গ্রামে নিয়ে হত্যা করে।

সহায়ক গ্রন্থ

সাবেক সিপিইপি (এম-এল)-এর '৬৭ সালের পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট, প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট লীগ।

সলিমুল্লাহ খান, আহমদ ছফা, সঞ্জীবনী, জাতীয় সাহিত্য ১, আগামী প্রকাশনী, ২০১০

সলিমুল্লাহ খান সম্পাদিত, বেহাত বিপ্লব ১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ২০০৯

আহমদ ছফা, নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১১

মঈদুল হাসান, মূলধারা '৭১

এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এস আর মীর্জা, মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন, প্রথমা প্রকাশন, ২০০৯

কাজী নূর-উজ্জামান, নির্বাচিত রচনা, সংহতি প্রকাশন, ২০১৪

মহিউদ্দিন আহমদ, জাসদের উত্থান পতন; অস্থির সময়ের রাজনীতি, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪

এ কে খন্দকার, ১৯৭১ ভেতরে বাইরে, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪
বিমল বিশ্বাস: ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃহত্তর যশোর জেলায় ইপিসিপি (এম-এল)-এর রীবরোচিত লড়াই ও জীবনদানের স্মৃতিময় অধ্যায়, শহীদ স্মরণে, ২৩ অক্টোবর ২০১২, শহীদ বিপ্লব স্মৃতি কমিটি, যশোর।

‘Bangladesh Wins Freedom’

Farooque Chowdhury

With flawed political process, mismanagement of contradictions

in body-society-polity, failures in political arrangement, incapability in handling of aspirations ingrained within the society, limitations in socio-political farsightedness of the dominating part of the society and failures in making compromises with emerging reality the dominating elites in pre-1971-Pakistan exposed its historical limits in its domain. It was a failure of the neocolonial state as well as of the imperialist power that stood by it as its guarantor and savior. The Bangladesh People's War for Liberation in 1971 exposed the failure, a significant development in the people's stride onward.

Pakistan, the moth-eaten country as was reportedly described by its leader M A Jinnah, was always in a precarious position since it was organized in 1947. "Pakistan has never been a country where the institutions might be stronger than personalities. The country has generally done well under authoritarian rule". (British Ambassador in Islamabad to Secretary of State Foreign and Commonwealth Office, 1973, Diplomatic Report No. 392/73, August 16, FCO 37/1334, The National Archives, London, cited in Mahboob Hussain, Assistant Professor, Department of History and Pakistan Studies, University of the Punjab, Lahore, "Parliament in Pakistan 1971-77 and Chief Executive: An Analysis of Institutional Autonomy", *Journal of Political Studies*, vol. 20, Issue. 1, 2013)

The state's deep rooted problem is evident in the following finding and the question : "Pakistan has been in existence for more than four decades, yet has still not [...] resolved the question of its nationhood. Does Pakistan's national identity depend on Islam, the common faith of the majority of its citizens? [...] The country's foreign policy files contain evidence of a seemingly unending debate about the nature of Pakistan state." (Mehtab Ali Shah, *The Foreign Policy of Pakistan : Ethnic Impacts on Diplomacy*, 1971-1994, I B Tauris, London, New York, 1997) Mehtab Ali Shah cites "the contradiction that exists between the country's official status as an 'Islamic' nation state, on the one hand, and the reality of its existence as a multi-etlmic society [...]

on the other." (ibid.)

The state dived into more perilous position in 1971. Quoting Robert LaPorte's "Pakistan in 1971 : The Disintegration of a Nation" (*Asian Survey*, vol. 12, no. 2, February, 1972) Syeda Sara Abbas writes : "Pakistan was a country without a viable government, money, international policy or a constitution [...] ("Deliberative Oratory in the Darkest Hour : Style Analysis of Zulfikar Ali Bhurto's Statement at the Security Council", *Pakistaniaat : A Journal of Pakistan Studies*, vol. 3, no. 1, 2011). The state "survived" on "fatal links", and the "fatal links" or the "linkages of failure" are told by Tariq Ali in his *Can Pakistan Survive? The Death of a State* (1983) and by Ayesha Jalal in her *The State of Martial Rule* (1991). Both of them cite linkage to, among others, the US imperialism. Like a business organization, the state at least once, had a CEO—Chief Executive Officer, a show of the state of the state's nefarious political arrangement and compulsion, which many of the state's 1971-mainstream politicians failed to perceive, which itself was a weakness in its system of observation, analysis and theory related to politics, especially the state.

The last act began on March 25, 1971, and the act concluded on December 16, 1971, the day Bangladesh people formally achieved victory by waging an armed struggle. A retired brigadier writes : "On March 25, 1971, Gen Yahya Khan ordered the army to restore the writ of the state in East Pakistan [today's independent Bangladesh]. On Dec 16, 1971, East Pakistan was no more.

"That afternoon [of December 16, 1971] in Dhaka, the Pakistan Army lost its honour [...] when Lt Gen A.A.K. Niazi (Tiger) and his Eastern Command surrendered [...]—honour that can be regained only on the battlefield. Until then, the ignominious defeat will continue to haunt the armed forces and succeeding generations in Pakistan.

"After he [Yahya Khan] chose to solve a political problem by military means [...] East Pakistan, as it stood on Dec 3, 1971, was ready to fall like a ripe plum." (*Dawn*, December 3, 2009,

"Blunders of the 1971 war")

The military officer admits : "[T]he people there [in erstwhile East Pakistan, today's independent Bangladesh] had risen in rebellion against the Pakistani state." (ibid.)

"In 1971 Pakistan suffered a near death experience: genocide, civil war, migration and territorial reconfiguration." (Syeda Sara Abbas, op. cit.) US Senator Fred R Harris cited a March 31, 1971 datelined report from *The New York Times* while urging the US government to "immediately end all military and economic assistance to Pakistan" in his letter to William P Rogers, the US secretary of state: "Pakistani soldiers have been dragging political leaders in East Pakistan into the streets where they are summarily shot. [... Execution squads led by informers are systematically tracking down and killing East Pakistani intellectual leaders so that the people of that region will forever remain without a voice." (US Senate, Committee on Government Operations, April 1, 1971) Congress member Halpern said in his statement: "thousands of people are being killed". (Congressional Record House, "The need to clarify the Pakistani situation", April 7, 1971, H 2524) US Senators Walter F Mondale, Edward W Brook, Mark O Hatfield and Edmund S Muskie in their letter to William P Rogers mentioned "bloodshed in East Pakistan" and "indiscriminate killing of unarmed civilians". Senator Kennedy's comments in early-April are much known: "It is a story of indiscriminate killing, the execution of dissident political leaders and students, and thousands of civilians suffering and dying every hour. It is a story of dislocation and loss of home. It is a story of little food and water." With the situation the Pakistan state created in Bangladesh since March 1971 the state was engaged in its last act of delegitimizing itself as it was conducting genocide in a part of the country while waging a war against the majority of the population under its control as the majority of the people yearned for justice and equity.

The state found no tools and mechanism for controlling and cowing down the majority of the population other than carrying

on the genocide, which was a stark show of the state's limits in the capacity to rule. The state of business in 1971 in the Pakistan-statecraft was an example of a neocolonial state's failure; and the genocide and the war against the people was no exception in the imperialist-neocolonial system. The genocide took away the state's all claims to rule, and denuded its barbaric character. The war the state was waging against the majority of the population under its dominance "was intricate in nature as it involved gross human rights violations [... The] murder, rape and arson were severe enough to deem it an international crisis. (Syeda Sara Abbas, op. cit.) Ishaan Tahroor referred Sydney Schanberg, an eye witness and reporter, who termed it a pogrom, and cited the rape of 400,000. (Tharoor, "Keeping Dhaka's Ghosts Alive", *Time*, September 24, 2008).

Failure of the Pakistan state began since it was organized. "Political and economic mishandling of the East Pakistan by the former West Pakistan caused deep dissatisfaction and growth of nationalist feeling among the almost entirely Bengali population, regarded as inferior by most of West Wing's Punjabis who were the majority of administrators. [...] Unrest in the East was suppressed in a brutal pogrom by the army". (Brian Cloughley, *War, Coups and Terror, Pakistan's army in years of turmoil*, Pen & Sword Military, Pen & Sword Books Limited, South Yorkshire, Great Britain, 2008) Taha Siddiqui refers to a retired major of the Pakistan army, who fought in East Pakistan in 1971. The army officer "claims the cracks in the system had started to show long before 1971" (*The Express Tribune*, December 16, 2011, "Remembering 1971: A retired major tells the story he'd rather forget") "The retired major, who is a third generation military officer, says that when he was young, he used to visit his father who was also posted in Chittagong, Bangladesh. 'The civil service, military and other high ranking government positions were all occupied by West Pakistanis, who considered Bengalis an inferior race,' he says. Many times he saw Bengalis openly humiliated and treated like 'untouchables'." (ibid.)

The failure culminated in 1971 while the Baangaalee people rose in revolt against injustice, deprivation, killing, violation of honor of its women, arson and loot.

Political crisis that the state was nourishing within its head began taking acute shape since the overthrow of dictator Ayub Khan in a mass upsurge that reached its peak in 1969. A general election based on universal adult franchise was held in the later part of 1970. The days going to the election and the election results signaled the forthcoming conflict, and failure of a faction of the dominating elites of the state and success of the Baangaalees, the majority of the population, in their political fight. The following finding is only an example picked up randomly from among many: "Between May and December 1970 the Jama'at campaigned frantically. Competition with the Awami League and clashes with Bhashani's supporters escalated tensions in East Pakistan and Punjab, and clashes with the People's Party tied down the Jama'at in West Pakistan. [...] Despite untiring efforts, it won only four of the 151 National Assembly seats which it contested, all in West Pakistan [now, Pakistan), and only four of the 331 provincial assembly seats it had aimed for, one in each province except Baluchistan [...] It trailed far behind the Awami League and the People's Party [...] and to its dismay and embarrassment finished behind the Jami'at-i Ulama-i Islam and Jami'at-i Ulama-i Pakistan. The Jami'at-i Ulama-i Islam even gained enough seats to serve as a partner to the National Awami Party [...] in forming provincial governments in Baluchistan and North-West Frontier Province. To the Jama'at's surprise the two ulama parties did better than the Jama'at, although they had contested fewer seats and received a lower percentage of votes cast. [...] Where the Jama'at had won only four seats (and none in East Pakistan), [...] the ulama parties had won seven seats each. [...] In contrast with the Jama'at's four provincial seats, the Jami'at-i Ulama-i Islam had won nine and the Jami'at-i Ulama-i Pakistan eleven. The Jama'at's 6.03 percent of the votes cast in National Assembly elections had yielded only 1.3 percent of the

seats, and its 3.25 percent share of the vote in provincial elections a mere 0.67 percent of the seats. [...T]he Islamic parties taken together did poorly in both parts of Pakistan. This limited the political power of Islam and further constricted the Jama'at. [...] The election results dealt a severe blow to the morale of Jama'at members. Mawdudi's leadership was questioned, as was the party's time-honored reliance on Islamic symbols and the putative Islamic loyalties of Pakistanis. The election results, moreover, effectively eliminated the Jama'at as a power broker." (Seyyed Vali Reza Nasr, *The Vanguard of the Islamic Revolution : The Jama'at-i Islami of Pakistan*. Berkeley : University of California Press. 1994, "7. The Secular State, 1958-1971", The elections of 1970 and their aftermath) Almost similar pattern was experienced by other rightist political parties including Muslim League, the party that claimed spearheading the political moves for the establishment of Pakistan.

Moreover, the Pakistan state found the ideological and theoretical basis of its existence was lost in the political fight as Seyyed Vali Reza Nasr writes "[t]he inability of Islam to keep the two halves of the country united", (ibid. "8. The Bhutto Years, 1971-1977") The developments of contradictions, and deepening of failures led to further developments or complication of contradictions as Seyyed Vali Reza Nasr describes in the following way: "Driven by its dedication to Pakistan's unity and unable to counter the challenge of the Awami League, the Jama'at abandoned its role as intermediary and formed an unholy alliance with the Pakistan army, which had been sent to Dhaka to crush the Bengali nationalists. After a meeting with General Tikka Khan, the head of the army in East Pakistan, in April 1971, Ghulam A'zam, the amir of East Pakistan, gave full support to the army's actions against 'enemies of Islam.' Meanwhile, a group of Jama'at members went to Europe to explain Pakistan's cause and defend what the army was doing in East Pakistan; another group was sent to the Arab world, where the Jama'at drew upon its considerable influence to gain support. In September 1971 the

alliance between the Jama'at and the army was made official when four members of the Jama'at-i Islami of East Pakistan joined the military government of the province. Both sides saw gains to be made from their alliance. The army would receive religious sanction for its increasingly brutal campaign, and the Jama'at would gain prominence. Its position was, in good measure, the result of decisions made by the Jama'at-i Islami of East Pakistan, then led by Ghulam A'zam and Khurram Jah Murad. This branch of the Jama'at, faced with annihilation, was thoroughly radicalized, and acted with increasing independence in doing the bidding of the military regime in Dhaka. The Lahore secretariat often merely approved the lead taken by the Jama'at and the IJT [Islami Jami'at-i Tulabah] in Dhaka. Nowhere was this development more evident than in the IJT's contribution to the ill-fated al-Badr and al-Shams counterinsurgency operations." (ibid. "7. The Secular State, 1958-97, The elections of 1970 and their aftermath)

The reality the neocolonial state was facing surfaced forcefully, and concerned quarters were looking at roots of the reality. Citing 'Abdu'l-Ghani Faruqi's "Hayat-i Javidan," (HRZ, 31) Seyyed Vali Reza Nasr mentions one of those searches :

"Since the beginning of the East Pakistan crisis, Mawdudi had claimed that the problem before the country was the product of lackluster adherence to Islam. He in fact blamed the loss of East Pakistan on Yahya Khan's womanizing and drinking. The IJT echoed Mawdudi's sentiments: its answer to 'What broke up the country?' was 'wine' *(sharab)*. Some in the army apparently agreed." (op. cit., "8. The Bhutto Years, 1971-1977")

On the basis of an interview with lawyer S. M. Zafar Seyyed Vali Reza Nasr cites another similar evidence : "In 1972-1973, the military high command uncovered a conspiracy [...] hatched by a group junior officers, led by Brigadier F. B. 'Ali [....] S. M. Zafar, who defended the officers in court, recollects that they believed East Pakistan had been lost because of the government's "un-Islamic" ways and Yahya Khan's drinking in particular." (ibid.)

Answers to the questions cropping up from the circumstances the neocolonial state faced, thus, are abounding. But don't the answers also create further questions for further inquiry? As, for example, picking out a few from many questions : (1) Why institutions are not stronger than personalities? (2) Is it factual that the country generally does well under authoritarian rule and, if the claim is factual, what's the reason? (3) Why the state failed to solve the question of nationhood? (4) Why the country was without a viable government, a constitution, etc.? (5) Why the state's official status faced contradiction? (6) Why a state failed to resist a *sharab* addicted womanizer in usurping the helm of the state? (7) Is *sharab* more powerful than political process or when does *sharab* turns more powerful than political process? (8) Does a person or a group of persons determine fate of a state? (9) Is the state defensible if *sharab* turns more powerful than political process? (10) Are these the real questions? The questions turn more complicated if one looks at the political fight within and around the state machine that was going around since April 1971, the reactions among a part of its allies, and the genocide the state was carrying on. Positions of Z A Bhutto/Pakistan People's Party, and its competitors during those days help find the reality of political jockeying that the state was experiencing. Statements of Z A Bhutto, Khan Abdul Qayyum Khan, Nawabjada Nasrullah Khan, Maulana Golam Gaus Hazarvi, Maulana Mufti Mahmud, Chowdhury Rahmate Elahi and other political leaders show their understanding of the situation and factional fight within the political system while the system was facing one of its most critical hours. The banning of all groups of National Awami Party and the cancellation of national awards of 32 high ranking civilian officers in 1971 are a few more evidences of the state's vulnerabilities. There are more evidences. Even failure of a part of mainstream political leadership related to the state to foresee the coming events or the path of political developments or the destined path of the state is an important question, which haunts political scientists and politicians. The complications thicken if

the scene is compared with other neocolonial states. The complication deepens if the reality or the questions are related to the Baangaalee people's armed struggle for liberation and its victory. It was a people's interaction/contradiction with a neocolonial state, and their way to carry forward the contradiction with the aim of liberation. Throughout the entire course of incidents/development the Baangaalee people appeared as the hero of history, which was blindly ignored by a part of the mainstream politics of those days although this principal character of history—the Baangaalee people—shaped political destiny of many. Actions by the people were impacting not only destiny of their land, but politics of other countries. Cold War days-super power relationships, etc. also. It was a unique moment in the life of the Bangladesh people. There were dynamics, equations, momentum, relations, speed and velocity. Hence, for furthering people's political participation/activism, and for learning, the issue demands study.

[Frontier Vol. 48, No. 27, Jan 10 - 16, 2016]

কয়েকটি রাজনৈতিক দলিল

স্বাধীন পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে (১৯৬৮)
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

(১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে গৃহীত 'কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট'এর প্রাসঙ্গিক অংশ। সিপিবি'র নেতারা ১৯৬৮'র এই কংগ্রেসকে তাদের প্রথম কংগ্রেস বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অবশ্য এই পার্টির ইতিহাস অনেক পুরাতন। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে সমগ্র ভারতের যে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল বর্তমানের সিপিবি বা ১৯৬৮ সালের কমিউনিস্ট পার্টি সেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অংশ এবং পরাধীন যুগের সেই ধারাবাহিকতার উত্তরাধিকারীও বটে। ১৯৪৮ সালে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। যেহেতু ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে গেছে সেহেতু পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত কমরেডরা ১৯৪৮ সালের ৬ই মার্চ কলকাতায় মিলিত হয়ে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কমরেড সাজ্জাদ জহির। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আতা মোহাম্মদ, জামালউদ্দীন বুখারী, ইব্রাহিম (শ্রমিক নেতা), খোকা রায়, নেপাল নাগ, মণি সিংহ, কৃষ্ণ বিনোদ রায় ও মনসুর হাবিব (১৯৫০ সালে রাজশাহী খাপড়া ওয়ার্ডে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ভারতে চলে যান এবং ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা ছিলেন)। শেষের পাঁচজন কমরেড পূর্ববঙ্গের (আজকের বাংলাদেশ) প্রতিনিধি ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে একই সঙ্গে পূর্ব বঙ্গের জন্য প্রাদেশিক কমিটিও গঠিত হয়েছিল যার সম্পাদক নির্বাচিত হন খোকা রায়। এখানে আরো উল্লেখ্য যে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির এই কেন্দ্রীয় কমিটি কোনদিনই বসতে পারেনি। চরম সরকারি নির্যাতন ও ভৌগলিক দূরত্বই তার কারণ। পূর্ববঙ্গের জন্য যে প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়েছিল সেটাই স্বাধীনভাবে কাজ করে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত ও চীন পার্টির মধ্যকার মতাদর্শগত বিতর্কের প্রভাবে প্রায় প্রতিটি দেশেই পার্টিতে ভাঙন এসেছিল। ১৯৬৬ সালে চীনের পার্টির মতাদর্শের প্রতি আস্থাবান কমরেডরা ঐ পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুন পার্টি গঠন করেন ইপিসিপি এম-এল (পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)। এইভাবে সেইদিনকার পূর্ব পাকিস্তানেও কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল। তার দুই তিন বছরের মধ্যেই তথাকথিত চীনের লাইন অনুসরণকারী পার্টি কয়েক টুকরা হয়ে গেল। তথাকথিত মস্কোপন্থীরা কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে পূর্বের পার্টিতে রয়ে গেলেন। ১৯৫৬ সালে অবিভক্ত পার্টির যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোলকাতায় তার বারো বছর পর ১৯৬৮ সালে তথাকথিত মস্কোপন্থীদের কংগ্রেস। সিপিবি এই কারণেই ১৯৬৮ সালের কংগ্রেসকে প্রথম কংগ্রেস ঘোষণা করেছে। বাস্তবে সিপিবি একটি পুরাতন পার্টি এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন পার্টি। ১৯৬৮ সালের পার্টি কংগ্রেসে যে রাজনৈতিক রিপোর্টটি গৃহীত হয়েছিল তারই একটি পরিচ্ছেদের নাম হচ্ছে 'স্বাধীন পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে'। আমরা এখানে সেই অংশটি হুবহু নীচে তুলে ধরছি।)

১৯৫৯ সন হইতে 'স্বাধীন পূর্ববঙ্গের' একটা চিন্তাধারা যে এখানকার মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের ভিতর দেখা যাইতেছিল তা পূর্বে বলা হইয়াছে। ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন ও গণ-আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৬১ সনের শেষের দিকে আমাদের পার্টি যখন অন্য গণতান্ত্রিক দলের সাথে আলোচনা চালাইয়াছিল তখনও 'স্বাধীন পূর্ববঙ্গের' বিষয়টি একাধিকবার উত্থাপিত হইয়াছিল। 'স্বাধীন পূর্ববঙ্গের' চিন্তাধারা তখন ক্রমশঃ জোরদার হইয়া উঠিতেছিল, বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের ভিতর।

এই অবস্থায়, স্বাধীন পূর্ববঙ্গ দাবী সম্পর্কে পার্টির আশু করণীয় এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামো ভবিষ্যতে কি রূপ গ্রহণ করিতে পারে তাহা বিচার করিয়া পার্টির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৯৬২ সনের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠক হইয়াছিল। ঐ বৈঠকের 'স্বাধীন পূর্ববঙ্গ' দাবী সম্পর্কে আশু করণীয় বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি একটি 'রাজনৈতিক চিঠি' (১৪। ৭। ৬২) পার্টির ভিতর প্রচার করিয়াছিল। সে 'রাজনৈতকি চিঠিতে' ধর্মীয় ভিত্তিতে গঠিত বহু জাতিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের জাতি সমস্যার সমাধানের পথ হিসাবে 'পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার অধিকার সহ জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা "আমাদের মূল লক্ষ্য" এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে "পূর্ব পাকিস্তানের পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলোপ ও ওখানকার বিভিন্ন জাতির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আমাদের বর্তমান দাবী" প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়া 'স্বাধীন পূর্ববঙ্গ' দাবী সম্পর্কে বলা হইয়াছিল যে, "এই দাবীর মধ্যে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটি নিহিত রহিয়াছে" এবং "ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠা আমরা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলিয়া মনে করি না। কিন্তু, বর্তমানে যে ভাবে..... 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা'র দাবী উঠিতেছে তাহা রাজনৈতিক দিক হইতে যুক্তিসঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য নয়। তাহা ছাড়া, বর্তমানে এইরূপ দাবী উত্থাপন করা আমরা অপরিপক্ক এবং অসময়োচিত মনে করি।"

"বাঙ্গালী ধনিক ও বুদ্ধিজীবীরা" "পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী উগ্র স্বদেশীপণা" এবং একমাত্র নিজেদের সঙ্কীর্ণ শ্রেণী স্বার্থের দিক হইতে এই দাবীটি তুলিতেছেন। "তাহারা ইহা অর্জনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের তথা সমগ্র পাকিস্তানের জনতার প্রধান শত্রু ও শোষক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের

সহযোগিতার আশা রাখেন.....।"

"পূর্ব বাংলার জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের প্রধান শক্তি হইবে এখানকার শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী মানুষরা" কিন্তু, এই "ব্যাপক জনসাধারণ স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কথা চিন্তা করেন না।" এই পরিস্থিতিতে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের' দাবী এখন একটি হঠকারী দাবী।" তাই, "বর্তমানে আমরা পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করিব।"

কিন্তু "যাহারা 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' দাবী উত্থাপন করিবেন আমরা তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকিব। আমাদের খেয়াল রাখিতে হইবে যে এই দাবীর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্খার প্রকাশ রহিয়াছে, যদিও বর্তমান অবস্থায় এই দাবী হঠকারী। আমরা এই কথা তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বর্তমানে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন যে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সঠিক পথ ইহা বুঝাইয়া এখন তাহাদিগকে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবী উত্থাপন হইতে বিরত করিতে চেষ্টা" করিব।

কমরেডগণ, ইতিমধ্যে 'স্বাধীন পূর্ববঙ্গের' চিন্তাধারা জনগণ বিশেষ করিয়া বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত সমাজে আরও জোরদার হইয়াছে এবং শ্রমিকদের কোন কোন অংশেও ইহা প্রসার লাভ করিতেছে। তাই, এই সম্পর্কে পার্টির আশু করণীয় আবার স্থির করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামো ভবিষ্যতে কি রূপ গ্রহণ করিতে পারে সে সম্পর্কে ঐ বৈঠকে কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যগণ এই বিষয়ে একমত ছিলেন যে:

"যে ভাবে একটি ধর্মীয় আদর্শের অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম বুনিয়াদের উপর বিভিন্ন জাতি ও দুইটি পৃথক অঞ্চল নিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে এবং যে ভাবে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবীকে ভিত্তি করিয়া বিকাশ লাভ করিতেছে, তাহাতে পাকিস্তানের বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামো স্থায়ী হওয়ার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা যত বৃদ্ধি পাইবে এবং জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আন্দোলন যত জোরদার হইবে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শগত ভিত্তিও তত দুর্বল হইয়া পড়িবে। এই অবস্থায়, বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি, বিশেষতঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মত দুইটি পৃথক অঞ্চল নিয়া একটি মাত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি

থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং, ভবিষ্যতে পাকিস্তান রাষ্ট্র একাধিক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িতে পারে।" *(জেলা কমিটির নিকট প্রেরিত কেন্দ্রীয় কমিটির দলিল ২৮।৮।৬২)*

কিন্তু, পার্টির লক্ষ কি হইবে কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যগণ তখন একমত হইতে পারেন নাই। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটিতে মূলতঃ দুইটি মত ছিল।

একটি মত ছিল যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠন বৈশিষ্ট্য, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা এবং জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মার্কসবাদী লেনিনবাদী নীতি প্রভৃতি বিচার করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির পূর্ববঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত।

দ্বিতীয় মত ছিল যে, যদিও ভবিষ্যতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের একাধিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়ার সম্ভাবনা আছে, তথাপি গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভবিষ্যতে কিরূপ গ্রহণ করে এবং ভারত সম্পর্কে সাধারণ লোকের মনে যে সংশয় বা ভীতি আছে, সেই পটভূমিতে 'স্বাধীন পূর্ববঙ্গ' সম্পর্কে জনগণ কি মনোভাব গ্রহণ করে ইত্যাদি বিষয়ে বিচার বিবেচনার জন্য অপেক্ষা করা উচিত এবং পূর্ববঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এখন পাকিস্তানে জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও জাতি সমূহের বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার সহ আত্মনিয়ন্ত্রণ কায়েম– এই সাধারণ লক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত।

কমরেডগণ, পূর্ববঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা 'স্বাধীন পূর্ববঙ্গে'র লক্ষ্য পার্টি গ্রহণ করিবে কি না– এই বিষয়টি হইল পার্টির মৌল রণনীতি ও কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির ভিতর মতভেদ হেতু তখন কেন্দ্রীয় কমিটির ইহা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করে নাই। সমস্ত পার্টির মতামত নিয়া এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা কেন্দ্রীয় কমিটি সমীচীন মনে করিয়াছিল।

তাই, তখন কেন্দ্রীয় কমিটির একটি দলিলে (২৮। ৮। ৬২) পূর্ববঙ্গে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য গ্রহণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যদের সমস্ত মতামত ব্যাখ্যা করিয়া, সে সব বিষয়ে জেলা ইউনিটগুলির মতামত চাহিয়া পাঠান হইয়াছিল।

কিন্তু, এই বিষয়টি সম্পর্কে আজও কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। এই সম্মেলনে সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

[এপ্রিল, ১৯৬৯]

পূর্ব বাংলার জনতার নিকট কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচি পেশ

বিপ্লবী জনতা!

পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী, এক কথায় সমগ্র জনগণের জীবন এক সর্বগ্রাসী সংকটের আগুনে জ্বলিতেছে। পূর্ব বাংলার জনগণের উপর এক নিষ্ঠুর জাতিগত নিপীড়ন চলিতেছে। সংকটের এই আগুন পূর্ব বাংলার জনতার ধমনীতে ধমনীতে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা জ্বালাইয়া দিয়াছে। পূর্ব বাংলার জনগণ আজ মুক্তি চায়। মুক্তি চায় অনাহার, বুভুক্ষু, দুঃখ-দারিদ্র্য, বন্যা, বেকারত্ব ও জাতিগত নিপীড়নের অভিশাপ হইতে। কিন্তু কোন পথে আসিবে তাহাদের মুক্তি? সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির প্রতিভূ এককেন্দ্রিক স্বৈরাচারী সমরবাদী শাসকগোষ্ঠীকে পূর্ব বাংলার বুক হইতে উচ্ছেদ করিয়া একমাত্র ''স্বাধীন, সাবভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা'' কায়েমের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার শোষিত, বঞ্চিত জনতার মুক্তি সম্ভব। ''স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা'' কায়েম করিতে হইবে গ্রাম বাংলায় জোতদার, মহাজন ও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কৃষকের গরিলা যুদ্ধ শুরু করিয়া, সামন্তশ্রেণীকে উৎখাতের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে মুক্ত এলাকা গঠনের মাধ্যমে। গ্রামে এইভাবে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে জনতার সশস্ত্র বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে, গ্রাম দিয়া শহর ঘেরাও করিতে হইবে এবং শাসকগোষ্ঠীকে চূড়ান্তভাবে উৎখাত করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিতে হইবে। শহরের শ্রমিক, মুটে-মজুর, রিকশাওয়ালা, স্কুটারওয়ালা, বাস্তুহারা, বস্তিবাসী, অফিসের কেরানি, পিয়ন, আর্দালী, দোকানদার, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সকলের কর্তব্য, বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানের উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া শাসকগোষ্ঠীকে বিপর্যস্ত করা ও শহরের মধ্যে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখা, যাহাতে গ্রাম বাংলার কৃষকের গেরিলা যুদ্ধ প্রচণ্ডগতিতে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে।

বিপ্লবী সাথীরা!

পূর্ব বাংলার জনতা সেই পথেই আগাইয়া চলিতেছে। ১৯৬৮-৬৯ সালের বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থান, গ্রাম বাংলার সিলেটের হাওর করাইয়া, খুলনার বাহিরদিয়ার কৃষি বিপ্লবের অগ্নি স্ফুলিঙ্গগুলি তাহারই নির্ভুল প্রমাণ। শ্যামপুর-পোস্তগোলা, খুলনা, সিদ্ধিরগঞ্জ, টঙ্গি, চট্টগ্রাম ও আদমজীতে শ্রমিক শ্রেণী নিজের ও শাসকগোষ্ঠীর রক্তে স্নান করিয়া তাহারাই জ্বলন্ত স্বাক্ষর রাখিয়াছে।

আজ তাই 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটি'র পক্ষ হইতে আমরা জনতার বিপ্লবী চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার' কর্মসূচি আপনাদের নিকট পেশ করিতেছি। আসুন, মহান চীন, ভিয়েতনাম, পশ্চিম বাংলার নকশালবাড়ী, প্যালেস্টাইনের আরবদের মুক্তির সংগ্রাম হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করি। আসুন, মহান মাও সেতুঙের শিক্ষাকে আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি ও গ্রহণ করি ''বন্দুকের নলই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস''। জয় আমাদের অনিবার্য। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম হইবেই।

''পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের'' কর্মসূচী

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা : রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হইবে সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্দি বৃহৎ পুঁজিবিরোধী শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যান্য অংশ এবং দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীসমূহের যৌথ একনায়কত্ব। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ইহা পরিচালিত হইবে– ইহা হইবে 'পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'।

রাজনৈতিক কাঠামো :

রাজনৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠিবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ভিত্তিতে। রূপরেখা হইবে নিম্নরূপ :

(১) কেন্দ্র হইতে একেবারে নিম্নপর্যায়ে পর্যন্ত জনগণের প্রত্যক্ষ ভোট দ্বারা নির্বাচিত গণপরিষদসমূহ (Peoples Congress) থাকিবে। যেমন, জাতীয় পরিষদ, জিলা গণপরিষদ, থানা গণপরিষদ, ইউনিয়ন গণপরিষদ। জাতীয় গণপরিষদ হইবে 'পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের' সর্বোচ্চ সংস্থা এবং ইউনিয়ন গণপরিষদ হইবে নিম্নতম

সংস্থা।

(২) এই গণপরিষদগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থাসমূহ (Organs of the Govt.) নির্বাচিত করিবে।

(৩) এই গণপরিষদগুলির নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকিবে। নির্দিষ্ট মেয়াদের পর পুনর্বার নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকিবে। তাহা ছাড়া নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অপসারিত করিয়া নতুন প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার জনগণের থাকিবে।

(৪) গণপরিষদসমূহে নির্বাচনের ভিত্তি হইবে শ্রেণী ও পেশাভিত্তিক। সকল বিপ্লবী শ্রেণীগুলি যাহাতে তাহাদের সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সমানুপাতিক হারে (equitably) প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে সেই জন্য নারী, পুরুষ ও সকল ধর্ম, জাতি পেশা ও শিক্ষা নির্বিশেষে একটি সত্যিকার সার্বজনীন ও সমভোটাধিকার ব্যবস্থা (Really universal & equal suffrage) প্রবর্তন করা হইবে।

(৫) এইভাবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে 'পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের' সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ জাতীয় সরকার গঠিত হইবে। এই জাতীয় সরকারের সহিত নিচের পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী সংস্থাসমূহের সম্পর্ক হইবে নিম্নরূপ : (ক) বিভিন্ন নিম্নতর সংস্থাসমূহ তাহাদের নিজেদের স্বার্থে স্বেচ্ছায় জাতীয় সরকারকে যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করিবে, ইহা তাহাই পালন করিবে। (খ) নিম্নতম সংস্থাগুলি কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রদত্ত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার যে নির্দেশনাবলী প্রদান করিবে, নিম্নতম সংস্থাগুলি তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে : ইহাই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির মাধ্যমে পরিচালিত একটি সরকারই জনগণের বিভিন্ন বিপ্লবী অংশের মতামতের সার্থক প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে এবং বিপ্লবের শত্রুদের সম্পূর্ণ কার্যকরভাবে প্রতিহত করিতে পারে। (গ) জাতীয় সরকার ব্যতীত অন্যান্য নিম্নতর সংস্থাগুলির পারস্পরিক সম্পর্কও এই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হইবে।

গণতান্ত্রিক অধিকার :

(১) নারী, পুরুষ এবং সকল ধর্ম, জাতি, বর্ণ, পেশা ও শিক্ষা নির্বিশেষে সকল বিপ্লবী শ্রেণীসমূহের যথা শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী ও দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সকল রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার থাকিবে। কিন্তু জনগণের শত্রু সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা-মুৎসুদ্দি বৃহৎ পুঁজিপতিদের এবং তাহাদের সহযোগী প্রতিবিপ্লবীদের কোন রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার থাকিবে না।

(২) জনগণের বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও প্রকাশনার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা-মুৎসুদ্দি বৃহৎ পুঁজির পক্ষে ও জনগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বক্তব্য প্রকাশ ও সংগঠন করিবার অধিকার দেওয়া হইবে না।

(৩) যে সকল ব্যক্তি বিপ্লবের বিরোধিতা করিয়াছিল অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল অথবা কোন সময়ে জনগণের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাইয়াছিল, সেই সকল ব্যক্তির সারা জীবনের জন্য অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইবে। অপরাধের তারতম্য বিবেচনা করিয়া তাহাদের সম্পত্তি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক বাজেয়াপ্ত, মৃত্যুদণ্ড, কারাদণ্ড, কঠোর পরিশ্রমমূলক কাজ করিতে বাধ্য করা প্রভৃতি শাস্তি প্রদান করা হইবে এবং মার্কসবাদী পদ্ধতিতে তাহাদের চরিত্র সংশোধনের (যেমন জনগণের সাথে মিশিয়া উৎপাদনমূলক শারীরিক পরিশ্রমে বাধ্য করা) প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে। এই সব কিছুই নির্ধারিত হইবে স্থানীয়ভাবে জনগণের নির্বাচিত প্রশাসন গণ-আদালত দ্বারা।

ধর্মীয় স্বাধীনতা :

(১) রাষ্ট্র মানুষের নিজ নিজ ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিবে।

(২) বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, কিয়াং ইত্যাদি এবং ধর্মীয় গবেষণাগারগুলি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে

পরিচালিত হইতে পারে সেই জন্য রাষ্ট্র ইহা তত্ত্বাবধানের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবে এবং তাহা স্থানীয় ভিত্তিতে স্ব স্ব ধর্মের আগ্রহী জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হইবে।

প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থা :

(১) প্রশাসন ও বিচার বিভাগ হইতে আমলাতন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করা হইবে।

(২) সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় ঐ পর্যায়ের গণপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে।

(৩) বর্তমান সকল প্রকারের আইন বাতিল ঘোষণা করিয়া জনগণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন করা হইবে।

(৪) বিচার পদ্ধতি হইবে সহজ, সরল ও জনগণের আয়ত্তাধীন। বিচারসমূহ অনুষ্ঠিত হইবে প্রকাশ্যভাবে ও স্থানীয় জনগণের মতামত সাপেক্ষে।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা :

(১) জাতীয় সরকারের অধীনে সশস্ত্র গণফৌজ থাকিবে– ইহা দেশের ভেতরের ও বাহিরের প্রতিবিপ্লবী আক্রমণকে প্রতিহত করিবে এবং জনগণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করিবে।

(২) বিপ্লবের মধ্য দিয়া যে গণফৌজ গড়িয়া উঠিবে, বিপ্লবোত্তর যুগে তাহাই রাষ্ট্রীয় গণফৌজ হিসাবে পরিগণিত হইবে। এই গণফৌজ মূলত ভূমিহীন ও গরীব কৃষক ও শ্রমিক যুবকদের লইয়া গড়িয়া উঠিবে।

(৩) জাতীয় গণপরিষদের এই গণফৌজ পরিচালনার ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

(৪) এই সশস্ত্র গণফৌজ ছাড়াও সমগ্র জনগণকে অস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করা হইবে এবং গণমিলিশিয়া গঠন করা হইবে।

(৫) গণফৌজ সম্পর্কে সমালোচনা ও সুপারিশ করিবার পূর্ণ অধিকার জনগণের থাকিবে।

(৬) গণফৌজের সদস্যদেরও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিবার ও নিজস্ব

পেশাগত সংগঠন করিবার এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে। গণপরিষদসমূহে তাহাদের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে।

(৭) গণফৌজের বিভিন্ন পদ ও স্তরের সৈনিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক হইবে সাথীসুলভ ও ভ্রাতৃত্বমূলক-আমলাতান্ত্রিক নয়।

সংখ্যালঘু জাতি সংক্রান্ত নীতি

(১) পূর্ব বাংলায় বসবাসকারী বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতির পৃথক সত্তাকে স্বীকার করা হইবে। তাহাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র উৎসাহ ও সাহায্যদান করিবে। সংখ্যালঘু জাতিসমূহের নিজ নিজ কথ্য ও লিখিত ভাষা ব্যবহারের অধিকার থাকিবে। তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও শিল্পকলা বিকাশের এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সংরক্ষণ বা পরিবর্তনের অধিকার দেওয়া হইবে।

(২) ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত পূর্ব বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অবাঙালিদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের পূর্ণ অধিকার প্রদান করা হইবে।

(৩) যে সমস্ত অঞ্চলে সংখ্যালঘু জাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সমস্ত অঞ্চলে তাহাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হইবে– এই স্বায়ত্তশাসন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আওতায় পরিচালিত হইবে।

(৪) জাতীয় পরিষদ ও জাতীয় সরকারে সংখ্যালঘু জাতিদের প্রতিনিধি থাকিবে।

পররাষ্ট্রনীতি

(১) শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির ভিত্তিতে সকল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বিশেষ করিয়া গণচীনের সহিত বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।

(২) দুনিয়ার সমস্ত নিপীড়িত জনগণ ও নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সকল প্রকার সমর্থন ও সাহায্য প্রদান করা।

(৩) পরস্পরের ভূখণ্ডে অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদা রক্ষা করা;

পরস্পরকে আক্রমণ না করা; পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা; সমানাধিকারের ভিত্তিতে পারস্পরিক সুযোগ প্রদান ও শান্তিপূর্ণসহ অবস্থান– এই পঞ্চশীলা নীতির ভিত্তিতে ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলির সহিত শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার জন্য চেষ্টা করা ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী যুদ্ধনীতির সর্বাত্মক বিরোধিতা করা।

(৪) সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে দৃঢ়তার সহিত বিরোধিতা ও প্রতিহত করা।

(৫) সম্প্রসারণবাদী ভারত ও ইসরাইলসহ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক রাষ্ট্রসমূহের সর্বাত্মক বিরোধিতা করা।

(৬) কোন প্রকার সামরিক চুক্তিতে জড়িত না হওয়া; পূর্ব বাংলার মাটিতে কোন প্রকার বিদেশী সাম্রাজবাদী শক্তি অস্তিত্ব না রাখা; সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী পূর্বতন এককেন্দ্রিক শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক সম্পাদিত সকল প্রকার সামরিক ও অসম অর্থনৈতিক চুক্তি বাতিল করা।

(৭) কোনরূপ রাজনৈতিক শর্ত জড়িত না থাকিলে যে কোন দেশের কারিগরি ও অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণ করা।

জনগণতান্ত্রিক অর্থনীতির রূপরেখা :

সমাজতন্ত্রের অর্থনীতির লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন করিয়া জনগণতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করা হইবে। এই জনগণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল জাতীয় অর্থনীতি গড়িয়া তোলা হইবে। ইহার রূপরেখা হইবে নিম্নরূপ :

রাষ্ট্রীয় মালিকানা :

(১) সকল সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা, সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদী ঋণ অস্বীকার করা, সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

(২) সকল বৃহৎ পুঁজি যাহার চরিত্র আমলা-মুৎসুদ্দি এবং যাহা পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিজাতীয় তাহা বাজেয়াপ্ত করা।

(৩) যাহারা প্রতিবিপ্লবী ও বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

(৪) জোতদার, মহাজন, দুর্নীতিবাজ আমলা ও তাহাদের দালালদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। (জোতদারের বাজেয়াপ্ত জমি গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে)।

(৫) সকল ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে এবং রাষ্ট্র নিজেই তাহা পরিচালনা করিবে।

(৬) সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রাষ্ট্রের সম্পদ হিসেবে গণ্য হইবে, মধ্যস্বত্ব প্রথা বিলোপ করিয়া রাষ্ট্র নিজেই ইহা রক্ষা করিবে এবং নিজের তত্ত্বাবধানে সম্পদ আহরণ করিবে।

(৭) রেলওয়ে, জাহাজ, বিমান কোম্পানি, অস্ত্রের কারখানা, বিদ্যুৎ শিল্প ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকিবে।

(৮) যে সকল শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বর্তমানে সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের মালিকানায় রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

(৯) পাট শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে এবং রাষ্ট্র নিজের মালিকানায় ইহা পরিচালনা করিবে।

কৃষিনীতি :

(১) ''খোদ কৃষকের হাতে জমি'' এই নীতির ভিত্তিতে ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হইবে। বিপ্লবের পর সমস্ত জমি পুনরায় জরিপ করিয়া বর্তমানে জমি রেকর্ড ও খতিয়ানের ব্যাপারে যে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি রহিয়াছে রাষ্ট্র তাহা দূর করার ব্যবস্থা করিবে।

(২) জোতদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা হইবে। জোতদার ও তাহাদের দালালদের সমস্ত জমি ও চাষের যন্ত্রপাতি রাষ্ট্র দখল করিবে উহা বিনামূল্যে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিবে।

(৩) সরকারের সকল খাস জমি রাষ্ট্র দখল করিবে এবং গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিবে।

(৪) কৃষকদের মধ্যে বণ্টনকৃত জমির প্রতি তাহাদের স্বত্বাধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

(৫) সকল প্রকার বর্গাপ্রথার বিলোপ সাধন করা হইবে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত দৈনিক মজুরি দিয়া ক্ষেতমজুর নিয়োগ করা যাইবে। কিন্তু চাষের যন্ত্রপাতি ও কৃষি উৎপাদনের আবশ্যকীয় অন্যান্য সামগ্রী জমির মালিককে বহন করিতে হইবে।

(৬) স্থানীয় পরিস্থিতি সাপেক্ষে জমির মালিকদের পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ জমি সংরক্ষণের সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইবে। ধনী কৃষকদের নিকট হইতে এলাকা অনুযায়ী রাষ্ট্র নির্দিষ্ট উচ্চতম সীমার অতিরিক্ত জমি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

(৭) খাদ্য দ্রব্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যমানের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ক্ষেতমজুরদের বাঁচার উপযোগী নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হইবে।

(৮) অকৃষক বিধবা (এই অকৃষক বিধবা বলিতে কোন কৃষক পরিবারের বিধবাকে বুঝাইবে না), শিক্ষক, কুটির শিল্প, ছোট দোকানদার প্রভৃতির হাতে বর্তমানে যে জমি রহিয়াছে সেই সম্পর্কে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি হইবে :

(ক) মুক্ত এলাকায় যদি ইহাদের অবস্থান হয় (যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকের বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) সেই এলাকায় অথবা সারা পূর্ব বাংলাব্যাপী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন হইবার পর তাহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া রাষ্ট্র জমি ক্রয় করিয়া লইবে এবং গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের নিকট বিতরণ করিবে। কিন্তু রাষ্ট্র তাহাদের জীবন ধারণের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান অথবা তাহারা যে পেশায় নিযুক্ত রহিয়াছেন তাহাতে তাহারা পরিবারের ভরণ-পোষণের উপযোগী আয় যাহাতে করিতে পারেন রাষ্ট্র অবশ্যই তাহার ব্যবস্থা করিবে।

(খ) জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন হওয়ার পূর্বে অকৃষক বিধবা, শিক্ষক, কুটির শিল্প, ছোট দোকানদার, শহরে কার্যরত শ্রমিক, স্বল্প আয়ভোগী ব্যক্তিদের জমি যে অবস্থায় রহিয়াছে সেই অবস্থাতেই থাকিবে। কিন্তু বর্গাপ্রথার মাধ্যমে জমি চাষাবাদ করিতে দেওয়া হইবে না– উপযুক্ত মজুরি দিয়া ক্ষেতমজুর নিয়োগ করিয়া জমি চাষ করা যাইবে।

(৯) (ক) খাজনা প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করা হইবে। খাজনার পরিবর্তে উৎপাদনের উপর কৃষি আয়কর প্রথা চালু করা হইবে। ফসল না হইলে অথবা উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে না হইলে আয়কর দিতে হইবে না। ফসল উৎপাদনের পর কৃষকদের সাধারণভাবে খাওয়া-পরার পর যাহা থাকিবে, তাহার উপর আয়কর ধার্য হইবে। কৃষকদের আয়কর ফসলে লওয়া হইবে। এই আয়কর ধার্য করিবে মূলত কৃষক প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত ইউনিয়ন গণপরিষদ।

(খ) গরীব ও মাঝারী কৃষকের সকল বকেয়া খাজনা ও সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

(গ) নদী শিকস্তি জমির জন্য কোন আয়কর দিতে হইবে না এবং ইহার উপর কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হইবে বা নদী-নালা, জমি-জমা ও ভিটামাটি হইতে উচ্ছেদপ্রাপ্ত কৃষকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইবে।

(১০) (ক) হাট-বাজার, ঘাট, বন, পাহাড়, বিল প্রভৃতিতে যে ইজারাদারী, মহালদারী ও কন্ট্রাক্ট প্রথা চালু রহিয়াছে এবং মধ্যস্বত্ব ভোগ করিবার যে অধিকার বর্তমানে ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়ার বিধান প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা বিলোপ করা হইবে।

(খ) হাট-বাজারে জনসাধারণের খুচরা বেচাকেনার উপর তোলা বা কর বিলুপ্ত করা হইবে। রাষ্ট্র নিজেই ইহা সংরক্ষণ করিবে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা ইহা পরিচালনার ব্যবস্থা করিবে। হাট-বাজার যথাযথ সংরক্ষণ এবং উহার উন্নয়ন সাধনের জন্য পাইকারী ব্যবসায়ের উপর কর ধার্য্য করা হইবে।

(গ) বন, পাহাড়, বিল, হাওর, নদী সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে। যাহারা নিজের হাতে শ্রমকাজ করিবেন, রাষ্ট্র তাহাদের সামান্য করের বিনিময়ে বন-পাহাড়ে বাঁশ, ছন, কাঠ কাটিবার এবং বিলে ও জলাশয়ে মাছ ধরিবার অনুমতি প্রদান করিবে।

(১১) (ক) রাষ্ট্র সকল প্রকার মহাজনী প্রথা বাতিল করিবে। মহাজনদের সকল সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(খ)রাষ্ট্র কৃষকদের প্রয়োজন সাপেক্ষে চাষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও

দ্রব্যসামগ্রী যথা গরু, জমি, সার, আধুনিক চাষের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় করার জন্য বিনা সুদে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করিবে।

(১২) রাষ্ট্র কৃষকদের জীবন ধারণের মানোন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সামগ্রিক স্বার্থে আধুনিক যান্ত্রিক চাষ ও যৌথ সমবায় প্রথা প্রবর্তনের জন্য তাহাদের উৎসাহিত করিবে যাহাতে কৃষকেরা নিজেরা স্বেচ্ছামূলকভাবে এই পথ গ্রহণ করে। কৃষকেরা স্বেচ্ছায় যৌথ সমবায় প্রথায় রাজি হইলে তাহাদের রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সস্তা দামে সকল প্রকার সামগ্রী সরবরাহ করা হইবে। খাস জমি বণ্টনের ব্যাপারে যৌথ সমবায়ে অংশগ্রহণকারী কৃষককে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। এই সমস্ত যৌথ সমবায় অবশ্যই কৃষকদের নির্বাচিত কমিটি দ্বারা পরিচালিত হইবে– রাষ্ট্র এই ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবে না।

(১৩) কৃষকদের ফসলের জন্য প্রকৃতির উপর যাহাতে নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে না হয় সেইজন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে আধুনিক জলসেচের ব্যবস্থা করা হইবে।

(১৪) বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটিকে বিপ্লবোত্তর অবস্থায় রাষ্ট্র প্রথম ও প্রধান বিষয় বলিয়া গণ্য করিবে। বিশ্বের সকল দেশ বিশেষ করিয়া গণচীনের সাহায্য লইয়া আমাদের দেশের অফুরন্ত জনশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া পূর্ব বাংলার বন্যা সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান করা হইবে।

(১৫) কৃষকেরা তাহাদের অর্থকরী ফসল যেমন পাট, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতির ন্যায্য দাম যাহাতে পাইতে পারে, রাষ্ট্র তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিবে। বিশেষ করিয়া কৃষক পাটের ন্যায্য দাম যাহাতে পাইতে পারে সেই জন্য রাষ্ট্র সরাসরি কৃষকের নিকট হইতে পাট ক্রয় করিয়া তাহাদের প্রতিনিধি হিসাবে আন্তর্জাতিক বাজারে তাহা বিক্রয় করিবে। পাটের মূল্য নির্ধারিত হইবে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের প্রাপ্ত পূর্ণ মূল্য রাষ্ট্র কৃষককে প্রদান করিবে। দেশীয় শিল্পে ব্যবহার্য পাটের মূল্যও নির্ধারিত হইবে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের মূল্যের সহিত সঙ্গতি বিধান করিয়া। এইভাবে কৃষকের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

(১৬) শিল্পে ব্যবহার্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের ব্যাপারে রাষ্ট্র সর্বপ্রকার উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিবে।

শিল্পনীতি :

(১) জনগণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের চরিত্র হইবে সমাজতান্ত্রিক এবং ইহা সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইবে। কিন্তু জনগণের জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না এমন ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও পুঁজিবাদী উৎপাদনে রাষ্ট্র বাধা প্রদান করিবে না।

(২) রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও পরিচালনায় মূল ও ভারী শিল্প গড়া হইবে।

(৩) বিদ্যুৎশক্তি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কল-কবজা নির্মাণের ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

(৪) বিলাসদ্রব্য উৎপাদন নিরুৎসাহিত করা হইবে।

(৫) (ক) ক্ষুদ্র শিল্প, যথা তাঁত ও লবণ শিল্প সংরক্ষণ করার জন্য রাষ্ট্র যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। (খ) পূর্ব বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁত ও বয়ন শিল্প যাহাতে রক্ষা পাইতে পারে ও উন্নত শিল্পে পরিণত হইতে পারে, সেই জন্য রাষ্ট্র তাঁতীদের নিয়ন্ত্রিত স্বল্পমূল্যে সুতা সরবরাহ করিবে। (গ) পূর্ব বাংলার লবণ শিল্প ও ক্ষুদে লবণ উৎপাদকেরা যাহাতে রক্ষা পাইতে পারে, সেই জন্য রাষ্ট্র লবণ কর বাতিল করিবে ও বিদেশ হইতে লবণ আমদানি নিষিদ্ধ করিবে। লবণ চাষীরা যদি জোতদারের জমিতে লবণ চাষ করে, তাহা হইলে উক্ত জোতদারের জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া লবণ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। জেতদার নয় এমন মালিকদের জমিও উপযুক্ত মূল্য দিয়া রাষ্ট্র ক্রয় করিয়া লইবে এবং লবণ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করিবে। এইভাবে লবণ উৎপাদনের উপযোগী জমির উপর প্রকৃত লবণ চাষীদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে। লবণ চাষীর যাহাতে যৌথ সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে সেইজন্য রাষ্ট্র তাহাদের উৎসাহ প্রদান করিবে।

(৬) বনজ শিল্প সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৭) পূর্ব বাংলার খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উপর রাষ্ট্র বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিবে। পূর্ব বাংলার ভূগর্ভে কয়লা, তৈল, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হওয়ার যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রহিয়াছে রাষ্ট্র ব্যাপক অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও খনন কার্যের মাধ্যমে তাহা আহরণের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

(৮) নদী-নালা, খাল-হাওর-বিলের দেশ পূর্ব বাংলা মৎস্য শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশেষভাবে যত্নবান হইবে। এই জন্য মাছ ধরা ও মাছ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলিতেছে তাহা দূর করা হইবে এবং ইহাকে পূর্ব বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও লাভজনক শিল্পে পরিণত করার জন্য রাষ্ট্র নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে :

(ক) মৎস্য চাষের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। কৃত্রিম উপায়ে মৎস্য প্রজননের ব্যবস্থা করা হইবে।

(খ) নদী-নালা, খাল-বিল ও হাওরে জেলেদের মাছ ধরার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে মাছ ধরার যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্বল্পমূল্যে তাহাদের সরবরাহ করা হইবে। 'জাল যার জলা তার' এই নীতির ভিত্তিতে ইজারাদারী প্রথা ও জলকর গ্রহণ প্রত্যাহার করা হইবে।

(গ) বড় বড় নদী, গভীর সমুদ্রে রাষ্ট্র নিজেই সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা মাছ ধরার ব্যবস্থা করিবে।

(ঘ) মৎস্য সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ ও দেশী-বিদেশী বাজারে চালান দিবার জন্য পরিবহনের ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(ঙ) আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য যাহাতে বিদেশে রপ্তানী হইতে পারে তাহার উপর রাষ্ট্র বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিবে ও মৎস্য রপ্তানী ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে।

(৯) বিদ্যুৎ শক্তির উন্নয়নকল্পে আণবিক প্রকল্প নির্মাণ করা হইবে।

(১০) জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও গ্যাস শিল্পের উন্নয়ন করা হইবে।

(১১) সমস্ত শহর ও গ্রামাঞ্চলকে বৈদ্যুতিকীরণ করা হইবে।

শ্রমনীতি :

শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশের এবং ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নেতা হিসাবে গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া শ্রমনীতি নির্ধারিত হইবে। ইহার রূপরেখা হইবে :

(১) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার পরিপূর্ণ অধিকার থাকিবে।

(২) পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রামে পরিচালনা ও ধর্মঘট করার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় পক্ষের আলাপ-আলোচনা ও জনগণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যস্থতায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যকার বিরোধসমূহ মীমাংসা করা হইবে।

(৪) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহ শ্রমিক কর্মচারী ও রাষ্ট্র যৌথভাবে পরিচালনা করিবে। রাষ্ট্র ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি যৌথভাবে শ্রমিকদের স্বার্থ, শিল্পের সম্প্রসারণ ও দেশের সার্বিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্রমিকদের বেতন ও অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করিবে।

(৫) সকল শ্রমিকের জন্য বিনা ভাড়ায় পারিবারিক বাসস্থান, বিনা খরচে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ও বিনা পয়সায় আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইবে। শ্রমিক কর্মচারীদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য রাষ্ট্র বিনা খরচে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে। মহিলা শ্রমিকদের জন্য প্রসবকালীন সবেতন ছুটি ও প্রসূতি ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৬) রোগ-ব্যাধি, কর্মক্ষমতা লোপ, বার্ধক্য ও অবসর গ্রহণকালে শ্রমিক ও কর্মচারীদের যত্ন, সাহায্যদান ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। বৃদ্ধ বয়সে পেনশন, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ ও ভাতা প্রদান করা হইবে।

(৭) খাদ্য দ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যের সহিত সমতা বিধান করিয়া শ্রমিক কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হইবে। এই নিম্নতম মজুরি এমন হইবে, যাহাতে শুধু শ্রমিকরা নিজেরাই নয়, তাহাদের পরিবার পরিজনসহ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা চালাইতে পারে।

(৮) একই সুযোগ-সুবিধাসহ বিকল্প কর্মসংস্থান ব্যতীত শ্রমিক ছাঁটাই করা চলিবে না। শ্রমিকদের চাকরি হইতে বরখাস্ত করা চলিবে না, তবে

শ্রমিকেরা কোন প্রকার অপরাধ করিলে তাহার জন্য তাহাদের সংশোধনের দায়িত্ব শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গ্রহণ করিবে।

(৯) ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করা হইবে।

(১০) সকল প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ও নিম্ন বেতনের ব্যবধান হ্রাস করা হইবে। সকল পর্যায়ে সরকারী কর্মচারীদের বেতনের ব্যবধান হ্রাস করা হইবে।

শিল্পে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রসঙ্গে :

(১) রাষ্ট্র ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা, পুঁজির বিকাশ ও পুঁজিবাদী উৎপাদনের স্বাধীনতা প্রদান করিবে, কিন্তু ইহা যাহাতে জনগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারে তাহার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) ক্ষুদ্র শিল্প ও হস্ত শিল্প পুনঃনির্মাণ ও উন্নয়ন করা হইবে এবং এই উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য শিল্প ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট ছোট পুঁজিপতিদের রাষ্ট্র উৎসাহিত করিবে।

(৩) এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা মাফিক হইতে হইবে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বহির্ভূত অথবা ঐ পরিকল্পনার সহিত অসমাঞ্জস্যপূর্ণ কোন শিল্প বা ব্যবসায়ের জন্য রাষ্ট্র অনুমতি দিবে না।

(৪) দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহ দান ও সংরক্ষণের অনুকূল শুল্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৫) এই সমস্ত শিল্পের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করা হইবে।

ব্যবসা ও বাণিজ্য :

(১) সকল বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে।

(২) পারস্পরিক স্বার্থ ও সমতার ভিত্তিতে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদা রক্ষা করিয়া সকল দেশের সহিত বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা যাইবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহিত বিশেষ করিয়া গণচীনের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়ন ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ

করার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হইবে।

(৩) পাট ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে।

(৪) কৃষকের অন্যান্য অর্থকরী ফসল যথা– ইক্ষু, হলুদ, পান, আলু ইত্যাদির ন্যায্য মূল্য পাওয়ার জন্য রাষ্ট্র নিশ্চয়তা বিধান করিবে এবং দেশী-বিদেশী বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করা হইবে। সকল কৃষি পণ্যের বিক্রয়ের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা হইবে।

(৫) মূল খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে। মূল খাদ্যশস্যের মূল্য কৃষকের শ্রম, উৎপাদনের খরচ, জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ও দেশী-বিদেশী বাজারের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নির্ধারিত হইবে।

(৬) ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের স্বার্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

(৭) রাষ্ট্র নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণ করা হইবে।

ফিন্যান্স (অর্থ, মুদ্রা, কর) :

(১) সাম্রাজ্যবাদের অধীন মুদ্রা ব্যবস্থা বাতিল করিয়া স্বাধীন মুদ্রা প্রবর্তন করা হইবে।

(২) অপ্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে জনগণের উপর যে বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাতিল করা হইবে।

(৩) জনগণতান্ত্রিক সরকারের কর নির্ধারণের নীতি হইবে 'যাহার আয় যত বেশি, ট্যাক্সের হারও তত বেশি।'

যোগাযোগ ও পরিবহন :

যথাযথ যোগাযোগ ও পরিবহন মুদ্রা ব্যবস্থা না থাকার ফলে বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নিরসনকল্পে রাষ্ট্র নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে :

(১) পূর্ব বাংলার মূল যোগাযোগ ব্যবস্থা– জলপথসমূহকে নৌচলাচলের উপযোগী করার জন্য নদী ও খালসমূহের সংস্কার সাধন করা হইবে।

(২) নৌ-যানসমূহ, বিশেষ করিয়া দেশী নৌকাকে আধুনিকীকরণ করা হইবে।

(৩) রেলপথ সম্প্রসারণ ও রেলওয়ে ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করা হইবে।

(৪) সকল যানবাহন চলাচলের উপযোগী সারা দেশব্যাপী সড়ক নির্মাণ করা হইবে যাহাতে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকে।

(৫) দেশের উত্তরাঞ্চলের সহিত পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করা হইবে।

(৬) বিপ্লবের পর প্রধান যানবাহন শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে এবং 'লাভেও নয়-লোকসানেও নয়' এই নীতির ভিত্তিতে উক্ত শিল্প পরিচালিত হইবে। যে সমস্ত ক্ষুদ্র যানবাহন বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত করা সম্ভব হইবে না তাহার ভাড়ার হার হ্রাস করা হইবে।

জনগণতান্ত্রিক শিক্ষা-সংস্কৃতির রূপরেখা

জনগণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হইবে নিম্নরূপ :

(১) বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করিয়া এমনভাবে ঢালিয়া সাজানো হইবে, যাহাতে ইহা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির সেবাদাসে পরিণত না করিয়া সৃষ্টি করিবে দেশকর্মী, কবি, শিল্পী-সাহিত্যিক, বিজ্ঞান কর্মী, কারিগর ও উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী দক্ষ শ্রমিক বাহিনী। এই শিক্ষা ব্যবস্থা হইবে এমনি যাহা তরুণ শিক্ষার্থীদের তাহাদের স্বদেশ ভূমি ও পৃথিবীর সকল নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের সহিত পরিচিত ও একাত্ম করিবে, দেশমাতৃকা ও তাহার জনগণের বিশেষ করিয়া শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সঞ্চার করিবে সুগভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, যাহা সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজিপতি ও তাহাদের দালালদের প্রতিও সৃষ্টি করিবে অপরিসীম ঘৃণা। এই শিক্ষা ব্যবস্থাই হইবে জনগণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা, যাহার মাধ্যমে ছাত্রসমাজের মন সাম্প্রদায়িকতা ও সকল প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শের বিষবাষ্প হইতে

মুক্ত হইবে। তাহারা উদ্বুদ্ধ হইবে বৈজ্ঞানিক ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে।

(২) পূর্ব বাংলার বুক হইতে নিরক্ষরতার অভিশাপকে চিরতরে নির্মূল করা হইবে। প্রতিটি নাগরিকের জন্য শিক্ষা দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য গণশিক্ষার প্রসার করা হইবে। উক্ত শিক্ষা মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর সন্তান-সন্ততির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হইবে না– ইহার সুযোগ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পেশা নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইবে।

প্রতিটি নাগরিকের জন্য একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হইবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার তারতম্য যথা কিন্ডারগার্টেন, পাবলিক স্কুল প্রভৃতি বিলুপ্ত করা হইবে।

(৩) মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিকের রাষ্ট্রীয় খরচে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। শ্রমিক কৃষকের সন্তান-সন্ততিদের উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য রাষ্ট্র পর্যাপ্ত স্কলারশিপের ব্যবস্থা করিবে।

(৪) প্রচলিত শিক্ষা সিলেবাসকে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কর্মসূচির সহিত সঙ্গতি বিধান করিয়া পরিবর্তন করা হইবে। অনাবশ্যক সিলেবাসের বোঝা কমানো হইবে এবং ঘন ঘন সিলেবাস পরিবর্তন রদ করা হইবে। বর্তমান পরীক্ষাসমূহের পদ্ধতিরও সংস্কার সাধন করা হইবে।

(৫) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইবে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য প্রতিটি নাগরিককে অবাধ সুযোগ প্রদান করা হইবে। প্রতিটি জেলায় অন্ততপক্ষে একটি করিয়া কৃষি কলেজ, টেকনিক্যাল, পলিটেকনিক্যাল, উইভিং, ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা হইবে।

(৬) বিভিন্ন কলকারখানার মেকানিক, যানবাহন চালনা, দর্জির কাজ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অপারেটর, রেডিও মেকানিজম, সিনেমা শিল্পের কারিগর প্রভৃতি শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইবে।

(৭) বাংলা ভাষাকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম করা হইবে। বিদেশী ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বইসমূহ দ্রুত বাংলা ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা হইবে।

পূর্ব বাংলার অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিরা যাহাতে তাহাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৮) রাষ্ট্রভাষা হইবে বাংলা এবং প্রতিটি রাষ্ট্রীয় কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হইবে।

(৯) যে সমস্ত তরুণ তাহাদের শিক্ষা জীবন অসমাপ্ত রাখিয়া বিপ্লবে আত্মনিয়োগ করিবে, বিপ্লবোত্তর যুগে তাহাদের শিক্ষা ও প্রতিভার বিকাশের জন্য রাষ্ট্র সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(১০) বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় চরম অবহেলিত শিক্ষক সম্প্রদায় বিপ্লবের পরে জনগণতান্ত্রিক সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হইবেন। তাঁহারা যাহাতে নির্ভাবনায় তাঁহাদের শিক্ষকতা ও গবেষণা কার্য এবং প্রতিভার বিকাশ সাধন করিতে পারেন, সেইজন্য রাষ্ট্র তাঁহাদের পর্যাপ্ত বেতন ও অন্যান্য সর্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করিবে।

(১১) বর্তমানে পচাগলা ঘুণেধরা সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও বাহন যে সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা সমূলে উচ্ছেদ করা হইবে এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও সকল প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক ভাবধারা বিরোধী জনগণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে এমন ধাঁচে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে ইহা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের শত্রুদের চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করিতে পারে। এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান ও নেতৃস্থানীয় উপাদান হইবে সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী মতাদর্শ ও সংস্কৃতি, যাহাতে ইহা দ্রুত সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত হইতে পারে।

(১২) বাঙালি জাতির সংস্কৃতির বিকাশ ও মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ চেষ্টা গ্রহণ করা হইবে। এই জাতীয় সংস্কৃতি পূর্ব বাংলা গোটা জনগণ বিশেষ করিয়া শ্রমজীবী মানুষের সংঘাতময় জীবন ও নিরন্তর শ্রেণী সংগ্রামের একটি সার্থক দর্পণ হইবে।

(১৩) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবময় ঐতিহ্যকে রাষ্ট্র পরম নিষ্ঠার সহিত সংরক্ষণ করিবে– ইহার মধ্যে যে অংশ বিপ্লবের সহায়ক

হইবে, তাহার বিকাশের জন্য রাষ্ট্র সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইবে, যে অংশ শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে যাইবে, তাহা জনগণের নিকট সমালোচনাসহকারে তুলিয়া ধরা হইবে। কিন্তু রাষ্ট্র মাইকেল, রবীন্দ্র, নজরুল বা অন্য ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে না।

(১৪) বিদেশের যে সকল শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি মানবজাতির সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে, তাহার সারবস্তু আত্মস্থ করিবার জন্য অনুশীলন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু ইহার সম্পর্কেও শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভক্তি ও সমালোচনা তুলিয়া ধরা হইবে।

(১৫) সকল প্রকার লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবলুপ্তি রোধের জন্য এবং তাহার বিকাশসাধনের জন্য রাষ্ট্র সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইবে।

(১৬) সকল জাতীয় সংখ্যালঘুদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ও মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে।

(১৭) নোংরা মার্কিনী সিনেমা, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও গণবিরোধী সকল প্রকার সাংস্কৃতিক কার্যকে উৎখাত করা হইবে এবং নিষ্ঠুর হস্তে দমন করা হইবে।

(১৮) সমাজে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি করা জন্য যাহারা প্রচেষ্টা চালাইবে রাষ্ট্র কঠোর হস্তে তাহাদের দমন করিবে।

(১৯) সাহিত্য ও শিল্পের সৃজনশীল ভূমিকা গ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে প্রতিটি নাগরিককে অবাধ সুযোগ প্রদান করা হইবে।

(২০) বুদ্ধিজীবী, কবি, লেখক ও শিল্পীদের সমাজে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে এবং তাহারা যাহাতে নিরুদ্বেগে তাহাদের সৃজনশীল কাজ অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাইতে পারেন, রাষ্ট্র তাহার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে।

(২১) মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও তাহার সর্বোচ্চরূপ মাও সেতুঙের চিন্তাধারা অবাধ প্রচার ও প্রসারে সুযোগ প্রদান ও জনগণকে তাহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্র উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে। রাষ্ট্র মার্কসবাদকে বিকৃতকারী সংশোধনবাদী, নয়া সংশোধনবাদী ভাবাদর্শে পূর্ণ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিষিদ্ধ করিবে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা :

(১) স্বাস্থ্য বিভাগের উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য রক্ষার ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণের আন্দোলন গড়িয়া তোলা, জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা করা, মহামারী নিরোধের স্থায়ী ও কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

(২) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পেশা নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের একই ধরনের চিকিৎসা সুযোগ প্রাপ্তির প্রশ্নে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা বিলুপ্ত করা হইবে।

(৩) 'জনগণের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সর্বপ্রকার ওষুধ সরবরাহ' এই লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া প্রতিটি ইউনিয়নে অন্ততপক্ষে একটি সর্বাধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদিসহ হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ওষুধ শিল্প ও ওষুধ ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কেহ ওষুধ শিল্প ও ওষুধ ব্যবসা করিতে পারিবে না।

(৫) ওষুধ প্রস্তুতের জন্য দেশজ গাছ-গাছড়া বিদেশে রপ্তানি না করিয়া উহার উপাদান হইতে ওষুধ প্রস্তুত করার ব্যাপক গবেষণা কার্য চালাইয়া যাইতে হইবে এবং উহার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ওষুধ শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে।

(৬) পূর্ব বাংলার যে ঐতিহ্যবাহী কবিরাজী, হেকিমী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে, ব্যাপক গবেষণা ও পরীক্ষা চালাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্র প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে।

(৭) শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া আন্দোলনের বিকাশ সাধন করা হইবে।

(৮) শহরে ও গ্রামে সর্বত্র বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও সুষ্ঠু পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করা হইবে।

সামাজিক নিরাপত্তা :

(১) রাষ্ট্র অনাথ, বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের বিশেষ যত্ন গ্রহণ করিবে। বৃদ্ধদের জন্য ভাতা, প্রত্যেক অন্ধ, আঁতুর ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্র নিজ খরচে তাহাদের নিজেদের বাড়িতে, কোন স্বাস্থ্যনিবাস বা

ক্লিনিকে থাকার ব্যবস্থা করিবে। অন্ধ ও আঁতুরদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

(২) ভিক্ষাবৃত্তি চিরতরে বিলুপ্ত করা হইবে এবং ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৩) বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান অথবা তাহাদের বেকারভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, জুয়া খেলা, মাতলামি, রাহাজানি, গুণ্ডামি চিরতরে সমাজদেহ হইতে উৎপাটিত করা হইবে।

(৫) বেশ্যাবৃত্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করা হইবে এবং বেশ্যাদের সুচিকিৎসা ও শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে। তাহাদেরকে সম্মানজনক জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৬) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বা শস্যহানির ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের রিলিফ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। যাহাদের জমিজমা, বাড়ি-ঘর নদীভাঙনের ফলে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে রাষ্ট্র তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবে।

নারীর অধিকার :

(১) রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। নারী সমাজের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৃত্তিগত মানোন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে।

(২) যে সকল মহিলা পুরুষের অনুরূপ কার্যে নিযুক্ত তাহারা সমবেতন, সমমর্যাদা, অধিকার ভোগ করিবেন।

(৩) মহিলা কর্মীদের উৎকর্ষ বিধান, উপযুক্ত ট্রেনিং ও সক্রিয় সাহায্যদানের নীতি গ্রহণ করা হইবে।

(৪) বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে প্রগতিশীল আইন প্রণয়ন করা হইবে।

(৫) মহিলা শ্রমিক ও কর্মচারীদের দুই মাসের সবেতন মাতৃত্ব ছুটি প্রদান করা হইবে। প্রসূতিদের বিশেষ ভাতা প্রদান করা হইবে।

(৬) মাতা ও শিশুদের প্রতি রাষ্ট্র বিশেষ যত্ন গ্রহণ করিবে। রাষ্ট্রীয় খরচে মাতৃসদন, শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান ও নার্সারী স্কুল পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রতিষ্ঠা

করা হইবে।

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৭-৬১

২২ ফেব্রুয়ারি'র (১৯৭০) ঐতিহাসিক ঘোষণা

১৯৭০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) ও শ্রমিক ফেডারেশনের ঘোষণা ও কর্মসূচী

স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ১১-দফা কর্মসূচী

পূর্ব-বাংলার জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজির শোষণ ও সামন্তবাদী শোষণ। পূর্ব বাংলার জনগণের শতকরা ৮৫ জন কৃষক যেহেতু তারা সামন্তবাদী শোষণে জর্জরিত- সেহেতু পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে সামন্তবাদী শোষণের দ্বন্দ্ব প্রধান। যদিও এই কর্মসূচী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক প্রচারিত হচ্ছে তবু ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়- এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন হতে পারে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শনিষ্ঠ বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক, গরীব ও মাঝারী কৃষককে সংগঠিত করে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী, শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতিসেবী, ছোট-মাঝারী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করার মধ্য দিয়ে, গ্রাম অঞ্চলে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর করে, শ্রেণী সংঘর্ষে রূপান্তরিত করে দীর্ঘ সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে মুক্ত এলাকা গঠন এবং শ্রেণী শত্রুকে সমূলে ধ্বংস করার মধ্য দিয়েই স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব-বাংলা প্রতিষ্ঠা করো সম্ভব। ছাত্র সমাজ জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের জন্য সহায়কের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম-- যদি ছাত্র সমাজ নিজেদের আরাম, আয়েশ, ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়ে বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিক এবং কৃষকের সাথে একাত্বতা ঘোষণা করে-- নিজেরা শ্রেণীচ্যুত হয়ে পূর্ব বাংলার জনগণের শ্রেণী শত্রুকে খতম করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে। সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির (যাহার চরিত্র আমলা মুৎসুদ্দি) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করিয়া **পূর্ব বাংলায় স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করা**। এই ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলার দেশরক্ষা, অর্থনীতি, শাসন ব্যবস্থা, সংস্কৃতি তথা সর্বময় কর্তৃত্ব পূর্ব বাংলার জনগণের হাতে থাকিবে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির জাতীয় নিপীড়ন ও শ্রেণী শোষণের কবলমুক্ত এই ব্যবস্থায় জনগণের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে ও জনতার গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ক) আঠারো ও তদউর্ধ বয়স্ক-বয়স্কা নর-নারীর ভোট ও প্রত্যক্ষ

নির্বাচনের ভিত্তিতে গণ পরিষদ নির্বাচিত হইবে। কোন নির্বাচনী এলাকার জনগণ ইচ্ছ করিলে যে কোন সময় তাদের প্রতিনিধি প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(খ) জনতার গণতান্ত্রিক অধিকার নিরঙ্কুশ করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির দালাল ও সমর্থক যে কোন শ্রেণী ও ব্যক্তিকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে।

(ক) হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী জাতি-উপজাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের জনগণের সমান রাজনৈতিক অধিকার থাকিবে।

(খ) নারী জাতির সমান অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(গ) জনগণের সকল প্রকার মৌলিক অধিকার, বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মতাদর্শের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইবে।

(ঘ) জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সরকারের সম্পর্ক হইবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে। ধর্মের নাম ব্যবহার করিয়া সকল প্রকার শোষণ উচ্ছেদ করা হইবে।

স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার সার্বাভৌমত্ব রক্ষা করে একটি গণবাহিনী থাকিবে। শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী জনতার সমবায়ে এই গণবাহিনী গঠিত হইবে। ইহা ছাড়াও সমগ্র জাতি বিশেষ করিয়া শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী জনতাকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা হইবে এবং তাহাদের লইয়া গণ-মিলিশিয়া গঠন করা হইবে।

জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিরঙ্কুশ করিবার জন্য আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিয়া প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগকে আমূল পরিবর্তন করা হইবে। জনগণের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জড়িত ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা হইবে। বিচার বিভাগের মূল ভিত্তি হইবে গণ-আদালত।

পররাষ্ট্র নীতিরি ক্ষেত্রে পিণ্ডি, ওয়াশিংটন, মস্কো, নয়াদিল্লীর সরকারের বিরোধিতা করা হইবে। যে কোন বন্ধুদেশের বশ্যতা স্বীকার করা হইবে না। সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশসমূহের সহিত

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হইবে পারস্পরিক লাভ ও মুনাফার ভিত্তিতে। পৃথিবীর দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থনব প্রদান করা হইবে।

(ক) জোতদারী, মহাজনী, ইজারাদারী, তথা সকল প্রকার সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানো হইবে। "কৃষকদের হাতে জমি" এই নীতির ভিত্তিতে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে জোতদার, মহাজনদের উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্ত জমি বন্টন করা হইবে।

(খ) টাকা ও পণ্যে আদায়কৃত খাজনা প্রথার অবসান করা হইবে।

(গ) কৃষকের অর্থকরী ফসল ধান, পাট, ইক্ষু ইত্যাদির ন্যায্যমূল্য প্রদান করা হইবে। এই সকল ফসলে মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে চাউলের সঙ্গে বিনিময়ের ভিত্তিতে।

(ঘ) কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষককূলকে বিনাসূদে ঋণ দেওয়া হইবে। কৃষককে বকেয়া খাজনা ও ঋণের বোঝা হইতে মুক্ত করিয়া উন্নত চাষাবাদ করিবার জন্য সকল প্রকার উৎসাহ ও সুবিধাদি প্রদান করা হইবে।

বন্যা নিয়ন্ত্রেণের জন্য স্থায়ী ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং জল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য সেচ ব্যবস্থার প্রণয়ন করা হইবে।

(ক) বিদেশী মালিকানায় পরিচালিত সমস্ত শিল্প ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বাজেয়াপ্ত করিয়া জনগণের সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হইবে।

(খ) বৃহৎ পুঁজির শোষণ হইতে জনগণকে মুক্ত করিবার জন্য বৃহৎ বাইশ পুঁজিপতির পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(গ) ব্যাঙ্ক, বীমা, পাটশিল্প, পাট ব্যবসা ও অর্থনীতির মূল নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবসাসমূহ জাতীয়করণ করা হইবে।

(ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে।

(ঙ) সকল প্রকার পরোক্ষ কর প্রথা বাতিল করা হইবে। আয়ের হারের ভিত্তিতে কর ধার্য করা হইবে।

(চ) জনগণ বিরোধী অসৎ ব্যক্তি ও আমলাদের অসদুপায়ে অর্জিত

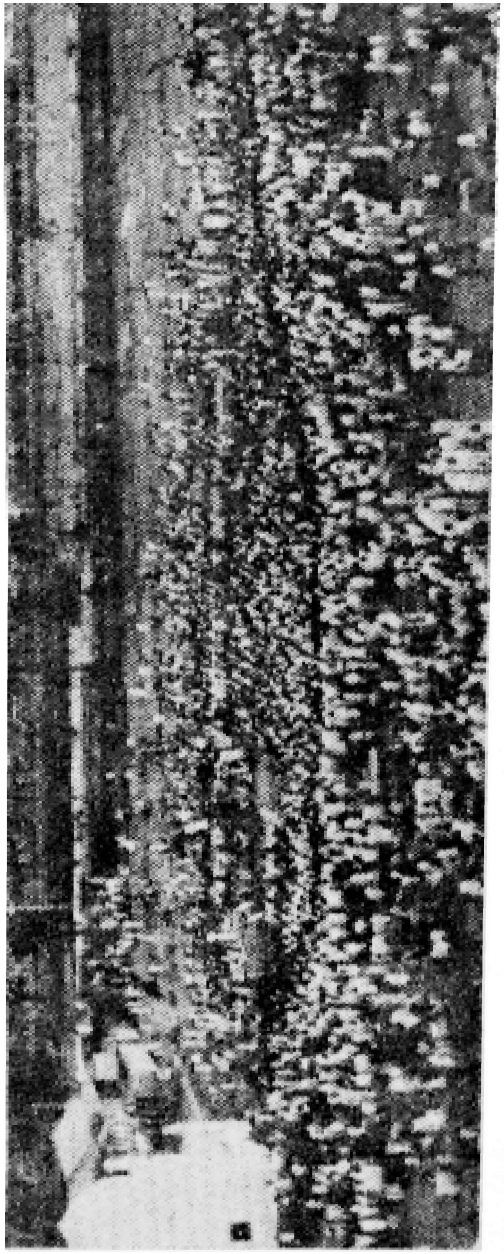

A public meeting was held on Sunday evening by East Pakistan Students' Union (Menon group) at Paltan Maidan on the occasion of Shaheed Day.—OBSERVER

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ সালে পল্টন ময়দানের জনসভায় বক্তৃতা করছেন রাশেদ খান মেনন।

সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(ছ) পুঁজি নিয়ন্ত্রণ নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনীকদের শিল্প ব্যবসায়ে আনুকুল্য প্রদান করা হইবে।

(ক) প্রত্যেক ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের ন্যায্য মুজরী, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং সার্বিক সুবিধাদির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করা হইবে। শ্রমিকদের সন্তান সন্ততির শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

(খ) দেশে ব্যাপক শিল্পায়ণের মাধ্যমে সকল প্রকার বেকার লোকের কর্মসংস্থান করা হইবে।

(ক) সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করিয়া গণমুখী, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হইবে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে।

(খ) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গণসংস্কৃতিকে সর্বাধিক মর্যাদা দেওয়া হইবে এবং কৃসংস্কারাচ্ছন্ন ও সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণার কবল হইতে জনগণকে মুক্ত করা হইবে।

২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পল্টন ময়দানের জনসভায় পঠিত ও গৃহীত
প্রকাশকাল: ৭ই মার্চ, ১৯৭০
** মওলানা ভাসানীর সমর্থক এই ছাত্র সংগঠনটি 'মেনন গ্রুপ' নামে পরিচিত ছিলো। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক আদালত কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেননকে সাত বৎসর এবং মোস্তাফা জামাল হায়দার ও মাহবুব উল্লাহকে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে তাদের অনুপস্থিতিতে।*
সূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাসান হাফিজুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র; দ্বিতীয় খণ্ড, (পৃষ্ঠা ৪৯০) থেকে সংগৃহীত

সম্পাদকের নোট: *এই ঘোষণাটি প্রকাশ হওয়ার পরপরই ইত্তেফাক পত্রিকা এবং তৎকালীন সোভিয়েত পার্টির মুখপত্র New Times পত্রিকায় সভার বক্তাদের ও ঘোষণার তীব্র সমালোচনা করা হয়। ইত্তেফাকের 'মঞ্চে' (উপ-সম্পাদকীয়) তাদেরকে হঠকারী বলে উল্লেখ করা হয় এবং New Times পত্রিকায় ইহাকে চীনপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হঠকারী*

কাজ বলে নিন্দা করা হয়। ইতিহাসের পরিহাস এই যে যখন সত্যিকারের যুদ্ধ (পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার) শুরু হল তখন চীন পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে অবস্থান।

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা

সমন্বয় কমিটির ডাক

আঘাত-হানো
সশস্ত্র বিপ্লব শুরু কর
জনতার স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েম কর

পূর্ব বাংলার মাটি আজ রক্ত চায়। পূর্ব বাংলার কোটি কোটি মানুষ আজ স্বাধীনতার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। গত তেইশ বছর ধরিয়া পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনতার রক্ত চুষিয়া খাইয়াছে। পূর্ব বাংলার জনতা আজ রিক্ত, নিঃস্ব, পথের ভিখারী। বার বার পূর্ব বাংলার মাটি শত শত শহীদের তাজা খুনে লাল হইয়াছে। পূর্ব বাংলার মানুষ যতবার তাহাদের মুক্তির জন্য সংগ্রামের ময়দানে নামিয়াছে, ততবারই শাসকগোষ্ঠী তাহাদের বর্বর পশুশক্তির মাধ্যমে তাহা দাবাইয়া দিয়াছে। সেনাবাহিনী হইল শাসকগোষ্ঠীর সকল ক্ষমতার উৎস। তাই আজ তাহারা সকল মুখোশ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাদের দেওয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশনও মুলতুবী করিয়া দিয়াছে। ইহা খুবই স্বাভাবিক। আমরা পূর্বেই বার বার বলিয়াছি যে, নির্বাচনের মাধ্যমে আপোসে বাংলার স্বাধীনতা আসিবে না– আসিবে না পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা সমগ্র জনতার মুক্তি। মুক্তির একমাত্র পথ সশস্ত্র বিপ্লব– ইতিহাস বার বার এই শিক্ষাই আমাদের দিয়াছে।

বিপ্লবী জনতা

তাই আজ এক মুহূর্তও দেরি করার সময় নাই। পূর্ব বাংলার মাটি আজ রক্ত চায়। তাই পূর্ব বাংলার কৃষক গ্রামে গেরিলা যুদ্ধ শুরু কর। শাসকগোষ্ঠীর হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লও। গ্রামে বাংলায় স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দাও। মুক্ত এলাকা গঠন কর। পূর্ব বাংলার শ্রমিক, ছাত্র, তরুণ ও যুবকেরা হাতিয়ার তুলিয়া লও। শত শহীদের রক্ত ঋণ শোধ কর– রক্তের প্রতিশোধ লও। সেনাবাহিনীকে খতম কর। এককেন্দ্রিক স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর শোষণের হাতিয়ার রাষ্ট্র যন্ত্রকে আঘাতের পর আঘাত হানো- লোপাট করিয়া দাও। পূর্ব বাংলার জনতা আস, আমরা শপথ গ্রহণ করি, জাতীয় মুক্তির যে লড়াই আমরা আজ শুরু করিব, যতদিন পর্যন্ত পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা না

আসিবে, যতদিন এই স্বাধীন পূর্ব বাংলার বুকে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী তথা সমগ্র জনতার রাষ্ট্র কায়েম না হইবে, ততদিন আমাদের এই লড়াইয়ে শ্রান্তি নাই, ক্ষান্তি নাই। আস, আমরা ঘোষণা করি, হুশিয়ার! পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে যাহারা বাধা প্রদান করিবে কিংবা যাহারা তাহাকে মাঝপথে থামাইয়া দিতে চাহিবে তাহাদের আমরা কিছুতেই ক্ষমা করিব না, বরদাশত করিব না।

জনতার সশস্ত্র বিপ্লব জিন্দাবাদ।
স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম কর॥

['কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি' কর্তৃক প্রচারিত প্রচারপত্র, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ। সূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও হাসান হাফিজুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ- দলিলপত্রঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৯৬]

বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম

সমন্বয় কমিটির ঘোষণা

১ ও ২ জুন ১৯৭১

[মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া লওয়ার যে আহ্বান ও নির্দেশ দিয়াছেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়া বাংলাদেশের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি *(মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত)*, কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি *(দেবেন শিকদারের নেতৃত্বে)*, শ্রমিক-কৃষক কর্মী সংঘ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি *(হাতিয়ার)*, পূর্ব বাংলা কৃষক সমিতি, পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন *(পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন)* এবং পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি রাজনৈতিক ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে মিলিত হইয়া 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' গঠন করিয়াছেন এবং সর্বসম্মতভাবে নিম্নোক্ত ঘোষণা প্রণয়ন করিয়া বাংলাদেশের জনগণের নিকট উপস্থাপিত করিতেছেন।]

বর্তমান পরিস্থিতি

সারা বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জীবনে আজ এক চরম মুহূর্ত উপস্থিত। পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট জঙ্গীশাহীর হানাদারবাহিনী ট্যাংক, বোমারু বিমান, মেশিনগান, মর্টার, রকেট, গানবোট প্রভৃতি অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নিরস্ত্র, নিরীহ, শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশের জনগণের উপর সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় শুরু করিয়াছে এমন এক বর্বর হামলা, সভ্য দুনিয়ার ইতিহাসে যাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সমগ্র সাড়ে সাত কোটি জনতাই এই হানাদার দস্যুদের বর্বর নির্যাতনের শিকারে পরিণত হইয়াছে। বাংলাদেশের এমন কোনো শহর, গ্রাম বা অঞ্চল নাই যেখানে এই পরদেশ লুণ্ঠনকারী দস্যুর দল নির্বিচারে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধনসম্পত্তি বিনষ্ট, লুটতরাজ ও নারী নির্যাতন করে নাই। পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট জঙ্গীশাহীর এই হামলা অত্যন্ত আকস্মিক ও বর্বর। দীর্ঘ চব্বিশ বছর গোটা বাঙালি জাতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে চরমভাবে নিপীড়িত

হইবার পর এইবারই সর্ব প্রথম জাতীয় মুক্তির আশার আলো দেখিতে শুরু করিয়াছিল। জাতীয় মুক্তির এই সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়াই বাংলাদেশের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী তথা সমগ্র জনতা ইতিপূর্বে বারবার রক্তঝরা সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। এই জনতাই মুক্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়া হাজার হাজার বীরসন্তানের রক্তের বিনিময়ে সৃষ্টি করিয়াছিল ১৯৬৮-৬৯ সালের গৌরবোজ্জ্বল সুমহান গণঅভ্যুত্থান। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাংলার জনগণ আবার সেই জাতীয় মুক্তির কামনাকেই বুকে করিয়া একচেটিয়া ভাবে আওয়ামী লীগকে ভোটদান করিয়াছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে দীর্ঘ চব্বিশ বছরের নিপীড়ন ও নির্যাতনের অবসান ঘটিবে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে নিরস্ত্র অপ্রস্তুত জনতার উপর নামিয়া আসিল শাসকগোষ্ঠীর সশস্ত্র হামলা। তবে এই হামলা জনগণের আকাঙ্ক্ষা অবদমিত করিতে পারে নাই, বরং শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণাকে আরও বেশি করিয়া তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। তাই অপ্রস্তুত অবস্থায় হইলেও জনগণ প্রতিরোধসংগ্রাম শুরু করিয়াছে। যে যেই ভাবেই পারিয়াছে সশস্ত্র আক্রমণের পাল্টা আক্রমণ করিয়াছে। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ ও বাংলার অসংখ্য তরুণ হানাদারদের বিরুদ্ধে শুরু করিয়াছে সশস্ত্র অভিযান। বাংলাদেশের জনগণ আজ নির্মম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া এই শিক্ষা লাভ করিয়াছে যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপোসের পথে বাংলার মুক্তি আসিবে না। বাংলার জনগণকে বাঁচিয়া থাকিবার তাগিদেই আজ হানাদার দস্যুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই অব্যাহত রাখিতে হইবে।

জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গড়ার আহ্বান

বাংলাদেশের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি, বাংলার সমগ্র জনতাকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও গ্রুপ, গণসংগঠন ও শ্রেণি-সংগঠন এবং প্রতিটি নাগরিকের মহান কর্তব্য পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা রক্ষা করিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের সুমহান ব্রত নিয়া এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। কেননা এ যুদ্ধ সমগ্র জাতির যুদ্ধ, সমগ্র জনগণের যুদ্ধ। সমগ্র জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হানাদার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নহে। এই বাস্তব উপলব্ধির ভিত্তিতে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী যে আহ্বান ও নির্দেশ দিয়াছেন,

তাহাকে অবলম্বন করিয়া ১ জুন বাংলাদেশের কতিপয় রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, ব্যক্তি, গণ-সংগঠন ও শ্রেণি-সংগঠন একত্রিত হইয়া 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' গঠন করিয়াছে। এই সমন্বয় কমিটির আশু লক্ষ্য হইলো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের সরকারের ও মুক্তিসংগ্রামরত সকল শক্তির সহিত সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া লওয়া। আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন সকল দল মত ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত একটি সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের। তাই এই সমন্বয় কমিটির তরফ হইতে আমরা আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতাকামী অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, গণ-সংগঠন, শ্রেণি-সংগঠন ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গের নিকট এইরূপ একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানাইতেছি।

চূড়ান্ত লক্ষ্য

এ সমন্বয় কমিটির চূড়ান্ত লক্ষ্য হইল বাংলাদেশকে হানাদার দস্যুদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া বাংলার বুকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী একটি স্বাধীন, সুখী-সুন্দর গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ইহা হইবে এমনই একটি সমাজব্যবস্থা যেখানে যুগ যুগ ধরিয়া শোষিত কৃষক জোতদারী-মহাজনী শোষণের নাগপাশ হইতে সত্যিকারের মুক্তিলাভ করিবে, যেখানে জমির উপর তাহার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইবে, যেখানে শ্রমিক পাইবে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবারসহ মানুষের মতো বাঁচিবার গ্যারান্টি, যেখানে বেকারত্বের অভিশাপ থাকিবে না, যেখানে ছাত্রের জন্য থাকিবে বিজ্ঞানভিত্তিক সর্বজনীন গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে বুদ্ধিজীবীর জন্য থাকিবে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ। প্রতিটি নাগরিকের জন্য থাকিবে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। এই সমাজ নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিবে। উন্নত মানের কৃষিব্যবস্থা ও শিল্প বিকাশের মাধ্যমে গড়িয়া তুলিবে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি ও একটি সমৃদ্ধশালী দেশ। এক কথায় এই সমাজব্যবস্থায় সমগ্র জনগণের জন্য থাকিবে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির ন্যূনতম গ্যারান্টি। এই বাংলা হইবে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মানুষ, মধ্যবিত্ত, দেশপ্রেমিক ধনিক শ্রেণির বাংলা, জনতার বাংলা।

আশু করণীয়

উপর্যুক্ত লক্ষ্য অর্জন করিবার জন্য পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীকে প্রতিহত ও সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিবার কর্মসূচি হইতেছে সমন্বয় কমিটির আশু কর্তব্য। আমাদের এই কর্তব্য মহান ও কঠিন। যেহেতু হানাদারবাহিনী সামরিক দিক দিয়া শক্তিশালী, অন্যদিকে যেহেতু জনগণের হাতে অস্ত্র নাই সেহেতু এই সমন্বয় কমিটি মনে করে যে, গেরিলাযুদ্ধের কায়দায় ক্রমান্বয়ে শত্রুকে দুর্বল করিয়া এবং নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করিয়া দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। অন্যদিকে যেহেতু হানাদারবাহিনী বিদেশি, বর্বর এবং সাড়ে সাত কোটি জনতার তুলনায় তাহাদের লোকবল অত্যন্ত নগণ্য, সেই হেতু এই যুদ্ধে জনগণের জয় যে সুনিশ্চিত সে সম্পর্কেও এ সমন্বয় কমিটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। এ সমন্বয় কমিটি আরও মনে করে যে, সমগ্র জনগণের শক্তি পূর্ণ ব্যবহারের উপরই যুদ্ধের সাফল্য নির্ভর করে। কোনো বিদেশি শক্তির উপর নির্ভর করিয়া নহে, নিজেদের শক্তিতে বলীয়ান হইয়াই এই মুক্তিযুদ্ধ চালাইয়া যাইতে হইবে। জনতার মধ্য হইতে সশস্ত্র গণফৌজ গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া আমাদের গেরিলাযুদ্ধের সূচনা করিতে হইবে। জনতার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষকরাই হইবে গণফৌজের মূল শক্তি। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল হইবে সশস্ত্র গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি। এ গেরিলাযুদ্ধ পরিচালিত হইবে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের সহিত যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে।

তাই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের এই পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি জনগণের নিকট নিম্নলিখিত করণীয় কর্তব্য উপস্থিত করিতেছে :

১. বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে জনতার বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি সমবায়ে সর্বদলীয় গণ-মুক্তি পরিষদ গঠন করিতে হইবে। এ গণ-মুক্তি পরিষদ গ্রামে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও সর্ববিধ কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবে, গ্রাম-রক্ষীবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করিবে এবং গণ-আদালত গঠন করিয়া বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করিবে।

২. পাক-জঙ্গীশাহী সরকারকে দেয়া খাজনা, ট্যাক্স, ঋণ ও সুদ পরিশোধ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখিতে হইবে।

৩. যাহারা অতিরিক্ত মুনাফার আশায় প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্য মজুদ রাখিবে গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ তাহাদের সেই উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য

বাজেয়াপ্ত করিয়া গরিব জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

৪. গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ গ্রামে গরিব জনসাধারণের উপর নিপীড়নমূলক মহাজনি ব্যবস্থা বন্ধ করিবে।

৫. (ক) যাহারা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সহিত কোনো প্রকার সহযোগিতা সাহায্য প্রদান করিবে অথবা চর হিসাবে কাজ করিবে গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ তাহাদের কঠোরতম শাস্তি প্রদান করিবে এবং তাহাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিবে।

(খ) যে সকল জোতদার জাতীয় মুক্তির স্বপক্ষে থাকিবে তাহাদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের উপর জোতদারের পূর্বতন শোষণ লাঘব হয়।

৬. বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক বাস্তুহারা হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ তাহাদের যাবতীয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিবে।

৭. যথোপযুক্ত বিলিবণ্টন, উৎপাদন বৃদ্ধি, কেনা-বেচা, কুটির শিল্পের বিকাশ সাধন প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রাম এলাকায় আত্মনির্ভরশীল স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইবে পারস্পরিক সাহায্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা (mutual aid and mutual cooperation)।

৮. শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জাতীয় ভাবধারা সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রচলিত শিক্ষা ও কলুষিত সাংস্কৃতিক রীতিনীতি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে।

৯. (ক) গ্রামে গ্রামে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র ও অন্যান্য জঙ্গী তরুণদের সমবায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেরিলা দল গঠন করিতে হইবে। এই গেরিলা দল সুযোগ ও সুবিধামতো বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত শত্রুকে খতম ও ক্ষতিসাধন করিবে এবং শত্রুর অস্ত্র কাড়িয়া নিয়া নিজেদের অস্ত্রবল বৃদ্ধি করিবে।

(খ) হানাদারবাহিনী বাংলাদেশের মাটিতে যাহাতে নির্বিঘ্নে চলাফেরা,

অস্ত্রশস্ত্র, রসদপত্র সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে না পারে এবং নির্বিবাদে শাসন ও শোষণ চালাইতে না পারে, তাহার জন্য সকল প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সরবরাহ লাইন ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করিতে হইবে।

(গ) গেরিলাদের জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জনের জন্য

–জনগণকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে।

–জনগণকে সাহায্য করিতে হইবে।

–জনগণকে রক্ষা করিতে হইবে।

(ঘ) গেরিলা দল সামরিক দায়িত্ব সম্পাদনের সাথে সাথে জনগণের মধ্যে জাতীয় মুক্তির স্বপক্ষে রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলনও চালাইবে।

(ঙ) যে সকল ব্যক্তি হানাদার পাক সরকার ও পাকবাহিনী অথবা তাহাদের এজেন্টদের সহিত স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক অথবা যে কোনো প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করিবে তাহারা জাতীয় শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে। পূর্ণ তদন্ত করিয়া সমষ্টিগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তাহাদের খতম অথবা যে কোনো প্রকার শাস্তি প্রদান করা হইবে।

১০. যাহারা জনগণের মনোবল নষ্ট করিবার জন্য গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনো প্রকার প্রচারকার্য চালাইবে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১১. যাহারা জনগণের দুরবস্থার সুযোগে ডাকাতি, গুণ্ডামি ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত, গণ-মুক্তি পরিষদের মাধ্যমে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১২. যাহারা মুক্তিসংগ্রামকে বিভক্ত ও বিপর্যস্ত করিবার জন্য কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকলাপ, উস্কানি অথবা প্রচারণা করিবে তাহাদের কঠোরতম শাস্তি প্রদান করা হইবে।

১৩. শহরাঞ্চলে শত্রুকে বিপর্যস্ত ও ব্যস্ত রাখিবার জন্য 'আঘাত করো ও সরে পড়ো' নীতির ভিত্তিতে গেরিলা তৎপরতা চালাইতে হইবে।

১৪. সর্বস্তরের জনগণকে জঙ্গীশাহীর প্রশাসনিক ও সকল প্রকার ব্যবস্থার

সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিতে হইবে।

১৫. বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণির প্রতি তাহাদের পূর্ব ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির অচলাবস্থা অব্যাহত রাখিবার উদাত্ত আহ্বান সমন্বয় কমিটি জানাইতেছে।

এই সমন্বয় কমিটি ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সংগঠনের কর্মীদের প্রতি এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব জনগণের সহিত থাকিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতেছে। এই সমন্বয় কমিটির বহির্ভূত যাহারা অনুরূপভাবে বাংলার মুক্তিসংগ্রামে কাজ করিয়া যাইতেছে বা ভবিষ্যতে করিবে তাহাদের সহিত পরিপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে উপরোক্ত দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতে হইবে।

আমাদের ঘোষণা

এই পরিস্থিতিতে আজিকার এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ও জনগণের প্রতি গভীর দায়িত্ববোধের কথা স্মরণ রাখিয়া 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' বাংলাদেশের এবং পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী মানুষের নিকট দৃঢ়তার সহিত নিম্নোক্ত ঘোষণা পেশ করিতেছে :

* সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর সেবাদাস পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট জঙ্গী শাসকচক্রের হানাদারবাহিনী গণহত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ ও ব্যাপকভাবে নাগরিক বিতাড়নের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিবার যে সুপরিকল্পিত অভিযান চালাইতেছে তাহা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করিয়া 'স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করিবার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করিতেছে।
* এই সমন্বয় কমিটি বাংলাদেশে যে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম চলিতেছে তাহাকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার জন্য বলিষ্ঠ শপথ গ্রহণ করিতেছে এবং যাহারা অসীম সাহসিকতার সহিত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া এই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতেছেন তাহাদের সহিত একাত্মতা ঘোষণা করিতেছে ও তাহাদের প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জ্ঞাপন

করিতেছে।

* সমন্বয় কমিটি সকল প্রকার দেশি-বিদেশি আপোসমূলক চক্রান্তকে প্রতিহত করিবার শপথ গ্রহণ করিতেছে এবং সুস্পষ্ট ঘোষণা করিতেছে যে, বাংলাদেশের মাটি হইতে হানাদার বাহিনী নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম থামিবে না। প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য এবং প্রকৃত জাতীয় মুক্তির জন্য বাংলাদেশের জনগণ রক্ত দিয়াছে, দিতেছে ও ভবিষ্যতেও দিবে।
* বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে যাহারা শহীদ হইয়াছেন, যাহারা লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হইয়াছেন, সর্বস্ব হারাইয়াছেন, এই সমন্বয় কমিটি তাহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে। যাহারা চরমভাবে নির্যাতিত হইয়া শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন, এই সংস্থা মুক্ত স্বাধীন পরিবেশে তাহাদের নিরাপদ পুনর্বাসনের জন্য সংগ্রামের সংকল্প ঘোষণা করিতেছে।
* বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুবক, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মোজাহিদ এবং সকল স্বেচ্ছা-সৈনিকরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতেছেন, এই সমন্বয় কমিটি তাহাদের প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে।
* বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রতি এবং বাস্তুহারা শরণার্থীদের প্রতি ভারতীয় জনগণ বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয়ের জনগণ যে সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছেন তাহার জন্য এই সমন্বয় কমিটি তাহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।
* এই সমন্বয় কমিটি সিন্ধি, বালুচ, পাঠান, পাঞ্জাবি জনগণ বিশেষ করিয়া শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি জনগণের নিকট পাকিস্তানি ফ্যাসিস্ট জঙ্গী শাসকচক্রের বাংলাদেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের স্বপক্ষে তীব্র গণআন্দোলন গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইতেছে।
* এই সমন্বয় কমিটি বিশ্বের সকল স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিকট বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে

সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার আবেদন জানাইতেছে। অফুরন্ত জনবল আমাদের রহিয়াছে, প্রয়োজন অস্ত্র, অর্থ, রসদ, ঔষধপত্র ও নৈতিক সমর্থন।
* এই সমন্বয় কমিটি বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিসংগ্রামরত সকল শক্তির সহিত সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করিয়া জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছে।
* এই সমন্বয় কমিটি বাংলাদেশের আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল, শ্রেণি-সংগঠন ও গণ-সংগঠন এবং ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিক জনগণকে 'জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট' গঠন করিয়া গণ-যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা ও বাংলাদেশের মাটি হইতে উৎখাত করিবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাইতেছে। এই সংস্থা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, যেহেতু জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমগ্র জনতার লড়াই, সেই জন্য সমগ্র জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক একটি সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মুক্তিফ্রন্টই তাহাকে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত বিজয়ের পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

বাংলার সংগ্রামী জনতা!

সারা বাংলাদেশব্যাপী মরণপণ যুদ্ধ চলিতেছে, স্বাধীনতার যুদ্ধ। লাঞ্ছিত জাতির অপমান মোচনের, পরাধীন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের এই জীবন-মরণ লড়াইয়ে আমরা সকলেই শরিক হইয়াছি। বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধের ক্ষান্তি নাই, শ্রান্তি নাই। যে দস্যুর দল আমাদের পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, পুত্র-কন্যাকে হত্যা করিয়াছে, মা-বোনের সম্ভ্রম বিনষ্ট করিয়াছে, আসুন, আমরা তীব্র প্রতিহিংসার জ্বালা ও ঘৃণা নিয়া সেই দস্যুর উপর সশস্ত্রভাবে ঝাঁপাইয়া পড়ি। তাহাকে খতম করি। রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করি। আমাদের যুদ্ধ ন্যায়ের যুদ্ধ। তাই জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। পাকিস্তানি হানাদার দস্যুর পরাজয় অনিবার্য। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই।

-স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
- জনতার সশস্ত্র বিপ্লব জিন্দাবাদ
বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি
১ জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ১৬ ডিসেম্বরের (১৯৭১) বিবৃতি

বাংলাদেশ আজ সম্পূর্ণরূপে পাকিস্তানের হানাদার দস্যুদের হিংস্র কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। বাংলার মাটিতে পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর চরম পতন ঘটিয়াছে। বাংলার সকল মুক্তিযোদ্ধা ও সংগ্রামী জনতাকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। যে অগণিত শহীদ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও দেশপ্রেমের মহান আদর্শের জন্য আত্মাহুতি দিয়া জনগণের মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাদিগকে আমরা স্মরণ করিতেছি পরম শ্রদ্ধাসহকারে। প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তাহারা চিরশ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়া থাকিবেন। ভারতের যে মহান জনগণ বাংলাদেশের সংগ্রামে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করিয়াছেন, আমরা পুনর্বার তাহাদের সহিত আমাদের একাত্মতা ঘোষণা করিতেছি। ভারত সরকার যে শরণার্থীদের আশ্রয়দান, বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যদান করিয়াছেন, সেইজন্য আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এইবারের সংগ্রামের মধ্য দিয়া বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণের মধ্যে যে মহান সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে, সর্বপ্রকার শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাহা চির অটুট থাকিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। আমরা আনন্দিত এই কারণে যে, ভারত সরকার পাক হানাদারবাহিনীকে খতম করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেও সে বারংবার ঘোষণা করিয়াছে যে, বাংলাদেশের উপর প্রভুত্ব করিবার অথবা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সৈন্য রাখিবার কোনো ইচ্ছাই তাহার নাই। জাতি-ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠিয়া দুই প্রতিবেশী দেশ পরস্পরের সার্বভৌমত্ব, মর্যাদা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণভাবে সহ-অবস্থান করিবে ইহাই আমাদের কাম্য। কোনো প্রকার উস্কানি, সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার দেশি-বিদেশি দালালদের কোনো প্রকার প্ররোচনার দ্বারা যেন দুই দেশের জনগণের মধ্যকার মৈত্রী ও বন্ধুত্বে ফাটল ধরিতে না পারে, সেদিকে আমাদের সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেননা এখনও সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত বিভিন্নভাবে অব্যাহত রহিয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ ভারত সরকারের একাধিকবার

সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও দুই দেশের সম্পর্ককে বাংলাদেশের উপর ভারতের প্রভুত্ব বিস্তারের দিকে লইয়া যাইতে চাহিতেছে। অপরদিকে আবার তাহাদেরই এক অংশ বাংলাদেশের ভিতরে ও বাহিরে মুসলমানদের স্বাধীনতা বিপন্নের জিগির তুলিয়া জাতিগত বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে। দুই দেশের সমগ্র জনগণকে একাট্টাভাবে এই সকল ষড়যন্ত্রকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে হইবে। ষড়যন্ত্রের শেষ এখানেই নহে। ইয়াহিয়ার দালাল জামাত, মুসলিম লীগের সমর্থক বদর বাহিনী, রাজাকার বাহিনীর অনেকে সশস্ত্রভাবে আত্মগোপন করিয়া বিভিন্ন ধরনের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে ব্যস্ত রহিয়াছে। অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালালরাও বিভিন্ন কৌশলে জনগণের বিপ্লবী জোয়ারকে ভিন্নপথে পরিচালিত করিয়া জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মূল লক্ষ্যকে নস্যাৎ করিতে চাহিতেছে। এই সকল ষড়যন্ত্রকে এই মুহূর্তে নির্মূল করিয়া দিতে হইবে। কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রমূলক বিভেদাত্মক কার্যকলাপ যাহা শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ ও কায়েমি স্বার্থবাদীদের পক্ষে আসিবে, তাহার বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক সংগঠনসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে তাহাকে প্রতিহত করিতে হইবে।

বাংলাদেশের আজিকার নতুন প্রেক্ষাপটে যখন বিভিন্ন ধরনের দেশি-বিদেশি চক্রান্ত চলিতেছে, তখন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং তাহার সঠিক মূল্যায়ন জনগণের চেতনার মধ্যে রাখা একান্তই আবশ্যক। দুনিয়ার মানুষের জানি দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা পালন করিয়াছে। ভিয়েতনামসহ পৃথিবীর সর্বত্র যাহারা জল্লাদের ভূমিকা পালন করিয়া আসিয়াছে, তাহারা এক্ষেত্রে জল্লাদ ইয়াহিয়াকেই সাহায্য করিয়াছে। তাহার পর বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার চরম পতনের মুহূর্তে বঙ্গোপসাগরে ৭ম নৌবহর আনয়ন করিয়া আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে, পরিস্থিতিকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুত ভারত মহাসাগরে এখন বৃহৎ শক্তিবর্গের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে। ৭ম নৌবহর প্রত্যাহার এবং ভারত মহাসাগরকে নিরপেক্ষ এলাকা হিসাবে বিবেচিত করিবার জন্য বিশ্বের দরবারে সক্রিয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আমাদের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। আর তাহার ব্যতীতও আমাদের সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে

যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ছাড়া কোনো জাতীয় মুক্তিই অর্জিত হইতে পারে না, জাতীয় স্বাধীনতাও রক্ষা করা যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এবং আমাদের নিজের দেশের অভিজ্ঞতাও তাহাই বলে। এই ব্যাপারে সরকারের সজাগ হওয়া উচিত এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা আমাদের কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে চীন সম্পর্কে আলোচিত হওয়া দরকার। গণচীন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। চীন এক সুমহান সুদীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়া তাহার নিজের দেশকে মুক্ত করিয়াছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে চীনই সর্ব প্রথম আগাইয়া আসিয়াছে। তাই আমাদের দেশের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আশা করিয়াছিল যে, জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামে গণচীনকে তাহারা বন্ধু হিসাবে দেখিতে পাইবে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাহার ভূমিকার ফলে জনগণ নিরাশ হইয়াছেন। চীন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সর্বদাই ভারতের হস্তক্ষেপের সঙ্গে এক করিয়া মিলাইয়া দেখিয়াছে। নীতিগতভাবে আমরাও মনে করি যে, বিপ্লব কোনো দেশে আমদানি করা যায় না, জাতীয় মুক্তি অপর রাষ্ট্রের হাত দিয়া পাওয়া যায় না, বরং বিদেশি হস্তক্ষেপ মুক্তিসংগ্রামকে আরও জটিল করিয়া তোলে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে জনগণের বহু বৎসরের পুরনো জাতীয় ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস, তাহার জাতীয় স্বাধীনতার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, একটি শক্তিশালী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তাহার অসীম বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র লড়াই এবং পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠীর অস্ত্রের জোরে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অভ্যন্তরে রাখিবার অবাস্তব পরিকল্পনা, সেই ফ্যাসিস্ট সরকারের চরম পৈশাচিক বর্বরতা ইত্যাদি সব কিছুকে বাদ দিয়া একপেশে চিন্তা ও বিশ্লেষণ সঠিক নয়। আমরা আশা করি, গণচীন তাহার নীতির পুনর্মূল্যায়ন করিবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সকল চক্রান্তকে নস্যাৎ করিবার জন্য বাংলাদেশের বিপ্লবী জনতার পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে। কারণ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সাম্রাজ্যবাদ সকলের সাধারণ ও এক নম্বরের শত্রু।

আজ হইতে আমাদের জাতীয় জীবনে এক নতুন যুগ শুরু হইয়াছে। এই যুগ হইল স্বাধীনতা রক্ষা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার এক কঠিন সংগ্রামের যুগ। পুরনো কায়েমি স্বার্থের বদলে যাহাতে নতুন করিয়া

কোনো কায়েমি স্বার্থের জন্ম না হইতে পারে, সেইজন্য আজ হইতে নতুন করিয়া নতুন সংগ্রামের সূচনা হইয়াছে। একটি দেশের বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করিবার এক দুরূহ কঠিন কাজ আমাদের সম্মুখে। ধনবাদী পথে বাংলাদেশের নতুন জাতীয় অর্থনীতিকে সবল ভিত্তিতে গঠন করা সম্ভব নহে। আজ প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া নতুন ধরনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা। আজ প্রয়োজন সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদী, আধা-ঔপনিবেশিক ও বিদেশি অর্থনৈতিক শোষণের সম্ভাবনাকে অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে বিনষ্ট করা, সামন্তবাদী অর্থনীতিকে চির অপসারিত করা, আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়িয়া তোলা, মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করা, একটি স্বাধীন সমৃদ্ধশালী উন্নতিশীল সমাজ গড়িয়া তোলা। বাংলাদেশের এই নতুন সমাজ গড়িবার জন্য এই মুহূর্তে যাহা সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাহা হইলো দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে অস্বাভাবিক অবস্থা চলিয়াছিল, এবং ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়া এখনও যাহার রেশ এদিক-সেদিক রহিয়া গিয়াছে, তাহার অবসান করা, ব্যাপক গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা চালু করা। সাম্প্রদায়িক, জাতিগত, ভাষাগত, দলগত অথবা ব্যক্তিগত কারণে খুন-জখম, বিনা বিচারে বা ব্যক্তিগত বিচারে প্রাণনাশ, সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার অবর্তমানে লুটতরাজ, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণ ইত্যাদি এই মুহূর্তে বন্ধ করিবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা মনে করি, সরকারকে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে যাহা আমাদের অবশ্য করণীয় তাহা হইল, ব্যাপক রিলিফের ব্যবস্থা করা, শিল্প-কলকারখানা দ্রুত চালু করা, শ্রমিক ও কর্মচারীদের পূর্ব কাজে নিয়োগের ও চাকুরির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, গ্রামের কৃষক ও গরিব কৃষকদের জন্য সরকারকে দেয়া পূর্বের সকল ঋণ ও খাজনা বাতিল করিয়া দেয়া, যে সকল জাতীয় শত্রুর জমি বাজেয়াপ্ত করা হইবে তাহা গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা, খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য মজুত রাখা বন্ধ করা ও জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা।

আজকের এই মুহূর্তে আমাদের যে বিশেষ কয়েকটি কাজ রহিয়াছে, তাহার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের এবং সমগ্র জনগণের একতার প্রয়োজনীয়তা পূর্বের চাহিতেও বেশি। সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্র ও

ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রতিহত করা, স্বাভাবিক অবস্থার প্রবর্তন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং প্রাথমিক অর্থনৈতিক জীবন চালু করিবার জন্য সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার কাজে আমরা সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছি। সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের যে সকল গণকমিটি গঠিত হইবে, তাহাতে সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল ও মতের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের কর্মীদিগকে এই প্রাথমিক গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা, জনগণের মধ্যে ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং এই ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছি।

বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত)
কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি
পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি
শ্রমিক কৃষক কর্মী সংঘ
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (হাতিয়ার)
পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট সংহতি কেন্দ্র (নজরুল ইসলাম পরিচালিত)
পূর্ব বাংলা কৃষক সমিতি
পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন
বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন
পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন
পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ও বামপন্থীদের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

উপক্রমণিকা

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের মানুষকে সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। ৩০ লক্ষ আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে জীবন উৎসর্গ করতে হয়, আর ২ লক্ষ নারীকে দিতে হয় সম্ভ্রম। দেশবাসীকে পরিচালনা করতে হয় উদ্দীপ্ত ও সুদৃঢ় ঐক্যের ওপর দাঁড়িয়ে পরিচালিত এক মহান জনযুদ্ধ। হানাদার-দখলদার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে চালাতে হয় বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র সংগ্রাম। সে সংগ্রাম হয়ে ওঠে সমগ্র জাতির মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধে এ ভূখণ্ডের মানুষের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সক্রিয় সমর্থন-সহযোগিতা দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং একইসঙ্গে ভারতকে সাহস জোগায়, তার ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইতিবাচক পরিণতি লাভ করতে সক্ষম হয়। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের নানাবিধ সহযোগিতা মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে বিকশিত করে অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর করতে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে।

মুক্তিযুদ্ধের মর্মকথা

মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম, সেটিই হলো 'মুক্তিসংগ্রাম'। মুক্তিসংগ্রামের ধারায় যে যুদ্ধ তা-ই হলো 'মুক্তিযুদ্ধ'। মুক্তির সে প্রত্যাশা হতে পারে জাতীয় মুক্তির জন্য এবং হতে পারে অর্থনৈতিক-সামাজিক মুক্তির জন্যও। অর্থনৈতিক-সামাজিক মুক্তির সাথে সম্পর্কিত বিষয় হলো সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি। জাতীয় মুক্তির বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রসঙ্গটি হলো ঔপনিবেশবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল থেকে মুক্তির প্রশ্ন। মুক্তিসংগ্রাম হিসেবে জাতীয় মুক্তির বিষয় ও অর্থনৈতিক-সামাজিক মুক্তির বিষয়– এই দুই বিষয়ের মধ্যে একটি স্বাভাবিক আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এই দুই উপাদানই প্রযুক্ত ছিল। তবে, তা ছিল মূলত জাতীয় মুক্তির জন্য

বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক সংগ্রাম।

জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পটভূমিতে জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারা সূচিত হয়। এদিকে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত 'অসম বিকাশের সূত্রের' কারণে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো অধিক সম্পদশালী হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। দুর্বল জাতিগুলোর উপর তারা জাতিগত শোষণ চালানোর সুযোগ পায় এবং এভাবে আরো সম্পদশালী হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। এরূপ জাতিগত শোষণের ক্রমপ্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র অর্জন করে। বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জন্ম নেয় একদিকে কেন্দ্রস্থিত উন্নত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং অন্যদিকে এই ব্যবস্থার প্রান্তস্থিত অবস্থানে নিক্ষিপ্ত হয় অসংখ্য রাষ্ট্র। তাদের উপর জাতিগত শোষণ ঔপনিবেশিক আকার গ্রহণ করে। পৃথিবীর আরো অনেক দেশের মতো বাংলাদেশসহ গোটা অবিভক্ত ভারতবর্ষ এই সাম্রাজ্যবাদী-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় পরাধীনতার শৃঙ্খলে আটকা পড়ে যায়। পরাধীনতার এই শৃঙ্খল ভাঙার প্রয়াসে ভারতব্যাপী যে সংগ্রাম গড়ে ওঠে, তা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। ভারতের অন্তর্ভুক্ত বাঙালি জাতি সেই সংগ্রামের অন্যতম শরিক হিসেবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রভাগে থেকে লড়াই করেছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সেই সংগ্রাম যথার্থভাবেই বাঙালির সুদীর্ঘ মুক্তিসংগ্রামের একটি বলিষ্ঠ ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সেই পর্বের মুক্তিসংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ও অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রামে বাংলার অগ্রণী অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ বেনিয়ার কবল থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করলেও, সেই 'স্বাধীনতার' ভেতর দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষ নতুন করে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আটকা পড়ে যায়। ভৌগোলিক সংযোগবিহীন পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলাকে জুড়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে অবৈজ্ঞানিকভাবে এক কৃত্রিম রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়। শ্রেণি-শোষণ, জাতিগত শোষণ, বৈষম্য, জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতন-নিপীড়ন চাপিয়ে দেওয়া হয় পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর। তার বিরুদ্ধেই সংগঠিত হয় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধ কেবল নয় মাসের 'সামরিক অভিযান' ছিল না। তা কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনও ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাংলাদেশের মানুষের

হাজার বছরের ধারাবাহিক বহুমাত্রিক লড়াইয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়। মুক্তিযুদ্ধ ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লড়াই। সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তীব্র চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ভিন্নতর একটি গণতান্ত্রিক প্রগতিবাদী আদর্শের ভিত্তিতে নতুন রাষ্ট্র বিনির্মাণই ছিল মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য। সব ধরনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক শোষণ-বৈষম্য-আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে প্রগতিশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা। সেজন্য মতাদর্শিক লড়াইয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষকে বহুদিন ধরে তীব্র রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক লড়াই করতে হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিবেচিত হয়েছে 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম' হিসেবে। সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রচলিত প্রতিক্রিয়াশীল সমাজকে নাকচ করে দিয়ে নতুন চিন্তা-দর্শনের ভিত্তিতে নতুন রাষ্ট্র বিনির্মাণের মাধ্যমে, মুক্তিযুদ্ধ জাতীয়তাবাদের প্রগতিশীল ধারাকে বিকশিত করার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ, প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজের প্রেরণা জোগায়। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্রের ধারায় অগ্রসর হওয়া। স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধের চার ভিত্তি হিসেবে তাই নির্ধারিত হয় গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র।

আদর্শিক কারণেই বাংলাদেশের মানুষের কাছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা আর সমাজতন্ত্রমুখীনতা ছিল দীর্ঘদিনের গণসংগ্রামের ধারায় গড়ে ওঠা একটি স্বাভাবিক বিষয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, কেবল বাংলাদেশের মানুষের কাছেই নয়, তৃতীয় বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণের কাছেই সমাজতন্ত্রের পথ হলো 'মুক্তি' লাভের পথ হিসেবে বিবেচিত। সমাজতন্ত্রের পীঠস্থান ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। তাই, আদর্শিক অবস্থানই পূর্ব বাংলার মানুষকে সমাজতন্ত্রের আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। তারা হয়ে ওঠে সোভিয়েতমুখী। মুক্তিযুদ্ধের মর্মবাণী উপলব্ধি করলেই বোঝা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের বন্ধন ছিল স্বাভাবিক ও অপরিহার্য।

সোভিয়েত ইউনিয়ন : জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্বাভাবিক মিত্র

১৯১৭ সালে কমরেড ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিনের নেতৃত্বে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তা একটি বড় ধরনের ভাঙন ঘটায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল বিশ্বের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর মধ্যে তুলনামূলক দুর্বলতম গ্রন্থি। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি ও সমাজ ছিল অগ্রসর ইউরোপীয় দেশসমূহ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় পশ্চাৎপদ। সে দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় তা অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর তোলপাড় করা প্রভাব সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে তার থেকে অগ্রসর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা তথা সমাজতন্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। শ্রেণি-শোষণের অবসানের পথ নির্দেশের পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন একই সাথে জাতিগত শোষণ-মুক্তির ঝাণ্ডাও সমুন্নত করে। জার-শাসিত রাশিয়ার নিপীড়িত জাতিসমূহ জাতীয় মুক্তির স্বাদ অনুভব করতে শুরু করে। জাতিসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাষ্ট্র এক নতুন গণতান্ত্রিক অধ্যায় সূচনা করে। সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করার এবং দেশে দেশে দৃঢ়ভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। শুধু ঘোষণা প্রদান করেই সে ক্ষান্ত থাকেনি। সেই অঙ্গীকার অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ় ও নীতিনিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতেও শুরু করে। এসব কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদের কাছে হৃদকম্পনের কারণ এবং পরাধীন জাতিসমূহের কাছে প্রেরণা ও ভরসার উৎস। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া হয়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী পরিচালিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের 'স্বাভাবিক মিত্র'।

আদর্শিক অবস্থানের কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ এবং জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মিত্র ও ভরসার শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষের পাশে অবস্থান নেয়। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নিপীড়িত জাতি পরিচালিত মুক্তিসংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বতোভাবে সহায়তা করতে থাকে। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ দখল করে উপনিবেশ স্থাপন করে নির্মমভাবে শোষণ করার সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার কারণে হুমকির মধ্যে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের

সহযোগিতায় দেশে দেশে মুক্তিসংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানায় সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব। সাম্রাজ্যবাদের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের এই বিরোধ সংকীর্ণ স্বার্থগত কোনো বিষয় থেকে উৎসারিত ছিল না, এটা ছিল এক আদর্শিক লড়াই। 'দুনিয়ার মজদুর ও নিপীড়িত জাতিসমূহ এক হও'– এই বজ্রনিনাদ নিয়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন বিশ্বকে কাঁপিয়ে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একের পর এক দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীন হতে থাকে। বিশ্বব্যাপী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। কবির ভাষায়, 'যেখানেই মুক্তির সংগ্রাম সেখানেই কমরেড লেনিন'। সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে ওঠে তৃতীয় বিশ্বের সংগ্রামরত মানুষের অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক বন্ধু। এই বন্ধুত্বের ভিত্তি ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের আদর্শগত অঙ্গীকার। সমাজতন্ত্রের আদর্শের কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্বাভাবিক মিত্র। তাই, সোভিয়েত ইউনিয়ন যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেরও মিত্র হয়ে উঠবে তা কিন্তু খুবই স্বাভাবিক এবং সেটিই ঘটেছিল।

বন্ধুত্বের বন্ধনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বেশ পুরনো। এ ভূখণ্ডের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন সব সময় সমর্থন দিয়ে তাকে নানাভাবে পরিপক্ব করে তুলতে আগাগোড়া সহায়তা করেছে। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তির জন্য ভারতব্যাপী গড়ে ওঠা আন্দোলন, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর নবপ্রেরণায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সোভিয়েতের মুক্তিবার্তা ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে নতুন জোয়ার এনে দেয়। গত শতাব্দীর বিশের দশকেই বাংলাদেশেও তার প্রভাব এসে লাগতে শুরু করে। স্বাধীনতাসংগ্রামীরা দলে দলে সোভিয়েতপন্থী হয়ে উঠতে থাকে।

১৯৪৭-এ দেশভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির পর সেই জাতীয় মুক্তি ও শোষণ মুক্তির সমঅভিমুখীন ধারা ও স্বাভাবিক নৈকট্য অব্যাহত থাকে। বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার নতুন পর্যায়ের সংগ্রামে তা আরো নতুন মাত্রা লাভ করে। নিজ দেশে ও সারা দুনিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল সাফল্য ও

আদর্শনিষ্ঠ ভূমিকা, বাঙালির স্বাধিকার সংগ্রামের প্রেরণা ও উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র, জাতীয় অধিকার, অসাম্প্রদায়িকতা ও প্রগতির জন্য প্রতিটি সংগ্রামে জনগণের মনের মাঝে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি মিত্র হিসেবে দৃঢ় অবস্থান অধিকার করে নেয়। শুধু রাজনীতি নয়, সমাজ-সংস্কৃতির সমগ্র প্রগতিমুখীন কর্মকাণ্ডে সে অনবদ্য প্রভাব ও অবদান রেখে চলে।

বাংলার প্রগতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চাকে চাঙা রাখার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশেষ ভূমিকা ছিল। '৫০ ও '৬০-এর দশক থেকেই সোভিয়েত ধ্রুপদী ও সমকালীন সাহিত্য প্রগতি প্রকাশনা থেকে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। সেসব প্রকাশনার বই এদেশের ব্যাপক সংখ্যক পাঠককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। প্রগতিবাদী ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এর ফলে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম বর্ধিত শক্তি অর্জন করে। ঢাকায় সোভিয়েত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 'উদয়ন' নামে একটি বাংলা পত্রিকা সেখান থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলাদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের অগ্রসর ও সক্রিয় অংশটি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিল। এই অংশের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। '৬৭ সালে এদেশে ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৫০তম বার্ষিকী পালিত হয়। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে তা গতিবেগ সঞ্চার করে। বাংলাদেশের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুত্ব ছিল নিপীড়িত জাতির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এক আদর্শিক বন্ধন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই বন্ধুত্বকে আরো দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করায়। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের পক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু বহু দূরের সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি অবশ্যই এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। রাজনীতির হিসাব-নিকাশের জন্য নয়, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের স্বপক্ষে তার আদর্শগত অবস্থানের কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সেদিন দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিচালিত হতো 'লেনিনীয়'

পথে। শান্তি, জাতীয় মুক্তি, সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, ন্যায়বিচার, বন্ধুত্বই যে পথের মর্মকথা। নীতিগত অবস্থানের কারণেই তাই বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রামের প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন একাত্তরে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার সোভিয়েত ইউনিয়ন

২৫ মার্চ রাতে বাংলাদেশের নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত মানুষের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী কামান ও ট্যাঙ্ক নিয়ে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করলে, এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে যে কয়টি দেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে তাৎক্ষণিক সোচ্চার প্রতিবাদ জানায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন তার অন্যতম। এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। আলোচনা ভেঙে দিয়ে ইয়াহিয়া ঢাকা ছেড়ে ইসলামাবাদে ফিরে যাবার পর প্রথম সুযোগেই এবং বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু হওয়ার ৫৬ ঘণ্টার মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের একটি নিন্দা-বার্তা নিয়ে ২৮ মার্চ ইসলামাবাদে ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত।

ঢাকায় গণহত্যার ঘটনাকে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে বর্ণনা করে, এ নিয়ে তাদের কিছু বলার নেই বলে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেয়। কিন্তু গণহত্যার সরাসরি নিন্দা করে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেদের অবস্থান ব্যক্ত করে। ২৫ মার্চের পর থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের দূরত্ব বাড়তে থাকে।

২ এপ্রিল সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগোর্নি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে কড়া ভাষায় একটি চিঠি লেখেন।

চিঠিটি নিম্নরূপ :

"মাননীয় প্রেসিডেন্ট, ঢাকার আলোচনা ভেঙে যাওয়ার খবর এবং সামরিক প্রশাসন চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন মনে করে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে সামরিক বলপ্রয়োগ করেছে সে সংক্রান্ত খবর সোভিয়েত ইউনিয়নে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করেছে।

এই ঘটনার ফলে পাকিস্তানের অগণিত মানুষের প্রাণহানি, নিপীড়ন ও দুঃখ-

কষ্টের খবরে সোভিয়েতের জনগণ বিচলিত না হয়ে পারে না। শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বন্দি ও নির্যাতন করায়ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এই নেতারা সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সন্দেহাতীত সমর্থন লাভ করেছিলেন। সোভিয়েত জনগণ সর্বদাই পাকিস্তানের মানুষের মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনা করেছে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের জটিল সমস্যার সমাধানে তাদের সফলতায় আনন্দিত হয়েছে।

পাকিস্তানের জনগণের কঠিন পরীক্ষার দিনে খাঁটি বন্ধু হিসেবে আমরা দু-একটি কথা না বলে পারি না। আমরা বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানে বর্তমানে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, বলপ্রয়োগ না করে রাজনৈতিকভাবে তার সমাধান করা যায় এবং করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে দমননীতি ও রক্তপাত যদি চলতে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে সমস্যার সমাধান আরও কঠিন হয়ে উঠবে এবং তাতে পাকিস্তানের সব মানুষের মৌল স্বার্থেই বিরাট ক্ষতি হবে। মাননীয় প্রেসিডেন্ট মহাশয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ (কর্তৃপক্ষ) সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে আপনাকে কিছু বলা, আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য, সেখানকার মানুষের ওপর নিপীড়নের অবসান ঘটানোর জন্য এবং সমস্যা সমাধানের একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায় উদ্ভাবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানের সব মানুষের স্বার্থ এবং সে অঞ্চলের শান্তি রক্ষার স্বার্থ এর ফলে রক্ষিত হবে।

উদ্ভূত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানকে সমগ্র সোভিয়েত জনগণ সন্তোষের সঙ্গে গ্রহণ করবে।

আপনাকে আবেদন জানানোর সময় আমরা মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণার লিপিবদ্ধ সর্বজনস্বীকৃত মানবিক নীতির দ্বারা এবং পাকিস্তানের বন্ধু জনগণের কল্যাণের জন্য উদ্বেগের দ্বারা পরিচালিত হয়েছি।

প্রেসিডেন্ট মহাশয়, আপনাকে এই অনুরোধ জানাতে আমরা কোন নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছি, আশা করি আপনি তা সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন। আমাদের একান্ত কামনা যে অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক।"

ক্রেমলিন, মস্কো, ২ এপ্রিল ১৯৭১; চিঠিটি ৪ এপ্রিল ১৯৭১-এ প্রাভদায় প্রকাশিত হয়।

জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানের গণহত্যা চালানোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ অব্যাহত রাখে। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সময়োপযোগী ভূমিকা, পাকিস্তানি সেনাদের অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা বাংলাদেশের জনগণের মনোবল চাঙা করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এরপর থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাষ্ট্রটি ক্রমাগত তার অবস্থান শক্তিশালী করতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্বে পালন করে ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায় : পাকিস্তানের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের দূরত্ব বৃদ্ধি

স্নায়ুযুদ্ধের কালে দক্ষিণ এশিয়ার শান্তির স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর, সোভিয়েত ইউনিয়নের চেষ্টায়ই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে 'তাসখন্দ শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। পাকিস্তান মার্কিন শিবিরের অধিকতর ঘনিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাথমিক প্রয়াস ছিল পাকিস্তান সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানে গৃহীত সামরিক কৌশল থেকে ফিরিয়ে এনে সংকটের শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানে উৎসাহিত করা।

প্রকৃতপক্ষে ২৫ মার্চের পরই সোভিয়েত ইউনিয়নের মনোভাব বদলে যেতে শুরু করে। পাকিস্তান সামরিক বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রাখলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের গোপন চীন সফর তথা চীন-মার্কিন গোপন আঁতাত সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই অবস্থানকে আরো দৃঢ় করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করতে গিয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে

ভারসাম্যমূলক নীতি থেকে সরে আসে।

১২ এপ্রিল ১৯৭১ ক্রেমলিনে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত জামশেদ মার্কারকে ডেকে পাঠান, উপমহাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে পাঠানো এক বার্তায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন সংকটের সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর 'আইনসম্মত অভিপ্রায়' পূরণের ওপর। স্পষ্টতই, এটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়ার জন্য পাকিস্তানের প্রতি কূটনৈতিক ভাষায় প্রদত্ত একটি আহ্বান।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত জামশেদ মার্কার ১৯৭১ সালের ২২ জুন ক্রেমলিনে প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কোসিগিন মার্কারকে বলেন–

"পাকিস্তানের কৃষক অত্যন্ত রক্ষণশীল, নিজের জমি ও গ্রাম তার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তা ছাড়া সে খুব ভালো করেই জানে, ভারত কোনো স্বর্গরাজ্য নয়। তারপরও নিজের জীবনের হুমকি আছে জেনেই, তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

আপনারা কীভাবে বিশ্বের মানুষের সহানুভূতি আশা করেন, যখন লাখ লাখ মানুষ ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে এবং পালানোর সময় গুলিতে নিহত হচ্ছে? আপনার প্রেসিডেন্ট শান্তির পক্ষে অনেক কথা বলেছেন, তা সত্ত্বেও মানুষ ভারতে পালাতে বাধ্য হচ্ছে। ভারতে খাদ্য ও বাসস্থানের সমস্যা রয়েছে, তারপরও তারা সেখানে ছুটছে। এমন একটা অবস্থাকে কি স্বাভাবিক বলা যেতে পারে? এর অর্থ হলো, হয় কর্তৃপক্ষ অবস্থা সামাল দিতে পারছে না, নয়তো সত্য গোপন করছে। আমাদের দেশের মানুষ ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।"

সোভিয়েত ইউনিয়ন অক্টোবর পর্যন্ত পাকিস্তানকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিয়ে একটি রাজনৈতিক সমাধানের পথে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অপর দিকে পাকিস্তান পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্তে সেনা সমাবেশ সম্পন্ন করে। পাকিস্তানের আগ্রাসী মনোভাব ও তৎপরতার কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে পাকিস্তানের দূরত্ব ক্রমশ আরো বৃদ্ধি পায়।

শরণার্থীদের পাশে সোভিয়েত ইউনিয়ন

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে দিশেহারা হয়ে বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি আবালবৃদ্ধবনিতা ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। ভারতের সরকার ও জনগণ সাধ্যমতো আশ্রয় ও সাহায্য দেয়। শরণার্থীদের জন্য খাদ্যশস্য, পোশাক, ঔষধসহ জরুরি জিনিসপত্র নিয়ে এগিয়ে আসে সোভিয়েত ইউনিয়ন। নিজেরা সাহায্য করার পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর ত্রাণকাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রচারাভিযান পরিচালনা করে।

জুনের মাঝামাঝি সময় থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিমানযোগে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবির থেকে শরণার্থীদের মধ্যপ্রদেশের মানা'য় স্থাপিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নিতে সাহায্য করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে শরণার্থীদের জন্য ঔষধসহ নানা জরুরি সামগ্রী পাঠানো হয়। সে দেশের বিভিন্ন গণসংগঠন পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের জন্য সহায়তা কার্যক্রমকে সে দেশের ব্যাপক মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাধারণ মানুষও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন গণসংগঠন

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন গণসংগঠন প্রচারাভিযান পরিচালনা করে। প্রচারাভিযানে শামিল হয় সোভিয়েত শান্তি কমিটি, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, সোভিয়েত-আফ্রো গণসংহতি কমিটি, সাংবাদিক ইউনিয়ন, নারী কমিটি, রেডক্রস, শিশুদের সংগঠন পাইওনিয়ার অর্গানাইজেশন, যুব সংগঠন কমসোমলস্কায়া প্রভৃতি গণসংগঠনসমূহ। সোভিয়েত শান্তি কমিটির এক বিবৃতিতে বলা হয়–

"শান্তি রক্ষার স্বার্থে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছা, আইনসঙ্গত অধিকার ও স্বার্থকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে উদ্ভূত সমস্যাবলির রাজনৈতিক সমাধান অর্জনের জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।"

সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের এক বিবৃতিতে বলা হয়-

"পাকিস্তানের শ্রমজীবী জনগণের গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহের জন্য,

উপনিবেশবাদীদের জোয়ালের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য এবং সমাজ প্রগতির জন্য তাদের সংগ্রামে, আন্তর্জাতিক সংহতির প্রতি বিশ্বস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ সর্বদাই পাকিস্তানের শ্রমজীবী জনগণের পক্ষ নিয়েছে।"

সোভিয়েত আফ্রো-এশীয় গণসংহতি কমিটির এক বিবৃতিতে বলা হয়–

"বিশ্বজনমতের প্রতি কর্ণপাত করার এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছা, অধিকার ও আকাঙ্ক্ষার কথা বিবেচনায় নিয়ে রাজনৈতিক উপায়ে সমস্যাটির একটি ন্যায্য সমাধানের সম্ভাবনা খুঁজে বের করতে হবে, আর সেটাই হবে আফ্রো-এশীয় গণসংহতির উদ্দেশ্য ও নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।"

পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করে ৪ অক্টোবর ১৯৭১ সোভিয়েত নারী কমিটির এক বিবৃতিতে বলা হয়–

"পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতিশোধস্পৃহা, মানবাধিকার পায়ে মাড়ানো ও গণতন্ত্রের মৌলিক নীতি লঙ্ঘনের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৯০ লাখ মানুষ নিজ ভিটা ছেড়ে অন্য দেশে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হয়েছে। গৃহহীন ও জীবিকা অর্জনের উপায়হীন এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে অনাহার ও মহামারীতে মৃত্যুর হুমকির সম্মুখীন করে হতাশার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের বহু প্রগতিশীল ব্যক্তির ওপরেও প্রতিহিংসামূলক উৎপীড়ন চালানো হচ্ছে।"

সোভিয়েত রেডক্রস এক বিবৃতিতে মানবিক নীতিসমূহ অনুসরণ করে ক্রমাগত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা ও মানবিক নৈতিকতার সর্বজনস্বীকৃত মানগুলিকে নগ্নভাবে লঙ্ঘন করার জন্য ক্ষুব্ধ ঘৃণা প্রকাশ করে।

সোভিয়েত যুব সংগঠনগুলির কমিটি ও ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে আইনসম্মত অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ও যুব সমাজের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপন করা হয়।

পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রের মানবিক মূলনীতির স্থূল লঙ্ঘনের তীব্র প্রতিবাদ জানায় সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসংঘ বিষয়ক সমিতি।

৩ অক্টোবর মস্কোর তুরুরূপ ময়দাকলের শ্রমিক ও অফিস কর্মচারীরা পূর্ব

পাকিস্তানে নিপীড়নের প্রতিবাদে এক সভার আয়োজন করেন।

৫ অক্টোবর মস্কোর কিরভ ডায়নামো ইলেকট্রিক মেশিন বিল্ডিং প্ল্যান্টে শ্রমিকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়জ্জ

"পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের তৎপরতাকে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের আইনসম্মত ও মানবিক অধিকারের ওপর নিষ্ঠুর হস্তক্ষেপ বলে মনে করি।"

লেনিনগ্রাদ ক্রাস নোগভারদেয়েৎস ফার্ম-এর শ্রমিকদের এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়–

"আমরা দাবি জানাচ্ছি যে, পাকিস্তান সরকার শান্তিকামী জনগণের ওপর যে বর্বর অত্যাচার চালিয়েছে তা বন্ধ করুক, যাতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী স্বদেশে ফিরে যেতে পারেন।"

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সভা ও সংহতি সমাবেশ চলতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের পত্র-পত্রিকায় প্রচারণা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিএসইউ)-এর মুখপত্র 'প্রাভদা'য় প্রতিদিনই কোনো না কোনো সংবাদ, নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

১ জুন ১৯৭১ প্রাভদা মন্তব্য করে–

"পূর্ব পাকিস্তানে অব্যাহত রক্তপাতের ফলে শুধু যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে তা নয়, সমগ্র এশিয়ার তথা বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে।"

১৬ অক্টোবর ১৯৭১ প্রাভদার রাজনৈতিক ভাষ্যকার স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন-

"উপমহাদেশে উত্তেজনার কারণ এবং এই উত্তেজনা দ্রুত বৃদ্ধির সমস্ত দোষ সর্বতোভাবেই পাকিস্তানের একার।"

২৪ অক্টোবর ১৯৭১ প্রাভদায় আই শেদ্রোভর 'গঙ্গাতীরে ট্রাজেডি' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। রচনাটিতে পশ্চিম বাংলায়

পরিচালিত শরণার্থী শিবিরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে "একটি ব্যারাকের সামনে শরণার্থীদের সঙ্গে আমি কথাবার্তা শুরু করলাম। ওখানে শীর্ণকায় ও দুর্বল শিশুদের অতিরিক্ত খিচুড়ি দেওয়া হচ্ছিল। শরণার্থীরা কী রূপ কঠিন অবস্থায় ভারতে এসে পৌঁছেছেন তার বর্ণনা দিচ্ছিলেন কেউ কেউ। দু সপ্তাহ, তিন সপ্তাহও লেগেছে অনেকের ভারতে এসে পৌঁছুতে। খুলনার একজন প্রাক্তন কলেজের ছাত্র আমায় বললেন, ওঁরা সাত হাজার মানুষ একত্রে ভারতের সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। পৌঁছতে লেগেছিল চার দিন, চার রাত। কুড়িজনের বেশি সঙ্গী পথেই মারা যান। অপর কিছু ব্যক্তিকে শিবির হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তাঁদের উপর শারীরিক, মানসিক চাপ পড়েছিল প্রচণ্ড।

...শিবির হাসপাতালে ব্যারাকগুলির দৃশ্য ভয়াবহ। ধোঁয়া আবর্জনায় দুর্গন্ধের সঙ্গে মিশেছে কার্বলিক এসিডের কড়া গন্ধ। অস্থিচর্মসার শিশুরা ও মায়েরা শুয়ে রয়েছে বাঁশের শয্যার ওপর।

...পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য শরণার্থী শিবিরে একই পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছি। বস্তুত এ এক নৈরাশ্যজনক দৃশ্য। গৃহহীন এই নিযুত নিযুত মানুষ ভারতের উদার সাহায্য না পেলে, অনাহার ও মহামারীর শিকারের সংখ্যা আরো বেশি হতো।

...পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকা থেকে সবেমাত্র আমি কলকাতায় ফিরে এসেছি। যেসব পূর্ব পাকিস্তানি শরণার্থী এখনো শিবিরের আশ্রয় পাননি, তাঁদের সারি সারি ঝুপড়ি ছড়িয়ে রয়েছে ৯০ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে কলকাতা থেকে বনগাঁ যাবার রাস্তা। এখানে রয়েছে হাজার হাজার ঝুপড়ি, সঠিক সংখ্যা কেউ বলতে পারে না। এই সব শোচনীয় আশ্রয়ের কাছেই ছেলেমেয়েরা খেলা করছে, গরুও চরছে। বনগাঁ শহরটি লোকে উপচে পড়ছে। মার্চের আগে পর্যন্ত এখানকার জনসংখ্যা ছিল ১ লাখেরও কম, এখন তা চার গুণ। চালের জন্য শরণার্থীদের দীর্ঘ লাইন। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে আকাশপানে, সর্বত্রই নোংরা, এখনো পর্যন্ত উঠোন থেকে বন্যার জল সরে যায়নি।

ফেরার পথে আবার চোখে পড়ল পথের দু'পাশে সেই শোচনীয় চেহারার ঝুপড়ির সারি, রাস্তার সীমাহীন লোক চলাচল।"

৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ স্পার্তাক রেগলভ 'ভারতীয় উপমহাদেশ : বিয়োগান্ত

নাটকের তৃতীয় অঙ্ক' শিরোনামে লেখেন–

"... ভারতীয় উপমহাদেশের বিয়োগান্ত নাটকের কয়েকটি অঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চিত্রনাট্য অনুযায়ী ২৫ বছর আগে মঞ্চস্থ হয়েছিল। সেই সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতার ছক নিজেদের খুশিমতো তৈরি করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল আর তা তৈরি হয়েছিল 'বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করার' নীতির ওপর। ১৯৬৫ সালে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সেই যুদ্ধ এই রক্তাক্ত চিত্রনাট্যের সঙ্গে জড়িত একটি অধ্যায়। দ্বিতীয় অঙ্ক অনিবার্যভাবেই শুরু হলো একটা জাতিগত এবং অর্থনৈতিক অসঙ্গতি থেকে যে অসঙ্গতি পাকিস্তানের গঠনের মধ্যে, তার দুই অংশের মধ্যে নিহিত ছিল।...

...পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের ন্যায্য দাবির কথাই বলেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন সুবিচার, তাঁদের জন্য সুবিচার এবং যে দেশে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই দেশের জন্য সুবিচার।

...পূর্ব পাকিস্তানে 'এক অমানুষিক' হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছে। এই অত্যাচারিত মানুষের সংখ্যা কত, তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি।

...সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তি স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধানের চাবিকাঠি রয়েছে পাকিস্তানি শাসকদের হাতে। তারা একটা সমগ্র জাতিকে সুবিচার থেকে বঞ্চিত করেছে। তারা ভেবেছে যে, তরবারি দিয়ে সবকিছু শায়েস্তা করা যায়। সুবিচার প্রতিষ্ঠার সময় এখনো আছে, তখন আর তরবারির প্রয়োজন হবে না। তরবারি তার খাপের মধ্যে ফিরে যাবে।"

১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ এপিএন ভাষ্যকার আই পলিশেভস্কি 'পাক-ভারত উপমহাদেশে সংকটের মূল কারণ দূর করতে হবে' শিরোনামে লেখেন–

"...ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই সংঘর্ষ বন্ধ হলেই কি পাক-ভারত উপমহাদেশে রক্তপাত বন্ধ হবে? মোটেও তা হবে না। ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে বা তার পরে কাছাকাছি কোনো সময়েও সংঘর্ষ শুরু হয়নি। সংঘর্ষ শুরু হলো ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে অজস্র ধারায় রক্ত প্রবাহিত হলো। পূর্ব পাকিস্তানের বহু সহস্র মানুষ নিহত হলো।

আর প্রায় এক কোটি মানুষ কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে ভারতে পালিয়ে এলো, কারণ পূর্ব পাকিস্তানে তখন ব্যাপক সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব শুরু হয়েছে। যদি কেউ 'শীঘ্র' অথবা 'অবিলম্বে' যুদ্ধ বন্ধের ডাকে সাড়া দেয়, তবে তার অর্থ হবে এই যে নিরাপত্তা পরিষদ নতুনভাবে পূর্ব পাকিস্তানের হাজার হাজার মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং নতুনভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিজের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করছে।

তাই সামরিক সংঘর্ষ বন্ধ করাই একমাত্র জরুরি কাজ নয়। এই রক্তপাত বন্ধের কথা সোভিয়েত ইউনিয়নের খসড়া প্রস্তাবে আছে। ...

...এই প্রস্তাব রচনার সময় প্রতিনিধিদের মতামতের কথা মনে রাখা হয়েছিল। সোভিয়েত খসড়া প্রস্তাবে একটা প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অবিলম্বে যুদ্ধ এবং সামরিক অভিযান বন্ধের জন্য এবং একই সঙ্গে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ব্যক্ত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অভিলাষ অনুযায়ী একটি রাজনৈতিক সমাধানের উপযুক্ত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাকিস্তান সরকারকে রাজি করাতে সমস্ত সংশ্লিষ্ট দেশকে আহ্বান জানানো হয়। প্রস্তাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ বন্ধ এবং রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়টি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।"

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ প্রাভদায় ভি. মুরিগিনের 'ভারত উপমহাদেশে শান্তির জন্য' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটিতে বলা হয়–

"সোভিয়েত ইউনিয়ন তার পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলি অনুযায়ী, জাতিসমূহের মুক্তির সংগ্রামকে ব্যতিক্রমহীনভাবে সমর্থন করে। মানবিক বিবেচনাবোধের দ্বারা চালিত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তান সরকারের কাছে নিপীড়ন বন্ধ করতে এবং সঙ্কটের এক রাজনৈতিক মীমাংসার উপায় উদ্ভাবন করতে বার বার আবেদন জানিয়েছে। এই পদক্ষেপ নেওয়ার সময়ে সোভিয়েত সরকার পাকিস্তানি নেতাদের কাজ উপমহাদেশে শান্তির পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক, সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

জনগণের ইচ্ছার ওপর সামরিক দমন-পীড়নের প্রত্যুত্তরে জনগণের পক্ষ থেকে এসেছে সশস্ত্র প্রতিরোধ। সরকারি ফৌজের বিরুদ্ধে জনগণের মুক্তিবাহিনীর দলগুলি গেরিলা তৎপরতা চালিয়েছে। এ বছরের বসন্তকালে ভারত-পাক সীমান্তে এইভাবেই উদ্ভব হয়েছে এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। রাজনৈতিক সঙ্কটের সামরিক মীমাংসা বাতিল করে এবং জনগণের ইচ্ছা পূর্ণ

করে উত্তেজনা প্রশমিত করতে পারতো একমাত্র পাকিস্তান সরকারই।"

ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা চুক্তি : মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নতুন শক্তি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের চক্রান্তে পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র বলে চিহ্নিত করে পাকিস্তান সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত হতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদদে পাকিস্তান ভারতকে আগ্রাসী শক্তি বলে বিশ্বব্যাপী প্রচারণা চালায়। ফলে এসব নানাবিধ বিরামহীন অপপ্রচারের আক্রমণে ভারত অনেকটাই নিঃসঙ্গ এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে তার ভূমিকা সম্পর্কে অনেকটাই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। (বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সার্বিক পরিস্থিতি অবগত করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃঢ় ভূমিকা প্রত্যাশা করে সোভিয়েত নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করা হয়।

ঠিক এমনই এক পরিস্থিতিতে ৯ আগস্ট ১৯৭১ স্বাক্ষরিত হয় ২০ বছর মেয়াদি ঐতিহাসিক 'ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা চুক্তি'। এই চুক্তির নবম ধারাটি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ ধারায় বলা হয় যে, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনো কারও দ্বারা আক্রান্ত হলে, তারা তা নিজেদের ওপর আক্রমণ বলে গণ্য করবে এবং পরস্পরের সহযোগিতায় এগিয়ে যাবে।

মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের এক নোট থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রয়োজনীয় সাহায্য-সমর্থন জানাবে, সে কথা জুন মাসের শেষে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং-এর কাছে উল্লেখ করেন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন।

'ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা চুক্তি'র ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত-সংশ্লিষ্টতা বেড়ে যাওয়ার পথ তৈরি হয়, যা ভারতকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে নতুন শক্তিতে চাঙা করে তোলে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সহযোগিতার এক পর্যায়ে পাকিস্তানের সাথে সরাসরি যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠলে সোভিয়েতের কাছ থেকে ভারতের অস্ত্র সহযোগিতা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয় এই চুক্তির ফলে। চুক্তির ফলে ভারতের পাশে সোভিয়েত ইউনিয়নের দাঁড়ানোর নিশ্চয়তা পায় ভারত। তাই চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারত নিঃশঙ্ক চিত্তে মুক্তিযুদ্ধে দ্রুতই সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে। অনিবার্যভাবেই এই চুক্তি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নতুন শক্তি সঞ্চার করে ও

আশাব্যঞ্জক অধ্যায় শুরু হয়।

ভারতের কাছে এই চুক্তি ছিল এক ধরনের নিরাপত্তা রক্ষাকবচ। এই চুক্তির ফলে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ভারত দৃঢ় অবস্থান নিতে সক্ষম হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে ঐতিহাসিক 'ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা চুক্তি'র অনিবার্য প্রভাব পড়তে থাকে। অপর দিকে ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের মিত্র ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)। সিপিআই-এর প্রভাবে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার বামদিকে মোড় নেয় এবং অনেক বামপন্থী কর্মসূচি গ্রহণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ভারতের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০ হাজারের কাছাকাছি। অস্ত্রের স্বল্পতার জন্যই ব্যাপক হারে প্রতীক্ষারত অসংখ্য তরুণকে ট্রেনিং দেওয়া সম্ভব হয়নি। ট্রেনিংপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেকে আবার অস্ত্রের অভাবে অ্যাকশনে যেতে পারছিল না। এই চুক্তির ফলে এ সমস্যা মিটে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় অস্ত্র সংগ্রহের প্রতিবন্ধকতা দ্রুতই কেটে যেতে থাকে। শুধু এফএফ বাহিনীতে প্রতি মাসে ২০ হাজার করে নতুন মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং-এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই চুক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানে উদ্বেগ সৃষ্টি করে। হেনরি কিসিঞ্জার 'ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা চুক্তি'কে 'bombshell' বলে অভিহিত করেন। এই চুক্তিকে ঘিরে উদ্বেগের কথা সোভিয়েত কর্তৃপক্ষকে জানাতে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব সুলতান খানকে মস্কো পাঠান। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমিকো 'ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা চুক্তি'র কথা উল্লেখ করে সুলতান খানকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন–

"বাংলাদেশের ব্যাপারে পাকিস্তান যদি ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেয়, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন নীরব থাকবে না।"

১৮ অক্টোবর মার্কিন রাষ্ট্রদূত বীম্ মস্কোয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকোর কাছে পাক-ভারত সীমান্ত থেকে উভয় পক্ষের সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য মার্কিন-সোভিয়েত যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। দিল্লি সফরকালে সোভিয়েত সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোলাই ফিরুবিন মার্কিনের প্রস্তাবের জবাবে ২৩ অক্টোবর ১৯৭১ জানিয়ে দেন–

"শেখ মুজিবের মুক্তি এবং 'পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত রাজনৈতিক নিষ্পত্তি সাধন' ছাড়া কেবল সীমান্ত অঞ্চল থেকে ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে যুদ্ধের আশঙ্কা রোধ করা সম্ভব নয়।"

২৭ অক্টোবর ১৯৭১ ফিরুবিনের ভারত সফর শেষ হওয়ার পর দুই দেশের পক্ষ থেকে প্রচারিত যুক্ত ঘোষণায় বলা হয়–

"বর্তমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক শান্তি বিপন্ন হয়ে পড়ায় ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন মৈত্রী চুক্তির নবম ধারার অধীনে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সঙ্গে পূর্ণরূপে একমত যে, পাকিস্তান খুব শীঘ্র আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু করতে পারে।"

ফিরুবিনের ভারত ত্যাগ করার ৩ দিনের মধ্যে সোভিয়েত বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল কুতাকভের নেতৃত্বে এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সোভিয়েত সামরিক মিশন দিল্লি রওয়ানা হয়। ১ নভেম্বর থেকে আকাশপথে শুরু হয় ভারতের জন্য সোভিয়েত সামরিক সরবরাহ।

বিশ্বজনমত সৃষ্টির প্রয়াস

১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে মস্কোতে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিএসইউ)-র ২৪তম কংগ্রেসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)-র নেতৃবৃন্দ সিপিএসইউ-র প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মতবিনিময় করেন। আওয়ামী লীগের ওপর বামপন্থীদের প্রভাব থাকলেও, সাংগঠনিকভাবে সোভিয়েত নেতৃত্বের সাথে তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। উপরন্তু পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মার্কিনি সামরিক জোট ঘেঁষা বৈদেশিক নীতির জন্য (আওয়ামী লীগের জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করা সত্ত্বেও) আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মহলে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা ছিল। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ কমিউনিস্ট দেশগুলোর সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব মূলত এসে পড়ে (বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ওপর। (বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিপিএসইউ-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। এক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগী ভূমিকা পালন করেন সোভিয়েত ইউনিয়নে কর্মরত

ভারতের রাষ্ট্রদূত ডি পি ধর।

৩ মে ১৯৭১ (বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করে এবং মুক্তিযুদ্ধকে সক্রিয় সমর্থন ও বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান করার দ্ব্যর্থহীন আহ্বান জানিয়ে বিশ্বের সব কমিউনিস্ট পার্টির কাছে একটি বিশেষ চিঠি পাঠানো হয়। জাতিসংঘ, বিশ্বশান্তি পরিষদের সম্মেলনে, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের বিভিন্ন দেশে (বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টির তার প্রতিনিধি দল ও বিশেষ বার্তা পাঠায়। মুক্তিযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই (বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের সাথে সিপিএসইউ-এর নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৩-১৬ মে ১৯৭১ বুদাপেস্টে বিশ্বশান্তি পরিষদের সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে স্বাক্ষর অভিযান পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে বাংলাদেশ পরিস্থিতি ও স্বাধীনতা সম্পর্কে (বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টির একটি ছাপানো প্রস্তাব ও প্রবাসী সরকারের একটি শ্বেতপত্র বিলি করা হয়। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সাথে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব বৈঠক অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সিপিএসইউ এবং সর্বভারতীয় শান্তি পরিষদ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকার নেপথ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব

সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে ভারতের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু বিষয়ে ভারতের মধ্যে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, দোদুল্যমানতা ছিল, বিভিন্ন সংশয়বাদী লবীর প্রচারণাও ছিল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারতকে চাঙা রাখতে 'ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা চুক্তি' করা ছাড়াও, সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃঢ় অবস্থান এবং ভারতের ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিবাচক প্রভাব, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের কার্যকর ভূমিকা রাখার বিষয়টি সহজ করে দেয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ভারতের চেয়ে সোভিয়েত

ইউনিয়নের অবস্থান ছিল অনেক বেশি আদর্শিক। ভারতের ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব ছিল মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই প্রভাব ও দৃঢ় অবস্থানের অনুপস্থিতি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে নিশ্চিতভাবেই পাল্টে দিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মেলবন্ধন মুক্তিযুদ্ধকে অগ্রসর করছে।

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর উপলক্ষ্যে প্রচারিত হয় সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতি। সেই বিবৃতিতে বলা হয়–

"১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা-বিকাশের বিষয় খেয়ালে রেখে উভয় পক্ষই মনে করছেন, শান্তি বজায় রাখার স্বার্থেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছা, অলঙ্ঘনীয় অধিকার ও আইনসঙ্গত স্বার্থের প্রতি মর্যাদা দিয়ে সেখানে উদ্ভূত সমস্যাবলির এক রাজনৈতিক মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য এবং শরণার্থীদের সম্মান ও মর্যাদা সুরক্ষিত থাকার মতো অবস্থায় তাদের দ্রুত ও নিরাপদে নিজেদের দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য জরুরি ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ভারতীয় উপমহাদেশে সৃষ্ট পরিস্থিতির গুরুত্বের কথা বিবেচনার মধ্যে নিয়ে উভয় পক্ষই পরবর্তী সময়েও পারস্পরিক সংযোগ বজায় রেখে চলতে, এই সম্পর্কে উদ্ভূত বিষয়গুলি নিয়ে মতবিনিময় অব্যাহত রাখতে সম্মত হয়েছেন।"

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ শুরু করে। ভারতের পাশাপাশি কূটনৈতিক ও সামরিক উভয় ফ্রন্টে সোভিয়েত ইউনিয়ন এগিয়ে আসে। সামরিক কৌশল নিয়ে দু দেশের উচ্চ পর্যায়ের সামরিক কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে শলা-পরামর্শ হয়। অনেক স্ট্র্যাটেজিক বিষয় যৌথভাবে নির্ণীত হয়। সপ্তম নৌবহর ঠেকাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধকে বিজয়ের পূর্ণতায় নিয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোভিয়েতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা

বিভিন্ন সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে

নানা আনুষ্ঠানিক বক্তব্য প্রদান করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে দৃঢ় ভিত্তি তৈরি হয়।

৬ জুলাই ১৯৭১ সোভিয়েতের তিনজন নভোযাত্রী এক দুর্ঘটনায় নিহত হলে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এক শোকবার্তা পাঠান। সোভিয়েত বার্তা সংস্থা ইজভেস্তিয়া তাঁকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে উল্লেখ করে। এটা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি স্বীকৃতি।

৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারত সফরকালে সোভিয়েত সংসদীয় প্রতিনিধিদলের নেতা ও সুপ্রিম সোভিয়েতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ভি কুদরিয়াভেৎসেভ বলেন–

"বাংলাদেশে যে সংগ্রাম চলছে, তা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং তার মধ্যে গৃহযুদ্ধের উপাদান রয়েছে। যে সমাধানই নির্ণয় করা হোক না কেন, তা করতে হবে জনগণের ইচ্ছা, তাদের আইনসংগত অধিকার ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে।"

কুদরিয়াভেৎসেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারের প্রতিনিধি হিসেবেই মুক্তিযুদ্ধকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ মস্কোতে আফগানিস্তানের রাজা মুহম্মদ জহির শাহ-এর সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগোর্নি তাঁর ভাষণে বলেন–

"ভারত উপমহাদেশে সম্প্রতি পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়, জনসাধারণ অতিমাত্রায় আতঙ্কিত। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মমভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনসমষ্টির মৌল অধিকারসমূহের ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত ইচ্ছার দমন দেশের সেই অংশে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটিয়েছে। প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারতে পালিয়ে আসতে হয়েছে। এশিয়ার দুটি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সংঘর্ষ দানা বেঁধে উঠেছে।

আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন অবিচলভাবে দাঁড়িয়েছি রক্তপাত বন্ধ করার পক্ষে, বাইরের শক্তিগুলির কোনোরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়াই জনসাধারণের আইনসঙ্গত অধিকারসমূহ বিবেচনার মধ্যে রেখে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক মীমাংসার পক্ষে। সেই এলাকায় স্থায়ী ও ন্যায়সঙ্গত শান্তি প্রতিষ্ঠার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন চাপ দিচ্ছে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যুদ্ধ বিরতির প্রশ্নটিকে, যে সব কারণ ভারতীয়

উপমহাদেশে পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে, সেগুলি দূর করার বৈপ্লবিক উপায় হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক মীমাংসার প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না।"

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়নের লড়াই

জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন জোরালো ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশবিরোধী চক্রান্ত রুখতে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে এবং নিরাপত্তা পরিষদে কার্যত একাই লড়ে যায়। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি সমর্থন জানায়। কিন্তু জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্য দেশই ব্যাপারটিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়টি এড়িয়ে যায়। তারা শুধু শরণার্থী সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সাহায্যের কথা বলে। জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্টও বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের বিষয়টি এড়িয়ে যান।

অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধ যখন তার শেষ প্রান্তে চূড়ান্ত বিজয়ের একেবারে সন্নিকটে, তখন জাতিসংঘে পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা শর্তহীন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করতে শুরু করে। এসব প্রস্তাবে সংকটের মূল উৎস দূর করা তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়ার বিষয়ে কোনো কথাই ছিল না। বরং তাতে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখলদারিত্ব বজায় রেখেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করা হয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অবস্থান টিকিয়ে রাখার এই দূরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন বার বার ভেটো দিতে থাকে। প্রস্তাবে বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়টি বরাবরের মতো এড়িয়ে গিয়ে যুদ্ধবিরতি, উভয় দেশের সেনা প্রত্যাহার ও উদ্বাস্তু প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হয়। বার বার ভেটো দেওয়ার বিষয়টি যে কারো জন্যই সরল বিষয় ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যান্ড পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাবসহ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায়। ফলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি

অমীমাংসিতভাবে ঝুলে থাকে। জাতিসংঘে প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়যাত্রা রোধ করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়।

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারত-পাকিস্তান সরাসরি যুদ্ধ শুরু হলে, পরদিন নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠক আহ্বান করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের এই বৈঠকে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থায়ী প্রতিনিধি ইয়াকভ মালিক অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রচেষ্টা চালান। বৈঠকের শুরুতেই তিনি প্রস্তাব রাখেন, বাংলাদেশের প্রতিনিধিকে বক্তব্য রাখার অনুমতি দেওয়া হোক। আগেই বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নিরাপত্তা পরিষদে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ চেয়ে সদস্যদের কাছে একটি চিঠি ও পরিস্থিতির বিবরণ সম্বলিত একটি নথি বিলি করেছিলেন।

অনেক দেশের আপত্তির মুখেও মালিক তার প্রস্তাবের পক্ষে দৃঢ়তার সাথে যুক্তি উত্থাপন করেন। মালিক তাঁর বক্তব্যে স্বাধীনতা যুদ্ধকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বলে স্বীকৃতি দিয়ে বলেন–

"আমরা যদি উটপাখির মতো বালিতে মাথা গুঁজে থাকতে চাই, তাহলে এ নিয়ে ভাবার কিছু নেই। কিন্তু বাস্তব সত্য যদি আমরা জানতে চাই- কেন এই দুই দেশের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে, তাহলে এই সংকটের মূল কারণটা জানতে হবে; এই ঘটনা ও তার কারণ নিরূপণ করতে হবে। তা না করে অবশ্য আমরা ভিন্ন পথেও যেতে পারি। আমরা বিদ্রোহ বা বিদ্রোহীদের ব্যাপারে কথা বলতে পারি। কিন্তু এই যে বিদ্রোহ, জাতিসংঘের নিজস্ব পরিভাষায় একে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। আর তা হলো জাতীয় মুক্তিবাহিনী (ন্যাশনাল লিবারেশন ফোর্সেস) ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন (ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেন্ট)।"

যদিও শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধির বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ হয়নি। কিন্তু মালিকের প্রস্তাবের সূত্র ধরে সকলের সামনে একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, বাংলাদেশের প্রশ্নটি শুধু উদ্বাস্তু বিষয়ক একটি সমস্যা নয়। জাতিসংঘের মঞ্চ থেকে সোভিয়েত প্রতিনিধির বাঙালির সংগ্রামকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ জাতিসংঘে ইয়াকভ মালিক বলেন

"ভারতীয় উপমহাদেশের বিপজ্জনক পরিস্থিতি অতি দ্রুত পূর্ব পাকিস্তানের একটি রাজনৈতিক সমাধানের দাবি তুলে ধরছে। এই সমাধান করতে হবে সেখানকার জনগণের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা, যা ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে ব্যক্ত হয়েছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। এ কথার অর্থ হলো পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তথা তাদের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদেরকেই তাদের ভবিষ্যত নির্ধারণের পূর্ণ এক্তিয়ার দিতে হবে অর্থাৎ তারা পাকিস্তানের অংশ হিসেবে থাকবে, না তারা স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত কিংবা আলাদা রাষ্ট্র গঠন করবে-সেটা নির্ধারণ করার দায়িত্ব তাদের ওপরই ছেড়ে দিতে হবে।"

১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ নিরাপত্তা পরিষদের সভায় সোভিয়েত প্রতিনিধি ইয়াকভ মালিক যুক্তি দেখিয়ে বলেন-

"সাম্প্রতিক ঘটনাবলির কারণে এই সংকটে শুধু পাকিস্তান ও ভারত নয়, বাংলাদেশও একটি পক্ষ। দেড় লাখ গেরিলাযোদ্ধা স্বাধীনতার জন্য লড়ছেন, তাদের প্রতিনিধির বক্তব্যও শোনা উচিত।"

কিন্তু পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যদের বিরোধিতার কারণে মালিকের সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের দুই অংশেই প্রবল যুদ্ধ চলতে থাকে এবং পাকিস্তানের পরাজয় অত্যাসন্ন হয়ে ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের ব্যাপারে স্বভাবতই কালক্ষেপণের কৌশল নেয় এবং বার বার ভেটো দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর বিজয়কে সুনিশ্চিত করে তোলে।

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিম্নোক্ত বিষয়াবলি সম্বলিত একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করে–

পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয় ফ্রন্টে সকল প্রকার বিরোধমূলক কর্মকাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ করার লক্ষ্যে, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান;

এই সাথে ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনের মাধ্যমে সেখানকার জনগণ যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে, সেই আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের একটি রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান;

মানুষের জীবন রক্ষা এবং ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশন মেনে চলার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি

আহ্বান;
এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের বিষয়ে দ্রুত জানানোর জন্য মহাসচিবের প্রতি অনুরোধ;
সংশ্লিষ্ট সমগ্র এলাকায় শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরও পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আলোচনা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত।
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যে খসড়া প্রস্তাব পেশ করা হয়, তাতে বলা হয়–
পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ অবসানে অভিনন্দন প্রকাশ এবং কোনো প্রকার বিলম্ব ছাড়া ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচিত আইনসংগত জনপ্রতিনিধিদের হাতে নিঃশর্তভাবে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ যাতে নিশ্চিত হয়, সেজন্য উভয় পক্ষ কর্তৃক যুদ্ধ বিরতির চুক্তি মেনে চলা এবং এতদ্‌ঞ্চলে সংঘাত-সৃষ্ট সমস্যাবলির যথাযথ সমাধানের ব্যাপারে আশা প্রকাশ;
ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল সীমান্ত এলাকা এবং ১৯৬৫ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর অবিলম্বে সকল প্রকার সামরিক তৎপরতা বন্ধ এবং যুদ্ধ বিরতির আহ্বান। এই সঙ্গে ভারত সরকার ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ গ্রীনিচ মান সময় ৩টা ৩০ মিনিট থেকে একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ও এই অঞ্চলে সকল প্রকার সামরিক তৎপরতা বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে যে বিবৃতি দিয়েছে তার প্রতি অভিনন্দন এবং পাকিস্তান সরকারের প্রতি কোনো প্রকার বিলম্ব ছাড়া একই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জরুরি আহ্বান;
দ্রুততম গতিতে যাতে সকল সামরিক তৎপরতা বন্ধ হয়, সেজন্য সমন্বিত সহায়তা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং এমন কোনো কার্য যা ভারতীয় উপমহাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পথে বাধা তা থেকে বিরত থাকার জন্য জাতিসংঘের সকল সদস্যরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান।

সপ্তম নৌবহর প্রেরণ : সোভিয়েতের প্রতিরোধে
ব্যর্থ মার্কিনের শেষ চক্রান্ত

পাকিস্তানের সমর্থনে আমেরিকা সামরিক হস্তক্ষেপের প্রস্তুতি শুরু করে। পাকিস্তানি বাহিনীর নিশ্চিত পরাজয় ঠেকাতে ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন মার্কিন সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর

হওয়ার নির্দেশ দেন। সপ্তম নৌবহর ছিল সর্বাধুনিক পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত পাঁচ হাজার নাবিক, ৭৫টি যুদ্ধবিমান, ৫টি হেলিকপ্টার, ৩টি স্বচালিত মিসাইল বিধ্বংসী ডেস্ট্রয়ার, ৪টি কামান বিধ্বংসী ডেস্ট্রয়ার, ১টি হেলিকপ্টার বাহক ছাড়াও অন্যান্য মারণাস্ত্র সন্নিবেশিত। এই নৌবহর সমুদ্রের বহু দূর থেকে নির্ভুলভাবে গোলা নিক্ষেপ করে আমাদের দেশের ব্যাপক সম্পদ ও জনগণকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম ছিল।
সপ্তম নৌবহরের উদ্দেশ্য ছিল মুক্তপ্রায় বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর চূড়ান্ত পতন ঠেকানোর জন্য নৌ, বিমান ও স্থল তৎপরতা চালানো; বঙ্গোপসাগরে ভারতের নৌ-অবরোধ ব্যর্থ করা; পাকিস্তানি স্থলবাহিনীর তৎপরতায় সাহায্য করা; ভারতীয় বিমান তৎপরতা প্রতিহত করা এবং মার্কিন নৌসেনা অবতরণে সাহায্য করা।
কিন্তু সপ্তম নৌবহরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। পাল্টা জবাব দিয়ে সপ্তম নৌবহরের গতিরোধ করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক মুহূর্তও দেরি করেনি। সোভিয়েত নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল সের্গেই গরশকফ ঘোষণা দেন যে, মার্কিন নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরে আসতে দেওয়া হবে না। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'শক্ত ব্যবস্থা' গ্রহণ করতে পারে-এই উপলব্ধি সোভিয়েত ইউনিয়নের আগে থেকেই ছিল। মার্কিন সপ্তম নৌবহর আসার আগেই ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত নৌবহরের সমাবেশ সম্পূর্ণ হয়। ভারত মহাসাগর এলাকায় আগে থেকেই তিনটি সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজ টহলরত অবস্থায় ছিল। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রথম নৌবহরটি তাদের দায়িত্ব শেষে পূর্বনির্ধারিত বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তাদের ঘাঁটি ভ্লাদিভস্তকে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু মার্কিন পরিকল্পনা আঁচ করে সোভিয়েত নৌ-কমান্ড তাদের টহল অব্যাহত রাখতে বলেন। তাদের বদলে নতুন যে নৌবহরটি রওয়ানা হয়, তার যাত্রাও অব্যাহত রাখা হয়। আরো অতিরিক্ত নৌযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। ফলে ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে ভারত মহাসাগর এলাকায় মোট সোভিয়েত নৌযানের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬। মার্কিন সপ্তম নৌবহরের গতিবিধি জানার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন কসমস ৪৬৪ পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে।
সোভিয়েত ইউনিয়ন সময়মতো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করলে, সপ্তম নৌবহর আমাদের জন্য এক ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসত। সোভিয়েতের

সময়োচিত পদক্ষেপের কারণে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পরে জরুরি কাজ হয়ে ওঠে সদ্যঅর্জিত স্বাধীনতাকে 'অপরিবর্তনযোগ্য' বাস্তবতায় পরিণত করে তা সংহত করা, ষড়যন্ত্র থেকে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা। এই পর্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশগুলোর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল অন্যতম। ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক নানা ফোরামে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে সোভিয়েতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত দৃঢ় ও তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৭২ সালের ৩ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের মধ্যে যৌথ ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয়। এটা ছিল বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রথম মৌলিক ধরনের কোনো দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে স্বাক্ষর। এই ঘোষণা অনুসারে মার্চ মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের আরো একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নব প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দৃঢ় ভিত্তির জন্য এসব চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় ধ্বংসস্তুপের ওপর দাঁড়িয়ে। সবকিছুই ছিল তখন প্রায় বিধ্বস্ত। খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদি জরুরি সামগ্রীর অভাব ছিল অকল্পনীয়। শুরু থেকেই সদ্য স্বাধীন দেশের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশ নানা চক্রান্তে মেতে ওঠে। তখনও সেই দুঃসময়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে আমাদের পাশে দাঁড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব।

স্বাধীনতা অর্জনের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে উপহার হিসেবে দশটি মাছ ধরার ট্রলার, তিনটি কার্গো জাহাজ, চারটি হেলিকপ্টার, ৩৫০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন কোল্ডস্টোরেজ এবং চারটি ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের প্রয়োজনীয় সবকিছু দেয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ পাঠানো হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনর্গঠনসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও প্রকল্প নির্মাণে সোভিয়েত ইউনিয়ন এগিয়ে আসে। স্বাক্ষরিত হয় অর্থনৈতিক ও কারিগরি চুক্তি। বিদ্যুৎ উৎপাদন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নির্মাণ, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, মৎস্য শিকার শিল্প, সামুদ্রিক-নৌ-রেল যোগাযোগ, বিশেষজ্ঞ তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশেষ অবদান রাখে। এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরকে মাইনমুক্ত করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তারা। এই কাজে একজন সোভিয়েত উদ্ধারকারী প্রাণ দেন। আমাদের দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করতে ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নির্মাণ কারখানা, সাভার বেতার সম্প্রসারণ কেন্দ্র ইত্যাদির পেছনে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবদান অনস্বীকার্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে যেন ভুলে না যাই

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের অপরিহার্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখযোগ্যভাবে আলোচিতও হয়নি। এই ভেবে স্বস্তি পাই যে, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃঢ় উপস্থিতি ছিল। এটা খুবই দুঃখজনক যে, নতুন প্রজন্মের মানুষ এখন আর পৃথিবীর মানচিত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপস্থিতি খুঁজে পাচ্ছে না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক ইতিহাসকে কেবল জানার জন্যই নয়, একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের ধারায় যথাযথভাবে দেশকে অগ্রসর করার স্বার্থেও মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া এবং তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং পরবর্তীকালে দেশ পুনর্গঠনে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিএসইউ), সর্বোপরি সোভিয়েত জনগণের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার কথা যেন ভুলে না যাই। তাহলে যে মুক্তিযুদ্ধকেই ভুলে যাওয়া হবে।

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা
প্রকাশক : বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি। প্রকাশকাল : জানুয়ারি ১৯৮৭
হাসান ফেরদৌস, মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত বন্ধুরা
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন। প্রকাশকাল : জুন ২০১৩
মঈদুল হাসান, মূলধারা : '৭১
প্রকাশক : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬
আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। সম্পাদনা : শাহীন রহমান
প্রকাশক : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী। প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১১

মুক্তিযুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ভূমিকা : আত্মস্মৃতি

ডা: সারওয়ার আলী

সত্তুরের দশকে বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল। সারা বিশ্ব দুই পারমানবিক শক্তিধর পরাশক্তির প্রভাব বলয়ে বিভক্ত– একদিকে মার্কিন প্রশাসনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী জোট, অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব; মুখোমুখি অবস্থানে ন্যাটো এবং ওয়ারস্ সামরিক ব্যবস্থা। অবশ্য রুশ-চীন মতাদর্শগত বিরোধের কারণে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি হয়। পঞ্চাশের দশকে ভারতের জওহরলাল নেহেরু, মিশরের জামাল আব্দুল নাসের ও য়ুগস্লাভিয়ার মার্শাল টিটোর উদ্যোগে গড়ে ওঠা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন সত্তুরের দশকে বেগবান হয় এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সাথে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নৈকট্য লক্ষ্য করা যায়। পাকিস্তানের সামরিক সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উদ্যোগে গঠিত সিয়াটো ও সেন্টো সামরিক জোটে যুক্ত হয়। পাশাপাশি ছিল এশিয়া ও আফ্রিকার বহুদেশে উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামরত নেতৃত্ব ও জনগণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে গড়ে উঠে সামজতান্ত্রিক বিশ্বের প্রভাবাধীন বিশ্ব শান্তি পরিষদ ও পরে আফ্রো-এশীয় গণসংহতি পরিষদ। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই দুইট প্ল্যাটফর্মে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীদের ছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক শক্তি, স্যোশাল ডেমোক্রাট ও উদারনৈতিক রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা। এই জটিল ও দ্বান্দিক বিশ্ব পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মে ১৯৭১। আগরতলায় সিপিআই-এর কল্যাণে আশ্রয় পাওয়া ক্র্যাফ্ট হোস্টেলে আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছায় যে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং বাংলাদেশের গণহত্যার বিরুদ্ধে ও স্বাধীনতার সপক্ষে তাদের সমর্থন অর্জনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং এই সম্মেলনের সূত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো

হবে। এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের প্রথম প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন জাতীয় সংসদ সদস্য আবদুস সামাদ এবং অপর দুজন সদস্য থাকবেন ন্যাপের যুগ্ম সম্পাদক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দেওয়ান মাহবুব আলী ও আমি।

ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তান সরকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং তারা বাংলাদেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদও জানাবে না। তাদের এই সিদ্ধান্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের কাছে মানবতাবিবর্জিত ভূ-রাজনৈতিক কৌশল ও নীতি অধিকতর গুরুত্ব পায়। ১৯৭০ সাল থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে গণচীনের মাওবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে মার্কিন প্রশাসনের মৈত্রী ও বিশ্বব্যাপী বিশেষত উপমহাদেশে এক ধরনের নীতি অবলম্বনের কূটনৈতিক প্রক্রিয়া চলছিল।

উল্লেখ্য, ৬ এপ্রিল ১৯৭১ ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডসহ বিশজন ঢাকা ও ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টের কূটনীতিবিদেরা ব্যতিক্রমী ঐতিহাসিক ভিন্নমত জানিয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টে চিঠি পাঠান। তাঁরা পাকিস্তানি বাহিনীর গণতন্ত্র দমন ও নির্যাতনের প্রতিবাদ না করার এবং পাকিস্তানের সরকারকে আগাম সমর্থন প্রদানের মার্কিন নীতির প্রতিবাদ জানান। বস্তুতপক্ষে, এ সময় ভারতীয় উপমহাদেশ সংক্রান্ত মার্কিন প্রশাসনের নীতির ক্ষেত্রে সেক্রেটারি অব স্টেট রজার্স এবং রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তাবিষয়ক প্রধান কিসিঞ্জারের মধ্যে মতবিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। কিন্তু ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের জন্য চীনের সঙ্গে মৈত্রী নিক্সনের কাছে জরুরি হিসেবে বিবেচিত হয়। এই নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান ইয়াহিয়া খান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পরবর্তী সময়ে জুলাই মাসে কিসিঞ্জার পাকিস্তান সফরকালে অসুস্থতার ভান করে পাকিস্তান থেকে পিকিং সফরে যান এবং আনুষ্ঠানিক মার্কিন-চীন সমঝোতার পথ উন্মুক্ত করেন। পাকিস্তান সরকারের এই উপকারের প্রতিদানে রিচার্ড নিক্সন বাংলাদেশ ও উপমহাদেশসংক্রান্ত পলিসি পেপারে নিজ হাতে লেখেন "To all hands, Don't Squeeze Yahiya at this time, R.N." *(মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এই নোটটি প্রদর্শিত রয়েছে)*

এপ্রিল-মে মাস থেকেই নিক্সন সরকারের এই অবস্থানের আলামত পাওয়া যাচ্ছিল, বিশেষ করে ভারতীয় কূটনৈতিক মহলে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে

বাংলাদেশ ও ভারতের সরকারের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। মে-জুন মাস অবধি সোভিয়েত ইউনিয়নের বাংলাদেশ বিষয়ক অবস্থান যথেষ্ট সুস্পষ্ট ছিল না। অবশ্য গণহত্যা শুরু হওয়ার পর এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট পদগর্নি ইয়াহিয়া খানকে প্রকাশ্য পত্রে নির্যাতন বন্ধ ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি করে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আহ্বান জানান। সুতরাং, এই পটভূমিতে বুদাপেস্ট সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের পার্টি ও সরকারের নেতৃত্বকে বিস্তারিত পরিস্থিতি অবগত করা এবং তাদের বাংলাদেশের সপক্ষে অবস্থান গ্রহণে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের কাছে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এ জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল গঠনের পাশাপাশি ভারতের পক্ষ থেকেও একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জওহরলাল নেহরুর দপ্তরবিহীন মন্ত্রী ভি কে কৃষ্ণমেননের নেতৃত্বে গঠিত প্রতিনিধিদলের অন্যদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রধান ভূপেশ গুপ্ত, সর্বভারতীয় কংগ্রেসের দুজন সাধারণ সম্পাদক, কয়েকজন লোকসভার সদস্য ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা।

১৯৭১ সালে আগরতলা থেকে কলকাতা ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের দৈনিক একটিমাত্র ফ্লাইট ছিল। বিকল্প ছিল বাসে-ট্রেনে করে প্রায় ৪৮ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় পৌঁছানো। আগরতলা-কলকাতা ফ্লাইটটি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতো। আমাকে জানানো হলো, বুদাপেস্টে যাওয়ার পথে কলকাতায় কয়েক দিনের প্রস্তুতিমূলক কাজ রয়েছে এবং নয়াদিল্লিতে চূড়ান্ত ব্রিফিং হবে। সুতরাং সরকারি সূত্রে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট দিনে টিকিট জোগাড় করা হয়। সময়মতো আগরতলা বিমানবন্দরে ঢাকা জেলা পার্টির সম্পাদক জ্ঞান চক্রবর্তী ও আগরতলার কানু সান্যাল আমাকে পৌঁছাতে আসলেন। এ সময় উল্লেখ করার মতো ঘটনাটি ঘটে। বিমানের সিঁড়ি অবধি পৌঁছানোর পর বিমানবালা জানালো যে কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে দ্রুত ফিরতে হবে, তাই আমার যাওয়া হবে না। বিমানের সিঁড়ি ওপরে উঠে গেল। মুক্তিযুদ্ধে একটি ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিল, তা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় মন খারাপ করে বিমানের পাদদেশে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর বিমানের গহ্বর থেকে সিঁড়ি আবার নমল,

সুন্দরী বিমানবালা নিচে নেমে এলো। জিজ্ঞাসা করল, আমি কি বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সদস্য? হ্যাঁ-সূচক উত্তর পাওয়ার পর সে জানায়, পাইলটকে সে বিশেষ অনুরোধ করেছে আমাকে বিমানে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পাইলট সম্মত হয়েছেন, তবে আমাকে এয়ার হোস্টেস হিসেবে তার জন্য বরাদ্দ আসনে করে যেতে হবে। আমি সম্মত থাকলে বিমানে উঠতে পারি। আমি বিমানের মেঝেতে আসন গেড়ে বসে যেতে রাজি, বিমানে উঠলাম। বিমানবালাকে অনুরোধ করলাম, আমি দাঁড়িয়ে যাই, সে তার নিজস্ব আসন গ্রহণ করুক। সে যান্ত্রিকভাবে উত্তর দিয়েছে, আগরতলা-গুয়াহাটি পর্বে বিমানে প্রচুর বাম্পিং-এ হাঁটাহাঁটির অভ্যাস তার আছে। গুয়াহাটিতে কয়েকজন যাত্রী নেমে যাবে। তখন তার আসনটি ছেড়ে দিতে হবে। এই আপাত তুচ্ছ ঘটনাটি উল্লখ কলাম, কারণ এর মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের ভারতবাসীর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে গভীর আগ্রহ ও আবেগের প্রকাশ ঘটেছে। বহু শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধার এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। বাংলাদেশের বহু পণ্ডিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত সরকারের সমর্থনের বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণ করেছেন ও করছেন। চিরশত্রু পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত সরকারের রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে বিশেষ আগ্রহ থাকা সম্ভব। কিন্তু এই রাজনৈতিক বিশ্লেষণ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ ভারতবাসীর আবেগকে বিশ্লেষণ কিংবা পরিপূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে নামার পর আমার থাকার জায়গা স্থির করা হলো দিলীপ বসুর বাসায়। হিরেণ মুখোপাধ্যায়ের তরী থেকে তীর গ্রন্থে দিলীপ বসুর বামপন্থী ও প্রগতিশীল আন্দোলনে ভূমিকা বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন রয়েছে। তিনি আমাকে ১৪৪, লেনিন সরণিতে (ধর্মতলা) শান্তি পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ দপ্তরে পৌঁছে দিলেন। ১৪৪, লেনিন সরণি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। বেশ পুরোনো এই ভবনের দোতলায় বিভিন্ন ঘরে সর্বভারত শান্তি ও সংহতি পরিষদ, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি ও সর্বভারতীয় মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার কার্যালয় রয়েছে। এই ভবনে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়–সভাপতি খ্যাতনামা সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক সি পি আই-এর দীপেন

মুখোপাধ্যায়। দীপেন মুখোপাধ্যায় দিনরাত এই অফিসের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পী-সাহিত্যিক-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীরা সহায়ক সমিতির অফিসে আশ্রয়ের জন্য আসেন। তিনি তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এক ঘরে বাংলাদেশের শিল্পীদের গানের রিহার্সেল হয়, তাঁরা মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা নামে শরণার্থী শিবির ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গান গেয়ে তাদের উজ্জীবিত করেন।

দিলীপ বসু ধর্মতলা অফিসে শান্তি ও সংহতি পরিষদের সম্পাদক অমিয় মুখার্জি ও সর্বভারতীয় মেডিকেল অ্যাসেসিয়েশনের কলকাতা শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা. অসিত ঘোষের কাছে আমাকে সোপর্দ করলেন। প্রথম সমস্যা হলো আমাদের জন্য পাসপোর্ট জোগাড় করা। আমার মেডিকেল কলেজের সহপাঠীদের আশি শতাংশ স্নাতক হওয়ার পর যুক্তরাজ্যে পাড়ি দিয়েছে। বাবার ইচ্ছা ছিল আমিও উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রা করি; একদিকে আমার প্রবল আপত্তি, অন্যদিকে আমার পাসপোর্ট আবেদনের ওপর পুলিশ রিপোর্টে আমার ছাত্র রাজনীতি সংক্রান্ত ভয়াবহ প্রতিবেদন ছিল, পাকিস্তান আমলে পাসপোর্ট হয়নি। কিন্তু বিধির বিধান, নির্বিঘ্নে পায়ে হেঁটে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করেছি, কোনো পাসপোর্টের প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু হাঙ্গেরি যেতে হলে পাসপোর্ট দরকার। প্রতিনিধিদলের সদস্য আবদুস সামাদ, দেওয়ান মাহবুব আলী ও আমার জন্য ভারত সরকার একটি হলুদ মোড়কের আইডেনটিট সার্টিফিকেট-সংবলিত বই তৈরি করে। এই বইয়ে ভারত সরকার প্রত্যয়ন করে যে, আমরা ১৪৪, লেনিন সরণি, ধর্মতলা কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছি এবং বসবাস করছি। পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থে এই প্রত্যয়নপত্রে আমাদের ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হয়েছে। আবদুস সামাদ হলেন আবদুস সামাদ আজাদ, আমার নাম গোলাম সারওয়ার এবং দেওয়ান মাহবুব আলীর নতুন নামকরণ হলো মাহবুবুল আলম। স্বাধীনতার পরও সামাদ সাহেব আবদুস সামাদ আজাদ পরিচয় বহন করেছেন।

দিল্লি পৌঁছে আশ্রয় পেলাম সর্বভারতীয় শান্তি ও সংহতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক চিত্ত বিশ্বাসের পুরাতন দিল্লির 'কমিউন' ধরনের বাসায়। সেখানে এক ঘরে তাঁর সঙ্গে বসবাস করেন শান্তি পরিষদের সম্পাদক রমণ মিত্র। চিত্ত বিশ্বাসের আদি বাড়ি চট্টগ্রামে এবং তিনি অনর্গল চাটগাঁর ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত। ভারত বিভাগের আগে চিত্ত বিশ্বাস চট্টগ্রামে ছাত্র

ফেডারেশনের আন্দোলন করেছেন, বাংলাদেশের প্রতি নাড়ির টান অনুভব করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যেসব ভারতীয় নাগরিক নিরলস পরিশ্রম করে অবদান রেখেছেন, চিত্ত বিশ্বাস তাঁদের বিশিষ্ট একজন। অনবরত পান ও পানামা সিগারেটে অভ্যস্ত চিত্তদা যে দক্ষতার সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানা ধরনের ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও জীবনাচারের মানুষের প্রতিনিধিদলের ব্যবস্থাপনা করতেন, তার তুলনা নেই। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমাদের সফরের সময় তিনি সর্বত্র আমাদের প্রতিনিধিদলকে সঙ্গ দিয়েছেন কিন্তু কখনো নিজের মত চাপিয়ে দেন নি। চিত্ত বিশ্বাস পরবর্তী জীবনে হেলসিংকিতে বিশ্ব শান্তি পরিষদ ও কায়রোতে আফ্রো-এশীয় গণসংহতি পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এই নিবেদিতপ্রাণ অকৃতদার মানুষটি কয়েক বছর আগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

দিল্লি থেকে রওনা হওয়ার আগে দুই দফা আলোচনা করলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং। প্রথম দফা আলোচনা ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে, পরে আমাদের সঙ্গে পৃথকভাবে। শরণ সিংয়ের মূল বক্তব্য ছিল ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নি, তবে লোকসভায় গণহত্যার প্রতিবাদে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে। সুতরাং তিনি আশা করেন, ভারতীয় প্রতিনিধিরা ভারতের উদ্বাস্তু সমস্যার সূত্র ধরে গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালাবেন। আমাদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সৌজন্য সাক্ষাতে বললেন, আপনারা নিশ্চয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে বক্তব্য দেবেন।

দিল্লির পালাম বিমানবন্দর থেকে ফ্লাইটযোগে মস্কো যেতে হয়, কিছুক্ষণের বিরতির পর বুদাপেস্ট অভিমুখে যাত্রা। মস্কোতে অতিরিক্ত সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি ঘটে, ভূপেশ গুপ্ত তাঁর আলাপ সেরে আসার পর বিমান যাত্রা শুরু করে। বিশ্ব শান্তি পরিষদের সম্মেলনে যথারীতি উদ্বোধনী প্লেনারি অধিবেশনে স্বল্পসংখ্যক বক্তা ছিলেন। মূল বক্তব্য দিলেন প্রতিষ্ঠানের মহাসচিব রমেশ চন্দ্র। তিনি তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তান সরকারের গণহত্যার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপন করেন। ১৯৭৪ সালে রমেশ চন্দ্র ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সর্বোচ্চ পুরস্কার জুলিও কুরি পদকে ভূষিত করেন। প্লেনারি অধিবেশনে ভারতীয় দলের নেতা কৃষ্ণমেনন ভারতে আগত এক কোটি বাংলাদেশি উদ্বাস্তু বিষয়ে দীর্ঘ বক্তব্য

দিয়ে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। তখনো কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে বক্তব্য দেন নি। সেই দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত হয়। দুটি পৃথক অধিবেশনে আবদুস সামাদ আজাদ ও আমি বাংলাদেশে গণহত্যার ভয়াবহতা তুলে ধরে স্বাধীনতা ছাড়া যে এ সমস্যার কোনো সমাধান নেই, সে বিষয়টি সভাকে অবহিত করি। সম্ভবত বক্তৃতায় আবেগের অতিরিক্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। সভা সমাপ্তির পর অনেকে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

এই সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকার ও কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের পাশাপাশি আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি আন্দোলনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতারা এবং পশ্চিম ইউরোপের লিবারেল ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলগুলোর পার্লামেন্ট সদস্য ও নেতারা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। আমরা বাংলাদেশ পরিস্থিতির ওপর তড়িঘড়ি করে মুদ্রিত বাংলাদেশ শ্বেতপত্র শিরোনামের পুস্তিকা নিয়ে যাই। সম্মেলনের বিরতি, মধ্যাহ্ন কিংবা নৈশভোজ ও হোটেল লবিতে তিন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করি এবং পুস্তিকাটি হস্তান্তর করি। যেহেতু সম্মেলনটি বামপন্থীদের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, তাই বাংলাদেশে বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে আমাদের কথা শোনেন, কিন্তু কোনো ধরনের স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেন না। অন্যদিকে, পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমে বাংলাদেশে গণহত্যার বিষয়টি প্রচারিত হওয়ায় পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সব প্রতিনিধি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছাড়া যে সমস্যার সমাধান নেই, আমাদের এই যুক্তিটি মেনে নেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রেস, নামিবিয়ার মুক্তিসংগ্রাম ও সাহারা অঞ্চলের শীর্ষ নেতারা আমাদের যথেষ্ট উৎসাহ দেন। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলফ্রেড নজো আমাদের নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে জন্য সোভিয়েত অস্ত্র সহযোগিতার অনুরোধ জানানোর প্রস্তাব দিলেন।

আমরাও অনুরূপ পরিস্থিতিতে, কিছুটা সাহসের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে একটি স্বাক্ষর অভিযান চালাবো। একটি খসড়া প্রস্তাব লিখলাম। সেই

প্রস্তাবে নির্বাচনের রায় অস্বীকার করা, গণহত্যা এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বাধীনতা ছাড়া যে কোনো বিকল্প নেই, সেই বিষয়গুলো স্থান পায়। ভারতীয় প্রতিনিধিদের খসড়াটি দেখানো হলো। সিপিআই ও কংগ্রেসের তরুণ নেতাদের আপত্তি। তাঁরা ওই খসড়া প্রস্তাবে স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে পারবেন না, কারণ দলীয়ভাবে এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত তাঁদের নেই। তাঁরা খসড়া প্রস্তাব কিছুটা সংশোধন করে রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়টি উত্থাপনের অনুরোধ জানালেন। আবদুস সামাদ আজাদ প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে আলোচনাস্থল ত্যাগ করলেন। অথচ আমরা এ ধরনের সম্মেলনে একেবারে নতুন, স্বাক্ষর অভিযান সফল করার জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিদের সাহায্য দরকার। বেশ রাতে সিপিআইয়ের সম্পাদক ভূপেশ গুপ্তর কাছে গিয়ে পরিস্থিতি জানালাম। তিনি একটিমাত্র প্রশ্ন করলেন, আর ইউ সিওর, সিপিবি স্বাধীনতার পক্ষে এই অবস্থান নিয়েছে এবং এ বিষয়ে কোনো নমনীয়তা প্রদর্শন করবে না? আমি এ-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের বুকলেটটি ভূপেশ গুপ্তকে দেখালাম। তিনি পাঠ করলেন এবং আবার একই প্রশ্ন করলেন–আর ইউ সিওর দ্যাট ইজ সিপিবি পজিশন? পুনরায় একই উত্তর। এরপর তিনি স্পষ্টভাবে সিপিআই ও কংগ্রেসের তরুণ কর্মীদের জানালেন যে বাংলাদেশে স্বাধীনতা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই, এটি তাঁদের পার্টির সিদ্ধান্ত। এ ক্ষেত্রে আমাদের কোনো এখতিয়ার নেই। সবাই মিলে স্বাক্ষরে নামা যাক। আমরা বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৭০টি স্বাক্ষর গ্রহণ করি এবং এই বিবৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসহ পশ্চিম ইউরোপের সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত হয়। আকাশবাণী থেকে আমার বক্তৃতা প্রচারিত হয়। স্বাক্ষর অভিযান সফল করার জন্য ভারতের হাঙ্গেরি দূতাবাসে সন্ধ্যায় প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়। একটি উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পন্ন করা গেল।

বুদাপেস্ট সম্মেলনের পর মস্কোতে প্রত্যাবর্তন করলাম, কয়েক দিনের বিরতি। তারপর পোল্যাণ্ড ও পূর্ব জার্মানিতে যেতে হবে। মস্কো পৌঁছে ভূপেশ গুপ্তর বারবার 'আর ইউ সিওর'-এর মর্মার্থ টের পেলাম। মস্কোতে দ্বিতীয় দিন দুপুরে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক বিভাগের দুজন জাঁদরেল কর্মকর্তা আমার ও দেওয়ান মাহবুব আলীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনার জন্য আমার কক্ষে এলেন। আমি যথারীতি সিপিবির স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ সমর্থন-সংবলিত প্রস্তাবটি হস্তান্তর করলাম। তাঁরাও বললেন, আর

ইউ সিওর? এরপর তিনি জানালেন, তোমাদের পার্টির সম্পাদক অনিল মুখার্জি রাশিয়ায় এবং তিনি ইতিমধ্যে বিবৃতি দিয়েছেন। সেখানে সরাসরি স্বাধীনতার দাবি নেই। এই বিবৃতি সিপিআইয়ের মুখপত্র নিউ এজ-এ প্রকাশিত হয়েছে। ফিরে এসে আমাকে নিউ এজ ও কালান্তর পত্রিকায় পাল্টা বিবৃতি দিতে হয়েছে। অনিলদা অবশ্য পরে আমাকে জানিয়েছিলেন, তিনি মস্কোর বাইরে থাকায় পার্টির নতুন প্রস্তাবটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। সোভিয়েত পার্টির কর্মকর্তারা মনোযোগের সঙ্গে বাংলাদেশের বিস্তারিত ঘটনা জানার চেষ্টা করলেন এবং গণহত্যা শুরুর পর বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়ে একমত হলেন। বিষয়টি তাঁরা পার্টি ও সরকারের শীর্ষপর্যায়ে উত্থাপন করতেও সম্মত হন। আমাদের দায়িত্ব ছিল স্বাধীনতার পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ক্ষমতাসীন দলের সমর্থন আদায় করা। এই লক্ষ্য অর্জন বেশ জটিল মনে হলো। রমেশ চন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী পেরিন রমেশ চন্দ্র তখন মস্কোতে। পরিস্থিতির জটিলতা তাঁদের জানালাম। এবার উদ্ধারকর্তা সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত ডি পি ধর। দুই মাস পর তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টা নিযুক্ত হন এবং তিনি, রাজনৈতিক সচিব পি.এন. হাকসার ও পররাষ্ট্র সচিব টি.এন. কাউল মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সাহায্য-সহযোগিতাবিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ডি পি ধর ভারতীয় দূতাবাসে বুদাপেস্ট সম্মেলন থেকে প্রত্যাগত প্রতিনিধিদলের সম্মানে এক সংবর্ধনার আয়োজন করলেন। তিনি এ অনুষ্ঠানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের আমন্ত্রণ জানান। তিনি তাঁর বক্তৃতার শুরুতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত বাংলাদেশের প্রতিনিধি বলে অভিহিত করে পরিচয় করিয়ে আমার জবানিতে জানালেন যে, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ মনে করে যে, স্বাধীনতা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার সমাধান নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে সিপিবির দৃঢ় অবস্থান অন্যতম পূর্বশর্ত ছিল। ডি পি ধরের বক্তব্য তাঁদের দ্বিধা দূর করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তিনি কূটনৈতিক আচারের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে আমাদের বক্তব্যই তুলে ধরেন। ডি পি ধরের অভ্যর্থনা আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি আমাদের জানালেন সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তির খসড়া আলোচিত হচ্ছে এবং এই চুক্তি সম্পন্ন

হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করবে বলে তাঁর বিশ্বাস রয়েছে। তবে, ভারত ও সোভিযেত ইউনিয়ন উভয়ের পক্ষেই বাংলাদেশ প্রসঙ্গে গণচীনের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ হবে।

বস্তুতপক্ষে, জুলাই মাসে পাকিস্তান হয়ে কিসিঞ্জারের পিকিং সফর ও চীন-মার্কিন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টির পর দ্রুততার সঙ্গে আগস্ট মাসে সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির একটি ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয় যে তাঁদের কোনো এক দেশ অপর কোনো দেশ দ্বারা আক্রান্ত হলে, তাঁরা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পারস্পারিক আলোচনায় মিলিত হবেন। সবাই অবগত রয়েছেন, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের পর অধিক হারে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে এবং অস্ত্র সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পাকিস্তানের সামরিক সরকারের প্রতি সমর্থন প্রদানের পর ভারত সরকারের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতার গ্যারান্টি ছাড়া বাংলাদেশের ব্যাপারে বড় ধরনের ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নও মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে তিনবার ভেটো প্রয়োগ করে যৌথ বাহিনীর অগ্রযাত্রা ও চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করে এবং মার্কিন সপ্তম নৌবহরকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার যুদ্ধজাহাজ দ্বারা ভারত মহাসাগরে তাড়া করে।

মস্কো থেকে আমরা প্রথমে ওয়ারশ ও পরে পূর্ব বার্লিনে যাই। সঙ্গী চিত্ত বিশ্বাস। ওয়ারশতে আলোচনা গতানুগতিক, আমরা সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরি। ইতিমধ্যে আমাদের উপলব্ধি হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সুনির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ না করলে তারা গণহত্যার প্রতিবাদ জানাবে, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি করবে কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো অবস্থান নেবে না। এযাবৎকাল আলোচনা কর্মকর্তা পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। পাকিস্তান সরকারের জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না বিধায় পূর্ব বার্লিনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক মধ্যাহ্ন ভোজে মিলিত হন। আলোচনায় পূর্ব জার্মানিতে ভারতের রাষ্ট্রদূত আজনানি উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে ভারতের পররাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রথমে নানা প্রসঙ্গ ও সৌজন্য আলাপের পর ইয়াহিয়া খানের গণহত্যা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করেন। আমরা পরিস্থিতির বিশদ বিবরণ দিলাম। এরপর জার্মান

ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরাসরি জানান যে, তাঁরা বাংলাদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন এবং আপনারা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আশা করতে পারেন।

প্রায় দুই সপ্তাহ বিদেশ ভ্রমণের পর দিল্লি প্রত্যাবর্তন। আমি ও আবদুস সামাদ আজাদ কলকাতা ও আগরতলায় ফেরার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। পরবর্তী বিমানে কলকাতায় ফিরে এলাম। দেওয়ান মাহবুব আলী কিছু কাজের জন্য দিল্লিতে থেকে গেলেন। তিন দিন পর তিনি কলকাতার উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য পালাম বিমান বন্দরে যান। সেখানে আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দেওয়ান মাহবুব আলী মৃত্যুবরণ করেন।

বস্তুত:পক্ষে কেবল ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভাষা-সংস্কৃতির পার্থক্য ও বিশাল ভৌগলিক ব্যবধানে গঠিত পাকিস্তানে গণতন্ত্রহীনতা, শোষণ, বঞ্চনার ও বৈষম্যের রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা করা অসম্ভব ছিল। বিশেষ করে গণহত্যা শুরুর পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অবধারিত ছিল। তবে আমার বিবেচনায় জটিল বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারত ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সার্বিক সহায়তা ছাড়া নয় মাসের যুদ্ধে দেশ স্বাধীন করা কঠিন ছিল এবং আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম দীর্ঘায়িত হতো।

বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধে

সিপিআই (এম)-র ভূমিকা

গৌতম দাশ

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের জনগণ হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার পরদিনই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধকে সর্বাত্মক সমর্থন করে ভারতের সব অংশের জনগণকে বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়াতে আবেদন জানিয়েছিল। সিপিআই (এম)-র তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক পি সুন্দরাইয়া পার্টির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের জনগণের অবিসংবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের 'স্বাধীন বাংলাদেশ'-র ঘোষণাকে সমর্থন জানান এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বর গণহত্যার তীব্র নিন্দা করেন। বিবৃতিতে তিনি ভারতের জনগণ এবং ভারত সরকারকে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে সমর্থন দিতে এবং সমস্ত ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়াতে আহ্বান জানান। উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সিপিআই (এম)-ই প্রথম বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রাম তথা স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দিয়েছিল।

বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সিপিআই (এম)-র সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন তোলেন। এটা বলার চেষ্টা হয়– সিপিআই (এম) কেন আগ বাড়িয়ে প্রথম বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন দিতে গেল? সিপিআই (এম)-র পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দেয়া হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ১৯৬৪ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত যে পার্টি কংগ্রেস থেকে সিপিআই (এম) গঠনের ঘোষণা দেয়া হয় এবং পার্টির নতুন কর্মসূচি গৃহীত হয়, সেই কর্মসূচিতেই স্পষ্টভাবে বলা হয়, "সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির প্রতি অনুগত পার্টি হিসেবে সিপিআই (এম) সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ... শান্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের সপক্ষে লড়াইরত বিশ্বের সমস্ত শক্তির প্রতি সিপিআই (এম) সংহতি জ্ঞাপন করছে।"

ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সিপিআই (এম) বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধকে প্রথম সমর্থন দিয়েছিল তা শুধু নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সংগ্রামকে সিপিআই (এম) ধারাবাহিকভাবে সমর্থন দিয়ে আসছিল। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গণঅভ্যুত্থানকে সিপিআই (এম) পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল। বাংলাদেশের জনগণের সেই ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানে জেনারেল আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী সামরিক সরকারের পতন ঘটে এবং পরবর্তী সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান জাতীয় সংসদের এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর নির্বাচন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর শান্তিপূর্ণভাবে পাকিস্তান জাতীয় সংসদ এবং পূর্ব পাকিস্তানসহ পাকিস্তানের সমস্ত প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে এবং পূর্ব পাকিস্তান আইনসভায়ও একচেটিয়া সাফল্য অর্জন করে। ১৯৭০ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়ায় পাকিস্তানের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত নাগরিকদের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং পাকিস্তানের সমস্ত প্রদেশকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেবেন।

পাকিস্তানের নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে অভিমত দিতে গিয়ে সেদিন সিপিআই (এম) পলিটব্যুরোর সদস্য জ্যোতি বসু কলকাতায় বলেছিলেন– "আমি আশা করি পাকিস্তানে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভারতের সাথে পাকিস্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে।"

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সরকার জনগণের রায় মেনে নিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরকার গঠন করতে দেয়নি। শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে বসতে না দিতে জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার ষড়যন্ত্র শুরু করল। শেখ মুজিবুর রহমান কয়েকবার ইয়াহিয়ার সাথে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে কথা বললেও জেনারেল ইয়াহিয়া আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করতে থাকেন এবং গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে

জাহাজে করে সমুদ্রপথে পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র মজুত করতে থাকেন। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি থেকে হাজার হাজার সৈন্যকে পূর্ব পাকিস্তানে উড়িয়ে এনে বিভিন্ন জেলায় মোতায়েন করা হতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে জনবিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রমনা রেস কোর্স ময়দানে এক সুবিশাল জনসমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি সামরিক জান্তার প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার তীব্র সমালোচনা করে জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান। পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে শুরু হয় শ্রমিক ও ছাত্র ধর্মঘট। বিভিন্ন শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী জনগণকে গুলি করে হত্যা করতে শুরু করে। চট্টগ্রাম বন্দরে শ্রমিকরা জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করতে অস্বীকার করলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শ্রমিকদের গুলি করে হত্যা করে। সমগ্র পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে অবরোধ করা শুরু করেন।

তখন সিপিআই (এম)-র কেন্দ্রীয় কমিটির অফিস ছিল কলকাতার ৪৯ নং লেক প্লেস-এ। পার্টির পলিটব্যুরো সদস্যরা পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর প্রতি নিয়মিত নজর রাখছিলেন। পার্টির সে সময়কার সাধারণ সম্পাদক পি সুন্দরাইয়া ছাড়াও পলিট ব্যুরো সদস্য বি টি রণদিভে, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, এ কে গোপালন, এম বাসবপুন্নাইয়া, হরকিষাণ সিং সুরজিৎ, জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, পি রামমূর্তি প্রমুখ নিয়মিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতেন। ১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ সিপি আই (এম) পলিট ব্যুরো এক প্রেস বিবৃতিতে বলে, 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-ও পলিট ব্যুরো পূর্ব বাংলার বীর জনগণ পাকিস্তানি সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে স্বায়ত্তশাসন অধিকার এবং গণতন্ত্রের জন্য যে অসম সাহসী এবং গৌরবজনক সংগ্রাম চালাচ্ছেন তাদের উষ্ণ ভ্রাতৃত্বপূর্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন সামরিক বাহিনী নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে, গণহত্যা সংঘটিত করছে, কিন্তু জনগণকে অবদমিত করতে পারছে না। বরং তারা ইস্পাতদৃঢ় মনোবল নিয়ে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। সমগ্র জনগণ একাত্ম হয়ে সামরিক রাজত্বের বিরুদ্ধে তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। চট্টগ্রাম বন্দরের শ্রমিকরা অস্ত্রশস্ত্র খালাস করতে অস্বীকার করেছেন। এমনকি হাইকোর্টের

বিচারপতিরা নতুন গভর্নরকে শপথ গ্রহণ করাতে অস্বীকার করেছেন। সমগ্র পূর্ববঙ্গের জনগণের সম্পূর্ণ অসহযোগ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসকদের ফরমান অকার্যকর হয়ে গেছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান অসামরিক প্রশাসন নিজের হাতে নিয়েছেন।

স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র এবং অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয় অভ্যুত্থান এতো সর্বব্যাপকতা লাভ করেছে যে ধর্মীয় ফতোয়া উত্তাল ঢেউয়ের মুখে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে গেছে।

পলিট ব্যুরো পূর্ববঙ্গের জনগণের মরণপণ, সাহসিক এবং বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে অভিনন্দিত করে এই আস্থা প্রকাশ করছে, খুব শিগগরই তাদের সংগ্রাম সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।'

পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি ক্রমেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠতে থাকে। জেলায় জেলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ ঘটতে থাকে। সেনাবাহিনীর গুলিতে অনেকেই প্রাণ হারান। কিন্তু ছাত্র-জনতা এতোখানি ভীত না হয়ে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধে নামেন। ২৫ মার্চ বিকেলে ঢাকায় আরেকটি উদ্বেলিত জনসমাবেশ সংগঠিত হয় পল্টন ময়দানে। বিকেল থেকেই ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যাপকসংখ্যায় মোতায়েন করা হতে থাকে। মাঝ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শেখ মুজিবুর রহমানকে তার বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। ঢাকা এবং অন্যান্য শহরে নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করে হত্যা, গণহত্যা শুরু করে। ঢাকাসহ অনেক শহরে কারফিউ জারি করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার আগে 'স্বাধীন বাংলাদেশ'-র ঘোষণা দিয়ে তার স্বদেশবাসীকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

২৬ মার্চ বিকেল থেকে ত্রিপুরা, অসম, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে আক্রান্ত বাংলাদেশের হাজার হাজার নারী-পুরুষ আশ্রয় নিতে শুরু করেন। ২৬ মার্চ সারা রাত ধরে আগরতলা শহরে, ত্রিপুরার বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশ থেকে স্রোতের মতো মানুষ প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নেন। বিভিন্ন স্কুল বাড়িতে, গাছতলায় বা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বাংলাদেশের মানুষ মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিতে থাকেন।

২৭ মার্চ ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করে সারা ত্রিপুরায় হরতাল ডাক দেয়। বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের হরতালের ডাকে সমগ্র ত্রিপুরার মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেন স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, হাট-বাজার সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে। সেদিন বিকেলে সিপিআই (এম) এবং ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে আগরতলায় গণমিছিল সংগঠিত হয়। মিছিল থেকে দাবি ওঠে, 'ইন্দিরা সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও', 'বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদের সাহায্য চাই।' সেদিনই সিপিআই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক নৃপেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে ত্রিপুরার সমগ্র সীমান্ত বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য খুলে দেয়ার দাবি জানান। তারা স্কুল ও কলেজে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য সরকারি আশ্রয় শিবির খোলার এবং সবার জন্য খাদ্য শিশুদের জন্য শিশু খাদ্য ঔষধ সরবরাহ করার দাবি জানান। নৃপেন চক্রবর্তী ছাড়া প্রতিনিধিদলে ছিলেন ত্রিপুরা থেকে নির্বাচিত দুই লোকসভা সদস্য দশরথ দেব এবং বীরেন দত্ত। ত্রিপুরার বিভিন্ন সীমান্তে বামপন্থী ছাত্র-যুবরা জড়ো হয়ে বাংলাদেশের ছাত্র-যুবদের সাথে মত বিনিময় করেন এবং তাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। সিপিআই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি এক প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করে বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয়, খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য দিতে ত্রিপুরা সরকারের কাছে দাবি জানায়। ২৭ মার্চই সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরোর পক্ষ থেকে পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি সুন্দরাইয়া বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জানাতে আহ্বান জানান।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু থেকে সে বছর ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় পর্যন্ত সিপিআই (এম) ধারাবাহিক এবং সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন এবং সমস্ত ধরনের সহযোগিতা দিয়ে এসেছে। আগরতলা, কলকাতা এবং ভারতের বিভিন্ন শহরে সিপিআই (এম) বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানাতে বিরাট বিরাট জনসমাবেশ আয়োজন করেছে এবং বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে ভারত সরকারের কাছে ক্রমাগত জোরালো দাবি জানিয়ে এসেছে।

২৯ মার্চ আগরতলায় সিপিআই (এম)-র ডাকে ১০ হাজারের বেশি নারী-পুরুষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে গণমিছিলে শামিল হয়েছিলেন এবং নিরীহ মানুষকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

৩০ মার্চ ত্রিপুরা বিধানসভায় সর্বসম্মতভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে স্বীকৃতি দেবার অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয় এবং তাদের সমস্ত রকম সাহায্য দিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়।

ভারতের ছাত্র ফেডারেশন এবং ত্রিপুরা মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বর গণহত্যার বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতির দাবিতে ৩০ মার্চ ফের 'ত্রিপুরা বন্ধ' ডাকে। ত্রিপুরার কংগ্রেস সরকার কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিত না হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে সার্কুলার জারি করেছিল। কিন্তু তা অগ্রাহ্য করে কর্মচারীরা সমগ্র ত্রিপুরায় জনগণসহ সর্বাত্মক বন্ধ পালন করেন। ২ এপ্রিল সিপিআই (এম)-র ডাকে আগরতলার শিশু উদ্যানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিরাট সমাবেশ সংগঠিত হয়। শ্রমিক নেতা চিত্ত চন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভার প্রধান বক্তা সিপিআই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক নৃপেন চক্রবর্তী বাংলাদেশের নিরীহ মানুষকে ইয়াহিয়া বাহিনীর বর্বর গণহত্যার তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করতে দাবি জানান। নৃপেন চক্রবর্তী চিন সরকারের নীরবতায় এবং সোভিয়েত রাশিয়া সরকারের ঘটকালিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আগতলার হাজার হাজার মানুষের সাথে বাংলাদেশের প্রচুর শরণার্থীও শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের আশ্রয় এবং খাদ্য সরবরাহ করতে গড়িমসি করছিল। সিপিআই (এম) এবং বামপন্থী ছাত্র-যুব শ্রমিক এবং মহিলা সংগঠনগুলো নিজেরাই শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ সাহায্য সংগ্রহে নেমে পড়েছিলেন। বাজারের দোকানপাট, মানুষের বাড়ি বাড়ি থেকে চাল, কাপড়, টাকা-পয়সা সংগ্রহ করে সিপিআই (এম) নেতা এবং কর্মীরা শরণার্থীদের আশ্রয় শিবিরগুলোতে খাদ্য ও কাপড় বিলি

করতেন। সংগ্রহীত টাকা দিয়ে বাজার থেকে শিশু খাদ্য এবং ঔষধ কিনে শিবিরে শিবিরে তা বিলি করতেন।

বাংলাদেশের জনগণের নয় মাসব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে ভিয়েতনামের জনগণের বীরত্বপূর্ণ বিজয়ের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম গৌরবোজ্জ্বল বিজয়। বহু বাধা অতিক্রম করে বাংলাদেশের বীর জনগণ সাফল্য অর্জন করেছেন। এই নয়মাস সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট পাকিস্তানের সামরিক সরকার অমানবিক নিষ্ঠুরতার ঘৃণ্য নজির স্থাপন করেছে। লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে গণহত্যা করেছে। মা-বোনদের উপর নির্মম পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে, গ্রামের পর গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে– এতো নৃশংস অত্যাচার সত্ত্বেও বাংলাদেশের জনগণ এবং মুক্তিযোদ্ধারা অসম সাহসী প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন। বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে এবং বিশ্বের বিভিন্ন শক্তি কেন্দ্রে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য নানান কুটিল ষড়যন্ত্রও হয়েছে। এই সমগ্র পর্বে সিপিআই (এম) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে– যাতে কোনওভাবে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে কেউ ব্যাহত করতে না পারে এবং সংগ্রাম সঠিক খাতে প্রবাহিত হয়ে বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শুরু থেকে সিপিআই (এম) নেতৃত্ব বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে সহায়তা করতে কতগুলো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়। এর মধ্যে ছিল (এক) বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয় ও ত্রাণ সাহায্য দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করতে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করা, (দুই) সমগ্র ভারতের জনগণের কাছ থেকে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে শরণার্থীদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিলি-বণ্টন করা, (তিন) ভারতের ইন্দিরা গান্ধি সরকার যেন দ্রুত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় তার জন্য গণআন্দোলন সংগঠিত করা, (চার) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামকে উৎসাহিত করা, (পাঁচ) বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও গ্রুপগুলোকে সংঘবদ্ধ করে মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণে সহায়তা করা এবং (ছয়) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে এবং ত্রাণ সাহায্য পাঠাতে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া।

৮ থেকে ১২ এপ্রিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত সিপিআই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির

অধিবেশন থেকে প্রচারিত প্রেস বিবৃতিতে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে সমগ্র ভারতব্যাপী ২৫ এপ্রিল 'বাংলাদেশ সংহতি দিবস' পালনের জন্য ভারতবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীন বাংলাদেশে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যেসব অস্ত্র তারা সংগ্রহ করতে পেরেছেন তাই দিয়ে, এমনকি খালি হাতেও পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে বীরের মতো লড়ছেন। যে আত্মত্যাগ তারা স্বীকার করছেন, গণবিদ্রোহের ইতিহাসে আর একটি গৌরবময় অধ্যায় যুক্ত হয়েছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে বর্বরতা ও গণহত্যা সংঘটিত করছে ইতিহাসে তার কমই তুলনা মেলে। বিবৃতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করার আহ্বান জানানো হয়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম হচ্ছে ন্যায়সঙ্গত এবং গণতান্ত্রিক। এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে নয়– এই সংগ্রাম হচ্ছে পাকিস্তানের শাসক চক্রের বিরুদ্ধে। বিবৃতিতে ভারতের ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের কাছে দাবি জাননো হয় অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তাকে সমস্ত রকমের সাহায্য করতে হবে, যাতে তারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের মোকাবিলা করতে এবং তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়।

সিপিআই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির এপ্রিলের অধিবেশন থেকেই বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ সাহায্য সংগ্রহে এবং বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতির দাবিতে জনমত গঠনে পলিট ব্যুরো সদস্য জ্যোতি বসুকে চেয়ারম্যান করে 'বাংলাদেশ সলিডারিটি অ্যান্ড এইড কমিটি' গঠন করা হয়। এই কমিটির উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে শরণার্থীদের জন্য খাদ্য, বিভিন্ন ধরনের ত্রাণসামগ্রী, কাপড়, ঔষধ, রক্তের প্লাজমা, নগদ অর্থ সংগ্রহ করা হয়। জ্যোতি বসুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের ঝাঁসির রানি ব্রিগেডের অধিনায়িকা ডা. লক্ষ্মী সায়গল, চট্টগ্রামের বিপ্লবী কন্যা কল্পনা দত্ত (যোশী) দিল্লিতে ত্রাণ সংগ্রহে নেতৃত্ব দেন। পাঞ্জাব থেকে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু), কেরালা, কর্ণাটক সর্বত্র হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশের জনগণের জন্য ত্রাণসামগ্রী দান, ঔষধ, রক্ত এবং অর্থ দান করেন। পাঞ্জাবের বিভিন্ন মিল থেকে শ্রমিকরা উলের সোয়েটার সংগ্রহ করে ট্রাক বোঝাই করে শরণার্থীদের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

বোম্বে এবং আমেদাবাদের কাপড় মিল শ্রমিকরা পাঠিয়েছিলেন প্রচুর কাপড়। পাকিস্তান জাতীয় সংসদের নির্বাচনে জনগণের বিপুল রায়ে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসতে না দিয়ে উল্টো তাকে গ্রেফতার এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে পাকিস্তানি সৈন্যরা নিষ্ঠুরভাবে গণহত্যা করবে– এটা কারো কল্পনাতেও ছিল না। তাই, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ হতভম্ব এবং দিশেহারা ছিলেন। আক্রান্ত নারী-পুরুষ প্রাণ বাঁচাতে যে যেদিকে পেরেছেন সেদিকে ছুটেছেন। সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসামের বিভিন্ন গ্রাম-শহরে আশ্রয় পাবার জন্য ছুটে এসেছিলেন। তেমনি, পাকিস্তান জাতীয় সংসদ এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইনসভার অনেক সদস্যও প্রাণ রক্ষায় আগরতলা, কলকাতা এবং অন্যান্য শহরে আশ্রয় নেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীরাও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেন।

এপ্রিল মাসে সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো সদস্য এবং লোকসভায় পার্টি গ্রুপের নেতা এ কে গোপালনের নেতৃত্বে সিপিআই (এম) সাংসদরা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সাথে দেখা করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার দাবি জানান। তখন ইন্দরা গান্ধি পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন– বাংলাদেশের সরকার কোথায়? কাকে স্বীকৃতি দেবো?

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল আগরতলার সার্কিট হাউসে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সদস্য এবং প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যরা এক সভায় মিলিত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে (শেখ মুজিবুর রহমান তখন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি জেলে বন্দি) সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে অস্থায়ী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। তবে সেদিন আগরতলায় তা ঘোষণা দেওয়া হয়নি। ১৪ এপ্রিল বাংলাদেশের ভেতরে একটি স্থানে অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা শপথ নেন। এখবর প্রচারিত হলে আগরতলা ও অন্যান্য শহরে সিপিআই (এম)-র ডাকে বিরাট বিরাট মিছিল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশকে ভারতের কূটনৈতিক স্বীকৃতির দাবিতে স্লোগান দেয়া হয়।

ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাংলাদেশের যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছিলেন, তাদের অনেকের কাছে ছিল পাকিস্তানি টাকা। পাকিস্তানি

কারেন্সি নোট ভারতের বাজারে ভাঙাতে অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে তারা প্রচণ্ড বিপাকে পড়েন। ৯ এপ্রিল সিপিআই (এম) লোকসভা সদস্য বীরেন দত্ত ত্রিপুরার উপরাজ্যপালের সাথে দেখা করে পাকিস্তানের মুদ্রার সাথে ভারতের মুদ্রার মানের সমতা রাখার দাবি জানান। বাংলাদেশের শরণার্থীরা এবং ভারতের নাগরিকরা যাতে নিয়মিত মুক্তিযুদ্ধের খবর জানতে পারেন তার জন্য তিনি আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র সারাদিন খোলা রাখা, শরণার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, ঔষধ সরবরাহ করা এবং সর্বদলীয় ত্রাণ কমিটি গঠনের দাবি জানান।

এপ্রিল মাসেই ত্রিপুরায় আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশের শরণার্থীদের সংখ্যা তিন লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। ফলে নানান জটিল সমস্যা সৃষ্টি হয়। ত্রিপুরার হাসপাতালগুলোতে রোগীর ভিড় উপচে পড়ে। স্বভাবতই চিকিৎসার বাড়তি চাপ সামাল দেয়া সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ভারতের স্বাধীনতার আগেই 'পিপলস রিলিফ কমিটি' গঠিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে পিপলস রিলিফ কমিটি বাংলাদেশের শরণার্থীদের প্রথম থেকেই চিকিৎসা পরিসেবা দিচ্ছিল। ত্রিপুরার সিপিআই (এম) নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের পিপলস রিলিফ কমিটি (পিআরসি)-র সহায়তা চাইলে তারা দ্রুততার সাথে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের টিম পাঠান। সেই সঙ্গে পাঠান ঔষধ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পিআরসি-র চিকিৎসকরা ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমায় রাত-দিন অক্লান্তভাবে শরণার্থীদের চিকিৎসা পরিসেবা দিয়েছেন। সিপিআই (এম)-র ছাত্র যুব কর্মীরা চিকিৎসা শিবিরগুলোতে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেছেন। মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভদের সংগঠনের সদস্যরা ত্রিপুরা থেকেও ঔষধ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। বাংলাদেশের কয়েকজন ডাক্তার পিআরসি'র মেডিকেল টিমের সদস্যদের সাথে একসাথে চিকিৎসার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ত্রিপুরা সরকার অল্প সংখ্যায় শরণার্থী ত্রাণ শিবির খোলে। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের বর্বর আক্রমণের মুখে বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার শরণার্থী আসছিলেন নিজেদের প্রাণ রক্ষায়। সরকারি ত্রাণ শিবিরগুলোতে অনেকেই আশ্রয় পাননি। আত্মীয়স্বজনের বাড়িঘর ছাড়াও অনেকে ঘর ভাড়া নিয়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে নিচ্ছিলেন। কিন্তু তারা

সরকারি ত্রাণ সাহায্য পেতেন না। আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময় বেসরকারি লোকদের হাতে থাকায় শরণার্থীরা পাকিস্তানি মুদ্রার খুব কম বিনিময় মূল্য পেতেন। ত্রিপুরার দুই সিপিআই (এম) লোকসভা সদস্য দশরথ দেব এবং বীরেন দত্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে ত্রিপুরার প্রতিটি মহকুমা শহরে সরকারি ট্রেজারিতে পাকিস্তানি মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবস্থা করার দাবি জানান। যারা সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় পাননি তাদেরকেও রিলিফ ক্যাম্পে নাম নথিভুক্ত করে ত্রাণ সাহায্য দেয়ার দাবি জানান।

সিপিআই (এম) এবং অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক দল, বামপন্থী ছাত্র যুব এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জোরালো দাবি জানিয়ে আসলেও ভারতের ইন্দিরা গান্ধির সরকার পাকিস্তানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখায় ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ২১ ও ২২ এপ্রিল আগরতলায় অনুষ্ঠিত সিপিআই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির অধিবেশন থেকে ফ্যাসিস্ট পাকিস্তানি সামরিক সরকারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে ভারত সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়।

২২ এপ্রিল আগরতলার শিশু উদ্যানে সিপিআই (এম)-র ডাকে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে একটি সুবিশাল জনসমাবেশ সংগঠিত হয়। সংসদ সদস্য দশরথ দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জন সমাবেশে সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত পূর্ব বাংলার জনগণের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করে বলেছিলেন, মাতৃভাষার মর্যাদা দাবিতে ১৯৫২ সালে যে ঐতিহাসিক আন্দোলন পূর্ব বাংলার মানুষ সংগঠিত করেছেন, তারাই সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগকে পরাজিত করেছেন। উৎখাত করেছেন সামরিক শাসক আইয়ুব খানকে। জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে পাকিস্তানকে ৪টি ইউনিট করতে বাধ্য করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে জনগণের রায় পদদলিত করে ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশের মানুষের ওপর বর্বর আক্রমণ চালাচ্ছেন। বাংলাদেশের জনগণ ইয়াহিয়ার হিংস্র বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামের জয় ঠেকানো যাবে না। প্রমোদ দাশগুপ্ত আরও বলেন, মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের নির্বাচন বয়কট করলেও বৃদ্ধ বয়সেও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

ইন্দিরা গান্ধি সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে দাশগুপ্ত বলেন, কলকাতার পাকিস্তান উপদূতাবাসের ডেপুটি হাই কমিশনার বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে ইস্তফা দিলেও ভারত সরকার নতুন নিযুক্ত পাকিস্তানি ডেপুটি হাই কমিশনারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। দাশগুপ্ত বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত সরকারকে ভারত সরকারের স্বীকৃতির জোরালো দাবি জানান।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ত্রিপুরায় বাংলাদেশের শরণার্থী সংখ্যা ৫ লক্ষ অতিক্রম করে যায়। কিন্তু প্রায় অর্ধেক সংখ্যক শরণার্থী সরকারি ত্রাণ শিবিরে স্থান পাননি। তখন ত্রিপুরার শাসন ক্ষমতায় শচীন্দ্রলাল সিংহের নেতৃত্বে কংগ্রেস দলের সরকার। ত্রাণ শিবিরগুলোতে সরকার যাদের সুপারভাইজর নিয়োগ করে তারা প্রচণ্ড দুর্নীতি করছিল। পাকিস্তানি সেনারা ত্রিপুরার সীমান্ত শহর ও গ্রামগুলোতে গোলা বর্ষণ করছিল। অনেক ভারতীয় নাগরিক হতাহত হচ্ছিলেন। ত্রাণ শিবিরে দুরবস্থা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ছড়াচ্ছিল। ১০ মে সিপিআই (এম) সংসদ সদস্য বীরন দত্ত সে সময়কার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরীর সাথে দেখা করে বাংলাদেশের শরণার্থীদের অবর্ণনীয় দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান, সরকারের ত্রাণ শিবির সংখ্যা অত্যন্ত কম। হাজার হাজার মানুষ গাছতলায় রয়েছেন। তারা কোন ত্রাণ পাচ্ছেন না। ত্রিপুরায় খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহও অপ্রতুল। বীরেন দত্ত দাবি জানান বিশেষ বিমানে তাঁবু ও টিন পাঠিয়ে ত্রাণ শিবির স্থাপন করে সবাইকে আশ্রয় দেয়া হোক। পর্যাপ্ত খাদ্য ও ঔষধ পাঠনো হোক। চোরাকারবারিদের কঠোরভাবে দমন করা হোক। না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে। ১১ মে সিপিআই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সম্পদক নৃপেন চক্রবর্তী, সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য সাংসদ বীরেন দত্ত ও ভানু ঘোষ উপ রাজ্যপাল এ এল ডায়াসের সাথে দেখা করে অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সরকার শরণার্থীদের আশ্রয় ও ত্রাণ সাহায্য দেয়ার ক্ষেত্রে চরম অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে। শরণার্থীদের ত্রাণসামগ্রী, রেশনের খাদ্য কালো বাজারে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে ত্রাণ কাজে দুর্নীতি বন্ধে ব্যবস্থা নিতে তারা দাবি জানান।

১৫ মে ত্রিপুরা সফরে আসেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। সিপিআই (এম) সাংসদ বীরেন দত্ত আগরতলা সার্কিট হাউসে ইন্দিরা গান্ধির সাথে দেখা করে

জানান, পাকিস্তানি সেনাদের গোলায় তখনো পর্যন্ত ১১ জন ভারতীয় নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন এবং দু'শতাধিক আহত হয়েছেন। ত্রিপুরার জনগণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে বীরেন দত্ত প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি জানান। বাংলাদেশের শরণার্থীদের পর্যাপ্ত ত্রাণ সাহায্য দেয়া, ত্রাণ বণ্টনে দুর্নীতি বন্ধ করা এবং ত্রিপুরার শরণার্থীদের বাড়তি চাপ মোকাবিলায় চাহিদামতো খাদ্য ও পণ্য সরবরাহ করতে সিপিআই (এম)-র পক্ষ থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি তুলে দেন।

বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনৈতিক দল এবং গ্রুপগুলো যাতে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তার জন্য সিপিআই (এম) প্রথম থেকে উদ্যোগ নিয়েছিল। মস্কো বা সোভিয়েত ইউনিয়নপন্থী বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু পিকিং বা চিনপন্থী বলে পরিচিত কমিউনিস্ট পার্টি এবং গ্রুপগুলোকে নিয়ে সমস্যা ছিল। সিপিআই (এম) নেতৃত্ব ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে পিকিংপন্থী বলে পরিচিত কমিউনিস্ট গ্রুপগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরোর পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং জ্যোতি বসু। ত্রিপুরায় এই দায়িত্বে ছিলেন নৃপেন চক্রবর্তী এবং তার সহযোগী ছিলেন ভানু ঘোষ ও গৌতম দাশ (লেখক)। পিকিংপন্থী বলে পরিচিত কমিউনিস্ট গ্রুপগুলো ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল, কিন্তু নিজেদের মধ্যে কোনো সমন্বয় ছিল না। ফলে কোন কোন গ্রুপ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তা প্রথমদিকে স্পষ্ট ছিল না।

পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য এবং বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হায়দর আনোয়ার খান জুনো ১৯ এপ্রিল প্রথম আগরতলায় এসে সিপিআই (এম) নেতা নৃপেন চক্রবর্তীর সাথে দেখা করেছিলেন। প্রাথমিক আলোচনার পর নৃপেন চক্রবর্তী তাকে জানান ২১ এবং ২২ এপ্রিল সিপিআই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির অধিবেশনে যোগ দিতে পলিট ব্যুরো সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত আগরতলা আসছেন। তার সাথে আলোচনার ব্যবস্থা করা হবে। ২১ এপ্রিল নৃপেন চক্রবর্তীর দাদা ডা. নন্দলাল চক্রবর্তীর বনমালীপুরের বাসভবনে প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং নৃপেন চক্রবর্তী বাংলাদেশের ছাত্র নেতা জুনোর সাথে আলোচনা করেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত তাকে জানান সিপিআই (এম) বাংলাদেশের কমিউনিস্ট

গ্রুপগুলোকে তাদের মুক্তিযুদ্ধে সবরকম সহযোগিতা করবে। জুনোকে তাদের পার্টির নেতৃত্বকে এবং সমমনোভাবাপন্ন অন্যান্য কমিউনিস্ট গ্রুপগুলোকে কলকাতায় আসার জন্য খবর দেবার দায়িত্ব দেন। জুনো তার একজন সহযোগীকে নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে দলের নেতৃত্বকে আলোচনার বিষয়বস্তু অবহিত করেন।

এপ্রিল মাসের শেষ দিকে কয়েকটি গ্রুপের সঙ্গে সিপিআই (এম) নেতত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে ছিলেন কাজী জাফর আহমেদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দর আকবর খান রনোর নেতৃত্বে পরিচালিত 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি', আবুল বাশর পরিচালিত 'বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন', অমল সেন, নজরুল ইসলাম, নাসিম আলি প্রমুখের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (হাতিয়ার), দেবেন শিকদারের নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি এবং আরও কয়েকটি বামপন্থী গ্রুপ।

অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যশোর জেলা কমিটির সদস্য অমল সেন দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় পাকিস্তানি জেলে আটক ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যশোরের ছাত্র-জনতা জেল ভেঙে অমল সেন এবং অন্যান্য বন্দিদের মুক্ত করেন। কিছুদিন পর অমল সেন কলকাতা গিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করেন।

১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা আব্দুল মতিন এবং তার সহযোদ্ধা আলাউদ্দিন, মোহম্মদ তোয়াহা এবং আব্দুল হক গ্রুপ ছাড়া পিকিংপন্থী বলে পরিচিত অন্যান্য গ্রুপগুলোর নেতারা কেউ আগরতলা হয়ে, কেউ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে কলকাতায় পৌঁছান। সেখানে সিপিআই (এম) নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত ও জ্যোতি বসুর সাথে কয়েক দফায় তাদের আলোচনা হয়। তারা সিপিআই (এম) নেতাদের সঙ্গে একমত হন যে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠন এবং বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষকে নিয়ে 'জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট' গঠনের প্রচেষ্টা চালানো হবে। বাংলাদেশের বামপন্থী কৃষক নেতা মওলানা

আব্দুল হামিদ খান ভাসানী মেঘালয়ের শিলং-এ একটি বিএসএফ ক্যাম্পে ছিলেন। তাই তিনি কলকাতায় কোনো বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে তিনি তার ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতাদের পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট গ্রুপগুলোর সঙ্গে একজোটে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ১ জুন কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি যৌথ বিবৃতিতে পিকিংপন্থী বলে পরিচিত কমিউনিস্ট গ্রুপগুলোর নেতৃত্বে এবং মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' গঠনের ঘোষণা দেয় এবং আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, গণসংগঠন, শ্রেণী সংগঠন ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক নাগরিকদের নিয়ে একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানায়। 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'র অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দল এবং গ্রুপগুলো নিজেদের ছাত্র-যুব কর্মীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়।

বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি নেতৃত্ব বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সাথে দেখা করে মুক্তিযুদ্ধে তাদের যৌথভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত জানান এবং 'জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট' গঠনের প্রস্তাব দেন।

পাকিস্তানের অনেক বাঙালি সামরিক অফিসার মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছেড়ে এসে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়ার এবং যুদ্ধের কলাকৌশল শেখানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের বেশ কয়েকটি অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। ত্রিপুরায় সবচাইতে বড়ো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ছিল সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘরে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছেড়ে আসা কর্নেল খালেদ মোশাররফ এবং আরও কয়েকজন অফিসার এই সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করতেন। বাংলাদেশের বামপন্থী নেতারা, বিশেষ কাজী জাফর আহমেদ, রাশেদ খান মেনন প্রমুখ কর্নেল খালেদ মোশাররফের সাথে যোগাযোগ করে তাদের কর্মীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির যুব কর্মীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণে সহায়তার জন্য সিপিআই (এম) প্যান্ট, গেঞ্জি, রেন কোর্ট, টর্চ, ব্যাগ ইত্যাদি সরবরাহ করেছিল।

বাংলাদেশের বামপন্থী নেতাদের আগরতলায় আশ্রয় কেন্দ্র ছিল সিপিআই (এম) নেতা খগেন দাশ এবং অনুপমা দাশের রামনগর ৬ নং রাস্তার বাসভবন। মে মাস থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বিভিন্ন সময় অমল সেন, কাজী জাফর আহমেদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দর আকবর খান রনো, আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, মোস্তফা জামাল হায়দার, দেগু মিয়া, সুনীল কুমার লোহ, আব্দুল্লাহ আল নোমান, সিরাজুল ইসলাম খান, মার্শাল সিরাজ, ছাত্রনেতা সায়ীদ ইস্কান্দার, ডা. ফরিদুল হুদাসহ অনেক বামপন্থী নেতা রামনগরের আশ্রয়স্থলে থেকে গেছেন। এই আশ্রয় কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন লেখক। ঢাকা প্রেস ক্লাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মর্টার শেলে আহত কবি-সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ, লেখক-সাংবাদিক কামাল লোহানী, কবি শুভ রহমানসহ অনেকেই কিছুদিন সিপিআই (এম)-র ব্যবস্থাপনায় আগরতলায় কাটিয়ে গেছেন। সিপিআই (এম) নেতা নৃপেন চক্রবর্তী আহত সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিমানে কলকাতা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কামাল লোহানী কলকাতা গিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'র বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব নেন।

১৭ থেকে ১৯ মে আগরতলায় ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের (এসএফআই) ত্রিপুরা রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ মে আগরতলার শিশু উদ্যানে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য অধিবেশনে সিপিআই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক নৃপেন চক্রবর্তী, ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি সুভাষ চক্রবর্তী, এসএফআই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক মানিক সরকার ত্রিপুরার সমগ্র ছাত্র সমাজকে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান জানান।

অনুরূপভাবে ২২ ও ২৩ মে সোনামুড়ার মেলাঘরে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ত্রিপুরা রাজ্য দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ মে মেলাঘর কালীতলায় অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সমাবেশে সিপিআই (এম) নেতা নৃপেন চক্রবর্তী, গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি খগেন দাশ এবং

সাধারণ সম্পাদক অনিল সরকার রাজ্যের যুব সমাজকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পাশে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। নৃপেন চক্রবর্তী বলেন, ভিয়েতনামে যেমন জনগণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন, সেই পথেই বাংলাদেশের সংগ্রাম চলছে। ভারতবর্ষের সংগ্রামী যুবকদের দায়িত্ব বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রামকে সমস্ত রকম সহায়তা দেয়া। নৃপেন চক্রবর্তী কংগ্রেস দলের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, পাকিস্তানের মুসলিম লীগ ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকারকে বাংলাদেশের জনগণের ওপর বর্বর অত্যাচার চালাতে সাহায্য করছে। আর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব মুসলিম লীগকে নিয়ে সরকার চালাচ্ছে। ভারতের মুসলিম লীগ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার বিরোধিতা করছে।

২৪ মে ভারতের লোকসভায় সিপিআই (এম)-র হুইপ জ্যোতির্ময় বসুসহ কয়েকজন বিরোধী সাংসদ বাংলাদেশকে ভারত সরকারের স্বীকৃতি দেবার দাবিতে মুলতবি প্রস্তাব আনেন। কিন্তু স্পিকার মুলতবি প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করলে মুসলিম লীগ এবং স্বতন্ত্র পার্টির সদস্যরা ছাড়া সমস্ত বিরোধী দলের সাংসদ প্রতিবাদে সভা ত্যাগ করন।

২৫ মে স্পিকার বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ দিলে সিপিআই (এম) সংসদীয় গ্রুপের উপনেতা দশরথ দেব বিতর্কে অংশ নিয়ে বলেন, ত্রিপুরায় বাংলাদেশের শরণার্থী সংখ্যা ৯ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। এতো বিশাল সংখ্যক শরণার্থীর চাপে ত্রিপুরার অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে ভারত সরকার যত দেরি করবে ততই মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষতি করা হবে। দশরথ দেব আরও বলেন, পাকিস্তানি ফৌজ বাংলাদেশ থেকে উৎখাত হলে তবেই একমাত্র শরণার্থীরা নিরাপদে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারবেন। তিনি বলেন, শুধু ইয়াহিয়ার কসাইবৃত্তির নিন্দা করে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে উৎখাত করা যাবে না। মুক্তিযোদ্ধারা যাতে লড়াই করে পাকিস্তানি ফৌজকে উৎখাত করতে পারেন তারজন্য তাদের সবরকম সাহায্য ভারতকে দিতে হবে। ইন্দিরা গান্ধি সরকারের ভূমিকায় তীব্র সমালোচনা করে সিপিআই (এম) সাংসদ দশরথ দেব বলেন, পাকিস্তানি ডেপুটি হাই কমিশনারকে ভারতে অবস্থানের অনুমতি দিয়ে ইন্দিরা গান্ধি সরকার অন্যায় করেছে। পাকিস্তান সরকার লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে, প্রধানমন্ত্রী বলতে পারতেন খুনি সরকারের

প্রতিনিধিকে ভারতে স্থান দেয়া হবে না। দশরথ দেব উল্লেখ করেন, ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন দমন করার জন্য পাকিস্তানি সৈন্যদের ভারত ভূখণ্ড ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। ত্রিপুরার পরিস্থিতি উল্লেখ করে দশরথ দেব বলেন, আমি শরণার্থীদের শিবিরগুলো ঘুরে দেখেছি, তারা নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। সাব্রুম মহকুমার জনসংখ্যা ৫৩ হাজার, সে মহকুমায় ২ লক্ষ বাংলাদেশের শরণার্থী এসেছেন। বিভিন্ন রোগ মহামারি আকার নিয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম দিন দিন বাড়ছে। পাকিস্তানি সেনাদের গোলায় আগরতলায় একজন নাগরিক নিহত ও চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ভারত সরকার নাগরিকদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করেনি।

ত্রিপুরার সীমান্ত গ্রামগুলোতে পাকিস্তানি সেনাদের উপদ্রব বাড়ছিল। ২৫ মে খোয়াই শহর সংলগ্ন বাংলাদেশের গ্রামে পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ চালালে একজন মহিলাসহ চারজন পালিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে পহরমুড়া গ্রামে আশ্রয় নেন। পাকিস্তানি সেনারা তাদের তাড়া করে ভারতে ঢুকে গুলি চালায়। গুলিতে একজন আহত হন। পাকিস্তানি সেনারা আহত বাংলাদেশী নাগরিক এবং মহিলাসহ অন্য তিনজনকে ধরে নিয়ে যায়। পহরমুড়ায় অনেক ভারতীয় নাগরিকের বাড়িঘর ভেঙে দিয়ে যায়।

১৫ জুন ত্রিপুরার বামপন্থী ছাত্র-যুব, শ্রমিক-কৃষক, শিক্ষক-কর্মচারী, মহিলাদের যুক্ত বৃহত্তম মঞ্চ ৬ ফেব্রুয়ারি কমিটির ডাকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবিতে আগরতলায় বিশাল মিছিল সংগঠিত হয়। গণমিছিল থেকে একটি প্রতিনিধিদল মুখ্য সচিবকে ডেপুটেশন দিয়ে দাবিসনদ ভারত সরকারের কাছে পাঠাতে অনুরোধ করেন। প্রতিনিধিরা শরণার্থী শিবিরগুলোতে খাদ্য, পানীয় জল ও চিকিৎসার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে দাবি জানান।

সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো ১৬ জুন এক বিবৃতিতে বলে, ভারতের সংসদে ও সংসদের বাইরে ভারত সরকার যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক সংঘাতে জড়িত হয় সে দাবি তোলা হচ্ছে। যদি এতে ভারত সায় দেয় তবে বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম, যার চরিত্র গণতান্ত্রিক, তা ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে পরিণত হবে। ইয়াহিয়া খানের সামরিক চক্র এটই চাইছে। এতে বাংলাদেশের জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামে মারাত্মক প্রভাব পড়বে। তাই,

সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো ভারতের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোকে এ ধরনের দাবির বিরোধিতা করার আহ্বান জানায়। বাংলাদেশ সরকারকে ভারত যেন অবিলম্বে স্বীকৃতি দেয় তার দাবি জানায়। সিপিআই (এম) পলিটব্যুরো পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জনসংঘের উগ্র জাতীয়তাবাদী ঘৃণা সৃষ্টিরও প্রতিবাদ করে। পলিট ব্যুরোর বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম ন্যায্য এবং গণতান্ত্রিক। তাদের সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে নয়। সুতরাং, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের উচিত বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামকে সমর্থন করা। পলিট ব্যুরো ভারত সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে বলে, ভারত সরকারের নীতির ফলে ভারতে বাংলাদেশের শরণার্থীর চাপ বাড়ছে এবং ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। পলিট ব্যুরোর বিবৃতিতে বলা হয়, পাকিস্তানি সামরিক শাসক চক্র একটি পুতুল সরকার বসানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (সিআইটিইউ) ১৯ জুন সমগ্র ভারতে 'বাংলাদেশ সংহতি দিবস' পালন করে। সেদিন কলকাতা, আগরতলা, গুয়াহাটিসহ ভারতের বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশ সরকারকে ভারত সরকারের স্বীকৃতি দাবিতে হাজার হাজার শ্রমিক মিছিল-সমাবেশ করেন। সিআইটিইউ-র সাধারণ সম্পাদক সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো সদস্য পি রামমূর্তি বলেন, ভারতের শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম বাংলাদেশের জনগণকে উৎসাহিত করবে।

বাংলাদেশের জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামের তীব্রতা যত বাড়ছিল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নতুন নতুন ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করছিল। জুলাই মাসে মার্কিন সরকার এবং তাদের সহযোগিরা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক পাঠাতে একটি প্রস্তাব আনে, ভারত সরকার অবশ্য প্রস্তাবটির তীব্র বিরোধিতা করে।

২৪ জুলাই সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরোর অধিবেশন থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে পর্যবেক্ষক পাঠাতে রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ভারত সরকার যে ভূমিকা নেয় তা সমর্থন করে। কারণ, তা ভারতে সরাসরি হস্তক্ষেপের শামিল। পলিট ব্যুরা দাবি জানায়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং ইয়াহিয়া সামরিক চক্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতেই আর সময়ক্ষেপণ না করে

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের স্বীকৃতি দেয়া উচিত। পলিট ব্যুরো জনসংঘের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টির তীব্র বিরোধিতা করে। পলিট ব্যুরো বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানায়। নয়াদিল্লিতে পলিট ব্যুরোর বিবৃতিটি প্রকাশ করে সিপিআই (এম)-র সাধারণ সম্পাদক পি সুন্দরাইয়া বলেন, ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে ইতস্তত করছে এই বলে যে, এটা পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুন্দরাইয়া বলেন, আসল বিষয় হচ্ছে অন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইছে না যে ভারত সরকার বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দিক। তিনি বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অভিসন্ধি সম্পর্কে ভারত ও বাংলাদেশের জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করা চলবে না। সিপিআই (এম) চীনের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে ভারত সরকারকে উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানায়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে যুব বিদ্রোহের অন্যতম নেতা তথা সিপিআই (এম) নেতা গণেশ ঘোষ জুলাই মাসে ত্রিপুরায় আগরতলা, খোয়াই, কল্যাণপুর, কমলপুরের মানিকভাণ্ডার, বিলোনীয়া ও সব্রুম শহরে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন। প্রতিটি সমাবেশে হাজার হাজার মানুষ শামিল ছিলেন। গণেশ ঘোষ ভারত সরকারকে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দিতে জোরালো দাবি জানান। গণেশ ঘোষ বলেন, বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণে প্রাণ দিচ্ছেন। শুধু প্রাণটুকু রক্ষায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শরণার্থী হয়ে ভারতে এসেছেন। ভারতের জনগণের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবি আদায় করা।

ভারতের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের সমর্থনে বাংলাদেশের জনগণ যখন তাদের মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর করছিলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যেমন পাকিস্তানি সামরিক শাসক চক্রকে মুক্তিযুদ্ধ গুঁড়িয়ে দিতে সবরকম সহায়তা দিচ্ছিল, তেমনি ভারতে কিছু কিছু রাজনৈতিক শক্তি বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে বিপথথগ্রামী করার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আর এস এস), যাদের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন অবদান নেই, বরং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালালি করছে, সে আর এস এস

পরিচালিত ভারতীয় জনসংঘ (বর্তমানের বিজেপি) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ধ্বংস করতে ভারত সরকারকে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে ক্রমাগত প্ররোচনা দিচ্ছিল।

একদিকে যেমন বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এবং ভারতীয় জনসংঘ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, তেমনি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধরত শক্তিগুলোর মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা ছিল। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সামনে রেখে গঠিত 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' বাংলাদেশের বামপন্থী ছাত্র-যুবদের একজোট করে আন্তরিকভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেও বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের অন্যতম মন্ত্রী কামারুজ্জামান প্রাকশ্য বিবৃতি দিয়ে সমন্বয় কমিটিকে 'বিভেদপন্থী' বলে আক্রমণ করেছিলেন। অথচ মুক্তিযুদ্ধ সমন্বয় কমিটির নেতৃত্ব অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজ উদ্দিন আহমেদের সাথে দেখা করে তাদের পক্ষ থেকে সরকারকে সবরকম সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীকে তারা 'জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট' গঠন করে স্বাধীনতার সপক্ষের সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতা কামারুজ্জামানের মতো মস্কোপন্থী বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বও সমন্বয় কমিটিকে 'বিভেদপন্থী' বলে গালাগাল দেয়। এমনকি ভারতের গোয়েন্দা পুলিশকে দিয়ে সমন্বয় কমিটির কয়েকজন নেতা ও কর্মীকে 'পাকিস্তানি গুপ্তচর' বলে বদনাম দিয়ে গ্রেফতার করানো হয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ সমন্বয় কমিটি তাতে বিচলিত হয়নি, দেশপ্রেমিক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। বামপন্থী মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য অর্জনের অনেক খবর পশ্চিমবঙ্গের সান্ধ্য দৈনিক 'গণশক্তি' এবং ত্রিপুরার বামপন্থী সাপ্তাহিক 'দেশের ডাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের গণসংস্কৃতি সংগঠনগুলো বাংলাদেশের গণসংগীত শিল্পী এবং বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের সাথে একসঙ্গে বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে। ত্রিপুরার বিশিষ্ট গণসংগীত শিল্পী হীরালাল সেনগুপ্ত তার সঙ্গীত নাটকের টিম নিয়ে মহকুমায় মহকুমায় মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণকে উৎসাহিত করতে গণসংগীত ও নাটক পরিবেশন করেছেন। কবি অনিল সরকারের নেতৃত্বে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় আগরতলায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কবিতা ও ছড়া পরিবেশন করা হোত রাস্তার মোড়ে মোড়ে।

বাংলাদেশের কবি শুভ রহমান, কাজী সিরাজ প্রমুখও কবিতার আসরে অংশ নিতেন।

বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের ৫ মাস অতিক্রম করে গেলেও ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। অন্যদিকে ত্রিপুরা, পশ্চিমবাংলার সীমান্তে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ বাড়ছিল। বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী আগমন স্রোত অব্যাহত ছিল। কিন্তু ত্রাণ সাহায্য ছিল অপ্রতুল। ১৪ আগস্ট ত্রিপুরার বামুটিয়া এলাকার জলিলপুরে পাকিস্তানি সেনাদের গুলিবর্ষণে ১৫ জন ভারতীয় নাগরিক নিহত হন। কিন্তু ভারত সরকার নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা না করায় সিপিআই (এম) তীব্র ক্ষোভ জানায়। সিপিআই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী ১৫ আগস্ট প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সাহায্যপুষ্ট হয়ে ইয়াহিয়া সামরিক চক্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্তব্ধ করার জন্য তাদের আক্রমণের তীব্রতা বাড়াচ্ছে। পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকার ৫০-৬০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়েছেন। সীমান্তে কৃষকরা জমিতে চাষ করতে পারছেন না। বিবৃতিতে ভারত সরকারের কাছে নাগরিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়। সীমান্তে জনগণের সহায়তা নিয়ে আত্মরক্ষামূলক সংগঠন গড়ে তোলারও প্রস্তাব দেয়া হয়।

সিপিআই (এম) লোকসভা সদস্য দশরথ দেব, বীরেন দত্ত বাংলাদেশের শরণার্থীদের অপ্রতুল ত্রাণ, ত্রাণ সাহায্য বণ্টনে দুর্নীতি সম্পর্কে বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভারত সরকার বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ২০০ কোটি টাকা ত্রাণ বাবদ বরাদ্দ করতে লোকসভায় একটি প্রস্তাব এনেছিল। ৯ আগস্ট সে প্রস্তাবের ওপর লোকসভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে দশরথ দেব বলেন, আর্থিক বরাদ্দ আরও বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ, মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। ত্রিপুরার মানুষের দুর্ভোগের উল্লেখ করে তিনি বলেন, ত্রিপুরার জনসংখ্যা ১৬ লক্ষ। কিন্তু প্রতি ত্রিপুরাবাসীর কাঁধে গড়ে ৩ জন বাংলাদেশের শরণার্থীর বোঝা চেপেছে। সুতরাং শরণার্থীদের একটা অংশকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সরানো উচিত। শরণার্থীদের বাঁচার উপযোগী ত্রাণ সাহায্য দেয়া উচিত।

পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে অনেক মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হচ্ছিলেন আহত মুক্তিযোদ্ধাদের জরুরি চিকিৎসা দেয়ার প্রয়োজনীয়তায় বাংলাদেশের বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরী, মেজর আখতারসহ মুক্তি বাহিনীর কয়েকজন ডাক্তার একটি ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। সোনামুড়া মহকুমার জুমেরঢেপায় ডা. নন্দলাল চক্রবর্তীর জামাতা হাবুল ব্যানার্জির ফলের বাগানে ফিল্ড হাসপাতালটি স্থাপনে সবরকম সহায়তা করেন সিপিআই (এম) নেতা সমর চৌধুরীর নেতৃত্বে পার্টির কর্মীরা। বাংলাদেশের অনেক নার্সিংস্টাফ ফিল্ড হাসপাতালে যোগ দিয়েছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার একটি পরামর্শদাতা কমিটি (কনসালটেটিভ কমিটি) গঠন করে। তাতে মওলানা ভাসানীকে অন্যতম সদস্য করা হয়। কিন্তু ভাসানী কার্যত মেঘালয়ে অন্তরীণ ছিলেন। সিপিআই (এম)-'র পক্ষ থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য মার্কসবাদী গ্রুপগুলোকে, বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির প্রতিনিধিদের পরামর্শদাতা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে অভিমত দেয়া হয়।

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতের লোকসভা ও রাজ্যসভার পাঁচ শতাধিক সদস্য বাংলাদেশের জনগণের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করে রাষ্ট্রসংঘের সে সময়কার মহাসচিব ইউ থান্টের কাছে তারবার্তা পাঠান। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা যে বিচারের প্রহসন করছে তারবার্তায় তা বন্ধ করার দাবি জানানো হয়।

১০ আগস্ট ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাবি করে সারা ত্রিপুরায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। ত্রিপুরার সমস্ত স্কুল-কলেজে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয়।

এই ছাত্র ধর্মঘটের আগেরদিন ৯ আগস্ট ভারত সরকার এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকারের মধ্যে ঐতিহাসিক 'শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। ১১ আগস্ট সিপিআই (এম)-র সাধারণ সম্পাদক পি সুন্দরাইয়া ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, স্বাক্ষরিত চুক্তিটি ভারতের ওপর সাম্রাজ্যবাদী চাপ এবং ইয়াহিয়া খানের ব্ল্যাক মেইলের বিরুদ্ধে

প্রতিরোধাত্মক ভূমিকা নেবে। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরকারী দুটি দেশের কারও নিরাপত্তার হুমকি বা বিপদ দেখা দিলে একে অন্যকে সবরকম সাহায্য করবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সিপিআই (এম) বরাবর ভারত সরকারকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়ে আসছে। কারণ নির্জোট গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ভারত সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশের সাথে সমদূরত্বের নীতি নিতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিজেদের সার্বভৌমত্ব রাক্ষার ক্ষেত্রে এবং সাম্রাজ্যবাদী চাপ প্রতিরোধে সহায়ক হবে।

মস্কোপন্থী সিপিআই চুক্তিটি চিনকে একঘরে করতে সহায়ক হবে বলে অভিমত দিয়েছিল। সিপিআই (এম) সাধারণ সম্পাদক সিপিআই-র এই অভিমতের তীব্র সমালোচনা করেন। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ৯ আগস্ট শান্তি-বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি হলেও ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় দেশের সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল। ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রশ্নের সমাধান চাইছিল। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত সিপিআই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন থেকে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ভূমিকার সমালোচনা করা হয়।

২ অক্টোবর ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র মন্ত্রক একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে। বিবৃতিটিতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিয়ে পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে সমস্যার সমাধানের কথা বলা হয়। সেদিনই সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো ভারত-সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রকের যৌথ বিবৃতির তীব্র সমালোচনা করে বলে, বাংলাদেশের জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা যখন স্বাধীনতার জন্য প্রতি মুহূর্ত রক্ত দিচ্ছেন, এই যৌথ বিবৃতি বাংলাদেশের জনগণকে পুরোপুরি নিরাশ করবে। পলিট ব্যুরোর বিবৃতিতে বলা হয়, ভারত-সোভিয়েত শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি দুদেশকে দোদুল্যমান অবস্থান থেকে মুক্ত হয়ে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করবে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু উভয় দেশের বিবৃতি বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার দাবিটি পাশ কাটিয়ে গেছে। পলিট ব্যুরোর বিবৃতিতে বলা হয়, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যৌথ বিবৃতিতে ভিয়েতনাম থেকে সমস্ত মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার দাবি করেছে, যা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু

কেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বর গণহত্যা বন্ধের দাবি জানানো হল না? সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরোর বিবৃতিতে দৃঢ়তার সাথে বলা হয়, কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে টুটি টিপে হত্যা করতে দেয়া হবে না।

বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি ৪ অক্টোবর প্রচারিত এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানের প্রস্তাবকে ধিক্কার জানায় এবং গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। বিবৃতিতে বলা হয়, ভারত-সোভিয়েত যৌথ বিবৃতি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রসংঘে ভাষণে এবং সিমলায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ভারতের সে সময়কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বরন সিং পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ওকালতি করেন।

৯ অক্টোবর সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির মস্কো সফরের পর প্রকাশিত বিবৃতির তীব্র সমালোচনা করে বলে, এই বিবৃতি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। যুক্ত বিবৃতি বাংলাদেশের জনগণ এবং তাদের গৌরবময় সংগ্রামের পক্ষে চূড়ান্ত অপমানকর। বিবৃতিতে ভারতের জনগণকে আত্মসন্তুষ্টির বিরুদ্ধে সতর্ক থেকে বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামের সমর্থনে আরও ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।

১৯৬৪ সালে সিপিআই (এম) প্রতিষ্ঠার পর চিনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে কোন ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক ছিল না। বরং ১৯৬৭ সালে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতে নকশালপন্থীদের আন্দোলনকে প্রকাশ্যে সমর্থন দেয় এবং সিপিআই (এম)-কে 'নয়া সংশোধনবাদী' বলে পিকিং রেডিও থেকে গালিগালাজ করা হতো। সিপিআই (এম) স্বাধীনভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আসছিল। ১৯৭১ সালে একমাত্র ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সিপিআই (এম)-র বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি

সংগ্রাম সম্পর্কে তাদের সাথে একাধিকবার মত বিনিময় হয়।

অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতে নিযুক্ত উত্তর ভিয়েতনামের কনসাল জেনারেল নগুয়েন আন ভু নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তার দেশের পক্ষে সমর্থন জানান। গণসাধারণতন্ত্রী ভিয়েতনাম হল প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দিয়েছিল।

বাংলাদেশের জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম যত বাড়ছিল, মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমাগত পাকিস্তানি সৈন্যদের ওপর আঘাত হেনে সাফল্য অর্জন করছিলেন- ইয়াহিয়া খানের পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আরও হিংস্র আক্রমণ চালাচ্ছিল। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় মৌলবাদী মুসলিম লিগের সদস্য সমর্থকদের নিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা রাজাকার, আলবদর, আল শামস ইত্যাদি নামে ঘাতক বাহিনী গঠন করে বাংলাদেশে নিরীহ মানুষকে গণহত্যা, মা-বোনদের ওপর পাশবিক নির্যাতন, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া, লুটতরাজ চালাচ্ছিল। অন্যদিকে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে ব্যাপকভাবে গোলাবর্ষণ করে প্রচুর ভারতীয় নাগরিককে হতাহত করছিল। অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ত্রিপুরার কমলপুর, সোনামুড়া, বিলোনীয়া মহকুমায় পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে প্রচুর ভারতীয় নাগরিক প্রাণ হারান। কমলপুর মহকুমাতেই ছাত্রসহ ২৩ জন ভারতীয় নিহত হন। ২৪ অক্টোবর রাত ৮টা নাগাদ আগরতলা শহরের বনমালীপুর, বোধজং স্কুলের পাশে, মোটরস্ট্যান্ড এবং মসজিদ রোডে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মর্টার শেল এসে পড়ে। ৬ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হন। সমগ্র শহরবাসীর মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, আগরতলাসহ সীমান্ত এলাকায় প্রায় প্রতি বাড়িতে মানুষ বাঙ্কার তৈরি করে আশ্রয় নিতেন।

২৫ অক্টোবর সিপিআই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি এক বিবৃতিতে পাকিস্তানি সেনাদের গোলায় প্রচুর ভারতীয় নাগরিক হতাহত হওয়ায় গভীর ক্ষোভ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করে ত্রিপুরার জনগণের নিরাপত্তা রক্ষায় ভারত সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে দাবি জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভারতের জনগণের ওপর হিংস্র আক্রমণ চালাচ্ছে।

১৯ নভেম্বর সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো প্রদত্ত বিবৃতিতে বলে, বাংলাদেশের

জনগণের সংগ্রাম আজ জটিল পরিস্থিতির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা সর্বত্র এগিয়ে চলেছেন। এ অবস্থায় পাকিস্তানি সামরিক জান্তা আরও মরিয়া হয়ে উঠেছে। ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তে সংঘর্ষ বাড়ছে। প্রতিদিনই হতাহতের ঘটনা ঘটছে। সীমান্তের গ্রামগুলোতে গোলাগুলি বর্ষণের ফলে নিরীহ গ্রামবাসীরা বিপদের মুখে পড়েছেন। এ সমস্ত ঘটনাবালি যুদ্ধের বিপদকেই বাড়িয়ে তুলেছে। পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা এখন যুদ্ধের মধ্য দিয়েই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের শেষ চেষ্টা করছে।

পলিট ব্যুরো ভারতের জনগণকে এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকতে এবং মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানায়। বিবৃতিতে বলা হয় এটা পরিষ্কার যে, আমেরিকা ইয়াহিয়া খানকে দিয়ে যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে চাইছে। যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয় তবে তা হবে আমেরিকা ও পাকিস্তানের যৌথ ষড়যন্ত্রের ফল। পলিট ব্যুরো ভারত সরকারকে আর দেরি না করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে দাবি জানায়।

১৫ নভেম্বর লোকসভায় সিপিআই (এম)-র উপনেতা দশরথ দেব দৃষ্টি আকর্ষণী এনে ত্রিপুরার ভয়াবহ পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তিনি জানান, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ত্রিপুরার সীমান্ত শহর ও গ্রামগুলোতে প্রতিদিন গোলা বর্ষণ করছে। একমাত্র কমলপুর মহকুমাতেই ৫০ জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। অনেক মানুষ প্রাণ বাঁচাতে শহর ও গ্রাম ছেড়ে গেছেন। তারা কোন ত্রাণ সাহায্যও পাচ্ছেন না। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম বলেন, ভারতের জওয়ানরা সীমান্ত রক্ষায় প্রস্তুত। দশরথ দেব জানতে চান ভারত সরকার আর কতদিন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবে? কেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে না? প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'উপযুক্ত সময় স্বীকৃতি দেয়া হবে'।

যুদ্ধের আবহাওয়ার মধ্যে ২১ থেকে ২৪ নভেম্বর খোয়াই মহকুমার রামচন্দ্রঘাটে সিপিআই (এম)-র নবম ত্রিপুরা রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ নভেম্বর বিকেলে খোয়াই শহরের গণকী মাঠে বিরাট প্রকাশ্য অধিবেশনে হাজার হাজার মানুষ যোগ দেন। সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দশরথ দেব, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পুনর্নির্বাচিত সম্পাদক নৃপেন চক্রবর্তী বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধকে বিজয়ী করার জন্য ভারতের জনগণকে সর্বাত্মক সমর্থন দেয়ার আহ্বান জানান। তারা বাংলাদেশ সরকারকে এখনি স্বীকৃতি দেয়া এবং সমস্ত রকম

সহায়তা দেয়ার দাবি জানান।

প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, বাংলাদেশের জনগণ আত্মপ্রত্যয়ের সাথে স্বাধীনতার জন্য লড়ছেন। আট মাসের বাস্তব অভিজ্ঞতায় তারা বুঝতে পারছেন, তাদের লড়াই অন্য কেউ লড়ে দেবে না। নিজেদেরই লড়াই করে জয় অর্জন করতে হবে।

১ ডিসেম্বর থেকে পাকিস্তানি স্থল ও বিমান বাহিনী ভারতের ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালাতে শুরু করে। সেদিন রাতে আগরতলার জয়নগর, রাধানগর, কুঞ্জবন, সার্কিট হাউস, বেসিক ট্রেনিং কলেজে পাকিস্তানি মর্টার শেল এসে আঘাত করে। ৬ জন অসামরিক মানুষ নিহত এবং ৪৭ জন আহত হন।

২ ও ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বিমান বাহিনী আগরতলা বিমানবন্দরে বিমান থেকে গুলি ও গোলা বর্ষণ করে। বোমায় রানওয়ের ক্ষতি হয়। আহত হন ৭৮ জন।

৩ ডিসেম্বর রাতে পাকিস্তানি মিরেজ ও সাবার জেট জঙ্গি বিমান থেকে আগরতলা ছাড়াও পাঞ্জাবের অমৃতসর, পাঠানকোটা, আম্বালা, পাতিয়ালা, শ্রীনগরসহ নয়টি বিমান ঘাঁটিতে বোমা বর্ষণ করে। ভারতের বিমান বাহিনীও পাল্টা জাবাব দেয়।

৩ ডিসেম্বর মধ্য রাতে ভারত সরকার সমগ্র দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। গভীর রাতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে দেশ রক্ষার প্রয়োজনে সমস্ত রাজনৈতিক দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা বিরাট বিরাট সাফল্য অর্জন করছিলেন। ঠাকুরগাঁও, সিলেট, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা বহু পাকিস্তানি সেনাকে হতাহত করতে সক্ষম হন। ৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সামরিক জান্তা প্রধান ইয়াহিয়া খান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ভারতের স্থল, বিমান ও নৌ সেনাবাহিনীও পাল্টা জাবাব দিতে শুরু করলে পূর্ব রণাঙ্গনে পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটতে থাকে। পশ্চিম রণাঙ্গনেও ভারতের স্থল ও বিমান বাহিনী প্রায় লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে যায়।

সিপিআই (এম)-র সাধারণ সম্পাক পি সুন্দরাইয়া ৪ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে পাকিস্তানি সামরিক শাসক চক্র ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারকে আক্রমণ প্রতিরোধে পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানান। বিবৃতিতে তিনি বাংলাদেশের জনগণের বিজয়ে সাহায্য করার জন্য

বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতির দাবি জানান। সমগ্র ভারতবাসী যেন সরকারের পাশে থাকে তারজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে তিনি ভারত সরকারকে আহ্বান জানান।

সেদিন সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো সদস্য জোতি বসু একটি পৃথক বিবৃতিতে পাকিস্তানের ব্যাপক আক্রমণ মোকাবিলায় ভারতের সেনাবাহিনী ও জনগণকে দেশ রক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা পাবার জন্য ভারত সরকার যেন সমস্ত পদক্ষেপ নেয় তারজন্যও তিনি আহ্বান জানান। জ্যোতি বসু বলেন, বাংলাদেশ সরকারকে এখনি স্বীকৃতি দেয়া হোক এবং তাদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সংগ্রামে সর্বাত্মক সাহায্য দেয়া হোক।

৬ ডিসেম্বর ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশকে পাকিস্তানি দখলদার সৈন্যদের হাত থেকে মুক্ত করতে ভারতের সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর যৌথ কমান্ড গঠিত হয়।

সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো ৬ ডিসেম্বর কলকাতায় জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার ভারত সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, এ সিদ্ধান্ত অনেকদিন ধরে প্রত্যাশিত ছিল। এ সিদ্ধান্তের প্রতি সমগ্র ভারতবাসীর সমর্থন রয়েছে। ৭ ডিসেম্বর সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো আরেকটি বিবৃতিতে বলে, লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশীকে গণহত্যার পরও তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে মার্কিন অস্ত্র সাহায্যপুষ্ট ইয়াহিয়া খান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, কারণ ভারত বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানিয়েছে। ভারতের জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অপচেষ্টা ব্যর্থ করতে হবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যাতে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়, উদ্বাস্তুরা নিজেদের দেশে ফিরে যেতে পারেন, সে লক্ষ্য অর্জনে ভারতের জনগণকে অবদান রাখতে হবে।

পলিট ব্যুরোর বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির বক্তব্যের উল্লেখ করে বলা হয়, পাকিস্তানি ভূখণ্ড দখল করার কোনো অভিপ্রায় বারতের নেই। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক চক্র ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকে যুদ্ধে জড়িয়েছে। তারা শিগগরই বুঝতে পারবেন এই যুদ্ধ তাদের স্বার্থে নয় এবং তারাও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন। পলিট ব্যুরোর বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি, কংগ্রেস (সংগঠন) ইত্যাদি

দল মার্কিন লবির হয়ে কাজ করছে।

ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী বীর বিক্রমে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ শুরু করেন। পাকিস্তানি বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়তে থাকে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরাজয় অনিবার্য এটা বুঝতে পেরে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নস্যাৎ করার শেষ চেষ্টায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ১৪ ডিসেম্বর সপ্তম নৌ বহরকে চট্টগ্রাম সদুদ্র উপকূলে পাঠান। চট্টগ্রাম উপকূলে মার্কিন নৌবাহিনীর উপস্থিতির খবর ছড়িয়ে পড়লে ভারতের জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর কলকাতা, আগরতলাসহ ভারতের প্রায় প্রতিটি শহরে সিপিআই (এম)-র ডাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হন। স্লোগান ওঠে- মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশ থেকে হাত ওঠাও, সপ্তম নৌ বহর চট্টগ্রাম উপকূল থেকে সরিয়ে নাও।

১৪ ডিসেম্বর সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো এক বিবৃতিতে বলে, ১০ বা ২০ জন মার্কিন নাগরিককে উদ্ধার করার অজুহাত দেখিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌ বহর পাঠিয়েছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য ছাড়া পাকিস্তানি বাহিনী অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না এই নির্লজ্জ প্রচেষ্টায় তা উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং ভারতের বিরুদ্ধে মার্কিন হুমকির বিরুদ্ধে ভারতের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ ও সমস্ত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদে শামিল হওয়ার আহ্বান জানায় পলিট ব্যুরো। মার্কিন প্রেসিডেন্টের পাঠানো সপ্তম নৌবহরও পাকিস্তানি সামরিক জান্তার পতন ঠেকাতে পারেনি। ১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেয়।

১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পরাজিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৯৪ হাজার সদস্য ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ সামরিক কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। বিজয়ী হয় বাংলাদেশের জনগণের নয় মাসব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রাম। ১৬ ডিসেম্বর আগরতলা, কলকাতাসহ ভারতের প্রায় সব শহরে জনতা স্বতঃস্বফূর্তভাবে বিজয় মিছিলে শামিল হন। ভারতের জাতীয় পতাকার সাথে বাংলাদেশের শরণার্থীরা বাংলাদেশের নতুন জাতীয় পতাকা নিয়ে বিজয় মিছিলে শামিল হন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধারা জাতীয়

পতাকা নিয়ে আকাশে রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়ে বিজয় উদযাপন করেন।
কুমিল্লার দক্ষিণে মিয়ার বাজারে ১৩ ডিসেম্বর সারা রাত ভারতের সেনাবাহিনীর সাথে পাকিস্তানি সেনাদের তুমুল ট্যাংক যুদ্ধ চলেছিল। পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হয়ে শেষ রাতে ঢাকার দিকে পালিয়ে যায়।
নিবন্ধ লেখক ১৪ ডিসেম্বর সকালে বামপন্থী নেতা কাজী জাফর আহমেদের সহযোগী হয়ে মিয়ার বাজার দিয়ে বাংলাদেশে যান। ভারতের সেনারা তখনো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পুতে রাখা মাইন খুঁজে বের করছিল। লেখক ১৪ থেকে ১৬ ডিসেম্বর চিয়রা, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বীভৎস আক্রমণের ক্ষতচিহ্নগুলো ঘুরে দেখেছিলেন। তেমনি দেখেছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে গেরিলা কায়দায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে কাবু করেছিল, যা ভিয়েতনামের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা কৌশলের সাথে তুলনীয়। (এ সম্পর্কে লেখককের একটি নিবন্ধ সিপিআই (এম)-র ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সে সময়কার সাপ্তাহিক মুখপত্র 'দেশের ডাক' পত্রিকার ১৯৭১-এর ২১ ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।)
১৭ ডিসেম্বর সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো এক বিবৃতিতে দখলদারি রাজত্ব উৎখাত করে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে অভিনন্দিত করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, মুক্তি বাহিনী এবং ভারতীয় জওয়ানদের যৌথ অভিযানে দু'দশকের সামরিক আধিপত্যের অবসান ঘটল। সাহসী মুক্তি বাহিনীর সদস্যদের সাথে ভারতের জওয়ানরা এক সাথে রক্ত দিয়ে দস্যুদের রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, গত নয় মাস বাংলাদেশের জনগণের যে মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছেন– লক্ষ লক্ষ মানুষকে গণহত্যা করা হয়েছে, মা-বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে, গ্রামগুলো ধুলিসাৎ করা হয়েছে– ইতিহাসে এমন বর্বরতার খুব কম নজির খুঁজে পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের তরুণ ছাত্ররা, যুবকরা, শ্রমিক ও কৃষকরা সাহসের সাথে লড়াই করে এ উপমহাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযুক্ত করেছেন। ভারতের জনগণ তাদের এ সংগ্রামে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। ভারতের জওয়ানরা এই বিজয়ের শরিক হয়েছেন।
সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো বিবৃতিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, সাম্রাজ্যবাদের

দালালরা তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যে কোন চক্রান্ত করতে পারে। বাংলাদেশের জনগণ ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোকে এ সম্পর্কে সতর্ক থেকে তাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিজয়ের বার্তা সমস্ত গ্রাম ও শহরে পৌঁছে দিতে আহ্বান জানায়।
কোন কোন মহল থেকে ভারতের অসামরিক অফিসারদের বাংলাদেশে পাঠানোর যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা পুরোপুরি খারিজ করে সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো বলে বাংলাদেশে অফিসারদের অভাব নেই। ভারতের সেনাবাহিনী অন্যান্য ভারতীয় অফিসাররা যেন প্রয়োজনের পর আর এক মুহূর্তও বাংলাদেশে না থাকে। চিন এখন বাস্তবতা মেনে নেবে বলেও আশা প্রকাশ করা হয়।
বাংলাদেশ সরকার একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান রচনা করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো তাকে স্বাগত জানিয়ে আশা প্রকাশ করে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি উদ্বাস্তুরা শিগগিরই ভারত থেকে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারবেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে একতরফা যুদ্ধবিরতির যে প্রস্তাব দিয়েছেন সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো তা সমর্থন জানিয়ে বলে, যুদ্ধে দুদেশের বহু মূল্যবান প্রাণ গেছে, অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
পলিট ব্যুরো পশ্চিম পাকিসতান সরকারের কাছে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে দাবি জানায়।
পলিট ব্যুরো বাংলাদেশের নারী-পুরুষ ও যুবকদের অভিনন্দন জানিয়ে আশা প্রকাশ করে, শিগগিরই তারা তাদের ভবিষ্যৎ নিজেদের হাতে তুলে নেবেন এবং দখলদার বাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত তাদের মহান সুন্দর দেশকে পুনর্গঠন করবেন।
২৫ ডিসেম্বর সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরো পাঁচ পৃষ্ঠা দীর্ঘ বিবৃতিতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার দস্যু রাজত্ব থেকে নিজেদের দেশকে মুক্ত করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করায় বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানায়। বিবৃতিতে পাকিস্তানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে সামরিক জান্তা যেভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করে এসেছে তার উল্লেখ করা হয়। ভারত সরকার অনেক দোদুল্যমানতা দেখানোর পর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া সর্বজনীন দাবি মেনে নেয়ার ফলে পাকিস্তানের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধকে পরাজিত করে দ্রুত

বিজয় অর্জন করা সম্ভব হয়েছে বলে অভিমত দেয়া হয়।

ভারতের সেনাবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের যে ভূখণ্ড দখল করেছে তা ছেড়ে না আসতে জনসংঘ যে দাবি তুলেছে সিপিআই (এম) এ দাবির তীব্র বিরোধিতা করে। পলিট ব্যুরো পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিতে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব মুক্ত হতে আহ্বান জানায়। ভারত, বাংলাদেশসহ সমগ্র অঞ্চলের জনগণকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া উপনিবেশিক নীতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়।

বাংলাদেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর ভারতে আশ্রয় নেয়া এক কোটির বেশি শরণার্থী নিজ দেশে ফিরতে শুরু করেন। সিপিআই (এম) নেতা ও কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করে শরণার্থীদের নিজ দেশে ফিরতে সবরকম সাহায্য করেন।

বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বিপুল গণসংবর্ধনার মধ্যে ঢাকা পৌঁছে স্বাধীন দেশের দায়িত্ব ভার নেন। নিবন্ধ লেখক সেদিন ঢাকায় গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭২ সালের ২৬ ও ২৭ এপ্রিল মওলানা ভাসানী ঢাকার শিবপুরে বাংলাদেশ কৃষক সমিতির সম্মেলন সংগঠিত করেন। সে সম্মেলনে আমন্ত্রিত ছিলেন জ্যোতি বসু, নৃপেন চক্রবর্তী, হরেকৃষ্ণ কোনার প্রমুখ সিপিআই (এম) নেতৃবৃন্দ। কিন্তু ভারত সরকার তাদের বাংলাদেশে যাবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। সারা ভারত কৃষক সভার অন্যতম নেতা শান্তিময় ঘোষ, বরদা গুহ, নিবন্ধ লেখক আমন্ত্রিত হয়ে শিবপুরে কৃষক সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলন শেষে সিপিআই (এম) প্রতিনিধিদল ঢাকা ফিরে এলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ৩০ এপ্রিল প্রতিনিধিদলকে তার সাথে সাক্ষাৎকারের সুযোগ দেন। ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যায় বঙ্গ ভবনে সিপিআই (এম) প্রতিনিধিদলের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎকারের সময় বাংলাদেশের বামপন্থী নেতা কাজী জাফর আহমেদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দর আকবর খান রনো উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধে সিপিআই (এম) এবং বিশেষ করে জ্যোতি বসু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় তার প্রশংসা উল্লেখ করে শেখ মুজিবুর রহমান সিপিআই (এম)-কে ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সে মৈত্রীর সম্পর্কের ক্রমোন্নতি ঘটিয় দু'দেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে এবং অভিন্ন শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যৌথ ভূমিকা গ্রহণে সিপিআই (এম) বরবার দু'দেশের জনগণের সাথে জনগণের সম্পর্ক সুনিবিড় করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। সিপিআই (এম)-র নেতৃত্বে পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারগুলো সবসময় বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের সাথে সুপ্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। অনেক দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক চুক্তি ছাড়াও নিয়মিত সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান করা হয়েছে।

১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতের জনগণের, বিশেষ করে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে যে উষ্ণ মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে দুদেশের প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে চির অক্ষয় করে রাখতে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকে 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান' গড়ে তুলেছে, যা নির্মাণে বাংলাদেশের শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সহায়তা নেয়া হয়েছে। ১৯৭১ সালের বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের নেতা, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ২০১৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর মৈত্রী উদ্যানটি উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধে সিপিআই (এম) যে ভূমিকা পালন করেছে তা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে এক স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে।

মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে আসার কয়েকটি ঘটনা

গোলাপের কথা

হায়দার আনোয়ার খান জুনো

[১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিযোদ্ধা আহসান উল্লাহ শেখ গোলাপ জয়দেবপুরে পাক সেনাদের হাতে ধরা পড়েন। অন্য কয়েকজনের সঙ্গে লাইনে দাঁড় করিয়ে বর্বর পাক সেনারা গুলি চালিয়েছিল। গোলাপও গুলিবিদ্ধ হন, কিন্তু কৌশলে পালিয়ে যেতে ও ভাগ্যক্রমে বেঁচে যেতে সক্ষম হন। গোলাপ তখন ছিলেন 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির সক্রিয় সদস্য। এখনও তিনি তিনটি বুলেট বুকে নিয়ে বেঁচে আছেন। মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসার সেই ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন তারই এককালীন সহকর্মী ও কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির সেই সময়ের অন্যতম নেতা এবং বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা হায়দার আনোয়ার খান জুনো। তার লেখা প্রবন্ধটি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত নতুন দিগন্তে ছাপা হয়েছিল। নিচে প্রবন্ধটি ঈষৎ সংক্ষিপ্ত আকারে পুনরায় ছাপা হল।]

গোলাপের কথা বলছি। এই গোলাপ ফুল নয়, সে একজন মুক্তিযোদ্ধা। একাত্তরের বেদনাময় স্মৃতি এখনও লালন করে চলেছে বুকের মাঝে। সিনেমার স্লো মোসানের মতো প্রায়ই চোখের সামনে ভাসে সেই বিভীষিকাময় স্মৃতি। একটা দুঃস্বপ্ন। খালের পাড়ে ওরা তিনজন বন্দী সারিবদ্ধভবে দাঁড়ানো। দশ-বারো গজ সামনে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে পাকসেনারা। যেন সাক্ষাৎ যমদূত। বার্স্ট ফায়ারের শব্দ। বুকে সুতীব্র যন্ত্রণার একটা ঝলক।

গোলাপের বেঁচে যাওয়াটা একটা অলৌকিক ঘটনা। মোট চারটা বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল। বুকের ডান পাশে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপর একটা বের করা হয়। তিনটা বুলেট এখনও আছে। ডান কাত হয়ে শুতে পারে না। বুকের মধ্যে খোঁচা দেয়। মনে করিয়ে দেয় একাত্তরের সেই রক্তঝরা দিনগুলোর কথা।

আহসানউল্লা শেখ গোলাপ। জন্ম গাজীপুর জেলার ভবানীপুর গ্রামে। গোলাপদের আদি বসতি ছিল শিবপুর উপজেলার মাসিমপুর গ্রামে। ওর বাবা পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে শিক্ষকতার সুবাদে শিবপুর ছেড়ে ভবানীপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন।

ঊনসত্তরের ২০ জানুয়ারী আসাদের মৃত্যু ও পরবর্তী গণঅভ্যুত্থান যখন সারা পূর্ব বাংলাকে আন্দোলিত করে তোলে, গোলাপও তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই আন্দোলনে। এ সময় সে বাম রাজনীতির নেতাদের সংস্পর্শে আসে এবং ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি কৃষকদের মধ্যে কাজ করার তাগিদ অনুভব করে। সত্তরের মাঝামাঝি সময়ে গোলাপ নিজ এলাকা গাজীপুর ফিরে আসে।

বি.এস.সি. পরীক্ষা দিয়ে গাজীপুরের ভবানীপুর হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেছে। তার পাশাপাশি কৃষকদের মধ্যেও কাজ করছে। কৃষক মুক্তি সমিতি, ঢাকা উত্তর অঞ্চলের আহ্বায়কও নির্বাচিত হয় গোলাপ।

ঊনসত্তর ও সত্তর সালে টঙ্গী শিল্প এলাকায় কাজী জাফর আহমেদ ও হায়দার আকবর খান রনোর নেতৃত্বে ঘেরাও আন্দোলনসহ ব্যাপক জঙ্গী আন্দোলন হয়। পুরো টঙ্গী শিল্প এলাকা বামদের একটা ঘাঁটি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। টঙ্গীর জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে জয়দেবপুরে। মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরী ও কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের শ্রমিকরা পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন (যার সভাপতি ছিলেন কাজী জাফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক হায়দার আকবর খান রনো)-এর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হতে থাকে। জয়দেবপুরে নেতৃত্ব দেন নূরুল আনোয়ার ও গিয়াসউদ্দিন।

১৯৭০-এর ১ মে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ)-এর কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সংগঠনের নতুন নামকরণ হয়– পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন। আমাকে (হায়দার আনোয়ার খান জুনো) সভাপতি ও আতিকুর রহমান সালুকে সাধারণ সম্পাদক করে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম যে কমিটি গঠিত হয়, গোলাপ তার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়। সম্মেলনে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের মূল শ্লোগান নির্ধারিত হয়– মেহনতী জনতার সাথে একাত্ম হও। এই শ্লোগানের ভিত্তিতে ছাত্রদের শ্রমিক-কৃষকের মাঝে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

গোলাপ তখন কাজ করছে গাজীপুর এলাকায় কৃষকদের মধ্যে। নূরুল আনোয়ার আর গিয়াস কাজ করছেন জয়দেবপুরে শ্রমিকদের মাঝে। আর টঙ্গীতো বামদের শক্তিশালী ঘাঁটি। সব মিলিয়ে টঙ্গী, জয়দেবপুর, গাজীপুর–এই বিশাল এলাকা জুড়ে বামদের তখন বিরাট প্রভাব।

প্রকাশ্য সংগঠনের পাশাপাশি গোপন বিপ্লবী সংগঠনের কাজও চলছিল সেখানে। পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের নেপথ্যে চালিকা শক্তি ছিল 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পুর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'। মাঝে মাঝে এই সমন্বয় কমিটির গোপন বৈঠক বসতো জয়দেবপুর ও গাজীপুরে। কমিটির কেন্দ্রীয় নেতারা 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা'র রণনীতি ও রণকৌশল ব্যাখ্যা করতেন। দাবি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জনগণের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। শুধু

বিচ্ছিন্ন হওয়াই যথেষ্ট নয়। জাতীয় মুক্তি ও শোষণ মুক্তি– দুটো লক্ষই অর্জন করতে হবে। আর সেটা সম্ভব একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই। তাই গ্রামে গ্রামে কৃষকদের ভেতর কাজ করতে হবে– গ্রামাঞ্চলে গড়ে তুলতে হবে সশস্ত্র গেরিলা ঘাঁটি।

একাত্তরের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির শেষ সার্কুলার আসে গোলাপের হাতে। তাতে সশস্ত্র সংগ্রামের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার কথা ছিল। স্থানীয়ভাবে বোমা বানানো আর অস্ত্র সংগ্রহের কথাও বলা হয়েছে। গোলাপ ভাবে, ভাওয়ালের গড় থেকে মধুপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল কি হতে পারে না সশস্ত্র যুদ্ধের একটা আদর্শ ঘাঁটি?

বাংলাদেশে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু হয় একাত্তরের ১৯ মার্চ জয়দেবপুরে। সেদিন জয়দেবপুর চৌরাস্তা ও ভাওয়ালের রাজবাড়ির কাছে জমা হয় হাজার হাজার জঙ্গী জনতা– হাতে তাদের লাঠি, সড়কি, বল্লম। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে শ্লোগান ধ্বনিত হচ্ছিল মিছিলে মিছিলে। কাজী আজিমুদ্দিন মাস্টার তাঁর ব্যক্তিগত বন্দুক থেকে পাক বাহিনীর অবস্থানের উপর প্রথম গুলি ছোঁড়েন। জনতার হাতে তখন আরো পাঁচটা বন্দুক। সেখান থেকেও গুলি ছোঁড়া হয়। কিন্তু পাকবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে সেদিনের মত জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় রহমত ও মনু মিঞা।

পঁচিশে মার্চের পর জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বাঙালি সৈনিকরা বেরিয়ে আসে এবং ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কিশোরগঞ্জের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পথে তারা বিভিন্ন জায়গায় কিছু অস্ত্র ফেলে যায় বা লুকিয়ে রাখে। নূরুল আনোয়ার, রোকন, গোলাপ, ফজলু, আকবর, ইকবাল, পলুরামসহ আরো কয়েকজন এই অস্ত্র সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়। কয়েকদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিভিন্ন এলাকা থেকে এইসব অস্ত্র সংগ্রহ করে এক গোপন জায়গায় সব জমা করা হয়।

এরপর শুরু হয় যোদ্ধা সংগ্রহের কাজ। বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি আর ভাসানী ন্যাপের জঙ্গী যুবকরা এসে যোগাযোগ করতে থাকে রোকন আর গোলাপের সাথে। প্রাথমিক পর্যায়ে গাজীপুরের এক দুর্গম জঙ্গলে একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। দায়িত্ব নেন পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসা দু'জন বাঙালি সৈনিক। এদের নেতৃত্বে পাক বাহিনীর উপর

ছোটখাটো কয়েকটা আক্রমণও পরিচালনা করা হয়। এসব কর্মকাণ্ডে এলাকাবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন। সশস্ত্র কার্যক্রমের পাশাপাশি রাজনৈতিক কার্যক্রমও চলতে থাকে। গাজীপুরের মির্জাপুর, রাজেন্দ্রপুর, ইজ্জৎপুর ও শ্রীপুরে কৃষক ও সাধারণ মানুষের মাঝেও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু এলাকার ওপর বামপন্থীদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে দেখে বামবিরোধী যোদ্ধারা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে থাকে। ভালুকার হামিদ বাহিনী ও টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীর লোকজন এসে রোকন, গোলাপ ও অন্যান্য সাথীদের কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য চাপ দেয়। পাশাপাশি ওদের অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ারও হুমকী দেওয়া হয়। এই অবস্থায় রোকন শিবপুর যায় পরামর্শের জন্য। শিবপুর তখন বামদের একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ঘাঁটি। প্রায় মুক্তাঞ্চল বলা যায়। শিবপুরে গিয়ে রোকন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, কৌশলগত কারণে ত্রিপুরার বিভিন্ন ট্রেনিং ক্যাম্পে ছেলেদের পাঠাতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রোকনের নেতৃত্বে প্রায় ১০০ জনের একটা দল ত্রিপুরা চলে যায়। রোকনের বড় দুই ভাই ছাত্রলীগের নেতা। তারা ত্রিপুরার দুটো ট্রেনিং ক্যাম্পে রিক্রুটিং-এর দায়িত্বে ছিল। এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে রোকন ছেলেদের পর্যায়ক্রমে ঐ দুই ক্যাম্পে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে।

গাজীপুরে বাকী যে ছেলেরা রয়ে যায়, তাদের শিবপুরে পাঠানো হয় সেখানকার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য। আপাতত গাজীপুরের কার্যক্রম বন্ধ।

কয়েকদিন খুব খাটা-খাটুনী গেছে। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অস্ত্র আর গোলাগুলি এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে। তারপর সেগুলো ভালোমতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, গ্রীজ লাগিয়ে পলিথিনে জড়িয়ে গোপন জায়গায় লুকানো হয়েছে। কিছু দিনের জন্য ওগুলো আর ব্যবহার করা হবে না। গোলাপ নিজের কাছে রেখেছে একটা স্টেন ও গুলি ভর্তি দুটো ম্যাগজিন।

১৩ অক্টোবর। সন্ধ্যার দিকে গোলাপ গিয়ে উঠলো ভবানীপুর গ্রামে আওয়ালের বাড়িতে। পরদিন ভোরে শিবপুরের পথে রওনা দিতে হবে। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বে যেসব এলাকায় সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে সেসব এলাকার প্রতিনিধিদের একটা বৈঠক হবে

শিবপুরে।

আওয়াল গোলাপের পূর্বপরিচিত ও বিশ্বস্ত। আওয়ালরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বিড়ি বানায়। জঙ্গলের মাঝে একটা মাটির ঘর, ওপরে ছনের ছাউনি। গোলাপের গায়ে অল্প অল্প জ্বর, শরীরটা অবসন্ন। আওয়াল তার ঘর ছেড়ে দিয়েছে গোলাপের জন্য। আর স্বামী স্ত্রী দাওয়ায় বসে কাজ করছে।

গোলাপের মাথায় হাজারো চিন্তা। এলাকার যে ছেলেরা ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং নিচ্ছে, তারা ঠিক মতো ফিরে আসবে তো? গায়ে বাম গন্ধ থাকার জন্য বিপদের সম্ভাবনা থাকে। রোকন তার দলবল নিয়ে ঠিক মতো ফিরে আসলে আবার পুরো দমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হলে বামশক্তি কি তাদের ঘাঁটিগুলো আরো শক্তিশালী করতে পারবে না? এখন যারা যুদ্ধ করছে তাদের প্রায় সবাই ছাত্র ও শিক্ষিত যুবক। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য কৃষকদের সম্পৃক্ত করতে হবে– তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

যুদ্ধের রণকৌশল নিয়ে চিন্তা করতে করতে গোলাপ ঘুমিয়ে পড়ে। খুব ভোরে তার ঘুম ভেঙে গেলো। বাইরে কিসের যেন আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে– ছপ্ ছপ্ ছপাত-ছপাত। তবে কি...? গোলাপ আর চিন্তা করতে পারছে না। একবার স্টেনটা হাতে নিলো, আবার কি চিন্তা করে সেটা ঘরের কোনায় রেখে দিল। তারপর লাফ দিয়ে বাইরে এসে দেখে কুড়ি-পঁচিশ গজ দূর দিয়ে পাক বাহিনীর একটা দল এগিয়ে আসছে। গোলাপ দৌড়ে ঘরের পিছনের দিকে চলে এলো। কিন্তু পর মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেখানে অস্ত্র উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দশ বারোজন সৈন্য। আর কোনো উপায় নেই। গোলাপ ধরা পড়ে যায়।

ঘরের মধ্যে পাওয়া যায় গোলাপের স্টেন আর কিছু কাগজপত্র। টেনে হিঁচড়ে কমান্ডিং অফিসারের কাছে নিয়ে আসা হয় গোলাপকে। গোলাপ দেখলো সামনের মাঠে আরো কয়েকশ' গ্রামবাসীকে ঘিরে রেখেছে সৈন্যরা। একটা বিশাল এলাকা জুড়ে কমবিং অপারেশন চলছে। একটা হেলিকপ্টার উড়ছে আর সেখান থেকে নিচের কমান্ডিং অফিসারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

গোলাপের স্টেন দিয়েই তার পিঠের উপর আড়াআড়ি ভাবে একটা প্রচণ্ড বাড়ি মেরে নাম জিজ্ঞেস করা হলো।

আহসানউল্লা

প্রকৃত নাম আহসানউল্লাহ হলেও গোলাপ নামই সে সবার কাছে পরিচিত। কমান্ডিং অফিসারের কাছে গিয়ে কে যেন বললো, 'স্যার, এর নামই গোলাপ।' তারপরই শুরু হলো রাইফেলের বাড়ি আর বুটের লাথি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গোলাপ জ্ঞান হারায়। জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখলো, যে কয়েকশ' গ্রামবাসীদের আটক করা হয়েছে, তাদের ট্রাকে তোলা হচ্ছে। সেনা সদস্যদের কথাবার্তা থেকে সে বুঝলো, ওদেরকে মাইল তিনেক দূরে রাজেন্দ্রপুর কেন্দ্রীয় অস্ত্র কারখানায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে পাকবাহিনীর একটা বড় ক্যাম্প আছে।

গোলাপকে টেনে দাঁড় করানো হলো। তারপর এক সৈন্য অশ্রাব্য গালাগালি দিয়ে বললো, 'তোদের অস্ত্র কোথায় আছে? সেখানে আমাদের নিয়ে চল।' বিশ-পঁচিশ জনের একটা দল গোলাপকে নিয়ে চললো। সারা পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। ডান পা ঠিক মতো ফেলতে পারছে না। পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে। শরীরের ওপর নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনা বিলুপ্তপ্রায়। একটা যন্ত্রের মতো গোলাপ হেঁটে চলেছে। কি প্রশ্ন করা হচ্ছে, কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। ঘণ্টা দুয়েক হাঁটার পরে গোলাপ আবার জ্ঞান হারায়।

প্রায় অচেতন অবস্থায় গোলাপকে জীপে করে নিয়ে আসা হলো রাজেন্দ্রপুর ক্যাম্পে। তখন বিকেল চারটার মতো হবে।

গোলাপকে একটা শাল গাছের সাথে বাঁধা হলো। বীভৎস চেহারার দৈত্যের মতো এক সেপাই হাসতে হাসতে গোলাপের দিকে এগিয়ে আসে। তারপর হঠাৎ করে ডান হাতের উপরে কাঁধের কাছে রাইফেলের বাট দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলো। আর একজন একটা চোখা রড দিয়ে অনবরত খুঁচিয়ে চলেছে ডান হাতের বিভিন্ন জায়গায়। গোলাপের কাছে তার ডান হাতটা অস্তিত্বহীন মনে হচ্ছে– একেবারে অসাড়, অনুভূতিশূন্য।

সামনে কয়েক শ' বন্দী গ্রামবাসী। তাদেরকে বেদম পিটানো হচ্ছে আর প্রশ্ন করা হচ্ছে, গোলাপের সাথের অন্য মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় থাকে– তাদের নাম কি– অস্ত্র কোথায় আছে, এইসব।

রাতে মাটির তলার একটা ঘরে গোলাপকে ঢুকানো হলো– ঢুকানো ঠিক নয়, অনেকটা ছুড়ে ফেলা হলো। সেখানে আরো পঞ্চাশ জনের মতো বন্দী। এরা

সবাই মির্জাপুর ইউনিয়নের লোক– গোলাপের পরিচিত। এই পরিচিত পরিবেশে গোলাপের মনোবল একটু চাঙ্গা হল– শরীরের জ্বালা যন্ত্রণা কিছুটা ভোলার চেষ্টা করলো।

১৫ অক্টোবর সকাল

গোলাপকে মাটির তলার ঘর থেকে উপরে নিয়ে আসা হয়েছে। তারপর ঢুকানো হলো লোহার শিক দিয়ে ঘেরা একটা ছোট্ট ঘরে। সেখানে আগে থেকেই ছিল আরো দু'জন বন্দী– তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। গোলাপ মুসলমান জেনে তাদের একজন গোলাপকে অনুরোধ করলো, 'ভাই আমাদের একটু কলমা শিখিয়ে দেবেন। কলমা বলতে পারলে হয়তো রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।' কিন্তু তাদের আর কলমা শেখার সৌভাগ্য (?) হলো না। তার আগেই তাদেরকে ঐ ঘর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

গোলাপকেও ঐ ছোট্ট সেলে বেশীক্ষণ থাকতে হলো না। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় দোতলা বাড়ির একটা অফিস ঘরে। সেখানে কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা ঘণ্টা খানিক ধরে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। এই প্রশ্নপর্বে কখনো ভয়ভীতি দেখানো হয়, আবার দুই এক ঘা লাঠির বাড়িও পড়লো। শেষ পর্যায়ে এক অফিসার এসে হঠাৎ খুব সদয় ব্যবহার শুরু করে। এককাপ গরম চা আসে। অফিসার নিজের হাতে একটা দামী সিগারেট জ্বালিয়ে গোলাপের হাতে তুলে দেয়। তারপর একজন খাঁটি বাংলাদেশের দরদীর মতো বলতে শুরু করে, 'দেখ ইয়াং ম্যান, আমি যদি বাঙালি হতাম, তা হলে আমিও তোমার মতো পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তাম।' তারপর গলার স্বর নামিয়ে আশেপাশে কেউ আছে কিনা দেখে আবার বলতে শুরু করে, 'এরা তোমাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু তুমি একজন খাঁটি মুক্তিযোদ্ধা। আমি তোমাকে সম্মান করি। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তোমার বেঁচে থাকা দরকার। তুমি যদি তোমাদের অস্ত্র কোথায় আছে, আমাকে জানিয়ে দাও, তার বিনিময়ে আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে মুক্তি দেবো।'

গোলাপের একবার মনে হলো, সত্যিই তো, সে যদি মুক্ত হতে পারে, তবে আবার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, তার বাঁচার কোন আশা নেই– অস্ত্র কোথায় আছে দেখিয়ে দিলেও না, না-দিলেও না। তবে কেন সে অস্ত্র দেখিয়ে দেবে? একদিকে মুক্তির অতিক্ষীণ হাতছানি– অন্য

দিকে কঠিন বাস্তব– পাক বাহিনীর হাতে মৃত্যুই তার একমাত্র পরিণতি। না, মনে কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। সে সরাসরি অফিসারকে বললো, 'আমার কাছে আর কোন অস্ত্র নেই। আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।'

অফিসার তখন গোলাপের মাথার চুল ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'ইয়াং ম্যান, তোমার সাহস আছে। ঠিক আছে, তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজন কোথায় আছে, তাদের ঠিকানা আমাকে দাও। তাদের কাছে কোন খবর পৌঁছানোর থাকলে আমাকে বলো, আমি ব্যবস্থা করে দেবো।'

কিন্তু গোলাপের কাছ থেকে আর কোন তথ্য বের করা সম্ভব হলো না। ঘণ্টা খানিক পরে তাকে একটা জীপে করে নিয়ে আসা হলো রাজেন্দ্রপুর রেল স্টেশনে। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় গোলাপকে ওঠানো হয়। কিছুক্ষণ পরে আরো দু'জনকে তোলা হলো সেই কামরায়। এরা দুজনেই গোলাপের পূর্বপরিচিত। একজন ছাত্র, নাম আবদুর রশিদ। অন্যজন কুদ্দুস, কৃষি কাজ করে। ট্রেন জয়দেবপুর এসে থামলো। সেখানে আগে থেকেই একটা আর্মির ট্রাক ও কয়েকজন সৈন্য দাঁড়িয়ে ছিল। গোলাপদের সেই ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হয় গাজীপুরের ভাওয়াল রাজবাড়ীর আর্মি ক্যাম্পে। সেই ক্যাম্পে একটা সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে গোলাপের বিচার হলো। শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। রশিদ ও কুদ্দুসের বেলায়ও একই রায়।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত তিন আসামীর জন্য খাবার এলো– রুটি আর ভুনা মাংস। গোলাপের ডান হাত আসাড় হয়ে আছে। নাড়ানোর ক্ষমতা নেই। এক সেপাই এসে একটু রুটি আর মাংস তার মুখে গুঁজে দিল। প্রায় দেড়দিন পর মুখ দিয়ে খাবার ঢুকছে। কিন্তু গোলাপের ক্ষিদে নেই। কিল ঘুসি খাওয়ার ফলে মুখের ভিতরে যে রক্তক্ষরণ হয়েছে, তাই ভিতরে ঢুকে গিয়ে পেট ফেঁপে আছে। গোলাপ কিছুই খেতে পারলো না।

১৫ অক্টোবর রাত ন'টা

গোলাপদের তিনজনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গুলি করে হত্যার করার জন্য। পনেরো বিশ জনের একটা দল ওদের নিয়ে এলো ভাওয়াল রাজার শ্মশানে। এসময় রশিদ বলে উঠলো, 'আমরা মুসলমান, শ্মশানে কেন মারবে? আমাদের খালের ধারে নিয়ে গুলি করো।'

শ্মশান ঘাট থেকে ওদের তিনজনকে রাস্তার ধারে খালের পাড়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হলো। একদম ডানে কুদ্দুস, মাঝে গোলাপ, আর শেষে রশিদ। গোলাপ লক্ষ করে, রশিদ তার হাতের বাঁধন খুলে ফেলেছে। গোলাপও তার হাতের বাঁধন কিছুটা আলগা করতে সক্ষম হয়।

চারিদিকে অন্ধকার। দূর থেকে মাঝে মাঝে শিয়াল কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। ঘাতকরা মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালিয়ে বন্দীদের অবস্থান দেখে নিচ্ছে। ওরা দাঁড়িয়ে আছে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। এখনই গোলাপের চব্বিশ বছরের জীবনের ইতি ঘটতে চলেছে। তার এই মৃত্যু কি অন্য সাথীদের আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করবে? এই যুদ্ধ কতদিন চলবে? দেশ নিশ্চয়ই একদিন হানাদার মুক্ত হবে। কিন্তু সে ইতিহাস তো গোলাপের আর জানা হবে না।

সামনে পাক সেনাদের কথাবার্তা হাঁকডাক শোনা গেল। এখনই বোধ হয় অন্তিম মুহূর্ত। কি জানি কেন, গোলাপ একটু বাঁ দিকে ঝুঁকে গেলো। আর সাথে সাথেই একটা ঝাঁকুনি খেলো সে। গোলাপ বুঝতে পারলো না, গুলিবিদ্ধ হলো নাকি গুলির শব্দ শুনতে পেলো। বুকের মাঝে প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে সে খালের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। গুলিতে কুদ্দুসের বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সে খালের পাড়ে পড়ে আছে। কিন্তু রশিদ পাশে নেই। সে গুলির আগেই খালের পানিতে ডুব দিয়ে সরে গেছে। গোলাপের ডান বুকে গুলিগুলো তেরছাভাবে ঢুকেছে। অসহ্য যন্ত্রণা। বুঝতে পারছে, যে কোন সময় সে মারা যাবে।

ঘাতকরা খালের পাড়ে টর্চ ফেলে দেখলে দুজন পড়ে আছে। তৃতীয়জন কোথায়? ওদের মধ্যে রীতিমতো হৈচৈ বেধে যায়। ঘাতকরা ওদের ফেলে রেখে আশেপাশে 'তিসরা আদমী'র খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। এই তো সুযোগ। গোলাপকে বাঁচার শেষ চেষ্টা করতে হবে। দেহ আর মনের সমস্ত শক্তি এক করে গোলাপ তার শরীরকে খালের পানিতে ভাসিয়ে দেয়।

মিনিট পনেরো পরে ঘাতকরা ফিরে এসে দেখে, মৃতদেহ মাত্র একটা। তখন তারা চারিদিকে গোলাগুলি শুরু করে দেয়। কিন্তু ততক্ষণে গোলাপ বেশ দূরে সরে এসেছে। রাত বারোটার দিকে গোলাপ কোন মতে সাঁতরিয়ে ভরুলিয়া গ্রামে এসে পৌঁছায়। বুকের ব্যথা ক্রমে তীব্রতর হচ্ছে। সারা শরীরে প্রচণ্ড কাঁপুনি। নিয়ন্ত্রণহীন শরীরটা কোন মতে টানতে টানতে গোলাপ তার এক

দূর সম্পর্কের আত্মীয় হাফিজউদ্দিনের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। নিস্তেজ কণ্ঠে কয়েকটা ডাক দিয়েই সে জ্ঞান হারায়।

হাফিজউদ্দিন ঘরের বাইরে এসে দেখেন গোলাপ মাটিতে পড়ে আছে– সারা শরীরে রক্ত। চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিয়ে এবং কিছুক্ষণ বাতাস করার পর গোলাপের জ্ঞান ফিরে আসে। গোলাপ খুব সংক্ষেপে তার ঘটনা বর্ণনা করে। হাফিজউদ্দিনের মনে হয়, গোলাপের জন্য ভরুলিয়া গ্রাম নিরাপদ নয়। তাই তিনি সেই রাতেই কখনো নিজে কাঁধে নিয়ে আবার কখনো নৌকায় করে গোলাপকে জয়দেবপুরের পূবে ক্ষুদেবরমী খেয়া ঘাটে নিয়ে যায়। সেখানে গোলাপকে বসিয়ে তিনি ডাক্তারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন।

১৬ অক্টোবর ভোর

সূর্য উঠি উঠি করছে। গোলাপ গাছের গুঁড়ির উপর একা বসে আছে। দুই একজন লোক তার সামনে দিয়ে যাচ্ছে আসছে। তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে– কিন্তু কেউ কিছু বলছে না।

একটু পরে ওপার থেকে যাত্রী বোঝাই একটা নৌকা এসে ঘাটে ভিড়লো। যাত্রীরা সব নেমে গেলে গোলাপ বহু কষ্টে নৌকায় গিয়ে উঠলো। গোলাপের সারা শরীর রক্তমাখা। কিন্তু মাঝিও তাকে কোন প্রশ্ন না করে ওপারে নিয়ে যায়। মাঝির সাহায্যে কোনমতে পাড়ে নামতেই একজন বয়স্ক লোক গোলাপের বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করে। বাড়ি ভবানীপুর শুনে তিনি বলে উঠলেন, 'আরে তুমি গোলাপ না? তোমার এ অবস্থা কেন?'

সব শুনে তিনি তাড়াতাড়ি আরো কয়েকজনের সাহায্যে গোলাপকে এলাকার একটা বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে স্থানীয় একজন ডাক্তারের কাছে তার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো।

গোলাপ কিছুটা সুস্থ হলে, লোক পাঠিয়ে শিবপুরের সাথে যোগাযোগ করে। দুই তিন দিন পরে শিবপুর থেকে ক'জন মুক্তিযোদ্ধা এসে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত গোলাপ শিবপুরেই ছিল। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসায় নিয়োজিত ছিলেন ডাক্তার রমিজউদ্দিন। তিনিই গোলাপের চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। কিন্তু সীমিত ব্যবস্থায় গোলাপের বুকের বুলেট বের করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পর ঢাকায় নবগঠিত মুক্তিযোদ্ধা হাসপাতালে গোলাপের বুকের একটা বুলেট বের করা হয়। কিন্তু অন্য তিনটা

বুলেট আর বের করা যায় নি।

মুক্তিযুদ্ধের পর চৌত্রিশ বছর পার হয়েছে। আজও বুকের মাঝে লালনকরা বুলেটগুলো মাঝে মাঝে খোঁচা দেয়। একটা চাপা যন্ত্রণা অনুভব করে গোলাপ। দেশ তো স্বাধীন হলো। কিন্তু জনগণের মুক্তি কি এসেছে? এই চৌত্রিশ বছরে বহুবার ক্ষমতার রদবদল হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দলও ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু জনগণের পক্ষের কোন দল ক্ষমতায় বসে নি। যে আদর্শ ও চেতনা নিয়ে গোলাপ ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও একাত্তরের সশস্ত্র সংগ্রামে সচেতনভাবে অংশ নিয়েছিল সেই বামধারার বহু বড় বড় নেতা ধনীক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলোতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বামশক্তি আজ বহু ধারায় বিভক্ত ও দুর্বল। বুকের বুলেটগুলো আজ তাই তাকে বেশী করে যন্ত্রণা দেয়। তাকে কি আমরণ এই যন্ত্রণা বহন করে চলতে হবে? কার কাছে এর উত্তর পাবে গোলাপ?

২৫ মার্চ, জগন্নাথ হলের হত্যাকাণ্ড

আবুল ফজল

[১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে জগন্নাথ হলে বর্বর পাকসেনারা শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী সকলকেই লাইনে সারিবেধে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছিল। সেই ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী আবুল ফজল। কমরেড আবুল ফজল জগন্নাথ হলের ছাত্র না হলেও সেই রাতে তিনি কোন কারণে বন্ধুর সঙ্গে হলে শুতে গিয়েছিলেন। তখন তিনি 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র সিলেট জিলার সক্রিয় কর্মী। সদ্য একটি সরকারী চাকরীতে যোগ দিয়েছেন, কিন্তু ছাত্রত্বের গন্ধ তখনও ছিল। তিনি 'বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নও করতেন। সেই রাতে তারও নিহত হবার কথা ছিল। কিছুটা ভাগ্যক্রমে, কিছুটা কৌশলে তিনি বেঁচে যান। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার সেই ঘটনাবলী নিচে তাঁর সাক্ষাৎকারে বর্ণিত আছে। সাক্ষাৎকারটি ক্যাসেটে ধারণ করা হয়েছিল ১৯৯৯ সালের ৭ অক্টোবর। সাক্ষাতকারটি নিয়েছিলেন রুহুল মতিন। এই সাক্ষাৎকারটি 'শাহরিয়ার কবীর' সম্পাদিত 'একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেটিই নিচে হুবহু তুলে ধরা হল।]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে আমি ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে। আমার স্কুল জীবনের বন্ধু, জেনারেল সি আর দত্তের ভাগ্নে শিশুতোষ দত্তের ৮/এ রুমে। ওর রুমটা ছিল পূর্বদিকে এক্সটেনশন বিল্ডিং-এ, এখন যার নাম অক্টোবর ভবন। পহেলা মার্চ অফিসের ট্রেনিং-এর কাজে ঢাকা এসে আমি এই রুমেই উঠেছিলাম। তখন আমি চাকরি করি পোস্টাল সার্ভিসে।

এক তারিখে ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের মিটিং মুলতবি ঘোষণা করায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার মত সমগ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। মূলতঃ এ সময় থেকেই বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বাড়ছিল ধীরে ধীরে।

২৫শে মার্চ রাত আনুমানিক ১২টার দিকে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙে। বাইরে বেরিয়ে দেখি পূর্বদিকে গেটের কাছে, যেখানে রাস্তার উপর গাছের গুড়ি দিয়ে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছিল, সেখানে বেশ কয়েকটা মিলিটারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গুড়ি সরিয়ে না যেতে পেরে তারা বিশ্রী ভাষায় গালাগালি করছিল। তারা কয়টা গাড়ি নিয়ে এসেছিল সঠিক মনে নেই। কারণ গাড়ির সংখ্যা গোনার মত মানসিক অবস্থা তখন ছিল না। তাছাড়া আমাদের রুমটা থেকে দেয়ালের কারণে সব কিছু পরিষ্কার দেখাও যাচ্ছিল না। তবে মনে হল সংখ্যায় ৮/১০টা হবে।

পূর্ব দিকের গেটের ঠিক রাস্তার ওপারে জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা স্যারের বাসা। ওখান থেকেই গুলির শব্দটা পাচ্ছিলাম, হঠাৎ মেয়েলি কণ্ঠের প্রচণ্ড চিৎকার। নিশ্চিত হলাম কিলিং শুরু হয়েছে। শিশুতোষ-এর বিছানায় আমি

ও আমার আরেক সিলেটি বন্ধু মোস্তাক ছিলাম। অন্য আরেকটি বেডে ছিল শিবু নামে আরেকটি ছাত্র(!) মোস্তাক ইংরেজীতে অনার্স পড়ত আর শিবু সম্ভবত উদ্ভিদবিদ্যায় অনার্স। ৭ই মার্চের পর সে ঢাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু ওই দিন সন্ধ্যায় নীরেন নামে তার এক অতিথি নিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে আসে। সন্ধ্যা বেলায় পুরানা পল্টনের একটা রেস্টুরেন্টে মোস্তাক, আমি ও শিশুতোষ খাবার দাবার সেরে যখন রুমে আসি তখন ওদের দু'জনকে দেখি। শিবু কল্যাণপুরে টিউশনি করত। সম্ভবতঃ ওই কারণেই সে চলে আসে।

যা হোক, প্রথমে আমি রুম থেকে বেরিয়ে পাশের একটা রুমে গেলাম। আর্মিরা তখন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা স্যারের বিল্ডিং-এর পাঁচ তলার ছাদে বাংলাদেশের যে পতাকা উড়ছিল ওটাকে মেশিনগান দিয়ে গুলি করে নামানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না।

জীবনে কখনও মেশিনগান দেখিনি, এ রকম অবস্থার মধ্যেও পড়িনি, যদিও ছাত্র রাজনীতি করেছি দীর্ঘদিন ধরে এবং তখনও পর্যন্ত আমার রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ঠিক বুঝে ওঠতে পারছিলাম না কি করব।

পাশের রুমে কাঁচের জানালা দিয়ে দেখি আর্মিরা গেটের তালা ভাঙছে ভিতরে ঢোকার জন্যে। আমাদের রুমে তখন ছিল পেট্রোল ডিনামাইট পাউডার। ওগুলো সংগ্রহ করে রেখেছিলাম, ককটেল বোমা বানাব বলে। ওগুলো একটা টিনের মধ্যে ছিল। প্রথমে আমরা ওই প্রমাণগুলো সামনে মাঠের মধ্যে ফেলে দিলাম। ফেলে দিয়ে ভেবেছি তারা আমাদের কিছু করবে না।

আর্মিরা ভিতরে ঢুকেই হল লক্ষ্য করে প্রচণ্ড গুলি শুরু করল। আমরা ওই রুমটা ছেড়ে ক্রলিং করে টয়লেটে এসে আশ্রয় নিলাম। একটু পরেই নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। খেয়াল করে দেখলাম সামনের সুধীরদার ক্যান্টিনের টিনের চালে আগুন দিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে।

টয়লেটের খুবই সংকীর্ণ জানালা দিয়ে শরীর গলিয়ে নিচে নেমে যাই। আমার সাথে টয়লেটে শিবুও ছিল। অর্থাৎ প্রত্যেক টয়লেটেই আমরা দু'জন করে আশ্রয় নিয়েছিলাম। নিচে নেমেই আমরা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের রুমটাতে ঢুকে পড়ি। সাথে সাথে আমি আমার গায়ের গেঞ্জি কিছুটা ছিঁড়ে ফেলি। পরনে লুঙ্গিটা থাকল। আমার গায়ের রং অতন্ত সাধারণ। ওরা যাতে বুঝতে না পারে আমি ছাত্র, তাই এ কাজ করলাম। এরপর দেয়াল টপকে আমি

ড্রেনে পড়ি। মাথা উঁচু করে দেখি সামনে মিলিটারি। আবার দেয়াল টপকে ভিতরে আসি এবং সামনে টিন শেডে গিয়ে মালি, সুইপার ও অন্যান্য চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাথে মিশে যাই। আমার সাথে সুভাষ, শিবু ও নীরেন ছিল। সামনে মাঠের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি কয়েকটা মৃতদেহ পড়ে আছে। হয়ত ওরা পালানোর চেষ্টা করেছিল। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে আরো কয়েকটা মৃতদেহ। সামনে মেইন হলে ওরা গুলি করছে। জি সি দেব-এর বাসার দিকেও গুলি হচ্ছিল। আমরা যখন দেয়াল টপকেছি তখন মোস্তাকও টপকেছিল। তারপর পাগলের মত জোরে দৌড় দিয়েছিল, সোজা চলে গিয়েছিল কালীবাড়ির দিকে। দৌড়ানোর সময় আর্মিরা গুলি ছুড়েছিল পিছে পিছে। কিন্তু মারতে পারেনি ওকে।

মিলিটারিরা আমাদের দেখতে পাচ্ছিল। আমরা ভাবলাম ওরা আমাদের ছাত্র ভাববে না। মালি বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কেউ ভাববে; কিছু বলবে না। আমাদের সাথে মালি সুইপারদের কিছু মেয়ে সদস্যও ছিল।

এ সময় দু'জন আর্মি সেপাই এল। উর্দুতে বলল, 'সমস্ত পুরুষ মানুষ আলাদা হয়ে যাও।'

আমি ভাবছি, আল্লাহ জানেন আমাদেরকে এবার আলাদা করে কি করবে।

এ সময় তারা চেলা কাঠ দিয়ে দু'একজনকে পিটান শুরু করল। আমাকেও মারল। এরপর আমাদেরকে নিল মাঠের মধ্যে লন্ড্রির কাছে। সম্ভবঃ ওটা বর্তমান পূজামণ্ডপটার কাছে ছিল। লন্ড্রির সামনে সামান্য পাকা জায়গায় আমাদের বসিয়ে বলল, বিহারী কারা আলাদা হয়ে যাও।

এ সময় যারা একটু উর্দু জানে নিজেদের বিহারী বলল এবং আলাদা হয়ে গেল। আমি তখন ভাবছি বিহারীদের ছেড়ে দেবে, আমাদের মেরে ফেলবে। আমাদের যাদের বাঙালি ভেবেছে তাদেরকে পূর্বপাশের রাস্তা পার করে গুহঠাকুরতার কোয়ার্টারে আনল। ততক্ষণে শিক্ষকদের এ ভবনের অপারেশন শেষ করে ফেলেছে। ঢুকে পড়েছে মেইন ক্যাম্পাসে। আমাদেরকে দিয়ে ওখন থেকে লাশগুলো টেনে আনাল জগন্নাথ হল ক্যাম্পাসে। আমার মনে আছে, আমি ডঃ মনিরুজ্জামান স্যারের মৃতদেহটা বয়ে এনেছিলাম। উনি গুহঠাকুরতা স্যারের উপরে থাকতেন। মনিরুজ্জামান স্যারের বাসা থেকে আরও দুটো যুবকের লাশ আনি। আমরা শুধু রাস্তা পার করে কিছুটা ভিতরে রাখি। এখান থেকে অন্য একটা গ্রুপ বয়ে নিয়ে যায়

মেইন বিল্ডিং-এর দিকে (বর্তমান জি সি দেব ভবন)। আমাদেরকে ওদিকে নিয়ে যায়। ওখানে পৌঁছে দেখি মেইন বিল্ডিং-এর সামনে অনেকগুলো মৃতদেহ পড়ে আছে। বিল্ডিং-এর ভিতরে ঢুকে দেখি মেঝেতে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে অনেকগুলো মৃতদেহ।

নিচ তলার ডান দিকে একটা দেহ, সম্ভবত ছাত্রই হবে, প্রায় অর্ধেক পুড়ে গেছে। এখানে বেশ কয়েকটা লাশ পড়েছিল। কয়েকজন লোক ওগুলোকে বয়ে আনছিল। ওই লাশগুলোর একটা দেখলাম আমার বন্ধু শিশুতোষ দত্তের। আমরা ছিলাম তিন সিলেটী বন্ধু– শিশুতোষ, মোস্তাক ও আমি। মোস্তক ও আমার কারণে শিশুতোষ নিজের সিট ছেড়ে দিয়ে মেইন বিল্ডিং-এর ৮৪ নং রুমে চলে এসেছিল। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর মৃতদেহটা ধরে এনে লাশের স্তুপে রাখলাম। ওর গায়ের জামাটা রক্তে লাল হয়েছিল। এ সময় পাশেই দেখলাম আমাদের সাথে ধরা পড়ার সময় যারা বিহারী দাবি করেছিল, তাদের লাশগুলো। বুঝতে পারলাম ওদেরকে দিয়ে মৃতদেহ বহন করিয়ে তারপর মারা হয়েছে।

আমাদের ৬/৭ জনের গ্রুপটাকে মারার জন্য আর্মির লোকরা জগন্নাথ হলের শহীদ মিনারের কাছে দাঁড় করাল। তখন প্রায় ভোর হয়। ওদের সমস্ত অপারেশন শেষ হয়ে গেছে। আমরাই ছিলাম সর্বশেষ ব্যাচ। আমার সাথে এ ব্যাচে ছিল সুভাষ ও শিবু।

আমাদের ঠিক পূর্বদিকে মেইন রোডের কাছে দেয়ালটা ভাঙা ছিল। ওখান দিয়ে ছাত্ররা যাতায়াত করত। এখানে দেখলাম কিছু আর্মি চা খাচ্ছে খোশমেজাজে। ফাঁকা দিয়ে দু'একটা আর্মি কনভয় চলতে দেখা যাচ্ছে। হয়ত তারা ঢাকা শহরের অপারেশন শেষ করে ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছে। আমাদেরকে দাঁড় করাল উত্তর দিকে মুখ করিয়ে। উত্তর-দক্ষিণ লাইনটার পিছন দিকটা বেঁকে ছিল পুকুরের দিকে। ১০/১২ হাত সামনে একজন সৈন্য তার মেশিনগানটা উঁচিয়ে ধরল গুলি করার জন্য। তার পিছনে বসা অফিসারটির নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিল।

হঠাৎ অফিসারটি নির্দেশ দিল মেশিনগান নামিয়ে ফেলার। কারণ তখন লাইনের ঠিক পিছনে পুকুর থেকে একজন অফিসার হাত মুছতে মুছতে এদিকে আসছিল। আমাদের উপর গুলি চালালে হয়ত সেও মারা পড়ত।

আমি ছিলাম লাইনের ঠিক মাঝখানে। নিজেকে লুকানোর সুযোগ

খুঁজছিলাম। সুভাষ তখন আমাকে বলল, 'বেঁচে থেকে আর কি হবে, ওরা ডঃ জি সি দেবকেও মেরে ফেলেছে।'

যা হোক, অফিসারটি থামার নির্দেশ দেয়ার পর সিপাহিটা হাতের মেশিন গানটাকে পিছন দিকে ঠেকিয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। পকেট থেকে দুটো সিগারেটের প্যাকেট বের করল। আমার পরিষ্কার মনে আছে একটা গোল্ড লিফ আর একটা কিং স্টার্ক, অপারেশনের সময় ওরা স্যারদের বাড়ি লুটপাটও করেছিল। সম্ভবতঃ ওই সিগারেট ওখান থেকে নিয়ে এসেছিল। সিপাহিটা পিছন দিক থেকে আসা সৈনিকটির দিকে কিং স্টর্ক-এর প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিল। আর হাতের গোল্ড লিফ এর প্যাকেট থেকে একটা স্টিক বের করে আরামসে টানছিল অন্যমনস্কভাবে। আমি তখন ক্লান্তিতে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম কমান্ডিং অফিসারটি পিছন ফিরেছে অর্থাৎ পূর্বদিকে কি যেন দেখছিল। একটু এগিয়ে গেল চলে যাওয়া সৈন্যদের দিকে। অমনি আমি বসা থেকে স্লিপ করে শুয়ে গেলাম লাশের মধ্যে। আমি যে লাশটার উপর শুলাম ওটা ছিল জগন্নাথ হলের এক গার্ডের। তার দেহ থেকে সাংঘাতিক ভাবে রক্ত বেরুচ্ছিল। আমার পুরো মুখে ও শরীরে বিভিন্ন অংশে রক্ত ভরে গেল। এ কারণে বোঝা যাচ্ছিল না আমি জীবিত না মৃত। হঠাৎ ব্রাশ ফায়ারের শব্দ। আমার উপর কয়েকটা মৃত দেহ ছিটকে পড়ল। এর পরেও তারা বেছে বেছে কয়েকটা দেহের উপর গুলি করল। তখনও আমি বেঁচে গেলাম।

বেশ কিছুক্ষণ শুয়েছিলাম মৃতের স্তুপের ভিতর। শুনতে পাচ্ছিলাম আর্মিরা তাদের হত্যাযজ্ঞ শেষ করে দিনের আলো ফোটার আগেই ব্যারাকে রওনা দিয়েছে। ওরা চলে যাওয়ার ৫/৭ মিনিট পর পর্যন্ত শুয়ে ছিলাম।

মাথা উঁচু করে দেখে নিলাম সবাই চলে গেছে কি না। কোন আর্মি দেখলাম না। হঠাৎ টিন শেড বিল্ডিংটাতে প্রচণ্ড জোরে অনেকের এক সঙ্গে কান্নার শব্দ শুনলাম। মহিলা বাচ্চা সবাই দৌড় দিয়েছে এদিকে কাঁদতে কাঁদতে। কারো হাতে জগ, কারো হাতে গ্লাস, ঘড়া বা অন্যকিছু। ওদের অনেকেরই প্রিয়জনের লাশ পড়েছিল এ লাশের ভীড়ে। হয়ত আশাও ছিল– কেউ না কেউ বেঁচে আছে। ওদের আসা দেখে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম যে, আর্মি চলে গেছে। ওরা এসে কারো কারো মুখে পানির ঝাপটা দিচ্ছে। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে দৌড়দিলাম উত্তরের গেটের দিকে। ঠিক এ সময় মৃতের স্তূপ থেকে উঠে দৌড় দিল আর একটা ছেলে। ছেলেটার বাড়ি পরে

শুনেছি, বাজিতপুরে। সে ছাত্র নয়, এমনিতেই হলে থাকত।

আমি জগন্নাথ হলের সীমানা পেরিয়ে ওপারে একটা কোয়ার্টারে উঠলাম, সঙ্গে বাজিতপুরের ঐ ছেলেটি। বেশ কয়েকটা দরজা নক করলাম। কেউ খুলল না। আমি ছাদে উঠে পড়লাম। দেখলাম মাথার উপর একটা হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর একটা ছেলে এক জগ পানি নিয়ে দৌড়ে এল। বলল, 'আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম কিন্তু দরজা খুলতে পারছিলাম না। আমাকে খুলতে দিচ্ছিল না। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আপনাদের দেখতে।'

ছেলেটা আমাদের পানি খাওয়াল এবং বলল, আমি কী করব আপনাদের জন্য? আমি তো বেশি কিছু পারব না। এখানেই থাকেন দেখি কি করা যায়।'

ঘণ্টা খানেক থাকার পর আমি নিচে নেমে এলাম। দোতলা, কি তিন তলার একটা রুমে ঢুকলাম। এক ভদ্রলোক ছিলেন, ওনার পরিবার ছিল না। সবাইকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ৭ই মার্চের পর এরকম বেশির ভাগ লোকই তাদের পরিবারকে গ্রামে পাঠিয়েছিল। ঢাকা শহর প্রায় খালিই হয়ে গিয়েছিল। যা হোক উনি আমাকে বসতে দিলেন। আমার লুঙ্গি গেঞ্জি তখন রক্তে রঞ্জিত।

উনি আমাকে বললেন, 'আপনার লুঙ্গি গেঞ্জি রক্তমাখা। ওগুলো বড় প্রমাণ। তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকুন।'

বাথরুমে ঢুকে আমি বাংলা সাবান দিয়ে ভাল করে কাপড় চোপড় ধুলাম। নিজেকে পরিষ্কার করলাম। এরপর ধুয়ে ওই ভেজা কাপড়ই পরে নিলাম।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাদের তো এখানে' থাকা নিরাপদ নয়, অন্য জায়গায় যেতে হবে।'

তিন/চার ঘণ্টা পর উনি ভিতর দিকে আর একটা বিল্ডিং-এ নিয়ে গেলেন, আমাকে এবং বাজিতপুরের ওই ছেলেটাকে। ওই বিল্ডিং-এ ওঠার সময় দেখলাম সিঁড়িতে রক্তের দাগ। হয়ত এখানে অপারেশন করা হয়েছে অথবা কোন আহত ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছে।

ভদ্রলোক আমাদের জন্য ওখানটা নিরাপদ মনে না করে আবার নেমে এলেন, অন্য একটা বিল্ডিং-এ নিয়ে গেলেন। ওই বাসা থেকে হলের মাঠটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। দুপুর বেলার দিকে আর্মিরা একটা টুপিওয়ালা মোল্লাকে নিয়ে এল। দেখে গেল লাশগুলো। একটা মৃতদেহও কেউ সরায়নি। ২৬ তারিখ

বিকালের দিকে আর্মিরা বুলডোজার নিয়ে এল। লাশের স্তুপের ওপর দিয়ে বুলডোজার চালাল যেভাবে জমি চাষ করে– ঠিক সেভাবে। মনে হচ্ছিল যেন লাশের চাষ করছে, বর্বর অমানুষগুলো। কিছুক্ষণ চালিয়ে লাশগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে চলে গেল। কী অমানবিক দৃশ্য– চিন্তাই করা যায় না!

পরদিন সকালে কারফিউ তুলে নিলে মাঠে নামলাম। দেখলাম কারো হাত কারো পা বেরিয়ে আছে মাটির উপরে। অনেক খানি জায়গা জুড়ে ৫০/৬০টা মানব সন্তানের দেহ যেন চাষ করেছে নরপশুগুলো। সেই বীভৎস নারকীয় দৃশ্যের কথা ভাবলে এখনও গা শিউরে ওঠে। মানুষের এই নৃশংসতার কথা তো কোন দিন শুনিনি। মানুষকে পাখির মত গুলি করে মারতেও তো কোন দিন দেখিনি। ইতিহাসে পড়েছি হালাকু খান, চেঙ্গিস খানের কথা, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটতে পারে এই সভ্য পৃথিবীতে এবং আমাকে তা দেখতে হতে পারে কোন দিন এমন কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

ঠিক এ সময় দেখলাম আমার বন্ধু মোস্তাক কালীবাড়ির দিক থেকে এদিকে আসছে। আমাকে খুঁজছে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি জানতে পারিনি সে বেঁচে আছে কি না। মোস্তাক আমি আর শিশুতোষ ছিলাম খুব ছোট বেলার বন্ধু। মোস্তাক আর আমি যখন ওই বধ্যভূমি দেখছি এমন সময় পুকুরের দিক থেকে সুরেশকে আসতে দেখলাম। ওর কাঁধে কাপড় দিয়ে বাঁধা।

সুরেশ বলল, আর্মিরা ছাদের উপর লাইনে দাঁড় করিয়ে তাকেও গুলি করেছিল কিন্তু বেঁটে হওয়ায় তার কাঁধে গুলি লেগেছিল এবং মৃতের ভান করে লাশের মধ্যে শুয়েছিল।

আমি, সুরেশ ও মোস্তাক টিন শেডের কাছের এক ছোট্ট দোকান থেকে মুড়ি কিনলাম। তিন জন হেঁটে হেঁটে ঢাকা মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত গেলাম। সুরেশের চিকিৎসার দরকার ছিল, ওকে ওখানে ভর্তি করে মোস্তাক আর আমি সিলেটের পথে রওনা হলাম। যাওয়ার পথে তোপখানার মোড়ে দেখি আনোয়ার জাহিদ উঁকি দিয়ে কয়েকটা লাশ দেখছেন। বায়তুল মোকাররম পার হওয়ার সময়ও দেখেছি লাশ। অনেক জায়গায় নিরীহ মানুষের লাশ আর ঘর মুখো মানুষের স্রোত দেখতে দেখতে মাতুয়াইল এলাম হেঁটে। ওখানে আমার এক কলিগ বজলুর বাসায়। ওখানে দুইদিন পর ভাত খেলাম। বিকালে কিছু টাকা দিয়ে ও ডেমরা পার করে দিল।

তারপর সিলেট ফেরার রাস্তায় দেখেছি মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের

জোয়ার। তখনও বাংলাদেশের মানচিত্রওয়ালা পতাকা উড়ছে।

সাক্ষাৎকার : রুহুল মতিন

মিরেশ্বরাইয়ের বধ্যভূমি থেকে উঠে আসা অবধ্য প্রাণ

মৃদুল গুহ

['মুক্তিযুদ্ধে বামধারা' শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন মৃদুল গুহ (সদ্য প্রয়াত) ২০১২ সালে। এই গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদে লেখক বর্ণনা করেছেন তার জীবনের এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। ১৯৭১ সালে তরুণ মৃদুল গুহ ছিলেন 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র চট্টগ্রাম জিলা শাখার সক্রিয় কর্মী। তিনি একই সঙ্গে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নও করতেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তিনি আগস্ট মাসে পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং ১৭টি বেয়নেট চার্জ করা হয় তার দেহে। তারপর কিভাবে বধ্যভূমি থেকে কমরেড মৃদুল গুহ বেঁচে ফিরে আসলেন, সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে বইটির যে পরিচ্ছেদে সেই পরিচ্ছেদটি ইষৎ সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে তুলে ধরা হল।]

নাৎসী বা নাজী অত্যাচারের কাহিনী শুনেছি, হালাকু খান, নাদির শাহের অত্যাচারের কথা পড়েছি। চোখে দেখিনি কিংবা এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পাইনি। ১৯৭১ সালে এ শ্যামল মাটির দেশে ইয়াহিয়ার অত্যাচারের অভিজ্ঞতায় দুনিয়ার তাবৎ অত্যাচারীর অত্যাচারকে ভুক্তভোগীর অভিজ্ঞতায় আঁচ করতে পেরেছি। স্বাধীনতার এত বছর পরও সে অত্যাচারের কাহিনী বা স্মৃতি স্মরণ করলে এখনো সারা শরীর শিহরে উঠে। সুকান্তের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে, 'আদিম হিংস্র মানবিকতার আমি যদি কেউ হই, স্বজন হারানো শশ্মানে চিতা তোদের তুলবোই।' সত্যিকার অর্থেই আমরা একাত্তরের সে অত্যাচারী ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর চিতা এ মাটিতে তুলতে সমর্থ হয়েছিলাম। স্বাধীনতার স্মৃতিসৌধে আমরা আমাদের আকাংখার পূর্ণতা দিয়েছি। প্রতিশোধ নিয়েছি, নিজের মায়ের, বোনের, ভাইয়ের উপর অত্যাচারের। প্রতিষ্ঠিত করেছি ইতিহাসের সে অমর বাণীর। 'কোন অত্যাচারীই চিরস্থায়ী নয়। অত্যাচার যত বাড়বে, প্রতিরোধ তত শক্তিশালী হবে এবং শেষ পর্যন্ত অত্যাচারিতের প্রতিরোধেরই জয় হবে।' জয়ী আমরা হয়েছি সুদীর্ঘ সাড়ে নয় মাসের সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের সবুজ জমিনে লাল সূর্যের পতাকাকে বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে। জাতি হিসেবে আমাদের স্বাধীন সত্তাটিকে তুলে ধরে। নিজেদের এ স্বাধীন সত্তাটিকে তুলে ধরতে গিয়ে, স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে গিয়ে আমরা লাখে লাখে কাতারে কাতারে অকাতরে জীবন দিয়েছি। নিজেদের লাল রক্তে এ মাটিতে দেশপ্রেমের আল্পনা এঁকেছি। আর তাতে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য বধ্যভূমি, গণকবর। যাতে লিখিত হয়েছে একদিকে অত্যাচারীর পৈশাচিক অত্যাচারের কাহিনী এবং অত্যাচারিতের অর্জিত সাহসে অত্যাচার

মোকাবেলায় জীবন দেয়ার ইতিহাসের। ইতিহাসের এ বিস্তৃত ক্যানভাসের বর্ণালী বিস্তারে নিজেও কিছুটা স্থান রঞ্জিত করতে পেরেছিলাম। যার জন্য এ জাতির উদার অভ্যুদয়ের অহংকারে কিছুটা নিজেও গৌরবান্বিত হতে পারি। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের অহংকারে নিজেও হয়ে যাই স্পর্ধিত গৌরবের একজন গর্বিত সৈনিক-মুক্তিযোদ্ধা।

১৯৭১ সালের ৮ই আগস্ট। তখন মুক্তিযুদ্ধ প্রবল শক্তি সঞ্চয়ে দেশব্যাপী ব্যাপৃত। প্রতিবেশী ভারতে চলছে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে গ্রুপ, গ্রুপ ঢুকছে। আবার দেশ থেকে মরণজয়ী যুদ্ধে লড়ার আকাংখায় অনেকেই দল বেঁধে শত্রুকে ফাঁকি দিয়ে ভারতে যাচ্ছে প্রশিক্ষণ নিতে, অস্ত্র সংগ্রহ করতে। আমরা যারা বামপন্থী রাজনীতির প্রত্যক্ষ কর্মী এবং স্বাধীনতা যুদ্ধটা বহু আগেই শুরু করেছি, তারা কেউ কেউ ভারতে গেলেও অধিকাংশই দেশের অভ্যন্তরে থেকে যাই। আমাদের চিন্তা ছিল, দেশ থেকে সশস্ত্র রাজনৈতিক কর্মীরা সবাই যদি ভারতে চলে যায়, তবে জনগণের মাঝে একটা অসহায়ত্বের ভাব সৃষ্টি হতে পারে, তাই দেশের অভ্যন্তরে থেকে শত্রুর অস্ত্র কেড়ে নিয়ে শত্রুকে মোকাবেলা করার গেরিলা কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তাছাড়া আমাদের জন্য ভারতের মাটিতে সামরিক প্রশিক্ষণটা সহজসাধ্য ছিল না। কারণ ভারতের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী আমাদের কর্মীদের সেখানে 'নক্সাল' হিসেবে চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণ থেকে দূরে রাখতো, এমনকি অনেককে গ্রেপ্তারও করেছিল।

এছাড়া আমাদের কর্মীরা অনেকে নিজের রাজনৈতিক পরিচয় গোপন রেখে এফ. এফ হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল। সে সময়ে আমরা দেশের অভ্যন্তরে সকল স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তির সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে কিছু সামরিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু একটা পর্যায়ে সে তৎপরতা আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির অন্যতম প্রধান শরীক কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা (বাংলাদেশ) সমন্বয় কমিটির চট্টগ্রাম শাখার শামসুল আলমের (নয়াযুগ সম্পাদক) নেতৃত্বে চট্টগ্রাম শহরে, বোয়ালখালি, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, পটিয়া ও সাতকানিয়ায় সামরিক তৎপরতা চালিয়ে যাবার পাশাপাশি কিছু তরুণকে ভারতের প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণের জন্যে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। সে

সিদ্ধান্ত অনুসারেই আমরা কিছু কর্মীকে মিরসরাইয়ের মস্তান নগর হয়ে বেরুয়াইর ঘাট দিয়ে ফেনীখাল পাড়ি দিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশের জন্য ৮ই আগস্ট সকালে চট্টগ্রাম শহর থেকে ফেনীর বাসে খুব সকালেই রওয়ানা দিই। তৎকালিন বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের চট্টগ্রাম জেলার বিশিষ্ট নেতা ফালান সাহা ইতোপূর্বে বেশ কয়েকবার এ যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতে যাওয়া আসা করেছে। ভারতে অবস্থানরত নেতা এবং কর্মীদের সাথে তথা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সাথে এখানকার কমিটির যোগাযোগের মূল দায়িত্ব ছিল তার। সে কারণে পার্টির বিভিন্ন সার্কুলার, চিঠি, লিফলেট এবং নির্দেশাবলী সেই ফালান সাহা আনা নেওয়া করত। আমাদের প্রশিক্ষণের জন্য এবারেও ভারতে যাবার ব্যাপারে পথ দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল তার। ভারতে প্রশিক্ষণ শিবির পর্যন্ত যাবার পথে সেই থাকবে গাইড। আমরা দু'জন, তিনজন করে বাসে চড়ে মাস্তান নগর হাসপাতালে যাচ্ছি এভাবে সে পর্যন্ত যাব, তারপর সেখান থেকে গাইড হিসেবে ফালান সাহা নির্দিষ্ট পথে নিয়ে যাবে। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক কয়েকজন আগেই রওয়ানা হয়েছি মিরসরাইয়ের মাস্তান নগর গিয়ে সবাই মিলিত হব। অপু চৌধুরী (তৎকালীন পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের চট্টগ্রাম মহানগরীর দপ্তর সম্পাদক) আমার আগেই রওয়ানা দিয়েছে। আমি এবং সৈয়দ ওসমান (সৈয়দ ওসমানের বড় ভাই সৈয়দ জালাল উদ্দিন আহমদ, বোয়ালখালি এই সময় কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির জেলা নেতৃত্বে ছিলেন) সর্বশেষ জি পি ও'র সামনে থেকে বাসে চড়লাম। সৈয়দ ওসমান সিভিল সাপ্লাইয়ে চাকরী করত বলে পরচিতিপত্রও সাথে ছিল। আমাদের বাস এগিয়ে চললো। মিরসরাই থানার সামনে যখন আসলো হঠাৎ বাস থামিয়ে পাঞ্জাবী মিলিটারি এবং স্থানীয় কয়েকজন আলবদর বাস চেক করা শুরু করলো। সেদিন হঠাৎ করেই সেপথে মিরসরাই থানার সামনে চেক পোস্ট বসানো হয়েছিল। তরুণ যুবকদের প্রতি খান সেনাদের সন্দেহ ছিল বেশি। খান সেনাদের কাছে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় গোপন করে অন্য পরিচয় দিয়ে মোটামুটি উতরিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাধ সাধলো স্থানীয় আলবদর। তাদের বিভিন্ন জেরার জবাব দিতে গিয়ে আটকে গেলাম। বিশেষ করে স্থানীয় মাদ্রাসার সুপারিন্টেডেন্ট মাওলানা আজহার সোবহান (যার পরিচয় পরে জেনেছিলাম) এর বিভিন্ন প্রশ্নে আটকে গেলাম, তারা আমাকে এবং সৈয়দ ওসমানকে মুক্তিবাহিনী বলে সন্দেহ

করলো এবং থানায় নিয়ে গেলো। সেখানে গিয়ে দেখি আমাদের আগে আসা অপু চৌধুরী, বোয়ালখালির আব্দুল হামিদ, আকতার হোসেন (গোমদন্ডী), আবুল মোমেন, মনসুর আহমদ (গোমদন্ডী)। রাউজানের শাহাবুদ্দিন (শাহাবু)সহ আগের কিছু লোকজন আগেই এই চেক পোস্ট ফাঁকি দিয়ে আগেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেছিল এবং তারা ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণও নিয়েছিল। এছাড়া আমাদের আগে আরো একটি বাসে কক্সবাজারের জানে আলম, সাতকানিয়ার আব্দুল খালেক ও রাউজানের হারুণ ও কালাম ছিল। তারা কিভাবে জানি এই চেক পোস্ট উতরিয়ে গেছে। জানে আলম, আমি তার ভগ্নিপতি এডভোকেট শফিকুর রহমানের খলিফাপাট্টির বাসা থেকে নাস্তা করে বের হয়েছি। আবদুল খালেককে আমিই কালেক্ট করেছি। তারা পার হয়ে গেলো। অথচ আমরা আটকে গেলাম। পরে শুনেছি আমাদের পেছনেও একটি বাসে করে আমাদের কর্মী রফিক (সুলতানপুর) শফিক (গহিরা) এরা এসেছিল। এদেরকেও বাস থেকে নামিয়ে ফেলা হয়। এদের সাথে আমাদের আর দেখা হয়নি। এরাও শহীদ হয়েছে। আমাদের লোক ছাড়া এভাবে সেদিন ঢাকা চট্টগ্রামের বাস থেকে প্রায় শ দেড়েক তরুণ যুবককে খান সেনারা নামিয়ে ফেললো। সেদিন খান সেনাদের চেকে বিশিষ্ট স্থপতি এবং আবৃত্তিকার কাজী আরিফও পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি কিভাবে জানি উতরে যেতে পেরেছিলেন। আমরা যারা আটকে গেলাম, দুপুর দু'টার দিকে থানা থেকে থানার বিপরীতে মিরসরাই স্কুলে নিয়ে গেলো। স্কুলে ইতিপূর্বে পাঞ্জাবী ও বেলুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা ঘাঁটি গেড়েছিল। আমাদেরকে মিরসরাই স্কুলের মূলভবনের সামনে একতলা একটা ঘরে (সম্ভবতঃ স্কুলের এক্সেটেনশান বিল্ডিং) নিয়ে বন্দী করে রাখলো। এই ঘরে বেশ কয়েকটি কক্ষ ছিল। প্রত্যেকটি কক্ষেই বাস থেকে ধরে আনা লোকদের দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ভর্তি করা হলো। একজন পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেইনের নেতৃত্বে একটা হানাদার ট্রুপস আমাদের পাহারায় ছিল। এ সময়ে তারা এক একজন পর্যায়ক্রমে আমাদের উপর নির্যাতন চালাতে লাগলো। সে কি মার! বেত, লোহার রড, বন্দুকের বাট দিয়ে বেধড়ক মার! যতক্ষণ না কোন কথা বের করতে না পারছে, ততক্ষণ মার। কোন কথা বের হলে, আরো কথা বের করার জন্য আরো মার আর পাশবিক অত্যাচার বলৎকার। একজন হানাদার সৈনিক এসে সবাইকে এক ধারছে মার লাগিয়ে চলে যায়। আরেক জন এসে সবাইকে আবার মারতে

শুরু করে। একজন যুবক, সে সম্ভবতঃ চায়ের দোকানে চাকরী করতো, সে ঠিক মুক্তিবাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না। সেদিন সে পথে বাসে চড়ে যাচ্ছিল। তাকেও মুক্তিবাহিনী সন্দেহ করে আনা হলো। একজন বেলুচ সৈন্যকে দেয়া হলো, তার উপর নির্যাতন চালানোর জন্য। বিরাট এক গাছের টুকরো নিয়ে তাকে পিটানো হলো। মারে, বাপরে চিৎকার ছাড়া তার থেকে কোন কথা বের করতে পারলো না। সম্ভবতঃ তার কাছে বের করার মতো কোন কথা ছিল না। এক পর্যায়ে ঐ বেলুচ সৈন্যের ডিউটি পরিবর্তন হলো। এলো আরো তিনজন বেলুচ সিপাই। দায়িত্বে নিয়োজিত পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেইনের নির্দেশে দু'জন সিপাই ঐ যুবকের দু'পা দু'দিকে টেনে ধরলো। অপরজন সিপাই ঐ গাছ দিয়ে আলু ক্ষেতে ঢেলা গুড়ো করার মতো করে দু'পায়ের মাঝখানে পাছার অণ্ডকোষে সজোরে আঘাত করতে শুরু করলো। এভাবে উপর্যুপরি আঘাতের কারণে তার নিতম্ব ফুলে ফুটবলের মতো হলো। অণ্ডকোষ এবং লিঙ্গের অবস্থা আরো শোচনীয় হলো এবং অবশেষে ঘটনাস্থলেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। তার আর্ত চিৎকার সম্ভবতঃ সেখানে দূরে খেজুরগাছে বসা কালো ময়নাটিকে পর্যন্ত আহত করেছিল। কারণ ময়নাটি চেঁচিয়ে উঠে উড়াল দিয়েছিল। কিন্তু ঐ পাষণ্ড হানাদার দস্যুদের মন তাতে এতটুকু বিচলিত হয়নি। এই পাষ"রা ইসলামের নামে, ইসলামের দোহাই দিয়ে সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এ জাতির উপর। কিন্তু তাদের নির্মম অত্যাচারে সেদিন যে লোকটি মারা গেল, তার কোন দাফনের ব্যবস্থা তারা করেনি। তাদের অত্যাচারের শিকার ছিলাম সেদিন আমরা বন্দী প্রায় শ'দেড়েক লোক। আমাকে মারতে শুরু করলে প্রথম বেতের আঘাতেই হাতের আঙ্গুলগুলো কেটে গিয়েছিল এবং আঙ্গুল বেয়ে রক্ত ঝরছিল অবিরত। আমি যে রক্তাক্ত আঙ্গুলগুলো সামনে রেখে মেঝেতে বসা ছিলাম। আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই ধরনের কথা বলেছিলাম। ফলে আরো মারলে আরো কথা বের হবে– এই কৌশলটি আমার উপর কম প্রয়োগ হয়েছিল। তাছাড়া আমরা অপু, ওসমান, হামিদ যারা একই দলভুক্ত ছিলাম, এত অত্যাচারের মধ্যেও কেউ কারো সম্পর্ক প্রকাশ করিনি। তবে হামিদ সবার চাইতে বয়সে ছোট, আমাদের পার্টিতেও নতুন ছিল বিধায় অত্যাচারে কিছু কথা স্বীকার করেছিল। এই হানাদার দস্যুরা তথাকথিত ইসলাম রক্ষার জন্য এসেছিল বলে আমাদের বন্দী করে কাপড় উলটিয়ে মুসলমান কিনা পরীক্ষা করছিল। কারণ তাদের

ধারণা ছিল সম্ভবতঃ যারাই মুক্তিযুদ্ধ করছে, তারা সবাই ভারতের চর এবং হিন্দু। কোন মুসলমান ইসলামের স্বার্থে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। বারে বারে কলমা পড়েও আমাদের বন্দীদের মধ্যে যারা মুসলমান ছিল, তারা মুসলমানীর পরীক্ষায় এই হানাদারদের কাছে উত্তীর্ণ হয়নি। পরনের কাপড় তুলে মুসলমানী দেখানোর মাধ্যমে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। মুসলমানীর পরীক্ষায় অপু আটকে গেল, আমি আমার বৈশিষ্ট্যতার কারণে বেঁচে গেলাম। এভাবে এই ক্যাম্পে ক্রমাগত অত্যাচারে আর আর্ত চিৎকারে দিনের সূর্য হেলে পড়লো অস্তাচলে। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। ক্যাম্পের দায়িত্বে নিয়োজিত পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেইনের নির্দেশে বন্দীদের দু'ভাগ করা হলো। এক ভাগকে চট্টগ্রাম জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা হলো। অন্য ভাগকে দুনিয়া থেকে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হলো। হামিদ এবং আরো কয়েকজন প্রথম ভাগে পড়লো। আমি, অপু, ওসমানসহ মোট ৬৪ জন দ্বিতীয় ভাগে পড়লাম। আমাদেরকে আলাদা করে রাখা হলো। একজন বেলুচ সিপাই আমাদের সামনে এক বালতি পানি একটা এলুমিনিয়ামের মগ এনে ধরলো এবং আমাদের পানি খেতে বলা হলো। তখন সম্ভবতঃ রাত নয়টা কি দশটা। আমরা বুঝলাম আমাদের পরমায়ু শেষ হয়ে আসছে। অপু কানে কানে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমাদের কি মেরে ফেলবে। আমি বললাম, বোধহয়। সৈয়দ ওসমান খুব জোরে কলমা পড়ছিলেন, এক পর্যায়ে আমাকে বললেন, আপনার সাথে এসেই আটকে গেলাম। এরা তো আমাদের এখনই শেষ করে দেবে। কি করা যায়। আমি বললাম, স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে মেনে নেয়া ছাড়া এ মুহূর্তে আর কিছু দেখছি না।

তারপরে আমাদের চোখ মুখ বেঁধে ফেলা হলো। পিছমোড়া করে হাত দুটিও বেঁধে ফেললো। পিকআপ আনা হলো। চালের বস্তার মতো একজনের উপর একজনকে ছুড়ে মেরে পিক আপ ভর্তি করা হলো। কয়টি পিক আপ ভর্তি করা হলো, সেটি বলা সম্ভব ছিল না। কারণ আমাদের চোখ বাঁধা। অপু পড়েছিল আমার উপর। পিক আপ যখন চলতে শুরু করলো, মুখবাঁধা অবস্থায় অপু আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ওরা তো আমাদেরকে মেরে ফেলার জন্য নিয়ে যাচ্ছে, এখন কি করবি? আমিও মুখবাঁধা অবস্থায় বললাম, তোর যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে, তবে ঈশ্বরের নাম নে। আমাদের মৃত্যু হলেও দেশ স্বাধীন হবে। এটুকু বিশ্বাস নিয়ে মরতে পারিস। এছাড়া আর কিছু বলার নেই। পিক

আপে আমাদের মধ্যে আর কথা হয়নি। কারণ অন্যদের মুখবাঁধা গোঙ্গানি, হানাদার সৈন্যদের যে কজন ছিল তাদের বন্দুকের গুতোতে আর কিছু বলার অবস্থা ছিল না। পিক আপ চলতে লাগলো।

রাত্রির অন্ধকার মাড়িয়ে পিক আপ ভর্তি আমরা কজন হানাদারদের হাতে নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আর ভাবছিলাম আমাদের আসন্ন মৃত্যুটা কিভাবে হবে। ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক দিয়ে গাড়ি কিছুক্ষণ চলার পর মনে হল যেন গাড়ি মহাসড়ক থেকে নেমে ছোট রাস্তা দিয়ে টার্ন নিচ্ছে। ইট বাধা রাস্তা আঁচ করতে পারছিলাম ঝাঁকুনিতে। কোথায় এসেছি নিজেরাই জানি না। শুধু নিরবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা। এক সময় পিক আপখানি থামলো। মনে হলো, ইট বাধা রাস্তার উপরেই হবে। তারপর হানাদারদের এক একজন আমাদের দু'পা ধরে টান দিয়ে পিক আপ থেকে ফেলে দিচ্ছে এবং এক একজনকে দশ বিশ হাত দূরে দূরে করে ফেলছে। আমাকে এক সময় হানাদারদের একজন দুপা ধরে গমের বস্তা টানার মতো টান দিলো। ধুম করে পড়লাম রাস্তার উপর। সারা দিনের অত্যাচারের ক্ষত বিক্ষত দেহ নেতিয়ে পড়লো যেন। মাথায়ও ব্যাথা পেলাম খুব। কিন্তু মুখে কোন শব্দ করিনি। একজন এসে পা ধরে ইটের রাস্তার উপর কিছুদূর টেনে নিল। মাথায় রাস্তার ইটের সাথে ক্রমাগত বাড়ি পড়ছিল। এক সময় এখানে ফেলে রাখা হলো। অন্ধকারে খোলা আকাশের নীচে বন্দী অবস্থায় পড়ে রইলাম। তারপর এক সময় অনুভব করলাম রাইফেলের আগায় বেয়নেট লাগিয়ে সে বেয়নেট রাইফেলের সাহায্যে সজোরে আমার বুকে বিঁধিয়ে দেয়া হলো। বুকের পাঁজর কেটে বেয়নেট আমার শরীরকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। বেয়নেট তুলতে আমিসহ উপরের দিকে খানিকটা উঠে গেলাম। এ সময় বেয়নেটের প্রথম আঘাতেই আমি 'জয়বাংলা' বলে চিৎকার দিয়ে উঠলাম। খান সেনাদের একজন আরেকজনকে বললো, 'শালা লোক জয়বাংলা বলতি হে' এই বলে ক্ষিপ্ত হয়ে উপর্যুপরি বেয়নেটের আঘাত চালাতে লাগলো। আমি সাতটি পর্যন্ত গুনেছি, তারপর আর গুনিনি। মনে হলো, অন্যদের চেয়ে আমাকেই বেশি মারা হচ্ছে। কারণ আমি 'জয়বাংলা' বলাতে। বলা বাহুল্য, এই প্রথম আমি 'জয়বাংলা' শব্দটি উচ্চারণ করলাম। নতুবা আমাদের রাজনীতিতে যেহেতু আমরা 'জয়বাংলা'র বিপরীতে 'জয় সর্বহারা' শ্লোগান দিতাম সেহেতু 'জয়বাংলা' শ্লোগান আমাদের কখনো দেবারতো প্রশ্নই উঠেনি বরং বিরোধীতাই করতাম।

শুধুমাত্র হানাদারদের ক্ষেপাবার জন্যই আমি এই জীবনে প্রথম 'জয়বাংলা' শ্লোগান উচ্চারণ করলাম। অবশ্য পরবর্তীতে আর কখনো এ শ্লোগান আমি দিইনি বা এর রাজনীতিও করিনি। সে যাইহোক, এক পর্যায়ে হানাদাররা বেয়নেটের আঘাত করা থামালো এবং রাতের অন্ধকারে আমাকে মৃত মনে করে আবারও দুপা ধরে টান দিল এবং ছুঁড়ে মারলো। আমি প্রথমে শূন্যে পরে একটু ঠাণ্ডা অনুভব করলাম। মনে করলাম পানিতে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু না, ডুবছি না। বুঝলাম কাদায় পড়েছি। কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। আমার মনে হচ্ছিল, কিছুক্ষণের মধ্যে আমার প্রাণবায়ু নির্গত হবে। আমি মৃত্যুর ওপারে চলে যাব। দেখবো, মরণের পরে কি? মানুষ মরলে কোথায় যায়। সে সময় আমার মোটেই মাতাপিতা, ভাইবোন বা পরিবারের কেউ কিংবা পার্টির কারো কথা মনে হচ্ছিল না। আমি আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিলাম, কখন প্রাণ যায়। প্রাণ গেলেই আমি দেখব, মানুষ মরলে কোথায় যায়। স্বর্গ, নরক ইত্যাদি। তখন আমি ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র হলেও ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত হবার কারণে রাজনীতির বইপত্র বিশেষ করে বস্তুবাদী দর্শনের কিছু বইপত্র পড়েছিলাম। ঐতিহ্যগতভাবে ধর্মীয় সংস্কার এবং বস্তুবাদী দর্শনের প্রভাবে মৃত্যু সম্পর্কে এ ধরনের একটা অস্পষ্ট ধারণা এবং দ্বন্দ্বে এ সময় আমি ভুগছিলাম। ভাবছিলাম, এখনই যদি মৃত্যু হয়, তাহলে আমার সে মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তার দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হবে। কিন্তু না হলো না। অনেক্ষণ আমি মরছি না। প্রাণ যাচ্ছে না। তখন ভাবলাম, প্রাণ যখন যাচ্ছে না, এবার বাঁচার চেষ্টা করা যেতে পারে। আমার পরনের একটা সাদা কটন ট্রেটরোন কাপড়ের শার্ট দিয়েই আমার পেছনের হাত দুটি বাঁধা হয়েছিল। কোন রকমে হাত দু'টিকে পেছন দিকের বন্ধন মুক্ত করলাম। হাত মুক্ত হবার পর আমি অনায়াসেই চোখ, মুখ বন্ধনমুক্ত করতে সমর্থ হলাম। চোখ মুখে সামনের দিকে তাকালাম। দেখলাম, অন্ধকার। অন্ধকারে বিস্তৃতি দেখে মনে হলো, হয়তোবা সাগরের কুলে এনে ফেলা হয়েছে। আমার শরীরের যে সমস্ত জায়গায় রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, বিশেষ করে বুকের উপরের স্থানটি হাতের বন্ধনমুক্ত করে শার্ট দিয়ে বেঁধে ফেললাম। পেছনে খাড়া হয়ে আছে ইটের রাস্তা, সামনে বিস্তৃত অন্ধকারের সাগর। আমি একটা ছাড়া খেজুরের পাতা ধরে কোন রকমে পেছনের রাস্তায় উঠে দাঁড়ালাম। ডানে বাঁয়ে তাকালাম। কেবল অন্ধকার। একদিকে মনে হলো, যেন অন্ধকার একটু ঘন।

ভাবলাম, ঐদিকেই বোধ হয় কোন পাড়া আছে। আমি প্রাণপণে যতটুকু শরীরে শক্তি আছে, সবটুকু শক্তি দিয়ে ঐ পাড়ার দিকে দৌড়াতে লাগলাম। আমার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি হানাদাররা আমাকে দেখে ফেলছে, তারা আবার এসে আমাকে ধরে ফেলবে। আসলে তখন সেখানে হানাদারদের কেউ ছিল না। তারা সাথে সাথে চলে গিয়েছিল। একটা সন্ত্রাসের আতঙ্কভাব সৃষ্টি হয়েছিল বলে আমি সামনের দিকে দৌড়িয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইলাম। পাশে কার লাশ কোনদিকে পড়ে আছে, তা দেখার কথা আমি ভাবতেই পারছিলাম না। এক সময় দৌড়ে গিয়ে পাড়ায় এসে হাজির হলাম। পরে জেনেছিলাম, যে পাড়ায় এসে হাজির হয়েছি, সেটা মিরসরাই রেল স্টেশনের অদূরে তালবাড়িয়া গ্রামের এক পাড়া এবং যেখানে আমাদের খান সোনারা বেয়নেট চার্জ করে ছুড়ে ফেলেছিল সেটা ওয়ারলেজ চড়া, কোন সাগর নয়। মিরসরাইয়ের অদূরে যেহেতু বঙ্গোপসাগর। বর্তমানে সেখানে মুহুরী প্রকল্প; সেখানে কোথাও কাছাকাছি জায়গায় ফেলা হয়েছে বলে আমার ধারণাটি ভুল ছিল। যাই হোক, ঐ পাড়ায় এসে এক বাড়িতে ঢুকলাম। বাড়ির লোকজন তখন ঘুমে। ডাকাডাকিতে কোন সাড়া মিললো না। আমার বেশ তৃষ্ণা পেলো। চাইলাম পুকুরে গিয়ে পানি পান করবো। কিন্তু ঐ বাড়ির পুকুর ঘাটের দিকে যেতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ছুটে আসলো। ফলে পুকুর ঘাটে যাওয়া হলো না। বৃষ্টি শুরু হলো। একটা ছোট্ট কুঁড়েঘরের পৈঠায় গিয়ে চালার নিচে আশ্রয় নিলাম। অনেক ডাকাডাকি করলাম। ঘরের ভিতর থেকে কেউ বেরিয়ে এল না। সম্ভবতঃ ঐ বাড়ির সবাই ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। কারণ কয়দিন ধরে ঐ এলাকায় খান সেনাদের চরম অত্যাচার চলছিল। আমি তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে উঠলাম। হঠাৎ পৈঠার পাশে অদূরে একটা বদনা দেখতে পেলাম এবং সেখানে কিছু পানি পেয়ে তাই পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। সারারাত ঐ পৈঠার উপর রাত কাটিয়ে দিলাম। অন্ধকার ফেটে ভোর হতেই কয়েকজন লোক এলো। তারা জানতে চাইলো, আমার কি হয়েছে। তখন আমি এত ক্লান্ত এবং দুর্বল যে মুখে কথা বলার মতো শক্তি ছিল না। হাতের ইশারায় দু'জনকে ডাকলাম, বললাম, আমাকে একটা ডাক্তার দেখাতে। তারা ধরাধরি করে আমাকে মিরসরাই রেল স্টেশনে নিয়ে আসলো এবং স্টেশনের প্লাটফরমে শুইয়ে দিল। গ্রামে পালিয়ে আসা একজন ডাক্তারকে তারা কোত্থেকে নিয়ে এলো। ঐ ডাক্তার আমাকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যান্ডেজ

করে দিল। কিছু কিছু রক্তক্ষরণের জায়গা বন্ধ করা গেলেও সব বন্ধ করা যায়নি। ফলে তখনো আমার শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। কে একজন স্টেশনের চায়ের দোকান থেকে এক কাপ দুধ এবং এক টুকরো পাউরুটি নিয়ে এল। দুধটুকু মুখে দিতেই মনে হলো, আমি বুঝি এই মারা পড়লাম। এতক্ষণ মরিনি। কিন্তু এ দুধেই বোধহয় মারা পড়ছি। আমি আর দুধ খেলাম না। আসলে একদিন একরাত অনাহারে রক্তক্ষরণে আমার বুক গলা শুকিয়ে গিয়েছিল বলে ঐ দুধ গেলার সময় তাই মনে হলো। ঐ সময় ঢাকা চট্টগ্রাম লাইনে পাকিস্তানীরা দেশের অবস্থা স্বাভাবিক দেখানোর জন্য ট্রেন চালু করেছিল। দুয়েক দিন আগে। কিন্তু সে ট্রেনে যাত্রী থাকতো না। কিছুক্ষণ পর চট্টগ্রামগামী একটা ট্রেন এলো। সে ট্রেনের একটা কামরায় আমাকে কয়েকজন লোক ধরাধরি করে তুলে দিল এবং যেহেতু সমস্ত কামরাই খালি, সেহেতু ট্রেনের কামরায় পুরো একটা বেঞ্চিতে আমাকে শুইয়ে দিতে কষ্ট হলো না। একজন লোকও সাথে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সে লোক চাটগাঁ পর্যন্ত থাকে নি। পথে কোথাও নেমে পড়েছিল। আমি ট্রেনে চড়েই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লাম। চট্টগ্রাম স্টেশনে যখন ট্রেন এলো, তখন আমি বেহুস। গার্ড এসে মৃতপ্রায় আমাকে দেখে টেলিফোনে এ্যাম্বুলেন্স কল করে মেডিকেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে চার বোতল রক্ত দেয়ার পর পরের দিন আমার হুস এসেছিল। আমাকে ডাক্তার নাম জিজ্ঞেস করলে নাম বললাম, হামিদুল হক। আমি এ নাম নিয়েই ১৯৭১ সালে চলছিলাম। এ নামেরও একটা ইতিহাস আছে। ১৯৭০ সালে জলোচ্ছ্বাসের পর কুতুবদিয়ায় রিলিফ ওয়ার্কে যাবার সময় একই স্টীমারে পাঞ্জাবী সৈন্যরা আমাকে নাম জিজ্ঞেস করাতে আমি 'মৃদুল' বললে তারা 'হামিদুল' কিনা জানতে চেয়েছিল। সে নামটি আমার নামের উচ্চারণে আগে একটি 'হা' যোগ করলে সহজেই 'হামিদুল' হয়ে যায় বলে আমি ১৯৭১ সালে এ নামে চালিয়ে নিচ্ছিলাম। আমি আরো কয়েকটি নামও ব্যবহার করতাম এবং এগুলোই বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন স্থানে বলাতে হাসপাতালে ডাক্তার একদিন রাতে নিজকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের হিসেবে পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'হোয়াট ইজ ইওর রিয়্যাল নেম?' উত্তরে বলেছিলাম, রিয়্যাল নেম উইল কাম আউট ইন রিয়্যাল টাইম। হাসপাতালে এক নাগাড়ে সতের দিন চিকিৎসায় ছিলাম। ডাক্তাররা আমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে বেয়নেটের আঘাতে সতেরটি ক্ষত সনাক্ত করেছিলেন।

বেয়নেটের একটি ক্ষতই যেখানে মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। সেখানে সতেরটি ক্ষত নিয়ে আমি কি করে এ লাশের স্তুপ থেকে বধ্যভূমি থেকে ফিরে এলাম সত্যিই আশ্চর্যজনক। হাসপাতালে ছাড় নেয়ার দিন ডাক্তার আমাকে রসিকতা করে বললেন, আপনার শরীরে ক্ষতও সতেরটি, হাসপাতালে থাকলেনও সতের দিন। হাসপাতাল থেকে ছাড় পেয়ে আমি কিছুদিন আলকরণে এক বাসায় বিশ্রামে থাকার পর আবার রাউজান, রাঙ্গুনিয়া এবং বোয়ালখালি এলাকায় আমাদের পার্টির কর্মীদের সাথে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন গেরিলা কার্যক্রমে নিজকে নিয়োজিত করি। সে ইতিহাস এখানে না এনে এটুকু বলবো, সেদিন মূলতঃ আমার দ্বিতীয় জন্ম হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের একজন লড়াকু সৈন্য হিসেবে। খান সেনারা এবং তাদের এদেশীয় রাজাকার, আলবদর দোসররা মাওলানা আজহার সোবহানরা। যাকে দেশ স্বাধীন হবার পরই মারার জন্য আমি মিরসরাই গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার আগেই স্বাধীন দেশের মাটিতে স্থানীয় জনতা তাকে উপযুক্ত শিক্ষায় মেরে ফেলেছিল। বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে ও বধ করতে পারেনি। আমার অবধ্য প্রাণ তাদের হাতে বধ হবার নয়। সেদিনের খুনীরা যদি আবারও স্পর্ধা দেখায়, তবে এ অবধ্য প্রাণে তার বিরুদ্ধে লড়ে যাবো। একজন মুক্তিযোদ্ধার অমিত সাহসে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। এ প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ আমার। আমি বিশ্বাস করি এ উচ্চারণ আজ সকল মুক্তিযোদ্ধার। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তির।

লেখক পরিচিতি

মণি সিংহ (১৯০১-১৯৯০ এর ৩১ ডিসেম্বর)
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কিংবদন্তী নেতা। গত শতাব্দীর চল্লিশ দশকে ময়মনসিংহের গাড়ো পাহাড়ে সশস্ত্র হাজং বিদ্রোহের প্রধান নেতা। গত শতাব্দীর সোভিয়েত-চীন মহাবিতর্কের সময় তিনি সোভিয়েত লাইনের সমর্থক ছিলেন। পার্টি বিভক্তির আগেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি দীর্ঘদিন পার্টির সভাপতি ছিলেন।

রাশেদ খান মেনন
বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি অতি পরিচিত নাম। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ)-এর সভাপতি ও ডাকসুর সহ সভাপতি ছিলেন এবং মওলানা ভাসানীর সান্নিধ্যে থেকে কৃষকের লালটুপি আন্দোলনে ছিলেন। আন্তর্জাতিক সোভিয়েত-চীন মতাদর্শিক বিরোধের সময় তিনি চীনের লাইনের সমর্থক ছিলেন। ১৯৭০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী পল্টন ময়দানে প্রকাশ্যে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচী তুলে ধরার অপরাধে ইয়াহিয়ার সামরিক আদালত তাকে (তাঁর অনুপস্থিতে) সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি "কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তীতে তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে ওয়ার্কার্স পার্টি সংগঠিত করেন। বর্তমানে ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি এবং শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভার মন্ত্রী।

মনজুরুল আহসান খান
গত শতাব্দীর ষাটের দশকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য এবং শ্রমিক নেতা হিসাবে রাজনীতিতে অংশ নেন। বিশেষ করে পরিবহন সেক্টরে তিনি ষাটের দশকে শ্রমিক আন্দোলনে যেমন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা

পরবর্তীকালেও তেমনি পরিবহন সেক্টরে তিনি নতুন ধারার সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে তোলেন। ষাটের দশকে সোভিয়েত-চীন মহাবিতর্কের যুগে তিনি সোভিয়েতপন্থী পার্টির অংশের সঙ্গে ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি 'ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়ন' বিশেষ গেরিলা বাহিনী'র অন্যতম কমান্ডার ছিলেন। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার নেতৃত্ব মার্কসবাদ পরিত্যাগ করলে তিনি বিলোপবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করে পার্টিকে রক্ষা ও পুনর্গঠিত করেন। তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি ছিলেন, বর্তমানে পার্টির উপদেষ্টা। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের উপদেষ্টা হিসেবে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সংগ্রামী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছেন এবং নেতৃত্ব প্রদান করছেন।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

বর্তমানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ)-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি এবং ডাকসুর সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। গত শতাব্দীর ষাটের দশকেই তিনি গোপন কমিউনিস্ট পার্টির (সেভিয়েতপন্থী) সক্রিয় সভ্য হিসেবে রাজনীতিতে অংশ নেন। ১৯৭১ সালে 'ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়ন' বিশেষ গেরিলা বাহিনীর অন্যতম কমান্ডার। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করেন এবং আন্দোলন গড়ে তোলেন। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটলে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার নেতৃত্ব মার্কসবাদ পরিত্যাগ করলে তিনি বিলোপবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেন এবং পার্টিকে পুনর্গঠিত করে তার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

খালেকুজ্জামান

বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক। দলটির প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই তিনি উক্ত পদে রয়েছেন। তার আগে তিনি

জাসদের অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। ষাটের দশকে তিনি কিছুকাল দেবেন-শিকদার-আবুল বাশার-এর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তবে ১৯৬৯-এর পর তিনি ঐ পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ত্যাগ করেন। সোভিয়েত-চীন মহাবিতর্কের যুগে তিনি চীনের লাইনের সমর্থক ছিলেন। ষাটের দশকে তিনি চট্টগ্রামের বারবকুণ্ড এলাকায় একটি কেমিক্যাল কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন এবং চট্টগ্রামের শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৭১ সালে তিনি বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর) সরকারি মুক্তিফৌজের-এফএফ বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন।

শাহ আলম

বর্তমানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির (সোভিয়েতপন্থী) সভ্যপদ লাভ করেন। '৭১ সালে 'ন্যাপ-কমিউনিস্ট-ছাত্র ইউনিয়ন' বিশেষ গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে চট্টগ্রাম অঞ্চলে যুদ্ধ করেছেন। ইতোপূর্বে ১৯৬৯ সালে তিনি ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) চট্টগ্রাম শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

কাজী জাফর আহমদ (১৯৩৯-২০১৫)

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে তিনি ছিলেন অবিভক্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তীতে বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি। টঙ্গী অঞ্চলে সংগ্রামী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। সোভিয়েত-চীন মহাবির্তকের যুগে তিনি চীনপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৭১ সালে 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির'র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী পল্টন ময়দানে প্রকাশ্যে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচী তুলে ধরার অপরাধে ইয়াহিয়ার সামরিক আদালত তাঁকে (তাঁর অনুপস্থিতিতে) সাত বৎসর কারাদণ্ড প্রদান করে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি মার্কসবাদ পরিত্যাগ করেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি কিছু সময়ের জন্য ন্যাপ (ভাসানী)'র সাধারণ সম্পাদক ও ইউপিপি'র সাধারণ সম্পাদক

ছিলেন। তিনি জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভার মন্ত্রী ছিলেন। পরে এরশাদের মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

হায়দার আকবর খান রনো

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে তিনি অবিভক্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও পরবর্তীতে বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি টঙ্গী অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলন করতেন। ১৯৬১ সালে তিনি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। সোভিয়েত-চীন মহবিতর্কের সময় তিনি চীনের লাইনের সমর্থক ছিলেন। ১৯৭১ তিনি 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ওয়ার্কার্স পার্টি গঠনে ভূমিকা রাখেন এবং কিছুকাল ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ২০০৮ সালে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে ওয়ার্কার্স পার্টি ত্যাগ করেন এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। বর্তমানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য।

হায়দার আনোয়ার খান জুনো

ষাটের দশকে তিনি ছিলেন ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ)-এর সহ সভাপতি ও পরে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির অন্যতম সংগঠক। ১৯৭১ সালে তিনি শিবপুর অঞ্চলে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেন। বীরত্ব ও রণদক্ষতার জন্য তিনি তখন ঐ অঞ্চলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে তিনি কিছুকাল ন্যাপ (ভাসানী), ওয়ার্কার্স পার্টি (তখন নাম ছিল লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি) ও ইউপিপি করলেও, পরে সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হননি। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের গণসংস্কৃতি ফ্রন্ট ও বাংলাদেশ-কিউবা মৈত্রী সমিতির সভাপতি।

অধ্যাপক আবদুস সাত্তার

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে তিনি বরিশালে একটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তার আগে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) করতেন। ১৯৭১ সালে

তিনি বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের মুক্তিফৌজের বেইজ কমান্ডার ছিলেন। তবে 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল বিধায় তারা একত্রে যুদ্ধ করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি ওয়ার্কার্স পার্টির অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০৮ সালে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে তিনি ওয়ার্কার্স পার্টি পরিত্যাগ করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা।

আসাদুজ্জামান

সাংবাদিক।

মনির মুরশেদ

'৭১ সালে তিনি সর্বহারা পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সক্রিয় কর্মী ছিলেন। বর্তমানে লেখক ও গবেষক। তাঁর লেখা "সিরাজ সিকদার ও পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি ১৯৬৭-১৯৯২" বই থেকে কিছু অংশ এই সংকলনে সংকলিত হয়েছে।

ওহিদুর রহমান

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে ওহিদুর রহমান ছিলেন নাটোর জিলার তরুণ বাম নেতা। তিনি ন্যাপ (ভাসানী), কৃষক সমিতি ও ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ)-এর গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। গোপনে চীনপন্থী বলে পরিচিত পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির (নেতা আব্দুল মতিন) সদস্য ছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ সালে যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে রাজনৈতিক মতপার্থক্য দেখা দেয়ায় তিনি পার্টি হাইকমান্ডকে অস্বীকার করে স্বতন্ত্রভাবে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলেন এবং পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। বর্তমানে তিনি আওয়ামী লীগ করছেন।

নূর মহম্মদ

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে তিনি যশোর জিলায় ছাত্র ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন এবং চীনপন্থী বলে পরিচিত EPCP(ML)-এর তরুণ উদীয়মান

কমরেড ছিলেন। ১৯৭১ সালে পার্টি হাইকমান্ডের যুদ্ধ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাহ্য করে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। বর্তমানে তিনি লেখালেখি ও গবেষণা করছেন। কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন।

ডা. সারওয়ার আলী

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে তিনি গোপন কমিউনিস্ট পার্টির (সোভিয়েতপন্থী) সভ্য ছিলেন, অবিভক্ত ছাত্র ইউনিয়নের সহ সভাপতি ছিলেন এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি। ১৯৭১ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন।

গৌতম দাশ

বর্তমানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। তিনি দীর্ঘদিন সিপিআই (এম)-এর ত্রিপুরা রাজ্য শাখার মুখপত্র 'দেশের কথা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে CPI(M)-এর পক্ষ হয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং প্রয়োজন মত সহায়তা করতেন। বিশেষ করে বামপন্থী মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

ফারুক চৌধুরী

লেখক, গবেষক, অনুবাদক ও সাবেক সাংবাদিক।

আবুল ফজল

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে তিনি ছিলেন সিলেট জিলায় ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) প্রথম সহ সাধারণ সম্পাদক এবং পরে 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র সক্রিয় সদস্য। ১৯৭১ সালে তিনি সরকারী চাকরিতে যোগদান করলেও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

মৃদুল গুহ

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে এবং ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম জিলায় বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম সারির নেতা এবং 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র সদস্য। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে গিয়ে এক পর্যায়ে ধরা পড়েন এবং বর্বর পাক বাহিনী তাঁকে নির্মমভাবে ১৭টি বেয়নেট চার্জ করে মৃত মনে করে ফেলে রেখে গিয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে তিনি বেঁচে উঠলেও যুদ্ধে আর ফিরে যেতে পারেননি। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে চট্টগ্রামেই নানাভাবে পালিয়ে থাকতে হয়েছে। পরবর্তী জীবনে তিনি পেশা হিসাবে ওকালতি করেছেন। দর্শন বিষয়ের উপর কয়েকটা বই লিখেছেন। কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়ে ২০১৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

- # -